তুমি ও আমি, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, সাকার ও নিরাকার নিত্যত্বে মিলিত হইয়া একসাৎ হইয়া গেল—এক অদ্বিতীয় পরমাত্ম তত্ত্বে, পরম তত্ত্বে, পরকীয় তত্ত্বে; বিষয়তত্ত্বে, বস্তুতত্ত্বে, গুরুতত্ত্বে, পরিণত হইল। নিরঞ্জন বিষয়রত্নকে দেখিবামাত্র বিষয়ী, পরমাত্ম তত্ত্বের অতলস্পর্শ সমুদ্রগর্ভে আত্ম-হারা হইয়া ডুবিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই সেই নিরঞ্জন বিষয়রত্ন, নিরঞ্জন পরকীয় তত্ত্বের আকারে ব্যবহারিক রাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া, বিষয়ীর নিরঞ্জন নয়নে নিত্যকালের জন্য গাঁথিয়া, লাগিয়া, বিঁধিয়া গেল। সেই নিরঞ্জন বিষয়রত্নকে এখন আর কোন ক্রমেই নিষ্কাসিত করিবার উপায় নাই। যে দিকে, যে পদার্থের পানে সে দৃষ্টিক্ষেপ করে, সেই দিকে, সেই পদার্থে সেই নিরঞ্জন বিষয়রত্নকে তন্ময়, তদ্গত ও অপ্রভেদ অপরূপ যুগল মিলনে মিলিত দেখিতে পায়। সে এখন সেই নিরঞ্জন সমুদ্রের অন্ত ও পার, কূল ও তল ব্যবহারিক জ্ঞানে না পাইয়া চিরদিনের তরে হায় হায় করিতে লাগিল। বিষয়ীর এখনকার এই অদ্বৈতবাদ, তাহা আর দার্শনিক মতগত অনুমানাত্মক অদ্বৈতবাদ রহিল না। তাহা প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অনুভূতিমূলক এক অদ্বিতীয় নিরঞ্জন পরমতত্ত্বাকার ধারণ করিয়া প্রতিভাত হইল। ব্যষ্টীভূত স্বরাট পার্থক্য ভাব ব্যবহারিক সংস্কারের হস্তে স্বকীয় স্বরূপ ছায়ামাত্র ন্যস্ত রাখিয়া, সমষ্টিভূত অখণ্ড বিরাট ভাবের মধ্যে, অনুপ্রবেশ করিয়া আত্মাহারা হইল। এখানে "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"। এখানে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হওয়াতে বিষয়ী এখন ব্যষ্টিগত স্বরাট আত্মতত্ত্বরূপ শেষ গ্রন্থির বন্ধন হইতে প্রমুক্ত এক অদ্বিতীয় অখণ্ড পরব্রহ্ম তত্ত্বের সংশ্রবে তন্ময় হইয়া, যাবতীয় সংশয় হইতে নিত্যকালের তরে বিনির্ম্মুক্ত হইল। এখানকার এই অদ্বৈতবাদে আত্মপর ভেদভাব পরমাত্ম-মহাভাবের সমুদ্রগর্ভে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায়। এই মহাভাবাত্মক পরকীয় প্রেম সর্ব্বদিকে দিগন্ত-প্রসারী আদ্যন্তহীন স্বতঃসিদ্ধ বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে লীলানুগত হইয়া থাকে।

৮৩। জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে বহির্ব্বিষয় সন্দর্শনে ও সম্মিলনে বিষয়ীর যে অনাত্ম জ্ঞান স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা উপলব্ধ বিষয়ের বহিরঙ্গ প্রদেশ হইতে আত্মাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, আত্মার বহিরঙ্গে ঠেকিয়া পুনরায় বিষয়ান্তরালগত হইয়া স্বতঃই তন্মধ্যে অন্তর্মিত হইয়া যায়। তাহা কোন প্রকার আত্মাভিমানের সাক্ষাৎ স্ফূরণে স্বতঃই অসমর্থ। সেখানে বিষয়ের অনির্ব্বচনীয় মোহিনী শক্তি প্রভাবে এই আত্মাভিমানের বহিরঙ্গ পর্য্যন্তও বিষয়ীর নিকট স্বতঃই আবরিত থাকে এবং বিষয়ী কেবল বহির্ম্মুখে বিষয়জ্ঞান মাত্র লাভ করিয়া এবং যুক্তি ও অনুমানে স্বকীয় জ্ঞাতৃত্বের অভিমানী মাত্র হইয়া চিরকাল তাহাতে পরিতৃপ্ত থাকে। বিষয়ের মালিন্য হেতু বিষয়াঙ্গ হইতে আত্মাভিমুখে আসিয়াও আত্মস্থানে তাহার বহিরঙ্গ অসারূপ আমিত্ব মাত্র প্রকারান্তরে অনুভব করে, আত্মার সারাঙ্গ বিষয়ীর নিকট ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে সদ্‌গুরু বা সাধুরূপ রূপান্তরিত নির্ম্মল অন্তরঙ্গ সম্পন্ন নিরঞ্জন বিষয় সংশ্রবে বিষয়ীর তন্ময়ত্ব, স্বরূপত্ব ও তদাকারত্ব লাভ হেতু যে আত্ম জ্ঞান স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা কোন ক্রমে বিষয়ান্তরালগত, কারণান্তরালগত হইয়া লুক্কায়িত বা প্রাবৃত থাকিবার নহে। তাহা বিষয়ের অন্তরঙ্গের গভীর

প্রদেশ হইতে আত্মাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, আত্মার অন্তরঙ্গ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া, সেখানে তাহা বিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহা তখনও পর্য্যন্ত ব্যষ্টিগত ভাবে থাকিলেও বহু পরিমাণে মুক্ত ভাবাপন্ন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণে স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট, স্বতঃসিদ্ধ ও প্রকাশাত্মক সহজগম্য ও দৃষ্টিপথবর্ত্তী এবং বিষয় স্বরূপের সঙ্গে তাহার তদেকাত্ম ভাব জ্ঞাপক। একটীর উদয়ের সঙ্গে আর একটীর উদয় অবশ্যম্ভাবী। মনোযোগ মাত্রই, দৃষ্টিপাত মাত্রই, অবস্থা স্মরণ মাত্রই, ভাববেশ হইয়া স্বতঃই তাহার প্রকাশ হয়। কিন্তু জ্ঞানের পরমাত্ম প্রকোষ্ঠে সদ্‌গুরু বা সাধুরূপ নিরঞ্জন বিষয় দর্পণে বিষয়ীর যে স্বকীয় সমষ্টীভূত পরমাত্ম স্বরূপ সন্দর্শন, তাহা যার পর নাই ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট, নিত্যস্থায়ী ও স্বতঃই প্রকাশাত্মক। তাহা যাবতীয় বিষয়ের সঙ্গে অভেদাত্মক, যাবতীয় সাধু সজ্জনের সঙ্গে ত অভেদাত্মক হইবেই। তখন প্রত্যেক বিসয়ের সঙ্গে—যাবতীয়, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর অভেদ নিত্য যুক্ততা অভেদ নিত্য ভুক্ততা, অভেদ নিত্য একাত্মকতা, অভেদ নিত্য সাহিত্য, অপরিহার্য্য রূপে প্রকাশ পায়। পরিজ্ঞাত বিষয়-স্বরূপের ঐকান্তিক স্বচ্ছতা নিবন্ধন এরূপ সুপরিষ্কৃত নিত্য সিদ্ধ, নিত্য স্থায়ী, নিত্য দৃষ্টিপথবর্ত্তী দর্শন লাভ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। সেখানে মনোযোগের, দৃষ্টিপাতের, অবস্থা স্মরণের অপেক্ষা নাই। তাহা স্বভাবতঃই "নিত্য উদয় অস্তর বাহিরে"। তাহা নিত্য স্বতঃ স্বপ্রকাশ।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

দেশের উপরকার দশজন।

আমরা এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, দেশের উত্থান এবং পতন, ব্যক্তি-সাধারণের সঞ্চিত পুণ্য এবং পাপের পরিণাম-ফল। ব্যক্তি-সাধারণের পুণ্যের জোরে দেশের উত্থান হয়, আবার সেই জাতির ব্যক্তিগণের চরিত্র এবং নীতি যখন শিথিল হয়, মনের গতি পাপের দিকে ধাবিত হয়, তখন দেশ অলক্ষিত ভাবে পাপের পথে চালিত হয়। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য পুণ্যরাশি দেশের উত্থানের পক্ষে যেরূপ সহায়, পৃথিবীর নানা সম্প্রদায়ের উত্থান-ইতিহাসে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য পাপরাশিও, পর্য্যায়ক্রমে, দেশের পতনের মূল কারণ রূপে সময়ে২ জগতে যে কাজ করিয়াছে, নানা সম্প্রদায়ের অধোগতির ইতিহাসে, একথাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। মহাজন বলেন, যোগ্যতমের অধিষ্ঠান এ জগতে অপরিহার্য্য (survival of the fittest)। কথাটার অন্য অর্থ, পুণ্যবানের জয় এ জগতে অপরিহার্য্য। কেননা, এ জগতে অজেয় শক্তি কেবল পুণ্য এবং নীতির। যে দেশের উপরের লোক-সাধারণ পুণ্যবান, সে দেশের নিম্ন শ্রেণীও পুণ্যে অনুপ্রাণিত, আর যে সমাজের উপরের লোক-সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র, সে সমাজের নিম্ন শ্রেণীও পাপের কীট।

প্রবীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, নীতি ও পুণ্যবানদিগের দ্বারাই দেশ বা সমাজ চালিত। কথাটা যদিও ঈশা, মুশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, ম্যাটসিনি, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতির সমকালীন ঘটনারাশি দ্বারা তত প্রমাণিত হয় না বটে, তবু স্বীকার করিতে হইবে, কালক্রমে ইহাদের চরিত্রই দেশ ও সমাজে অজেয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়াছে। অন্ত

দিকে, পৃথিবী যাঁহাদিগকে বড় লোক বলে, অর্থাৎ টাকায় যাঁহারা বড়, তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা যে দেশের পতনের কারণ, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? উত্থানের সময় মহাপুরুষদিগের পুণ্যে দেশ জাগে, পতনের সময়ে, উপরকার দশজনের পাপ-রাশিতেই দেশ ধ্বংশ পায়। রোম এবং গ্রীস, মিসর এবং ভারতের উত্থান পতনের ইতি-হাসে এ কথার প্রমাণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পৃথিবী যখন পুণ্য ও নীতির পরিবর্ত্তে কেবল টাকার বশ হয়, তখন তাহার পতন অপরি-হার্য্য। উপরের দশ জনের কুদৃষ্টান্তে দেশের কতদূর অধোগতি হয়, এ কথার প্রমাণ আমরা প্রতিদিনের ঘটনারাশিতে পাইতেছি। আমরা এক সময়ে রাঁচি পরিদর্শনে গিয়া-ছিলাম। সেখানকার কোল জাতির লোকেরা অনেকেই মদ্যপান করিয়া থাকে। হাটের দিন রাঁচিতে বহু কোলের সমাগম হয়। আমরা দেখিলাম, দলে দলে কোল জাতীয় লোকেরা মদের দোকানে ঢুকিতেছে এবং সুরায় বিভোর হইয়া ফিরিতেছে। প্রাণে বড় যাতনা পাইয়া, তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাহারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল, একে একে সে সকল খণ্ডন করিয়া,দেখাইতে লাগিলাম। তাহারা অবশেষে বলিল—যদি মদ্যপানে অপকারই হইবে, তবে বাঙ্গালী বাবুরা মদ্যপান করেন কেন? আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কে কে মদ্যপান করে? তাহারা একে একে সেখানকার অধিকাংশ গণ্য মান্য বাঙ্গালী বাবুর নাম করিল। আমরা লজ্জায় অধোমুখ হইলাম। লজ্জায়, দুঃখে এবং ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া, কুদৃষ্টান্ত কিরূপে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অল্পেই সংক্রামিত হয়, সে বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমরা যেন যুদ্ধে পরাস্থ হইলাম। তারপরও অনেক কথা বলিলাম বটে, কিন্তু সে কথা তাহাদের মনে লাগিল না। রাঁচির জেলা স্কুলে, সেই সময়ে যে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহাতে এ বিষয়টী উল্লেখ করিয়া মনের দুঃখ কতক নিবারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখীর কথা শুনে কে? সেই হইতে যতই একথা ভাবি-তেছি এবং যতই নিম্ন শ্রেণীর সহিত মিশি-তেছি, ততই দেখিতেছি, বুঝিতেছি, উপরকার দশ জনের কুদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে অধি-কাংশ লোকই ব্যতিব্যস্ত। বিরুদ্ধে বলিলে অমনি লোকেরা বলিয়া উঠে—অমুক বড় লোক করেন, অমুক জমীদার করেন, অমুক পুরোহিত করেন, আমরা করিব না কেন? বঙ্গ প্রদেশের কথা আলোচনা করা যাউক। পোষাক পরিচ্ছদের সহিত এ দেশের বড় লোক-দিগের দুর্নীতিপরায়ণতা, অসচ্চরিত্রতা নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বঙ্গ-দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনেকটা ভাল। অনেকটা ভাল ছিল, এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাল নাই। দেশের উপরকার দশ জনের কুদৃষ্টান্তে,দিন দিন তাহারাও বিলাসিতার পথে গমন করিয়া ব্যভিচার এবং মদ্যপানে বিভোর হইতেছে। আমরা ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, এদেশের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ কেবল অজন্মা নয়, কেবল বিদেশের রপ্তানি নয়, অংশত, বিলাসিতা এবং চরিত্র-হীনতাও। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতের অনেক উপকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গেসঙ্গে জাতি-সাধারণের স্বাধীনতার স্বর্গীয় প্রভাব পরিম্লান করিয়া বিলাসিতার পথ

ভাবে সকলকে আকর্ষণ করিয়া, এদেশের যে কি মহা অনিষ্ট করিতেছেন, ভাবিলে আমাদের ধমনীতে রক্ত শুষ্ক এবং নিশ্চল হইয়া যায়। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতার অপর নাম উদাসীনতা! এই উদাসীনতা লোক-সাধারণের ধর্ম্মহীনতার প্রধান কারণ হইয়া পতনের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছে। শিক্ষার নামে দুশ্চরিত্রতা, সভ্যতার নামে বিলাসিতা, এবং বাবুগিরি, ধর্ম্মের নামে কপটতা, প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনাই দিন দিন প্রশ্রয় পাইতেছে। তুমি সমাজের উপরকার দশ জনের একজন, টাকার মছলন্দে বসিয়া তুমি আমাদের কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছ না, তাহা বুঝিতেছি। তুমি মদ্যপানে বিভোর, চটিয়া লালে লাল হইতেছ, তাহাও বুঝিতেছি। কিন্তু তোমার পা ধরিয়া মিনতি সহকারে বলিতেছি, একবার ভাবিয়া দেখ, দেশের কি শোচনীয় অবস্থা! তুমি সুশিক্ষিত, তুমি পণ্ডিত, তুমি যদি বিলাসিতাকে উপেক্ষা করিতে পারিতে, তুমি যদি নীতি ও পুণ্যের পরিধানে পরিশোভিত হইতে পারিতে, তবে না জানি তোমার দ্বারা সমাজের কত উপকার হইত! জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাবুগিরি ও বিলাসিতা বড়, তোমার জাঁকজমক, পোষাক পরিচ্ছদ বড়, না তোমার পাণ্ডিত্য বড়? তোমার বেশ-ভূষার পারিপাটা, না তোমার শিক্ষা এবং পাণ্ডিত্য তোমাকে এদেশে সম্মানিত করিয়াছে, বলত? স্থির হও, তুমি দেশের প্রতিনিধি, বিচলিত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া তোমার পক্ষে সাজে না। তুমি ত গিয়াছ, তোমার কুদৃষ্টান্তে তোমার পরিবার, তোমার সমাজ, তোমার দেশ—অধঃপাতে যাইতেছে, ভাবিতেছ কি? তুমি ঋণ করিয়া ঘি খাইতেছ, গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া বড় মানুষী চাল চালাইয়া, দশ জনকে ভোজ দিয়া বড় লোক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছ, শেষে, হায় অবশেষে, দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাইয়া বাহাদুরি দেখাইবার আয়োজন করিতেছ, তুমি জাননা, তোমার এই কুদৃষ্টান্তে লোকের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে। অন্তিম কালে তোমার সঙ্গে না যাইবে তোমার টাকা কড়ি, না যাইবে গাড়ী ঘুড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ এবং বাবুগিরি? তবে কেন মজিতেছ? পূর্ব্বে এদেশে এই শিক্ষা ছিল, ঋণ পরিশোধ না দিলে নিরয়গামী হইতে হয়। এখন তুমি দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাইয়া, বা তৎ কথা উল্লেখ করিয়া, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছ, ইহাই বুদ্ধির প্রাখর্য্য, পুরুষকার, ইহাই মহত্ত্ব। পূর্ব্বে এই শিক্ষা ছিল, নিবৃত্তিই ধর্ম্মের মহাসাধন, এখন তুমি প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া, মদ্যপান এবং ব্যভিচারকে সভ্যতার ভূষণ প্রতিপন্ন করিবার জন্য, ধীরে ধীরে বিষপাত্র চুম্বন করিতেছ। আপনি রসাতলে যাইতেছ, কিন্তু একবারও ভাবিতেছ কি যে, সেই সঙ্গে তোমার জাতিকে, তোমার সমাজকে এবং তোমার দেশকেও ডুবাইতেছ? তোমার ব্যভিচার, তোমার মদ্যপান, তোমার বিলাসিতা, তোমার সুরঞ্জিত, সুসজ্জিত, সুরভিত কেশ ও পোষাক-গরিমা তোমার নামকে এ জগতে অক্ষয় এবং পরকালে অমর করিতে পারিবে, ভাবিতেছ কি? ছি, ছি, ছি, রঙ্গালয়ের বেশ্যার অভিনয়কেও তুমি ভাল বলিতে অবসর দিতেছ, দেখিতেছি। তোমার সহিত কেবল তোমার সম্বন্ধ থাকিলে, কোন কথা বলিতাম না। তুমি রসাতলে যাইতে বসিয়াছ, যাও, কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু তুমি উপরের দশ জনের একজন, তোমার কুদৃষ্টান্তে সমাজ ও দেশ

যায় যে!! তুমি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সত্য গোপনের চেষ্টা করিতেছ, জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মুসলমানের রন্ধিত কুক্কুট-মাংস দ্বারা উদর পূরণ করিয়া, শেষে কিছুই খাও নাই বলিয়া, সভায় মিথ্যা ঘোষণা করিতেছ, তুমি বুঝ না যে, তোমার এ চাতুরী ধরা পড়িতেছে। ধরা পড়িতেছে এবং তোমার কুদৃষ্টান্তে জাতিভেদের মূল বিচ্ছিন্ন হইতেছে, এবং ক্রমে কপটতা এবং মিথ্যার জাল বিস্তৃত হইতেছে। তুমি গোপনে স্বাস্থ্যের ধুয়ায় মদ্যপান করিতেছ এবং প্রকাশ্যে বলিতেছ, মদ্যপান কর না, কিন্তু তোমার ভৃত্য, তোমার পুত্র কন্যা এবং পরিবারের সকলের চক্ষুকে ও নাসিকাকে আবৃত করিতে পারিতেছ কি? তাহারা তোমার কুদৃষ্টান্তে ঐ দেখ অল্পে অল্পে কি বিষপাত্র চুম্বন করিতেছে। তোমার গুপ্ত প্রণয়, পরিবারে, সমাজে, দেশে সংক্রামিত হইতেছে,—তোমার মিথ্যা প্রবঞ্চনা পরিবারে, সমাজে এবং দেশে সংক্রামিত হইতেছে। তোমার ধর্ম্মহীনতা, দুশ্চরিত্রতা এবং অপবিত্রতায় অনুপ্রাণিত হইয়া তোমার বংশধর, তোমার সমাজ এবং তোমার দেশ, পতনের দ্বারে উপস্থিত। তুমি শুনিয়াও শুনিবে না, তুমি বুঝিয়াও বুঝিবে না, এ দেশের মঙ্গল হইবে কিসে? হায়রে নবাবী!!

এ দেশের উপরের দশজন ধর্ম্মহীনতায় পরিম্লান এবং বাহ্যচটক ও বেশভূষার পারিপাট্যে উজ্জ্বল। এই ধর্ম্মহীনতার সহায়—সুসভ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্টের আমদানি করা সভ্যতার নামে এ দেশে না চলিতেছে, এমন জঘন্য কাজ নাই। আমরা এ দেশের কোন এক রাজার মন্ত্রীর কথা শুনিয়াছি। তিনি রাজপুত্রের চরিত্র কলুষিত করিতে যে সকল কদর্য্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও শুনিয়াছি। রাজপুত্রকে ডুবাইতে পারিলে মন্ত্রী স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। রাজপুত্রকে বিলাসিতা, মদ্যপান এবং ব্যভিচারে ডুবাইতে পারিলে আর ভাবনা কি? কে তাঁহার কাজে বাধা দিবে? তিনি কৃতকার্য্য হইয়া আজও দুর্দ্দান্ত প্রতাপে অত্যাচারের সিংহাসনে বসিয়া নরনারীর রক্ত শোষণ করিতেছেন। তাঁহার কুকার্য্যে নিরোর কার্য্যও প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে। এ দেশের এক নিম্নশ্রেণীর রমণীরা শিশুদিগকে অহিফেন-সেবনে নিদ্রিত করিয়া শেষে স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হয়। এই মন্ত্রীও পাপ-অহিফেনে রাজপুত্রকে সুষুপ্তিতে ডুবাইয়া স্বকার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বুঝি বা, গবর্ণমেণ্টও সভ্যতার মোহিনী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, ধর্ম্ম-উদাসীনতা-অহিফেন সেবন করাইয়া, চাকরী এবং উপাধির প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া, এদেশের উপরকার দশজন মানব-শিশুকে সুষুপ্তিতে ডুবাইয়া স্বকার্য্য সাধনে তৎপর! কেহ কেহ বলেন, অহিফেন এবং মদের ব্যবসায়ের ফাঁদে মানুষকে ফেলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বকার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য। এজন্য এদেশে এবং বিলাতে বিষম আন্দোলনও চলিতেছে। কিন্তু অহিফেন এবং মদ্য দেশের অধিক সর্ব্বনাশ করিতেছে, না, ধর্ম্মহীনতা দেশের অধিক সর্ব্বনাশ করিতেছে? প্রলোভন বাহিরে, না মানুষের অন্তরে? নিবৃত্তি গৈরিক বস্ত্রে, না মানুষের হৃদয়ে? ধর্ম্মহীনতা-অহিফেন এবং নীতির প্রতি উদাসীনতা-মদ্য দেশের যে সর্ব্বনাশ করিতেছে, বাহিরের মদ্যপান এবং অহিফেন তাহার নিকট তুচ্ছ। স্কুলে২ দেশের ভাবী সন্তানগণ নীতির প্রতি অনাস্থাবান হইয়া, ধর্ম্ম

সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যে সংসারে প্রবেশ করিতেছে, সে সংসারে পাপ, দুর্নীতি জীবন্ত দৃষ্টান্ত রূপ ধরিয়া বিভীষিকা দেখাইয়া সকলকে আকৃষ্ট করিতেছে। বালকেরা পিতৃকুলের দুশ্চরিত্রতায় দীক্ষিত হইতেছে। দিন ২ এই রূপে চতুর্দ্দিকে দুশ্চরিত্রতার রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। তারপর? তারপর আর বলিব কি? ঘোর দারিদ্য, দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দ্বারে ২ ঘুরিতেছে। আর গবর্ণমেণ্ট, যখন দেখিলেন, সকলে সুষুপ্তিতে ডুবিয়াছে, তখন সীমান্ত প্রদেশে, কি আর কোন রাজ্যে, দিক কাঁপাইয়া রাজ্যবিস্তারে ছুটিতেছেন। হঠাৎ যদি কোন কুলতিলক কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছেন, অমনিই তাঁহাকে ধরিয়া জেলে দিতেছেন। উপাধিতে বা চাকরীর মায়ায় যাহারা ভুলিলেন না, Hon'ble শব্দটীর মহামন্ত্রে যাঁহারা পোষ মানিলেন না, তাঁহাদের জন্য পুরাতন অকর্ম্মণ্য sedition আইন, নূতন টিকা টিপ্পনীতে জীবিত হইয়া উঠিতেছে!! ভয়ে সকলে জড়সড়। যাঁহারা একটু২ মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহারা আবার সুনিদ্রায় নিমগ্ন! দেশের সেবা ভাল, না, আপনার সুখ ভাল? পরের উপকার ভাল, না ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভাল? এই প্রশ্নের মীমাংসা উপরকার দশ জন কুদৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন করিতেছেন; যথা—"সেবা—মহা ভুল, প্রতিপত্তি এবং সম্মানই জগতে ধন্য। পরের উপকার বাতুলের প্রলাপ, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই জগতে ধন্য!! ঋণ করিয়া ঘি খাইয়া, তেজিয়ান হইয়া, বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া, গাড়ী ঘোঁড়ায় চড়িয়া, শেষে ঐ সোণার বাজারের, নব বৃন্দাবনের নব রসে মত্ত হও। সোণার পাত্রে মদ্যপান করা অপেক্ষা আর কিসে সুখ আছে? কিসের দেশ-সেবা, কিসের পরের উপকার? ইহা মিথ্যা কথা, ইহা প্রলাপ! জানিও, ইহার পরিণাম ঐ জেল।"

গবর্ণমেণ্টও ধন্য, এবং এ দেশের উপরকার দশজনও ধন্য! আর দেশ এবং সমাজ? তাহা ডুবাইবার জন্য যখন এত আয়োজন, তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? দেশের রাজা করিলেন না, দেশের উপরকার দশ জন করিলেন না; এখন কে করিবে? এই শোচনীয় অবস্থাতেও যদি কোন ক্ষণজন্মা পুণ্যবান মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যদি কোন ম্যাট্‌সিনি বা পার্কার, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের উদয় হয়, তবে বুঝিবা কোন সময়ে দেশ রক্ষা পাইতে পারে। শুনিয়াছি, মহাপাপে দেশ ডুবিলে ভগবানের প্রভাব দেশোদ্ধারের নবপুণ্য-বীজ বপন করেন। এদেশ যখনই পাপে ডুবিয়াছে, তখনই বিধাতা উদ্ধার করিয়াছেন। আবার কি সেই দিনের অভ্যুদয় হইবে না? অধোগতির আর কি অবশিষ্ট আছে? উপরকার দশজন যে অধর্ম্মের বিষ পান করিয়া, নির্লজ্জের ন্যায় তা-থেই তা-থেই করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, উহাতে দেশ অনুপ্রাণিত। পাপে তাপে এদেশ ডুবিয়াছে!! মহা পতনের মহান্ধকারে এদেশ নিমগ্ন!! বিধাতার কৃপা ভিন্ন আর রক্ষা নাই! প্রভু, বল, পুণ্যবীজ বপনের সময় আজও কি উপস্থিত হয় নাই?

922 4710 2—98

বিলাসে বিনাশ। (২)

জমীদার তাহার উদ্যান-ভবনে একটী দ্বিতল কক্ষে, মরক্কো-চামড়া মোড়া গদি-আঁটা একখানি আরাম চৌকীতে অর্দ্ধশয়ান ভাবে অবস্থিত। পাশে একটী সেক্রিটেরিয়াট টেবিল। তাহার উপর একটী বড় আর্গাণ্ড ল্যাম্প জলিতেছে। ঘরের চারিদিকে পুস্তকপূর্ণ আলমারি। মুক্ত বাতায়ন দিয়া মৃদু মন্দ গন্ধবহ উদ্যানের সুগন্ধ বহন করিয়া ঘরে বেড়াইতেছে; তাহার উপর টানা পাখাও চলিতেছে। বাবুর হাতে একখানি গ্রন্থ। তিনি ভাবিতেছেন,—"এই পুস্তকখানি কয়দিন পড়িবার অবসর পাই নাই। বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রায়ই অসার। তাই পড়িতে বড় ইচ্ছাও যায় না। কিন্তু সেই অজ্ঞাত অধ্যাপক-জমীদারের বিষয় জানিবার কৌতুহল হইয়াছিল, তাই [illegible] কতক পড়িলাম। ইহাতে কি[illegible] [illegible] [illegible]ন চিন্তাও দেখিলাম। অবসর [illegible] [illegible]কখানি ভাল করিয়া পড়িব। [illegible] [illegible]ক পূর্ণিমাতে আবার আসি[illegible] [illegible], [illegible]লিয়া গিয়াছিল। অদ্য পূর্ণিমা, [illegible] [illegible] আসিল না। কৃষক যে অধ্যা[illegible] [illegible] পড়িতে বলিয়াছিল, তাহা [illegible] [illegible]র পড়িয়া দেখি ;—

[illegible]র ৫ম উপদেশ।

[illegible] [illegible]ণ! সম্পত্তির হেতু স্বত্বের [illegible] [illegible] কিরূপে কাহার হস্তগত হইয়াছে, [illegible] আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে উপদেশ [illegible] সেই সকল কথা তোমরা যদি পরিষ্কার [illegible] বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে অদ্যকার [illegible]লোচ্য বিষয় অনেকটা সহজে বুঝিতে পারিবে। অদ্যকার বিষয়টা বড় সহজ নহে। ইউরোপে যাহাকে Political Economy বলে, হিন্দুদিগের বিবিধ শাস্ত্রের ভিতর সেরূপ গ্রন্থ পাওয়া যায় না, তাহা পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু বার্ত্তাশাস্ত্র, বা ধনতত্ত্ব, সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজের কিরূপ নিয়ম ও ব্যবস্থা হইলে, ধনের বৃদ্ধি হয়, এবং সমাজের সকল শ্রেণীর ভিতর যথোচিত ভাবে বিভাগ হয়, তাহারই মীমাংসা করা ধনতত্ত্বের উদ্দেশ্য। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে, প্রাচীন হিন্দুগণ, তাঁহাদিগের সামাজিক নিয়ম ও ব্যবস্থাতে, কার্য্যও ধনতত্ত্বের অনেকটা মীমাংসা করিয়াছিলেন। সেই মীমাংসার একটী ফল, ভারতে কখন অনাথ আইন Poor law প্রয়োজন হয় নাই। সে কথা এখন থাকুক।

আমি বলি, বিলাসে বিনাশ, বিলাসে পাপ; বিলাসে ধননাশ, বিলাসে প্রাণনাশ; বিলাসে ধর্ম্মনাশ, বিলাসে জাতিধ্বংস।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সমাজে কতক লোকের ভূমি আছে, আর বাকী লোকের ভূমি নাই। অনেক দেশেই ভূস্বামী অল্প লোক; ভূমিহীন অধিক লোক। যাহাদিগের ভূমি আছে, তাহারা ভূমিহীন ব্যক্তিগণের সাহায্য, অর্থাৎ শ্রম না লইয়া নিজের শ্রমেই উপজীব্য শস্যোৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু যাহাদিগের ভূমি নাই, তাহারা ভূস্বামীদিগের সাহায্য, অর্থাৎ ভূমি না লইয়া নিজের আহারের সংস্থান করিতে পারে না।

স্ত্রী অভাবে পুরুষের অপত্যোৎপাদন হয় না। ভূমি অভাবেও কেবল মাত্র শ্রম

দ্বারা শস্যোৎপাদন হয় না। বিনা শস্যে, বা বিনা খাদ্যে প্রাণ বাঁচে না। সুতরাং ভূমি-হীন ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভূস্বামীর কৃপার ভিখারী।

মনে কর, একজন ভূস্বামীর ৯০০ বিঘা জমী আছে। ৩০০ বিঘা চাস করিয়া যাহা জন্মে, তাহাতেই তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের খাওয়া পরা চলিয়া যায়। তাঁহার বাকী ৬০০ বিঘা কি হইবে? তাহাতে যে শস্য জন্মিতে পারে, তাহা তিনিও তাঁহার স্বজনবর্গ ভক্ষণ করিতে পারেন না। কারণ উদর ক্ষুদ্র, অধিক শস্য পাইলে, উদরের পরিমাণ বাড়ে না। ভূমিহীন ব্যক্তি ভূমিযুক্ত ব্যক্তির নিকট আসিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয় আপনার ৬০০ বিঘা জমী পড়িয়া আছে, আপনার কোনও উপকারেই আসিতেছে না। ইহা হইতে আমাকে ১০০ বিঘা জমী চাস করিতে দেন। ভূমির অভাবে আমি কষ্ট পাইতেছি। ইহাতে আপনার কোনও ক্ষতি হইবে না, অথচ আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। ভূস্বামী বলিলেন, 'আমি তোমাকে ১০০ বিঘা জমী দিতেছি, কিন্তু এই ১০০ বিঘা জমীতে যে শস্য জন্মিবে, তাহার অর্দ্ধেক আমাকে দিতে হইবে। আরও ৫ জন ভূমিহীন লোক ভূস্বামীকে অর্দ্ধেক শস্য দিবে, এই নিয়মে ৫০০ বিঘা লইল। সমুদয় ৬০০ বিঘা এই নিয়মে বিলি হইল। এখন এই ৬০০ বিঘার অর্দ্ধেক শস্য ভূস্বামী পাইতে লাগিলেন। সুতরাং এখন তাঁহার আর নিজে ভূমিকর্ষণ করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে তিনি ভূস্বামী-কৃষক ছিলেন, এখন তিনি আর কৃষক নহেন, তিনি কেবল ভূস্বামী বা জমীদার বাবু। পূর্ব্বে তিনি শ্রম করিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এখন তিনি শ্রম না করিয়া, অন্যের শ্রমে জীবন ধারণ করেন। এখনও তাহার ৩০০ বিঘা জমি পড়িয়া আছে, অর্থাৎ যে জমী তিনি স্বয়ং পূর্ব্বে চাস করিতেন। আবার অন্য ৩ জন ভূমিহীন ব্যক্তি আসিল। তাহারা জমী চাহিল। এইবার জমিদার বাবু বলিলেন, "তোমাদিগের নিকট আমি অর্দ্ধেক শস্য লইব না। শস্যের আমার আর প্রয়োজন নাই। তোমরা অর্দ্ধেক শস্যের পরিবর্ত্তে আমার জন্য মাসে দশ সের করিয়া মদ্য প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই বিলাসের সৃষ্টি হইল। এইরূপে মানুষ অন্যের শ্রমে আপনার অবনতির পথ প্রস্তুত করিল। এখন তোমরা দেখিলে যে, কতক ব্যক্তির অতিরিক্ত ভূমি থাকায় এবং অনেক ব্যক্তির ভূমি না থাকায় সভূমিক ব্যক্তি বহু অভূমিক ব্যক্তির শ্রমের প্রভু হয়েন, এবং আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আহরণ হওয়ার পর, অভূমিক ব্যক্তিগণের শ্রমের দ্বারা আপনাদিগের জন্য সৌখীন দ্রব্য, বিলাসের উপকরণ সকল প্রস্তুত করাইয়া লয়েন। এই সকল সৌখীন বাবুগণ, এইরূপ বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করায় যে কোন দোষ আছে, তাহা স্বীকার করেন না। বরঞ্চ তাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের বিলাসে দরিদ্রগণ কাজ ও আহার পাইতেছে।

বিলাতে এই মত Mandeville সাহেব তাহার প্রসিদ্ধ Fable of the Bees নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,— "Private vices are public b[illegible] অর্থাৎ ব্যক্তিগত পাপে (বা বিলা[illegible] রণের উপকার হয়। কথাটা বি[illegible] উপকার! পাপ বা অধর্ম্ম কাহাকে বলে? ধর্ম্মই বা কাহাকে বলে? যাহা সাধারণের হিতকর, তাহা করাই ধর্ম্ম। যাহা সাধারণের

অহিতকর বা অপকারী তাহাই অধর্ম্ম বা পাপ। এখন ব্যক্তিগত পাপে সাধারণের উপকার হয়, এই কথার কি অর্থ ফলিত হইল? (কতিপয় লোকের) পাপে অর্থাৎ যাহাতে সাধারণের অপকার হয়, তাহাতেই সাধারণের উপকার হয়, অথবা যাহাতে সাধারণের উপকার হয় না, (বরঞ্চ অপকার হয়) তাহাতে সাধারণের উপকার হয়—এই অর্থ দাঁড়াইল। সুতরাং এইমত অগ্রাহ্য। তবে ইহার মীমাংসা কি? ভাষায় আবরণ ভেদ কর। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ। "ব্যক্তিগত পাপে সাধারণের উপকার হয়" ইহা ভ্রান্তি জনক ভাষা। যাহাকে ব্যক্তিগত পাপ বলা হইতেছে, তাহার ভিতরে যেমন একদিকে পাপ আছে, তেমনি অপর দিকে পাপের লাঘব আছে। যাহা একটী কার্য্য বোধ হইতেছে, তাহার ভিতরে দুইটী কার্য্য আছে—দুইটী শক্তি আছে। বন্দুকের গুলি ছুড়িলে, গুলি আকাশপথে ২০০০ হাত যাইল, তাহার পর মাটীতে পড়িল। কেন? গুলির উপর দুইটী শক্তি কার্য্য করিয়াছিল, বন্দুকের বারুদের অগ্রগামী শক্তি এবং পৃথিবীর আকর্ষণের অধোগামী শক্তি। যাহাকে বিলাস বলিতেছ, তাহার ভিতরও দুইটী ক্রিয়া আছে। একটী অগ্রগামী, পাপ-লাঘব, উন্নতিবর্দ্ধক, শস্যোৎপাদক। আর একটী অধোগামী, পাপ প্রবর্ত্তক, শস্যনাশক। অন্যকে বঞ্চিত করিয়া জমীদার যে অতিরিক্ত ভূমি দখলে রাখিয়াছিলেন, সেইটী পাপ। সেই অতিরিক্ত ভূমির কতক অংশ অন্যজনকে চাস করিতে দিলেন, তাহাতে পূর্ব্বকৃত পাপের লাঘব হইল। এইটী হইল প্রথম ক্রিয়া। ইহাতে শস্যোৎপাদক, পাপহ্রাসক, অগ্রগামী শক্তি রহিয়াছে। তাহার পর জমীদার যে ভূমি চাস করিতে দিলেন, তাহার বীজনাশরূপ শস্য লইতে লাগিলেন এবং ঐ শস্যে বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এইটী হইল দ্বিতীয় ক্রিয়া। ইহাতে শস্যনাশক, পাপ-প্রবর্ত্তক, অধোগামী শক্তি রহিয়াছে। এই কথাটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতেছি।

এখন সমাজের একটী অবস্থা কল্পনা কর। ধর, কতিপয় ব্যক্তি মাত্র বহুজনকে বঞ্চিত করিয়া দেশের সমুদয় ভূমি অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারা তাহার কতকাংশ মাত্র কর্ষণ করেন এবং কর্ষণ করিতে দেন। অবশিষ্ট অংশ তাঁহারা নিজেও কর্ষণ করেন না, অন্যকেও কর্ষণ করিতে দেন না। তাহার কতক স্থানের উপর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, কতক অংশের উপর বিশাল বিহার-কানন রচনা করিয়াছেন এবং কতকাংশ শীকারের জন্য জঙ্গল-বনে আচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। এদিকে ভূমিহীন ব্যক্তিগণ চাস করিবার জন্য ভূমি পান না। তাঁহারা বনের ফল-মূল খাইয়া, বন্যপশু শীকার করিয়া, এবং দুর্গম পর্ব্বত বা ঘোর অরণ্যের অন্তর্বর্ত্তী ক্ষেত্র গোপনে কর্ষণ করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করেন। সমাজের যদি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, পাপ ভূস্বামীদিগকে পূর্ণ মাত্রায় আশ্রয় করিয়াছে।

মনে কর, এই অবস্থায়, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত উদার ভূস্বামী, তাঁহাদিগের ভূমির কতক পরিমাণ, ভূমিহীনদিগকে সকর দান করিলেন, অর্থাৎ ভূমির উপসত্বের কিছু অংশ খাজনা বলিয়া লইবেন, এই নিয়মে, ভূমি দান করিলেন। যদিও এ দান সকর, তথাপি ইহা দান অথবা (অন্যায়) ভোগত্যাগ। ভূমির স্বত্বের কতক ভাগ জমীদার ত্যাগ

করিয়া এখন প্রজাকে দিলেন। এই স্বত্ব-ত্যাগে, ভূমির অন্যায় অধিকার করায় জমীদারের যে পাপ হইতেছিল, তাহার কতক লাঘব হইল। পূর্ব্বে যে জমী উর্ব্বরা হইয়াও ও বন্ধ্যার ন্যায় ছিল, তাহা এক্ষণে শস্যোৎপাদন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহারা জমীদারদিগের জবরদস্তির জন্য আহার পাইত না, এখন তাহারা আহার পাইতে লাগিল, পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে অধিকতর জীব রক্ষা ও জীব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এদিকে, জমীদার যে শস্য, খাজনারূপে পাইতে লাগিলেন, তাহার দ্বারা তিনি আর কয়েকজন ব্যক্তিকে ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন, এবং সেই সকল ব্যক্তি দ্বারা আরও ভূমি কর্ষণ করাইয়া, আরও শস্যোৎপাদন করিয়া তাহা দেশে বিতরণ করিতে লাগিলেন। এস্থলে, তিনি যাহা খাজনা পাইলেন, তাহার ভোগ ত্যাগ করিলেন। সুতরাং পূর্ব্বকৃত অতিরিক্ত ভূমির দখল-জনিত পাপের আরও হ্রাস হইল। এই উদাহরণে, বিলাস এখনও আইসে নাই। এখানে একটী মাত্র শক্তির কার্য্য হইতেছে। তাহা অতিরিক্ত ভূমির অধিকার ত্যাগ। ইহা শস্যোৎপাদক, পাপ-হ্রাসক—জীবপালক।

কিন্তু মনে কর, জমীদার যে শস্য খাজনা বলিয়া লইতেছেন, কতকগুলি ভূমিহীন ব্যক্তিকে তাহা খাইতে দিয়া, তাহাদিগের দ্বারা কোন সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এখানে, যাহারা শস্য খাইতে লাগিল, তাহারা আর শস্যোৎপাদন করিল না। যে শস্য ভুক্ত হইল, তৎপরিবর্ত্তে আর কোন শস্য উৎপাদিত হইল না। খাজনা বলিয়া বৎসর বৎসর জমীদারের নিকট যে শস্য আসিতেছে, তাহা বৎসর বৎসর এক-কালে ধ্বংস হইতেছে। মনে কর, জমীদার প্রজার নিকট প্রতি বৎসর ৬০ মণ শস্য পান, প্রতি বৎসর এই ৬০ মণ শস্য আহার করিয়া ১০ জন মজুর জমীদারের সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত করে। সুতরাং এস্থলে বাৎসরিক ৬০ মণ শস্যে ১০ জনের অপেক্ষা অধিক লোকের ভরণপোষণ হইতেছে না। কিন্তু যদি বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত না করাইয়া, জমীদার যদি ঐ শস্য কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করিতেন, তাহা হইলে কি হইত? কৃষিকার্য্যে, কৃষকের আহার বীজাদিতে যে শস্যের ব্যয় হয়, তদপেক্ষা অধিক শস্য জন্মে, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বৃদ্ধি হার ছাড়িয়া দেও। ধর যাহা ব্যয় হইল, তাহাই কেবল পুনরুৎপন্ন হইল। তাহা হইলে, প্রতি বৎসর ৬০ মণ শস্যে ক্রমে ক্রমে কতজন প্রতিপালিত হইতে পারে, একবার গণনা কর।

১ম বৎসর, ৬০ মণ শস্যে, ১০ জন লোক (কৃষিকার্য্যে, শস্য পুনঃ পুনঃ উৎপাদিত হওয়ায়, ইহাতে ইহাদিগের চিরকাল চলিতে পারিবে) ২য় বৎসর, এই বৎসরের ৬০ মণ শস্যে আর ১০ জন লোক, এবং ১ম বৎসরের ১০ জন লোক, মোট ২০ জন।

৩য় বৎসর এই বৎসরের ৬০ মণ শস্যে আর ১০ জন এবং ২য় বৎসরের ২০ জন, মোট ৩০ জন।

এইরূপে ১০ম বৎসর, এই বৎসরের ৬০ মণ শস্যে আর ১০ জন এবং ৯ম বৎসরের ৯০ জন মোট ১০০ জন। তোমরা দেখিতেছ, কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিলে, এই ৬০ মণ শস্য বৎসর বৎসর অধিক হইতে অধিকতর লোক ভরণপোষণ করে। যে ৬০ মণ শস্য, বিলাস-দ্রব্য প্রস্তুত করণে নিযুক্ত করিলে, প্রথম বৎসরে যে দশ জন মাত্র খাইতে পাইত,

দশ বৎসর পরেও কেবল মাত্র সেই দশ জন খাইতে পায়,—সেই ৬০ মণ শস্য, শস্যোৎপাদনে নিযুক্ত করিলে, দশ বৎসর পরে এক শত জন অনায়াসে প্রতিপালন করিতে পারে; প্রভেদ দেখিলে? বিলাস দ্রব্যোৎপাদনে যে শস্য একবার মাত্র ভুক্ত হইয়া নষ্ট হইল, আর শস্য উৎপাদন করিতে পারিল না, কৃষিকার্য্যে তাহা নিয়োজিত হইলে তাহা পুনঃপুনঃ উৎপাদিত হইয়া, যেন চক্রাকারে ভ্রমণ করিয়া, অনন্তকাল জীবপোষণ করে। সুতরাং দেখিতেছ, বিলাসে শস্যের নাশ। যেখানে শস্যের নাশ,সেখানে শস্যজীবী জীবের নাশ। তাই বলিয়াছি, বিনাশে বিলাস। যাহাতে শস্যের নাশ হয়, অথচ পুনরুৎপাদন হয় না, তাহাতে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়, তাহাতে বহু লোকের অনাহারের সঙ্ঘটন হয়। এই জন্য কতিপয় লোকের বিলাসিতা, বহুলোকের অনাহারের কারণ। তোমরা শুনিয়াছ, "Private vices are public benefits" আমি তোমাদিগকে ধ্রুব নিশ্চিত বলিতেছি, "Private vices are public injuries" ব্যক্তিগত পাপ, সাধারণের ক্ষতি, সাধারণের উপর অত্যাচার হয়।

একজন ইংরাজ পণ্ডিত * বলেন, ধনীলোকে বিলাস-পরতন্ত্র হইয়া, বিলাস লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, অর্থোপার্জ্জন করেন, এবং সঞ্চয় করেন। সেই সঞ্চিত অর্থ মূলধন রূপে পরিণত হয়। অথবা কারবারীদিগের হস্তে মূলধনের সঞ্চার করে। সেই মূলধনে সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহাতে সেই সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুতকারীদিগের আহারের সংস্থান হয়। ইহা রূপান্তরে সেই পুরাতন কথা—Private vices are public benefits এ তর্কের মর্ম্ম এই, ধনীদিগের মূলধন না পাইলে, শ্রমীগণ নিজের আহারের উপায় করিতে পারে না। কিন্তু এই তর্কে সার নাই। শ্রমীদিগের প্রকৃত অভাব, ভূমি; শ্রমীদিগের প্রকৃত অভাব মূলধন নহে বা ধনী প্রভু নহে। উর্ব্বরা ভূমি পাইলে, শ্রমীগণ অনায়াসে সেই ভূমি কর্ষণ করিয়া, নিজের শ্রমজাত শস্যের দ্বারা; আপনাদিগকে ভরণপোষণ করিতে পারে। যাহাকে মূলধন বল, তাহা শ্রমজাত শস্য বা এমন কোনও বস্তু, যাহা শ্রমী শ্রমজাত শস্য খাইয়া উৎপাদিত করিয়াছে। প্রচলিত ধনতত্ত্ব তোমাদিগকে বলিতেছি যে, ধন উপার্জ্জন করিতে হইলে, তিনটী উপকরণের আবশ্যক:—ভূমি, শ্রম ও মূলধন। আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, মূলধনের উৎপত্তি কি? ভূমি ও শ্রম। যেরূপ ধনই হউক না কেন, মূল অনুসন্ধান কর, দেখিবে, তাহার উৎপত্তির কারণ দুইটী—ভূমি ও শ্রম। ইউরোপের ধনতত্ত্বে "মূলধন মূলধন" বলিয়া যে চীৎকার শুনিতে পাও, তাহা ধনীলোকদিগের স্বার্থ সম্ভূত। ভূমির অভাবই ভূমিহীন ব্যক্তিদিগের দারিদ্র্যের কারণ। এই সত্য কথাটী মিছা তর্কের মেঘে আচ্ছন্ন করিবার জন্য, "মূলধন" "মূলধন" বলিয়া এত আন্দোলন। বুদ্ধিমান শ্রমী যদি ভূমি পায়, তাহা হইলে তাহার মূলধনের অভাব হয় না। প্রথম দুই এক বৎসর কিছু কষ্ট যায়, মিতব্যয়িতার দ্বারা ক্রমেই নিজের কাজ চালাইবার জন্য যে ধন আবশ্যক, তাহা সে সংগ্রহ করিতে পারে। মূলধন শ্রমের ফল মাত্র। একদিকে ভূমি আর অন্যদিকে শ্রম, ইহা ব্যতীত ধনের তৃতীয় উপকরণ নাই। তবেই দেখিলে, বিলাসে মূলধনের সংস্থান হয়, এ কথায় সার

* M'Culloch

বস্তা নাই। আর ইহার পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বিলাসে শস্যের নাশ হয়, দারিদ্র্যের বৃদ্ধি হয়—বিলাসে সমাজের বিনাশ হয়।

তোমরা দেখিলে, সভ্য সমাজে বিলাসই দারিদ্র্যের কারণ, এবং বহু লোকের আদৌ ভূমি না থাকায় এবং কতিপয় লোকের অতিরিক্ত ভূমি থাকায়, বিলাসের উৎপত্তি। ইহাতে যেন কেহ এমন মনে করিও না যে, যাহাদিগের অতিরিক্ত জমী আছে, তাহাদিগের নিকট হইতে তাহা বলপূর্ব্বক লইয়া ভূমিহীন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত বা সম্ভব। বল প্রয়োগে অভীষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার, দারিদ্র্য হইতে জনরাশিকে উদ্ধার করিবার, সম্ভাবনা নাই। বরঞ্চ বল প্রয়োগে অনর্থক শোণিতপাত, ঘোর অরাজক হইবে এবং সংসারের বর্ত্তমান দুঃখরাশি আরও বর্দ্ধিত হইবে। অবশেষে, যাহারা বলবান ও ধূর্ত্ত, তাহারাই আবার ভূস্বামী হইবে।—না, বল ও বিবাদের দ্বারা মনুষ্যের উদ্ধার হইবে না। দয়া ও ধর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যের উদ্ধার হইবে। দয়া ও ধর্ম্মের দ্বারা দারিদ্র্য ঘুচিবে। এখন ধনতন্ত্র স্থূলস্বার্থ-তন্ত্রের উপর স্থাপিত। তখন, দয়া ও ধর্ম্মের রাজ্যে, ধনতন্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিষ্ঠিত হইবে। ইহা স্বপ্ন নহে। ইহা ধ্রুব সত্য। "ওঁ নমো ভগবতে।"

পাঠকের স্মরণ আছে, উদ্যান-ভবনে জমীদার বাবু এই গ্রন্থ পড়িতেছিলেন। "ওঁ নমঃ ভগবতে এতদূর পড়িয়া তিনি গ্রন্থখানি টেবিলের উপর রাখিলেন। আরাম-চোকাতে সমুদয় শরীর বিস্তৃত করিয়া বিজৃম্ভণ করিলেন, তারপর ভাবিতে লাগিলেন, তবু ভাল। আমি ভাবিতেছিলাম, লোকটা বুঝি প্রচণ্ড অরাজকবাদী। যাহা হউক, লোকটার উপদেশে হেনরি জর্জের গন্ধ আছে"। এমন সময় দূরে সঙ্গীত-লহরীর উচ্চতান আকাশে প্রতিধ্বনিতে উথলিয়া পড়িতে লাগিল। জমীদার ভাবিলেন—এই তো সেই কৃষকের স্বর—

কৃষকের গান।

"মোরা এই চাই,
মোরা ভাই ভাই, মোদের বিবাদ নাই
মোরা গান গাই, মোরা খেতে চাই।
মোরা ঘাটে মাঠে, মোরা বাজার হাটে.
মোরা খেটে খেটে, মোরা ঘেমে যাই॥
মোরা এই চাই,
মোরা ভাই ভাই, মোদের বিবাদ নাই
মোরা গান গাই, মোরা খেতে চাই।
মোরা হাল ধরি, মোরা শ্রম করি,
ধরা ধনদো ভাবি মোদের অন্ন নাই॥
মোরা এই চাই, মোরা খেতে চাই।
মোদের চোখে ঠুলি, মোরা ঘানি টানি,
মোদের বল আছে, মোদের বুদ্ধি নাই॥
মোদের মের না, গলায় পা দিও না,
দয়া ধর্ম্ম ছেড় না, পাপীর নিস্তার নাই॥
তোমরাও খাও দাও, মোদেরও খেতে দেও,
সব যদি শুষে লও, মোরা তবে কি খাই॥
মোরা এই চাই"
ইত্যাদি।

জমীদার—গানটী দুই জনে গাইতেছে,—না, অনেকে গাইতেছে। নূতন সুরে। কেমন একটী নূতন ভঙ্গী এই গানে দেখিতেছি। "মোরা ভাই ভাই' একি সেই Equality ও fraterntiyর কথা? "মোদের বল আছে. মোদের বুদ্ধি নাই" ইহার কি এই অর্থ যে, কৃষকদিগের একবার চক্ষু ফুটিলে জমীদারদিগের আর রক্ষা নাই? হাঁ, একটু শাসান বই কি, "পাপীর নিস্তার নাই"। ইউরোপের সাম্যবাদের ঢেউ কি আমাদিগের দেশে লাগিয়াছে?

আমাদিগের দেশের একজন সুশিক্ষিত প্রধান জমীদার, ঘোর প্রত্যক্ষবাদী, তাহা জানি, তাঁহার লেখাও দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের দেশের জমীদারদিগের মধ্যে কেহ যে সাম্যবাদী আছেন, তাহা জানিতাম না। আর যদিও বা কোন জমীদার মতে সাম্যবাদী থাকিতে পারেন, তিনি যে, তাহার মত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, একটী সম্প্রদায় গঠন করিবেন, তাহা সম্ভব মনে করি নাই। যদি এই কৃষকের কথা সত্য হয়, এবং আমি গোপনে যে সংবাদ পাইতেছি, তাহা মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে ত দেখিতেছি যে, এই সাম্যবাদী জমীদার ইহার মধ্যে তাঁহার মত অনেকটা বিস্তার করিয়াছেন। বাহিরে কোন শব্দ বা ধূমধাম নাই। আশ্চর্য্য! আরও কত কি দেখিব।

এই যে কৃষক আসিয়াছে। সঙ্গে আর একটী লোক দেখিতেছি। এসো কৃষক ভায়া। আমি ভাবিতেছিলাম, তুমি বুঝি এ পূর্ণিমাতে আসিলে না।

কৃষক। কেন, আসিব না কেন মহাশয়? আমার মত লোক কত সময় সাধ্য-সাধনা করিয়া আপনার দেখা পায় না; আর আপনি দয়া শ্রদ্ধা করিয়া আমাকে আসিতে বলিয়াছেন, আমি আসিব না?

জমীদার। ওখানে বসিলে কেন ও চৌকীতে বস।

কৃষক। এত বেশ গালিচা, আমার সাত পুরুষ এমন গালিচাতে কখন বসে নাই। ইহাতে বেশ আরাম করিয়া বসিয়াছি।

জমীদার। না ভাবা, পায়ের তলে তোমাদের বসাটা ভাল হয় কি?

কৃষক। মহাশয়, আমাদিগকে যেখানে বসিতে দেন, তাহাতেই আমরা কৃতার্থ। আপনি উঁচুতে বসিতে দিলেও আমরা যা আছি, নীচুতে বসিতে দিলেও আমরা তাই থাকিব। দেখুন উঁচু ও নীচু করিবার এক কর্ত্তা ভগবান্।

জমীদার। আচ্ছা তোমরা যেখানে বসিয়া সুখী হও, সেখানেই বস। আমি তোমাদিগের সহিত নীচেই বসিতেছি।

কৃষক। মহাশয়ের উদারতা।

জমীদার। তোমার সঙ্গে ইনি কে?

কৃষক। ইনি গুরুদেবের আর একজন শিষ্য।

জমীদার। হ্যাগা, তোমার বয়স ত খুব কম বোধ হইতেছে। আর দেখিয়া তোমাকে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে।

শিষ্য। মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, আমাদের জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস বলিতে নিষেধ।

জমীদার। ভাবী জীবনের কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

শিষ্য। ভাবী জীবনের কথা কে বলিতে পারে? তবে আমার সঙ্কল্প গুরুদেবের আদেশ পালন করা। আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত দুঃখীজনের উপকার করা।

জমীদার। ভাল। কৃষকভায়া, তোমার গুরুর উপদেশ আমি পড়িয়াছি। তাহার সব কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। হয়ত তোমার গুরুদেবের উপদেশ সবটুকু ঠিক লেখা হয় নাই।

কৃষক। হাঁ তাঁহার সব কথা ভাল করিয়া লেখা হয় নাই। কি কথা বুঝিতে পারেন নাই?

জমীদার। তুমি কি আমাকে বুঝাইয়া দিবে?

কৃষক। আমি পারি আর না পারি; আমার পক্ষের ইনি বুঝাইয়া দিতে পারেন।

জমীদার। আমি এই কথা বলি, সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যে মূলধন খাটান হয়, তাহাতে কতকগুলি মজুর খাইতে পারে। সুতরাং সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত করাতে কতকগুলি মজুরের উপকার হইল না, তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব?

তোমাদিগের গুরুদেবের ঊর্দ্ধমুখী ও অধোমুখী ব্যাখ্যা আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। এটা কি সহজ কথা নহে যে, যদি সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত না হইত তাহা হইলে সৌখীন-দ্রব্য-প্রস্তুতকারীগণ আহার পাইত না?

শিষ্য। "ঊর্দ্ধমুখী ও অধোমুখী ব্যাখ্যা" আপনার এই ভাষার ভিতরে একটু রহস্যের ভাব আছে। আমাদের গুরুদেবের সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় রহস্য করিলে আমাদিগের কষ্টহয়,—

জমীদার। যাউক, ওকথাটা কিছু মনে করিও না।

শিষ্য। আপনি বলিতেছেন, এটা সহজ কথা যে, যদি সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত না হইত, তাহা হইলে সৌখীন-দ্রব্য-প্রস্তুতকারীগণ অন্য উপায়ে আহার পাইত না। আপনি এটা যত সহজ কথা বিবেচনা করিতেছেন, তত সহজ নহে। মূলধন সম্বন্ধে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের কি ৪র্থ সূত্র মনে পড়িতেছে না? মিল বলেন,—Demand for commodities is not demmand for labour

জমীদার। হাঁ ঐ রকম একটা কথা মিল বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি ঐ কথাটা ভাল বুঝি নাই। আর মিল কতকগুলি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা আমি খণ্ডন করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে আমার বিশ্বাস জন্মায় নাই।

কেবল মিল নহে। ইংলণ্ডে মহা পণ্ডিত Recardo এবং ফরাসী দেশে এডাম স্মিথ স্থানীয় Say সাহেব ইঁহারাও ঐ মতাবলম্বী। আধুনিক, কতকটা সাম্যবাদী, ফরাসী অধ্যাপক Lavelayeও এই মত।

জমীদার। তা' হউক, আমি ওকথা মানি না। মিলের এই তর্কটী আমার ঠিক মনে নাই।

শিষ্য। আপনার এই কেতাব খানায় অবশ্য মিল আছে।

জমীদার। তুমি Mill এর Political Economy চাও? এই লও।

শিষ্য। বেশ মহাশয়।

Book I., chapter V., Section 8 আমি পড়ি।

"The demand for commodities determines in what particular branch of production the labour and capital shall be employed; it determines the *direction* of the labour, But not the more or less of the labour itself, or of the maintenance or payment of the labour"

অর্থাৎ কেহ বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করুক আর না করুক, তাহাতে শ্রমীদিগের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। কোনও বিলাসের দ্রব্যের ব্যবহার যদি উঠিয়া যায়, কারবারী সেই দ্রব্য প্রস্তুত না করিয়া, যে টাকা বিলাস-দ্রব্যের কারবারে খাটাইত, তাহা অন্য কোন কারবারে খাটাইবে। তাহাতে পূর্ব্বেও যতজন শ্রমী খাইতে পাইত, পরেও ততজন শ্রমী খাইতে পাইবে।

জমীদার। মিলের ওকথাটা ছাড়িয়া দেও।

শিষ্য। আমাদিগের গুরুদেব মিলের ঐ কথা মানেন না। বরঞ্চ তাহা যে ভুল, তিনি আমাদিগকে বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিলের অনুগামী ফসেট

এই বিষয়ে প্রথমে মিলের মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন। গুরুদেব বহু পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্যদিগকে যে ভুল দেখাইয়া দিয়াছিলেন ফসেট তাহার পুস্তকের শেষ সংস্করণে সেই ভুল কতকমাত্র সংশোধন করিয়াছেন।

জমীদার। তোমাদিগের গুরুদেব যদি মিলের ঐ মত খণ্ডন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমারই মত স্থির থাকে। অর্থাৎ বিলাসীগণ শ্রমীদিগের ভোগ্য মূলধন বৃদ্ধি করেন।

শিষ্য। আপনার কথার মর্ম্ম কি এই যে, যদি সংসারে বিলাস না থাকিত, তাহা হইলে অনেক গুলি শ্রমী আহার পাইত না?

জমীদার। হাঁ। তা বই কি।

শিষ্য। বেশ। যদি সমাজে বিলাস না থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্থাৎ কেবল মাত্র স্বাস্থ্যকর ও কষ্ট-নিবারক অসন-বসন ও স্বাস্থ্যকর ও কষ্ট-নিবারক গৃহেই সন্তুষ্ট থাকিত। সুতরাং প্রত্যেক, যেটুকু ভূমি এইরূপ সহজ খাওয়া-পরা ও বাড়ীর জন্য দরকার, কেবল সেই টুকু জমী দখল করিত। তাহার অতিরিক্ত জমী দখল করিবার জন্য কাহারও বাসনা হইত না। কাহারও অতিরিক্ত ভূমি না থাকাতে কেহই রিক্ত-ভূমি হইত না। আর আর কোন জমীতে মদ্য, অহিফেন বা অন্য কোন বিলাসের উপকরণ প্রস্তুত করিবার জন্য, আবাদ হইত না। সব জমী কেবল মাত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য, প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি দ্রব্যের জন্য চাস করা হইত। তাহা হইলে দেখুন, খাদ্যের পরিমাণ কত অধিক হইত, ঘরে ঘরে শস্য ছড়াইয়া যাইত, রাশি রাশি শস্য রক্ষিত থাকিত, দুই এক বৎসর অনাবৃষ্টিতে দুর্ভাগ্য হইত না। অনাহারে কেহ মরিত না, ক্ষুধার জন্য পুকুর চুরি ডাকাইতি করিত না। ক্ষুধার জন্য নারী গণিকা হইত না। আর, এখন এত বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিসের জন্য? অপরিতৃপ্ত বিষয় বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, কিন্তু যখন সকলেরই যাহা চাহি, তাহা খাওয়া পরার জন্য যাহা আছে, তাহার অধিক কাহারও দরকার নাই, তখন লোকে সম্পত্তির লোভে পতিত হইত না, লোভে পড়িয়া ভাই ভাই তাহা ভুলিয়া গিয়া, পরস্পরের মাথা ভাঙ্গিত না। দেখিতেছেন না কি মহাশয়, যে এই বিলাসই সর্ব্বনাশের মূল। এই বিলাসই অতিরিক্ত ভূমি গ্রাসের মূল, এই বিলাসই বহু লোকের নির্ভূমি হওয়ার কারণ, এই বিলাসই বহু লোকের দারিদ্র্যের ও দাসত্বের ও মৃত্যুর হেতু। এই বিলাসের মূল ইন্দ্রিয়াসক্তি ও গর্ব্ব। আর বিলাসীর পরিণাম কাপুরুষতা, ধর্ম্মের নাশ—আত্মার দুর্গতি।

জমীদার। তোমার কথাগুলিতে আমায় Utopia মনে পড়িতেছে। তোমার বয়স অল্প, তোমার আশা উৎসাহ অধিক।

শিষ্য। এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহা Utopia বৎ ছিল, অদ্য তাহা বাস্তব জগৎ। অদ্য যাহা Utopia বোধ হইতেছে, ১০০০ বৎসর পরে আবার তাহা বাস্তবিক জীবনের বিষয় হইবে। দেখুন, মহাশয়, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সম্প্রদায় বিলাস পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ, তাহাদিগের উন্নতি হইয়াছে কি না, তাহাদিগের ভিতর দারিদ্র্য ঘুচিয়াছে কি না। বিলাতে ও আমেরিকাতে Quakers, ইংলণ্ড এবং জর্ম্মানিতে Mennonites, ইঁহাদিগের ভিতর বিলাস নাই। ইঁহারা কেমন সুখ-স্বচ্ছন্দে আছেন দেখুন ইঁহাদিগের মধ্যে

নিঃস্ব ব্যক্তি নাই, প্রায় সকলেরই অবস্থা ভাল। ইঁহারা সকলেই শ্রমী, মিতব্যয়ী। ইঁহাদিগের পোষাক এবং বাড়ীতে আড়ম্বর নাই। ইঁহারা পরস্পরকে সাহায্য করেন, তাহার উপর কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করেন, শ্রমের দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় ধন বৃদ্ধি করেন। যাহা অদ্য Quaker দিগের মধ্যে দেখিতেছেন, তাহা এক হাজার বা দুই হাজার বৎসর পরে সমুদয় পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা বিচিত্র কি?

জমীদার। এত শীঘ্র? ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মাইবার পূর্ব্বে, মানুষ যাহা ছিল, এখনও প্রায় তাহাই আছে।

শিষ্য। আমি ঠিক সময় অবশ্য নির্দ্দেশ করিতেছিনা। না হয়, আরও কিছু পরে হইবে। তবে, আমাদিগের গুরুদেবের এ কথা নিশ্চয় যে, মানুষ যতই পাশব ভাব ত্যাগ করিবে, ততই জড় জগতের শাসন, ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব ও বিলাসপ্রবৃত্তি অতিক্রম করিবে, আত্মা ততই মায়া ও মোহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এই মুক্তি যখন পূর্ণ হয়, তখন আমাদিগের শাস্ত্রের কথিত মোক্ষ লাভ হয়। এই মোক্ষ প্রাপ্তির অর্থাৎ আত্মার বিষয় বিকাশের প্রথম সোপান, বিলাস ত্যাগ বা ইন্দ্রিয় দমন। সকল শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য এই ইন্দ্রিয় জনিত—বিষয় জনিত যে সুখ, সে সকল নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু। তাই গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন,—

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা
দুঃখ যোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়
নতেষু রমতে বুধঃ॥"

জমীদার—তুমি সুবক্তা ও পণ্ডিত। তোমার গুরুদেবের উপযুক্ত শিষ্য তাহা বোধ হইতেছে। কিন্তু তুমি কাহাকে বিলাস বল, তাহা আমি বুঝি নাই।

শিষ্য। আপনি বিলাসের সংজ্ঞা চাহেন। বেশ কথা। কিন্তু অদ্য রাত্রি হইল, যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে আমরা এখন বিদায় হই।

জমীদার। আবার কবে আসিবে?

শিষ্য। ঠিক বলিতে পারি না। তবে দেখা হইবে।

কৃষক ভায়া, তুমি আজি কোন কথাই কহিলে না কেন?

কৃষক। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা। তার ভিতর আমি মূর্খ মানুষ, কি বলিব? আমি যে গ্রন্থখানি আপনাকে দিয়াছি, তাহা আপনি রাখিবেন কি? রাখুন।

জমীদার। আচ্ছা। ভরসা করি, তোমরা শীঘ্রই আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

কৃষক ও তাহার সঙ্গী চলিয়া গেলেন।

জমীদার বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই যুবাটীও দেখিতেছি একটী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। খুব পণ্ডিত, বিনয়ী, ত্যাগী, উৎসাহী। ইহার গুরুদেব না জানি কি প্রকার লোক"! এমন সময় দূরে আবার সেই গান—

মোরা এই চাই—
মোরা ভাই ভাই, মোদের বিবাদ নাই
মোরা গান গাই মোরা খেতে চাই।

ইত্যাদি—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

স্বর্গীয় মহাত্মা গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ।

"Many are the lives of men unwritten, which have nevertheless as Powerfully influenced Civilisation and Progress, as the more fortunate great whose names are recorded in biography."—Samuel Smiles.

আজ আমরা যাঁহার জীবন আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাঁহাকে আমরা বড় সৌভাগ্যেই পাইয়াছিলাম। স্বেচ্ছায় যিনি আপনাকে সংসার-কোলাহলের অন্তরালে রাখিয়া আজীবন জন্মভূমির সেবাব্রতে কঠোর সাধনা অভ্যাস করিয়াছিলেন, যথার্থই তিলে তিলে দেহক্ষয় করিয়াও জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, স্বদেশের গৌরব প্রকাশ করিতে আয়াস এবং অর্থব্যয়ে একদিনের জন্যও যিনি কাতর হন নাই, ভারতের প্রাচীন গৌরবান্বিত বিদ্যাবিশেষকে বিস্মৃত ও বিলুপ্তপ্রায় দেখিয়া যিনি আন্তরিক যাতনা বোধ করিতেন, এই মহাত্মা বঙ্গদেশের প্রান্তবর্ত্তী একটী নির্জ্জন পল্লীকুটীরে আপন কর্ত্তব্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার চরিত্রের সৌরভে দূরদেশের গুণগ্রাহী জ্ঞানীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। রাজধানী হইতে জীবনের অধিকাংশ সময় দূরে থাকিয়া, সমুদয় আন্দোলন কোলাহল হইতে আপনাকে অপসারিত রাখিয়া তিনি হয়ত স্বদেশীয় সর্ব্ব সাধারণের পরিচিত হন নাই, কিন্তু তথাপি যিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্ততঃ একদিনের জন্যও তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তিনিই একটা কেমন উচ্ছ্বাসের ভাবে বলেন, "বিদ্যাবিনোদ গোবিন্দ মোহন দেশের গৌরব ছিলেন।" তবে সংসার-ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে তাঁহাকেও নীতিদ্রোহী একদল লোকের বাক্য ও ব্যবহার-বিষের প্রভাব সহ্য করিতে না হইয়াছে, এমন নহে। সময়ে তাহারা তাঁহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে সমুদয় ব্যক্তিই প্রত্যেকে তাঁহার দ্বারা কোন না কোন বিশেষ উপকারে উপকৃত ছিল। সংসারের এই সব প্রতিকূল বিঘ্নে তাঁহার কোন প্রকার হানি হওয়া দূরের কথা, তাঁহার চরিত্রের শক্তি অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার জীবনের ঘটনার এই অংশের সহিত পাশ্চাত্য লেখক Jonathan Swiftএর উক্তি আমাদের মনে পড়িয়া যায়; তিনি বলিয়াছিলেন,—

"When a true genius appeareth in the world, you may know him by this infallible sign, that the dunces are all against him.—"

যাহাহউক, তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত লইয়া বঙ্গবাসী যে আপনাদের গৌরব করিতে পারে, বঙ্গের মুখোজ্জলকারী সন্তানদের মধ্যে তিনি যে একজন মুখোজ্জলকারী ছিলেন, তাহা দেশের কৃতবিদ্য সমাজই জানিতেন। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-সেবার অভ্যাস এবং আদর্শচরিত্র তাঁহাকে বিনাশ পাইতে দেয় নাই। তাঁহার যথার্থ জীবনকে চিরদিনের জন্য ধরিয়া রাখিয়াছে—তাঁহার কৃত কার্য্য জাজ্বল্যমান অক্ষরে তাঁহাকে আমাদের নিকট জীবিত রাখিয়াছে। গ্রন্থাবলী পাঠে অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বদেশ এবং বিদেশের যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁহাদের সেই শ্রদ্ধেয় মহাত্মার সুবিমল জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করার ইচ্ছা স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁহার সেই চিররুগ্ন, শয্যাগত জীবনের

কৃতকার্য্যতার পরিমাণ এত বিপুল এবং নানা-বিষয়িনী প্রতিভায় এমন শোভিত ও বিবিধ শিক্ষনীয় ঘটনা সমন্বিত যে, সাময়িক পত্রে অদ্যকার এই আলোচনা, তাহার আভাষ বৈ অধিক দিতে পারিবে না। মহাত্মা গোবিন্দ মোহনের জন্মস্থানের অবস্থা, দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্তের শিক্ষা, সংসর্গ ও আদর্শ, তারপর স্থানান্তরে পিতৃসান্নিধ্যের শিক্ষাপ্রণালী ও তাঁহার প্রকৃতি এবং তদনন্তর বৈষয়িক গুরুভার ও তদনুযায়ী মনুষ্য-সংসর্গ ইত্যাদি জীবনের অবস্থান-ঘটনার প্রকৃতি একবার মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, তিনি কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন ভ্রমান্ধ প্রতিবেশী জনসাধারণের নিত্য সাহচর্য্যে থাকিয়াও, পরে সুকঠিন জীবন-সংগ্রামে বেষ্টিত হইয়াও, দয়া-ধর্ম্মহীন, আইন-কানুনহীন, আত্মোদর-পূরণ-স্বভাব সংসারের একান্ত সংসারী হইয়াও একদিকে ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা জ্ঞানগোচরে রক্ষা করিয়াছেন, আর একদিকে সংসার এবং সাংসারিকতাকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর উচ্চ জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বদেশ, স্বজাতি ও সাহিত্যের জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন!

১৭৬০ শকাব্দ, ভাদ্র মাসের শুক্লাবামন দ্বাদশী দিনে সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র কায়স্থ কুল-পরিচিত শ্রীযুক্ত রাধামোহন রায়ের একমাত্র পুত্র গোবিন্দমোহন তাঁহার মাতুলালয় পাবনা জেলার অন্তর্গত গয়েশবাটী গ্রামে শ্রীযুক্ত অভয়াকান্ত রায় মহাশয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ব পুরুষের ইতিহাস-গ্রন্থের অনুবাদ প্রসঙ্গে মহাত্মা গোবিন্দমোহন স্বহস্তে লিখিয়াছেনঃ—

"ভূতনন্দী বারেন্দ্রকায়স্থসমাজসংস্থাপন কর্ত্তাদিগের মধ্যে অন্যতম। এই মহাত্মা অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন। কাল সহকারে ইহাঁর সাতটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম, শ্রীকণ্ঠ, দ্বিতীয়, শিব, তৃতীয়, শঙ্কর, চতুর্থ, কৌতুক, পঞ্চম, বাল্মীক, ষষ্ঠ, কানু, এবং সপ্তম মাধব নামে বিখ্যাত। বাল্মীক নিঃসন্তানাবস্থায় পরলোক গমন করেন, সুতরাং ইহাঁর বংশ নাই, অবশিষ্ট ছয় ভ্রাতার মধ্যে কানু এবং মাধব শ্রেষ্ঠ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিব, শঙ্কর প্রভৃতি চারি ভ্রাতার কেহ কেহ মধ্যম ভাব এবং কেহ কেহ সাধারণ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ মাধবের সন্তান-সন্ততি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বারেন্দ্রকায়স্থ সমাজে মহাত্মা মাধবকে প্রজাপতি বলিলেও বলা যায়। এই কানু ও মাধব দুই ভাই পূর্ব্বে বহ্লার নামক স্থানে ছিলেন, পরে তাৎকালিক জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত পোতাজিয়া নামক গ্রামে বাস করেন। ইহাঁদের সন্তান সন্ততিগণ পোতাজিয়া হইতে নানাস্থানে বসতি বিস্তার করিয়াছেন। কানুর তিনটি পুত্রসন্তান জন্মে; একজন অষ্টমনিষা গ্রামে, আর একজন গঙ্গাতীরে বাস করেন। মাধবের সন্তান-সন্ততিগণ প্রথমতঃ সকলেই পোতাজিয়া ছিলেন, পরে বংশ বৃদ্ধি নিবন্ধন নানাস্থানে যাইয়া বাস করিয়াছেন। কানুর সন্তান অষ্টমনিষা নিবাসী গোপীকান্ত রায় সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক নিয়োগী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কানুনগো দপ্তরের প্রধান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই গোপীকান্ত রায়ের বংশ পরম্পরা অদ্যাপি নিয়োগী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। ইহাঁর জ্ঞাতিগণ মধ্যে কেহ কেহ সিংহডাঙ্গা এবং কেহ কেহ দেওঘর নামক স্থানে বাস করিয়াছেন। কানুর সন্তানগণ মধ্যে কেহ কেহ খামরা কালাই গ্রামে বাস করিয়া বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। খামরার নন্দীবংশে শিবানন্দ নামে একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, ইনি তৎকালীন যবন-রাজের অনুগ্রহভাজন হইয়া সরকার উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বংশের রাজ্যধর নামে একব্যক্তি রায় উপাধি এবং বাঙ্গালার নবাব সরকারে সরকারী ওকালতি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর, প্রজাপতি-কল্প মাধবের সন্তানগণ মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি যবন-রাজ সরকারে প্রধান পদে নিযুক্ত হইয়া রায় ও খাঁ প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁ-

দের মধ্যে দেবীদাস খাঁ অতি বিখ্যাত। প্রাচীন ঢাকুর পুস্তকানুসারে জানা যায়, এই দেবীদাস খাঁ আরবী, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দী এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই দেবীদাস খাঁর বংশীয়গণ মহিমাপুরের নন্দী নামে সমাজে পরিচিত। মাধবের সুবিখ্যাত পুত্র পোতাজিয়া গ্রাম নিবাসী মহাত্মা কাশীশ্বর রায় পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ইনি সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং জ্ঞানধর্ম্মে কাশীশ্বর রায় মহাশয় স্বীয় কুলকে আলোকিত করিয়াছিলেন। এই কাশীশ্বর রায়ের পৌত্র জগদানন্দ রায় দুই বিবাহ করেন, সেই দুই স্ত্রীতে জগদানন্দের পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, মতান্তরে ছয়পুত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমা স্ত্রীর প্রথম সন্তান, আমার ঊর্দ্ধতন সপ্তম-পুরুষ, সমাজ বিখ্যাত মহাত্মা রূপরাম রায় অতিশয় গুণযুক্ত ছিলেন। ইনি আপনার অনুরূপা একটী সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করাতে পিতার বিরাগভাজন হইয়া স্বীয় মাতা ও ভ্রাতা মাধবানন্দ রায়ের সহিত পোতাজিয়ার কিয়দ্দূর পূর্ব্ববর্ত্তী নিজ জমিদারীর অন্তর্গত ভূতিয়া নামক গ্রামে যাইয়া বাস করেন। মহাত্মা রূপরাম রায় আরবী ও পারসী ভাষাতে অসাধারণ কৃতবিদ্য ও তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব নাজিম শায়েস্তা খাঁর নিকটে অতি প্রধান পদে নিযুক্ত ছিলেন, পিতার বিরাগভাজন হইয়া পোতাজিয়া ভদ্রাসনে বাস করা নিতান্ত অসুখের কারণ বোধ করিয়া তাৎকালিক জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত ডিহি কাশীপুরের ভূতিয়া নামক গ্রামে ভদ্রাসন মনোনীত করেন। কিসামত কাশীপুর প্রভৃতি ২৭ খানি গ্রাম রূপ রায়ের নিজকৃত সম্পত্তি ছিল। ১২০৭ সালে রূপরাম রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র গঙ্গানারায়ণ রায়ের (আমার পিতামহের) সময়ে ঐ সম্পত্তি নিলামে বিক্রীত হয়। অতঃপর গঙ্গানারায়ণের পুত্র আমার পিতৃদেব রাধামোহন রায় এবং অন্য পুত্র আনন্দমোহন রায় ও অনুপ নারায়ণের পুত্র রসিকমোহন রায় বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত উধুনিয়া গ্রামে যাইয়া বাস করেন। মোহনলাল ও গোবিন্দ লাল রায় বগুড়াতে যান, আর কুঞ্জবিহারী ও মনোমোহন রায় পৈত্রিক ভদ্রাসনে থাকেন।"

এইরূপে, তাঁহার বংশাবলীর ইতিহাস আদ্যন্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, পিতামহ গঙ্গানারায়ণের সময় হইতেই সাংসারিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক ম্লান হইয়া পড়ে। এইরূপে, বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের একটী শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্তকুলের বংশধরেরা ক্রমে পরস্পর স্থানান্তরিত হইলেন, এবং শ্রীমন্ত রূপরাম রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ গঙ্গানারায়ণের সময়ে, অবশেষে, অজ্ঞাতপূর্ব্ব, অনভ্যস্ত আর্থিক অবসাদ উপস্থিত হইল। কৃতিমান পিতা রাধামোহন রায় মহাশয় যদিও সর্ব্বতোভাবে আপন বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, যদিও তিনি রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা সমাপনান্তে রংপুর জজ্‌কোর্টের উকীল হইয়া আপনার গুণে সকলের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন, তথাপি তিনিই আবার অব্যবসায়ী হইয়া কোন এক ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করায় স্বোপার্জ্জিত সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে গোবিন্দ মোহনের মস্তকে সংসারের গুরুভার পতিত হইল। একমাত্র তাঁহার প্রতি নির্ভরপরায়ণ সংসারের আহ্বানে তাঁহাকে তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর বিদ্যাচর্চ্চা হইতে অন্যমনস্ক হইতে হইল। পৈত্রিক সংসাররক্ষা ও পরিবার-পালনের উপস্থিত কর্ত্তব্যবোধ তাঁহাকে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু তাহা অতি অল্পদিনের জন্য। তিনি যে বিশেষভাবে দেবী সরস্বতীর সেবা করিতেই আসিয়াছিলেন, তিনি যে বৈষয়িক উপযোগিতা হইতে উচ্চতর কোন বিষয়ের উপযোগী হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তিনি যে নিতান্ত স্বাভাবিকরূপে, অকপটহৃদয়ে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতিচর্চ্চা ভালবাসিতেন, তাহা তিনি, বহুবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও, সংসা-

রের নিকট বলিদান করিতে পারিলেন না। সাংসারিক নিত্য আবশ্যক ও অভাবের অশান্তিমধ্যেও বিশুদ্ধ বিদ্যানুশীলন প্রবৃত্তিকে তিনি একটুও মলিন হইতে দেন নাই, নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়াও তিনি উচ্চ মনোবৃত্তিনিচয়কে সযত্নে ক্রমশঃই উন্নত ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন। সমাজধর্ম্মে, জ্ঞানধর্ম্মে, নীতিধর্ম্মে তিনি যাহাই করিয়াছেন, তাহাই উদার, সরলহৃদয়ে এবং স্বার্থশূন্য হইয়া করিয়াছেন। ব্যবসায়ী বুদ্ধির আভাষ মাত্র তাঁহাতে ছিলনা এবং একটী কার্য্য করিয়া তাহা দ্বারা একাধিক ফললাভ আশাও ছিলনা। তাঁহার কৃতকার্য্যের পরিমাণের কথা আপাততঃ না দেখিয়া জীবনের এই কথাটী বুঝিতে আরম্ভ করিলেও গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মন অবনত হইয়া পড়ে। পরন্তু, জীবনের পরবর্ত্তীকালে আমরা যখন দেখি যে, তিনি নীতিধর্ম্মের সূক্ষ্ম রেখাপথে অবিচলিত থাকিতে যাইয়া অনেক সময় সংসারের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়াছেন, জীবনের কোন এক সময় সাংসারিক অভাবের মধ্যে থাকিয়া ও তাঁহার প্রতি অযাচিতভাবে বর্ষিত উৎকট প্রলোভন সকল হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়তা ও সম্ভ্রান্ত মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যবোধ দেখিয়া যেমন পুলকিত হইতে হয়, তেমনি আবার যখন দেখা যায়, স্বার্থপর সংসার তাঁহার দ্বারা অনেক সময় প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তাঁহার গুণের অবমাননা করিতে সাহস পায় নাই, তিনি "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া" সরস্বতীর সেবায় হৃদয়মন সমর্পণ করিলেও লক্ষ্মী আপনার চিরাচরিত ব্যবহার ভুলিয়া গোবিন্দমোহনের প্রতি অল্পবিস্তর কৃপা বিতরণে সঙ্কুচিত হন নাই, তখন এই কঠিন সংসারে নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামপথে একটী স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো দেখিয়া নিরাশ-ভগ্ন-হৃদয়ে বিলক্ষণ আশার সঞ্চার হয় যে, ইহসংসারেই যথার্থ সরলতা ও মহাপ্রাণতার পুরস্কার আছে এবং নীতি ও কর্ত্তব্যের প্রতি যথার্থ নির্ভর-পরায়ণেরা কখনই অবসন্ন হন না।

বিদ্যাবিনোদ গোবিন্দ মোহনের একটী বিশেষত্ব আমরা সর্ব্বদাই বিলক্ষণ উপলব্ধি করি যে, উচ্চতর জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতিচর্চ্চাকেই তিনি মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ সার্থকতা ও সকল সময়ের জন্যই পরমবাঞ্ছিত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং সেই পরমবাঞ্ছিত পদার্থকে একদিনের জন্যও আপনার কোন প্রকার পার্থিব আনুকূল্যের সহিত মিশিতে দেন নাই, অথচ ক্ষতিলাভ গণনা-পরায়ণ সংসারের নিত্য-সহচর হইয়াও তিনি সংসার-নীতি ও ধর্ম্মনীতি এতদুভয়ের নিকটই সমান যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উন্নত জীবনের এই বিচিত্র কৃতকার্য্যতা, এবং সাংসারিকতা ও স্বর্গীয় ভাব এই পরস্পরবিরোধী উভয় অবস্থার অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যিনিই কিছুদিনের জন্য তাঁহার সান্নিধ্য-সুখভোগ করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন, প্রাচীন হিন্দুকুলোদ্ভব গোবিন্দমোহন নিষ্ঠায়, চরিত্রে, দৃষ্টান্তে ও জ্ঞানানুশীলনে একদিকে যেমন আপন কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন, আর একদিকে তেমনি পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায় সকলের সহিত অভিন্নবুদ্ধিতে জ্ঞানধর্ম্মের চর্চ্চা করিয়াছেন। তিনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণববংশের সন্তান হইলেও অনেক মতান্তরবাদী জ্ঞানী ও ভক্তের প্রীতিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, কোন কোন মুসলমান মৌলবীর সহিত ধর্ম্মালাপে এক এক দিন তাঁহার সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। ধর্ম্মপথে

একদিকে এই দৃশ্য, আর একদিকে সংসার-পথেও তাঁহার জীবনের ইহাই অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। সাংসারিক কার্য্যের প্রায় সকল বিভাগেই দেখা যায়, এক পক্ষ লাভবান হইতে যাইয়া অন্য পক্ষের ক্ষতি লাভের কথা ভাবিতে পারে না, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক কর্ম্মময় জীবনের একটীমাত্র ঘটনা দ্বারাও প্রমাণ করা অসম্ভব যে, তিনি কোন দিন এক পক্ষের কার্য্যে অগ্রসর হইয়া আর এক পক্ষের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। সংসারের সহিত তাঁহার প্রায় জীবনব্যাপী সংস্রব ছিল, একটী রাজসংসারের অন্যতম প্রধান অমাত্য-পদের দায়ীত্বে থাকিয়া তাঁহাকে সকল সময়েই উভয় পক্ষের সংস্রবে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু এমন একজন সত্যবাদীও নাই, যিনি বলিতে পারেন সংসারী গোবিন্দমোহন একদিনের জন্যও কোন এক পক্ষে পক্ষপাত করিয়াছেন। চরিত্রের এই অমূল্য মহত্বকে তিনি আমরণ পর্য্যন্ত অম্লান রাখিবার জন্য যথার্থ বীরের ন্যায় যত্ন করিয়াছেন ও তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং এইরূপে ন্যায়, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে যাইয়া জীবনে অনেক সময়ে প্রতিকূল সংসারের অনেক তরঙ্গাঘাত সহিয়াছেন, কিন্তু এক দিনও ডুবিয়া যান নাই—যেমন উজান বহিতেছিলেন, তেমনি বহিয়া আপন গন্তব্যে অগ্রসর হইয়াছেন। হয়ত, সংসারের কোন এক পক্ষ তাঁহার নিকট ন্যায্যের অতিরিক্ত প্রাপ্যের আশায় নিরাশ হইয়া তাঁহার প্রতি দারুণ বিরক্ত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সে পক্ষ তাঁহার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে সাহসী হয় নাই এবং হয়ত অন্য কোন সাংসারিক সঙ্কটে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। "জবরদস্ত" সংসারী বলিলে সাংসারিক ভাবে যাহা বুঝায়, তাহা তাঁহাতে কিছুই ছিল না। চিররুগ্ন তিনি, শারীরিক শ্রমে অসাধারণরূপে অপারগ ছিলেন, কখনও কোন অবস্থাতেই সত্য বৈ মিথ্যা বলিতে সাহস পাইতেন না, ন্যায়ের নিকট স্বপক্ষ বিপক্ষের বিশেষ করিতেন না, কিন্তু তথাপি সংসার তাঁহার সান্নিধ্যে শক্তি অনুভব করিত। এইরূপে তাঁহার সাংসারিক জীবনের ঘটনাবলীও আমাদিগকে সত্যপথে একটা জীবন্ত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। জবরদস্ত সংসারী ছিলেন না, অথচ তিনি কিরূপে সংসার-নীতির নিকট যশস্বী হইতে পারিয়াছেন, তাহা দেখিলে আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, চরিত্রবলই সাংসারনীতির প্রাণ—চরিত্র-বলই রাজার রাজ-শক্তি। তাঁহার সেই বল যথেষ্ট ছিল বলিয়াই তিনি সংসারের রাজ্যে বাস করিয়াও তাহার নিকট আপনার প্রকৃত মহত্ব বিক্রয় করেন নাই এবং আশ্চর্য্যের বিষয় সংসারও তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে সাহস পায় নাই। তাঁহার জীবনে "Honesty is the best Policy" "সততা সকল লাভের মূল কথা" যেন প্রতি বর্ণে ফলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি লাভের জন্য কোন দিন সততা শিক্ষা করেন নাই। সততা ও সত্যপ্রিয়তা তাঁহার সহজাত স্বভাব ছিল। ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহার বাল্যজীবনেই দেখিতে পাই। যে সত্য রক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি একাধিক ঘটনায় দারুণ দুরবস্থাকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার বাল্যজীবনেও আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। তাঁহার দুই তিন জন বয়োজ্যেষ্ঠের নিকট আমরা অতি আনন্দের সহিত শুনিয়াছি যে, বিদ্যাশিক্ষার জন্য যখন তিনি আলয় হইতে জননীর নিকট বিদায় হইয়া রংপুরে পিতৃ-

সান্নিধ্যে আসেন, তখন তিনি কিঞ্চিন্ন্যূন দ্বাদশ বৎসরের বালক। তখন দেশে রেলপথ ছিল না, তাই তখনকার নিয়মানুসারে নদী-পথে নৌকায় আসিতেছিলেন। পথে তাঁহার অভিভাবকেরা একদিন মৎস্য-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে যথেষ্ট মৎস্য কিনিয়া যথাস্থানে রাখাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটী সুবৃহৎ মৎস্য জীবিত ছিল, আহারের জন্য অধিক মূল্যে তাহাকে লওয়া হইয়াছিল। সহসা একদিন অমন ভাল মাছ পাইয়া সকলেই যার পর নাই উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু সেই মাছটীকে দেখিয়া বালক গোবিন্দমোহনের মন গেল আর একদিকে। জীবিত বৃহৎ মাছটাকে যথাস্থানে রাখিয়া নৌকার সকলেই ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হইয়াছে, এমন সময়ে সুযোগ বুঝিয়া বালক গোবিন্দমোহন ত্বরিতে সকলের অজ্ঞাতসারে মাছটী ধরিয়া নদীর গভীর স্রোতোজলে ছাড়িয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই যথাকালে মাছের অনুসন্ধান হইল, তখন সে মাছ আর নাই! এজন্য নৌকামধ্যে যখন গোলমাল উপস্থিত হইল, মুখের গ্রাস, অমন উত্তম মাছ হারাইয়া যখন তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই বিরক্ত ও অধীর হইয়া উঠিলেন, তখন সেই অতটুকু বালক গোবিন্দমোহন অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মাছ আমিই জলে ছাড়িয়া দিয়াছি।" বালকের এই সৃষ্টিছাড়া অসম্ভব উক্তি শুনিয়া যখন সমবেত তীব্রস্বরে "কেন?" "কেন?" ধ্বনি উঠিল, তখন অসম্ভবরূপ ভর্ৎসনা অথবা অন্য যে কোন শাস্তির জন্য বালক গোবিন্দমোহন প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু প্রত্যুত্তর করিলেন না। আমরা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে অতি কৌতূহল ও আনন্দের সহিত তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, যখন সেই অপরাধে তাঁহার প্রতি অভিভাবকদের তীব্র ভর্ৎসনা ও নৌকার মাল্লাদিগের পর্য্যন্ত বিদ্রূপ বর্ষিত হইতে লাগিল, তখন তিনি সে সকলই ইহাই ভাবিয়া অতি মাত্র ধীরভাবে ও আনন্দের সহিত সহ্য করিতেছিলেন যে, "যাহা হউক, বেচারা মাছটাকে ত সকলের জানিবার আগে জলে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।"

অতি কোমল, অগঠিত বালা-হৃদয়ের এই উচ্চ ভাব এবং দৃঢ়তাকেই আমরা তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তীকালে আরও অধিকতর উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইয়াছি। এই বালককেই আমরা পরবর্ত্তী জীবনকালে দেখিয়াছি, রুগ্ন দেহের আবশ্যক সত্ত্বেও মৎস্য মাংস আহার করেন নাই, পরিবার মধ্যে মৎস্যাহারী কাহারও জন্য জীবিত মৎস্য গৃহে আনা একান্ত অনভিমত ছিল ও নিজের একমাত্র পুত্র কোন দিন বাল্যকালসুলভ চপলতার বশে কোনও নিমন্ত্রণ-গৃহে মাংসাহার করিলে তিনি এজন্য অন্তরঙ্গ ও বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করিয়া স্বহস্তে আপন ললাটে করাঘাত করিয়াছিলেন, এবং একদিন কোনও বন্ধু তাঁহার নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের বিবাদ বিবরণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি সকল কথার উত্তর দিয়া অবশেষে সজল নয়নে, গদ্গদকণ্ঠে বৈষ্ণবকবি জয়দেবের গান আবৃত্তি করিয়াছিলেন;

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং,
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর।
জয় জগদীশ হরে॥"

পরন্তু, জীবনে তিনি যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাই তিনি অকপট হৃদয়ে করিয়াছেন, এজন্য স্বকীয় অথবা অন্যদীয় সম্প্রদায়ের

মুখাপেক্ষা করেন নাই। এজন্য তিনি অনেক সময় আপনার দেহের এবং সংসারের ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন ও অনেক সময় অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে আত্মনিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাঁহার যেরূপ ভূয়োদর্শন ছিল, প্রাচীন ও নবীন উভয় ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তিনি যেমন সুন্দর ভাবে শাস্ত্র-মীমাংসা করিতে সমর্থ ছিলেন, বর্ত্তমান বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা তিনি যেমন সর্ব্ব-সাধারণের মনোজ্ঞ প্রণালীতে লিখিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার সম্ভ্রান্ত সাহিত্য-ব্যবসায়ের যথেষ্ট অনুকূল পথ ছিল ও তদ্দ্বারা হয় তো তিনি লাভবান্ হইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চার আদ্যন্ত সমালোচনা করিয়াও আমরা তাঁহাকে এক দিনের জন্যও সাহিত্য-ব্যবসায়ী বলিতে পারি না। তাঁহার শিক্ষিত সুহৃদ্বর্গের মধ্যে অনেকে তাঁহার কৃত কোন কোন গ্রন্থকে বিদ্যালয়ের যোগ্য করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোন দিনই তাঁহার মনোযোগ হয় নাই। বিদ্যাবিনোদ যখন ভাস্করাচার্য্যের সংস্কৃত লীলাবতীর বঙ্গানুবাদ করিলেন, তখন অন্যান্য অধিকতর বিখ্যাত লোকের সঙ্গে "সাধারণী" সম্পাদকও বলিয়াছিলেন,—

"এই লীলাবতীর সহিত যদি এখনকার প্রচলিত ভাষা সংযোজিত থাকে এবং সেই পরিভাষা অভ্যাস জন্য যদি মিশ্র রাশির গুণ-ভাগাদির নিয়মে কতকগুলি উপযুক্ত উদাহরণ থাকে, তাহা হইলে ইহা বিদ্যালয়ে চলিত হইবার উপযোগী হয় ও আমরা বিবেচনা করি, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ঐরূপ পরিশিষ্ট যোজনা করিলে ভাল হয়। ইত্যাদি।"

কিন্তু গ্রন্থাবলীকে বিদ্যালয়ের উপযোগী না করিবার কারণ অনুমান করিয়া, বিদ্যাবিনোদের হৃদয় এবং মনের অবস্থা বুঝিয়া "মুর্শিদাবাদ-পত্রিকা একদিন বলিয়াছিলেন,—

"বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লীলাবতী, বঙ্গীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যমধ্যে যে সন্নিবেশিত হইবে, আমরা সে আশা করি না; বিশেষতঃ তিনিও তদুপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। সমধিক উদাহরণ ও সাধন দ্বারা পুস্তক বিস্তৃতাকারে পরিবর্দ্ধিত হইলেও ** মহাশয়ের ইংরেজী পাটীগণিত, বঙ্গ পরিচ্ছেদে যে বিদ্যালয়ে ভ্রমণ করিতেছে, তথায় লীলাবতীর স্থান পাওয়া সমধিক মাল-মসলার সংযোগ আয়ত্ত। ফলতঃ স্বর্ণবক্ষে হীরকের ন্যায় স্ফটিকখণ্ডও কার্য্যকর হইতে পারে বলিয়া হীরকের মহিমা নিষ্প্রভ হইতে পারে না; যাঁহারা হীরকের মর্ম্মজ্ঞ, তাঁহাদিগের নিকট ইহার সমাদর হইবে, সন্দেহ নাই।"

বিশুদ্ধ-জ্ঞানানুশীলন-সুখভোগ ব্যতীত বিদ্যালয়ে গ্রন্থ প্রচার জন্য যে তথা-কথিত "মাল-মসলা" আবশ্যক, তাহার অস্তিত্ব বিদ্যাবিনোদের মন ও শরীর-ধর্ম্মে কোন দিনই ছিল না। স্বীকার করিতে হইবে, কোন কোন উন্নতচেতা গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী তাঁহাদের অযাচিত ভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা তাঁহাদের সাংসারিক লাভ অগৌরবলব্ধ নহে; কিন্তু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, অজ্ঞাত পল্লীগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তাঁহার মর্ম্মজ্ঞ অতি অল্প-সংখ্যক ছিলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি স্ব-দেশের গৌরব-গ্রন্থ, বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলে, সেই "মাল-মসলা" ব্যতীত আর উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি সেরূপ প্রকৃতির-অতীত ছিলেন এবং শুদ্ধ স্বদেশীয় গৌরব প্রকাশের পবিত্র ভাবের মধ্যে তিনি নিজের লাভ ও সাংসারিকতার ছায়াপাত করিতে অত্যন্ত

সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। আমরা যখন দেখি যে, বিদ্যাবিনোদ গোবিন্দমোহন, আপন বিষয়-কর্ম্মের ন্যায্য প্রাপ্তির কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা ব্যতীত কড়া ক্রান্তি মাত্র গ্রহণ না করিয়া সচরাচর প্রচলিত মধ্যবিত্ত অবস্থায় একদিকে সংসারের গুরু-ভার, আর এক দিকে নিজের সদা রোগযাতনাময় শীর্ণ, দুর্ব্বল দেহ-যষ্টি খানি লইয়া অবস্থাতিরিক্ত অর্থব্যয়ে ও সম্ভবাতিরিক্ত অধ্যবসায়ে, শুধু একখানি নহে, গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিয়া জন্মভূমির অমূল্য জ্ঞানরাশি প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহার প্রতিদানে আর কিছুরই প্রত্যাশা না করিয়া কেবল বলিয়াছেন,—

"প্রাচীন হইতেও প্রাচীনতম কালে ভারতে গণিত বিজ্ঞানাদির বহুল প্রচার ছিল। ইহাতে যদি সে বিষয় অবগত হইয়া বঙ্গবাসী যুবকবৃন্দের স্বদেশানুরাগ উপচিত হইয়া থাকে, তবে সমুদয় শ্রমও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিয়াছি"—তখন স্বতঃই মনে না হইয়া যায় না যে, তাঁহার মতন মাতৃ-ভূমির এমন নিঃস্বার্থ অনুরাগী, আমরা আমাদের দেশে সময়ে সময়ে দুই চারিটীর অধিক পাই নাই। তাঁহার হৃদয়ের সেই নিঃস্বার্থ ভাব, কেবল একটী বিষয়েই প্রকাশ পায় নাই,—তাহা যেমন সাহিত্য-ক্ষেত্রে, তেমনই সাংসারিক পরীক্ষায় এবং তেমনই ধর্ম্মজীবনে আমাদের নিকট জীবন্ত-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এক দিকে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে যেমন স্বদেশ-হিতৈষণায় অনু-প্রাণিত হইয়া সম্ভবাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অবস্থাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিদানে নিজের কিছুই প্রত্যাশা করেন নাই, তেমনই তিনি সংসারিরূপে সংসার ও সংসারীদিগের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন; কিন্তু যথাতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশা করেন নাই এবং তেমনই তিনি ধর্ম্মরাজ্যে হিন্দু-সমাজের একজন পরমাত্মীয় চিহ্নিত ব্যক্তি হইয়া হিন্দু-সমাজের গৌরব-প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নিজের হৃদগত বিশ্বাস প্রকাশ করিতে, সম্প্রদায় অথবা সাম্প্রদায়িক-তার মুখাপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার জীব-নের প্রত্যেক বিভাগের ঘটনা, এইরূপে আলোচনা করিলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, সেই ক্ষীণ দেহখানির মধ্যে এক অসাধারণ আত্ম-নির্ভরতা, সত্যনিষ্ঠা ও তেজ-স্বিতা চির-জাগ্রৎ ছিল। এই উন্নতচেতা মহাত্মাকেই আবার আমরা যখন আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের মূর্ত্তিমান্ পুরুষ-রূপে দেখি, যখন দেখি যে, অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল-দেহ গোবিন্দমোহন কলিকাতার সেই বিগত বিখ্যাত আন্তর্জ্জা-তিক মহা-মেলা-মধ্যে এক দিন কোন এক দুর্দ্ধর্ষ গর্ব্বিত ইংরেজ, নেটিভের প্রতি ঘৃণা-সূচক যষ্টিচালনা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সাহেব-পুঙ্গবের গাত্রে তিনি আপন যষ্টির সুতীব্র আঘাত প্রত্যর্পণ করিয়া সাহেবকে শত শত ইংরেজ ও শত শত নেটিভের সম্মুখে ভদ্রোচিত শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন, তখন নিঃসংশয়ে মনে হয়, মহাত্মা গোবিন্দমোহন, আমাদের দেশীয় বিশুদ্ধ শিক্ষার একটী অমূল্য মৌলিক সৃষ্টি ছিলেন।

দ্বাবিংশতিবর্ষ বয়সে, যখন তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার বিধবা মাতৃদেবী, যার-পর নাই কাতর হন। তাঁহার তাৎকালিক দেশাচার অনুসারে একাদশী-দিবসে বিধবার সামান্য জলপান তো দূরের কথা, আসন্নমৃত্যু অবস্থাতেও একবিন্দু গঙ্গাজল দেওয়া মহা-পাপরূপে গণ্য ছিল। এইরূপ অবস্থায় একা-দশীর এক দিন রোগ-শয্যা-শায়িত মাতৃদেবীর

যখন কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছে, তখন পুত্র গোবিন্দমোহন অক্ষোভে গৃহের সকলের নিকটে প্রকাশ করিলেন, তিনি জননীকে অদ্য অবশ্যই শীতল জল দিবেন। তিনি তখন আপনি আপন গৃহের কর্ত্তা নহেন, গৃহে তাঁহার প্রবীণ অভিভাবক এবং অভিভাবিকারা ছিলেন। তাঁহারা সেই অজ্ঞাতপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব প্রস্তাব শুনিবামাত্র যারপর নাই বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং চিরাচরিত সদাচার-পরায়ণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানশীল পরিবারে এমন পাতিত্য-জনক অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া গৃহের সকলেই তাঁহাকে তীব্র কথা শুনাইয়া দিলেন। সে কথা, কেবল গৃহেই আবদ্ধ রহিল না। ক্রমে "রায়ের বাড়ী" হইতে "সিংহ দের বাড়ী", সিংহদের বাড়ী হইতে "সরকারদের বাড়ীতে" তুমুল আন্দোলন-কোলাহলের সঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল। প্রথমে গোবিন্দ মোহন, আপন বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবকদের এই প্রকার হৃদয়হীন ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্যের দৃঢ়সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তখনই জননীদেবীর নিকটে স্বহস্তে সুশীতল পবিত্র গঙ্গাজল লইয়া তাঁহাকে অপমৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে অনুরোধ করিলেন। জননীদেবী হস্তসংকেতে অসম্মতি জানাইলে, রোরুদ্যমান গোবিন্দ মোহন যখন বলিলেন,—"মা! তুমি নিঃসন্দেহে গঙ্গাজল খাও, যদি এজন্য কোনও অপরাধ হয়, তাহা সম্পূর্ণ আমার"—তখন তিনি কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল গ্রহণ করিলেন। পুত্রের প্রতি জননীর অগাধ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু আর সকলেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। কেহ বলিলেন, উহার সংস্কৃত শিক্ষা ভ্রষ্ট হইয়াছে। কেহ বলিলেন, রংপুরে ম্লেচ্ছ মৌলবীর নিকট পারসী শিক্ষার প্রভাব তাহার পরবর্ত্তী সংস্কৃত শিক্ষাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে! কিন্তু আমরা এখন ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই, সেই কিঞ্চিন্ন্যূন প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন পল্লীগ্রামে অতি প্রবল সমাজশাসন ও দেশাচারের ভয়ে ভীত না হইয়া দ্বাবিংশতিবর্ষ বয়সের যুবক, সুদৃঢ় সংকল্পের সহিত কেমন অকপটে আপন বিবেক-বুদ্ধির অনুসরণ করিয়াছিলেন!

এই ঘটনার মধ্যেই তিনি, তাঁহার জননী এবং একজন শ্রদ্ধেয় অভিভাবককে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন,—"আমার প্রাণের ইহাই নিশ্চিত ধারণা যে, মাকে আমি বিশেষ একাদশী দিনে গঙ্গাজল দিয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই। অশক্ত, মৃতকল্প বিধবাকে একাদশী দিবসে গঙ্গাজল দিতে হিন্দুশাস্ত্রে নিষেধ থাকিলে, তাহা দয়া-ধর্ম্মের শাস্ত্র হইতে পারে না।"—ইহার পর হইতেই তিনি স্মৃতিশাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করিলেন। অব্যবহিত পরেই উদ্বেগময় বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইলেন: কিন্তু তথাপি জ্ঞানানুশীলনে একদিনের জন্যও আলস্য করিলেন না। দিবসের অনেক সময় তিনি সংসারকে দিতে বাধ্য হইতেন, এজন্য আজীবন গভীর রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি বিদ্যা-চর্চ্চা করিয়াছেন। মহাত্মা বিদ্যাবিনোদ, প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষাকে "তপস্যা" বলিতেন। বাস্তবিক তাঁহার নিজের জীবনই, সেই কঠোর তপস্যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল। সে যাহা হউক, উল্লিখিত ঘটনার পরে তাঁহার স্মৃতি-শাস্ত্র আলোচনার শুভফল তাঁহার "হরিবাসর-তত্ত্বসার" গ্রন্থ। ১২৬৯ সালে পঁচিশ বর্ষ মাত্র বয়সে তিনি শ্রীমৎ গোপালভট্ট গোস্বামিকৃত মহামান্য বৈষ্ণবস্মৃতি "হরিভক্তি বিলাস"—গ্রন্থাভিমতা একাদশী ব্যবস্থার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করিয়া ভূমিকায় লিখিলেন,—

"হরিভক্তিবিলাসসম্মতা একাদশীর উপবাস ব্যব স্থায় শাস্ত্র, যুক্তি, শিষ্টাচার তিনেরই বিশেষ সদ্ভাব আছে। শাস্ত্রে কিছুমাত্র বিরোধ নাই, কেবল অধি কারি ভেদে মতের বিভিন্নতা। এরূপ অধিকারী আছেন, যাঁহারা জ্ঞান বা ভক্তিনিষ্ঠাবলে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, অবশ্যকর্ত্তব্য একাদশীর উপবাসেও তাঁহা দের অধিকারের শেষ হইয়াছে। তথাপি লোক-শিক্ষার্থ তাদৃশ কোন কোন মহাত্মা উপবাসব্রতের আচরণ করেন। যেহেতু সাধারণ ব্যক্তিরা যত্ন সহকারে শ্রেষ্ঠ লোকদিগের অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রকৃত তথাবিধ জীবন্মুক্ত একান্তিগণের উপবাসব্রত অথবা বাহ্য পূজাদি বিধিবোধিত কর্ম্মে অধিকারের পরি সমাপ্তি হওয়াতে ভগবদ্বিষয়িভূব শ্রবণ কীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তাঁহাদের প্রায়ই অভিরুচি থাকে না। এতাদৃশ অকপট, শ্রেষ্ঠ, অধিকারী পৃথিবীতে অল্প আছেন। শাস্ত্রকারেরা স্ব স্ব অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাকে গুণ এবং তদ্বিপরীতকে দোষ বলিয়াছেন। অতএব পরকালদর্শি-ব্যক্তি-মাত্রেরই স্বস্বাধিকারা নুরূপ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত উচিত। পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কি ঐহিক কি পারত্রিক উভয়বিধ কার্য্যেই সমুদয় মনুষ্য পরস্পর তুল্যাধিকারী হইতে পারে নাই, পারিবেও না। সক লের শারীরিক মানসিক অবস্থা তুল্য না হওয়ায় এই অধিকার-বিভেদ দ্বারা যে জগতের কত হিত সাধিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এতদ্দ্বারা আমাদের ধর্মশাস্ত্রের অপরিসীম দয়া প্রকাশ পাইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ দয়া না থাকিলে, দুর্ব্বল সবল ভেদে অধিকার-নির্ণয় না থাকিলে, জগতের কত অনিষ্ট, কত কষ্ট হইত। ধর্ম্মের কত হানি, কত গ্লানি হইত। একমাত্র একাদশীর উপবাস-ব্যবস্থাতেই ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুস্থ সবল ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত নিরাহার এবং বিশেষ বিশেষ অসুস্থ দুর্ব্বলদিগের নিমিত্ত একভুক্ত নক্ত, এবং অযাচিত,—অধিকারি-ভেদেই এক উপবাস চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকার বিভেদ দ্বারাই হিন্দুশাস্ত্রের অসামান্য দয়া ভাব প্রকাশ পায়। এতদ্দ্বারা কি ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্মান রক্ষা হইতেছে না? ফলতঃ, শাস্ত্রে এমন বিধান না থাকিলে অধিকাংশ মনুষ্যকেই চিরকাল ধর্ম্মসুখে বঞ্চিত হইতে হইত, সন্দেহ নাই।"

এইরূপে আমরা তাঁহার আদ্যন্ত জীবনে দেখিতে পাই, তিনি হিন্দুশাস্ত্রের সেই 'সম্মান' রক্ষা করিবার জন্য অনুক্ষণ সতর্ক ছিলেন। ব্যবসায়ী হিন্দু-সম্প্রদায়ের নিকট আমরা সচরাচর যাহা প্রত্যাশা করি ও সচরাচর যাহা পাইয়া থাকি, তাহা হইতে স্বতন্ত্র অনেক গূঢ় শাস্ত্র মীমাংসা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। শাস্ত্রের সেই সকল সত্য তিনি শুধুই আমা-দিগকে বাক্যে বলিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, গ্রন্থাদি প্রচার দ্বারা এবং উচ্চতর আপন জীবন দ্বারা বেশ দেখাইয়াছিলেন। এজন্য সময়ে সময়ে তিনি সমাজ-বিশেষেরও অনেক ব্যবসায়ী নেতার বিরাগভাজন হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি আবার তাঁহা-দেরই দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি সকল প্রকার সামাজিক ও সাম্প্রদায়িকতার অনুরাগ এবং বিরাগ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া কেবল সত্যের অনুরোধে পরবর্ত্তী প্রবীণ, জীবনের আরও প্রগাঢ় অবস্থায় আপনার প্রকাশ্য গ্রন্থে অক্ষোভে বলিয়াছেন,—

"ব্যবহারিক শাস্ত্রোক্ত কোন কোন বিষয় অত্যন্ত পক্ষপাত-দূষিত। স্ত্রীলোক ও শূদ্র জাতিকে নানা বিষয়ে হীনাবস্থ করিয়া রাখা প্রাচীন ঋষিগণের মহত্ত্ব-চন্দ্রমার একটী কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যে মনু, সমুদয় সংহিতাকারের আদি গুরু, তৎকৃত মনুসংহি-তাও পক্ষপাত পরিশূন্য নহে। ইদানীং ইংরেজ-রাজপুরুষেরা যেরূপ অধীন ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ রাজকার্য্যে অধিকার দেন না। পূর্ব্বকালে ঋষিগণও সেইরূপ শূদ্র জাতিকে রাজমন্ত্রিত্ব ও প্রাড়্ বিবাক (বিচারকর্ত্তা) পদের অধিকার দেন নাই।

"যদি কার্য্যবশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্যনির্ণয়ং। তদা নিযুঞ্জ্যাৎ বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগং॥

যদি বিপ্রো ন বিদ্বান স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥
দুঃশীলোপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥"

—(ব্যবহার-তত্ত্বং)

দ্বিজাতি দুঃশীল হইলেও উচ্চ রাজকার্য্যের অধিকারী হইবেন। শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হইলেও হইবেন না। ইহা হইতে দূষণীয় ও লজ্জাজনক পক্ষপাত আর কি হইতে পারে? অন্যত্র ঋষিগণের অসামান্য মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এ স্থলে কি তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধার উদয় হয় না? ক্রমশঃ।

শ্রীকিশোরিমোহন রায়।

ভারতীয় ইতিহাসের একাংশ *। (৩)

এই বারে ঘিয়াসের অপর তনয়-তনয়াদের প্রসঙ্গ বলিব। কোন কোন যবন-ঐতিহাসিক-গণের মতানুসারে তাঁহার ২ দুই পুত্র ও ২ দুই কন্যা। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ ও ইলিয়ট, ঐ মতের অনুগামী। কিন্তু ইহা ভুল। রীতিমত বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই বলা আবশ্যক, উক্ত পুরাবিদ্‌-বর্গের উক্তি অপ্রকৃত। ঘিয়াসের সর্ব্বশুদ্ধ ৩ তিন তনয় ও ৩ তিন তনয়া। জ্যেষ্ঠতানুসারে তাঁহাদের নাম বলিতেছি।

১। মহম্মদ শরিফ।

২। মির্জা আবুল্‌ হসন্‌ (চতুর্থ আসফ খাঁ)।

৩। মনীজা বেগম (কন্যা)।

৪। খদীজা বেগম (ঐ)।

৫। মিহ্‌রুন্নিসা [নুরমহল বা নুরজহাঁ বেগম] (কন্যা)।

৬। ইব্রাহিম খাঁ ফৎজঙ্গ।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তান, স্বদেশে (তেহারানে) জাত। পঞ্চম সন্ততি, মরুভূমিতে (কান্দাহারে) ভূমিষ্ঠ হন, পাঠকেরা তাহার বিস্তৃত বিশ্বাস্য বিবরণ জানিয়াছেন। ষষ্ঠ বা কনিষ্ঠের জন্মভূমি—এই ভারতবর্ষ।

এই তো প্রকৃত ব্যাপার। কিন্তু ডাউ সাহেবের উক্তি, সুস্পষ্ট না হইলেও, তাঁহার সিপি-ভঙ্গীতে সাধারণের বোধগম্য করাইয়া দেয়, মিহ্‌রুন্নিসা (নুরজঁহা) কনিষ্ঠ সন্ততি। আর, আসফ খাঁ জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই মত, গ্রহণীয় হইবে কি না, এখন আর তাহা ভাবিতে হইবে না। কেন না, উপরেই আমরা সে সন্দেহের নিরাস করিয়া আসিলাম। তথাপি যদি কাহারও কোন সংশয় হয়, তিনি আমাদের সঙ্কলিত বংশ-তালিকা ও এই বংশের আদ্যোপান্ত বর্ণনা, অভিনিবেশ-সহকারে পড়ুন ও চিন্তা করুন—এই মাত্র আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

১। মহম্মদ শরিফ।

তিনি, ঘিয়াস্‌ বেগের জ্যেষ্ঠ সুত। পিতামহের নামানুসারে তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে, কি হইবে? নামের ঐক্য পর্য্যন্তই। পিতামহের পরমায়ুর তিনি উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই। জহাঁগীর, রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই, তাঁহার প্রাণ-দণ্ড করেন। তিনি নিজ-রাজ্যারম্ভের দ্বিতীয় অব্দে (১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে)

* আমাদের প্রিয়-সুহৃদ্‌ বিদ্যোন্মাদী শ্রীযুক্ত নীলাম্বর পাল বাবু, এই প্রবন্ধে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহার বিকট সাধারণ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মহম্মদ শরিফের নিধন সাধন করেন। যে ঘটনায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়, সেই ঘটনা, আর বর্ষ-চতুষ্টয় পরে সংঘটিত হইলে, তাঁহার এ দশা ঘটিত না। সম্ভবতঃ, কারাদণ্ডেই তদনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্, মিহ্রুন্নিসার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি তখন মহিষী হইলে, কেমন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিধনে সম্মত হইতে পারিতেন? সম্মত হওয়ার পরিবর্ত্তে তিনি বরং বিপরীত ব্যবস্থার বিধান দিতেন। সম্রাটের উপর নুরজঁহার যেরূপ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি চলিয়াছিল, তৎ-প্রভাবে তাঁহারই মতের জয় হইত। ইহার প্রবল দৃষ্টান্ত, কত শত রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না।

সম্রাট্-সুত খুস্রুকে কারাবাস হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার চেষ্টায় মহম্মদ শরিফ, উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এই তাঁহার প্রথম অপরাধ। আর, তিনি না কি সম্রাট্ জহাঁগীরকে পদ-চ্যুত করিতেও, প্রয়াস পান! এইটী তাঁহার দ্বিতীয় দোষ (১)।

(১) আহম্মদ বেগ নামক জনৈক ব্যক্তি, ইতিহাসে নুরজহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত। তাঁহাকে মহম্মদ শরিফের পুত্র বলিয়া অনুমান হয়। তিনি বাঙ্গালায় ইব্রাহিম ফৎ জঙ্গের সাহায্যার্থ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আহম্মদ বেগ, ঢাকাতে ফিরিয়া গিয়া শাহজহাঁকে ৫০০ হস্তী এবং ৪৫,০০,০০০, পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা সমর্পণ করেন। শাহজঁহার রাজ্যাভিষেক হইলে, তিনি উচ্চ মনসব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মথুরাতান, সিবিস্তান ও শেষে মুলতানের শাসনকর্ত্তা হন। পরে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে জৈস এবং এমেথী পরগণা, জাইগীর-স্বরূপ প্রাপ্তি, তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শাহজঁহার রাজত্বের বিংশ বৎসরে (১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে) ২,০০,০১,৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যের সৈনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। (২)।

(2) Padishaha, II, 727.

২। মির্জা আবুল্ হসন্ (চতুর্থ আসফ খাঁ)।

যিয়াস বেগের দ্বিতীয় তনয় আবুল্ হসন্। তাঁহার সচরাচর-প্রচলিত নাম আসফ খাঁ। তিনি "আসফ খাঁ" নামে অভিহিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে "চতুর্থ আসফ খাঁ" * বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলে, ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। "আসফ খাঁ" বলিলে বুঝিতে হইবে, উহা উপাধি-মাত্র, কোন নাম নয়। তিনি কখন কখন "আসফ জা" নামেও প্রখ্যাত হইতেন। উপাধি সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ নাম—"মির্জা আবুল্ হসন্ যমীন্ উদ্দৌলা আসফ খাঁ খাঁ খানান্।" "যমীন্ উদ্দৌলা" উপাধিটী, জামাতৃ-প্রদত্ত। তিনি সম্রাট শাহজঁহার শ্বশুর ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ।

আসফ খাঁর কন্যার সহিত শাহজঁহার বিবাহ হইলেও, আসফ খাঁ, প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য-অবলম্বনে সাহসী হন নাই। তিনি জামাতার প্রথম প্রথম সহায়তা করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভগিনী রাজ্ঞী নুরজহাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করা, তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সম্রাট্ জহাঁগীরের মৃত্যুর পর যখন নুরজঁহার প্রভুত্ব-সাগরে ভাটা পড়িল, তখন আসফ খাঁ, খরমকে (জামাতা শাহজঁহাকে) দাক্ষিণাত্য হইতে আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে খুস্রুর পুত্র দাওয়ারকে (৩)

* জহাঙ্গীর পাতশা, ঐ উপাধি-দাতা। আর, শাহজঁহার রাজা-কালে তিনি "আসফুদ্দৌলা" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই চতুর্থ আসফ খাঁর এক আত্মীয় "আসফুদ্দৌলা জুমলতুল্ অমদজঙ্" (শাহজঁহা-আওরঙ্গজেব) এই উপাধির অধিকারী হইয়াছিলেন।

(৩) ইনি খুসরুর মধ্যম পুত্র। "খুসরু" অর্থে হাস্ত-বদন-বিশিষ্ট। "খুস্" শব্দের অর্থ 'হাস্ত'। "রু" অর্থে 'বদন'। সুতরাং দৃষ্ট হইল—"খসরু" শব্দ ভুল।

কারা-নির্ম্মুক্ত করিয়া, অগ্রেই আসফ খাঁ, তাঁহাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন (৪)। নুরজহা, জামাতার (শাহরিয়ারের) পক্ষ সমর্থন করিয়া কিয়ৎ-কালের নিমিত্ত ভ্রাতা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। ভগিনীকে এইরূপে অবরোধে নিক্ষেপ করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, আসফ খাঁ, পঞ্জাব প্রদেশের দিকে লাহোরে যাত্রা করিলেন। শাহরিয়ার, তৎকালে লাহোর-অঞ্চলে অবস্থিতি করিতেন। তখন ঐ ভগিনীর জামাতার সহিত রণ করাই, তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

বলাই বাহুল্য—এই দুর্ভাগ্য সম্রাট্-সন্তান শাহরিয়ারের পরাভবের সঙ্গে সঙ্গেই, ঐ মহা-সমরের অবসান। এতদুপলক্ষেই শাহজহাঁর দুই সেনাপতির (আসফ খাঁর ও মহাবতের) গৌরব বাড়িল। তাঁহাদের ভাগ্যে সম্মান জনক পদ-প্রাপ্তিও ঘটিল।

ইংলণ্ডীয় রাজ-দূত সার্ টমাস রো সাহেব, লিখিয়াছেন—তাঁহাকে এই আসফ খাঁর বশী-করণার্থে মুক্তা উৎকোচ দিতে হইয়াছিল। ইংরেজ-বণিক্‌দের নিকটে বাদসারা, যে সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন, তাহার প্রভূত-পরিমিত মূল্য অনাদায় থাকিত। উহা আদায়ের জন্য ঐ উৎকোচ প্রদত্ত হইয়াছিল। (৫)

তাঁহার বৈবাহিক পরিচয়, নিম্নের তালিকা দেখিলেই জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

১ আঘা মুল্লা দওয়াটদার

২ { মির্জা ঘিয়াসুদ্দিন আলি (২য় আসফ খাঁ) } — ২ মির্জা বদি উজ্জমান, ২ মির্জা আহম্মদ বেগ

৩ মির্জা জাফর বেগ (৩য় আসফ খাঁ)

৩ মির্জা নুরুদ্দিন — * কন্যা + { মির্জা আবুল হসন (৪র্থ আসফ খাঁ) } (নাম অজ্ঞাত)

ক) মির্জা আবু তালিব, (খ) বম্মনিয়ার, (গ) পুত্র, (ঘ) মমতাজমহল, (ঙ) কন্যা, (চ) কন্যা,
(শাইস্তা খাঁ)

তালিকা আলোচনা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে, (আবুল হসন অর্থাৎ চতুর্থ আসফ খাঁ,) ঘিয়াসুদ্দিন আলির কন্যার পাণি পীড়ন করেন। তাঁহার শ্বশুরেরও উপাধি "আসফ খাঁ"। শ্বশুর, দ্বিতীয় আসফ খাঁ * জামাতা, চতুর্থ আসফ খাঁ। চতুর্থ আসফ খাঁর দুই জন খুড়-শ্বশুর। একের নাম মির্জা বদি উজ্জমান †। অপরের নাম-মির্জা আহম্মদ বেগ। চতুর্থ আসফ খাঁর শ্বশুরের পিতৃ-নাম আঘা মুল্লা দওয়াটদার। মির্জা নুরুদ্দিন, চতুর্থ আসফ খাঁর সম্বন্ধী। তিনি তদীয় পত্নীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। চতুর্থ আসফ খাঁর ৩ তিন পুত্র ও ৩ তিন পুত্রী। তাঁহাদের নাম এই,—

(ক) মির্জা আবু তালিব (শাইস্তা খাঁ)।
(খ) বম্মনিয়ার।
(গ) পুত্র। নাম অজ্ঞাত।
(ঘ) মমতাজ-মহল (কন্যা)।

(৪) খাফি খাঁ।
* ১৮৯ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।
† তৃতীয় আসফ খাঁ, তাঁহার তনয়।

(5) Sir Thomas Roe's Journal, 5th Oct 1617.

(ঙ) কন্যা। নাম অজ্ঞাত।

(চ) ঐ ঐ।

কাল-ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া অগ্রে মূল প্রবন্ধ (অর্থাৎ এই চতুর্থ আসফ খাঁর ভ্রাতার ও ভগিনীদের বৃত্তান্ত) পরিসমাপ্ত করিব। তৎ-পরে এই আসফ খাঁর বংশ্য জনের বিবরণ, যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে।

১০৫১ হিজিরায় ১৭ই শাবন (১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল) রবিবারে চতুর্থ আসফ খাঁর মৃত্যু হয় (৫)। সম্রাট্ শাহজহাঁ, আসফ খাঁর লোকান্তে শোকার্ত্ত ও কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার অভাব, কেবল আত্মীয়-বিয়োগ-জনিত কষ্ট-কর হয় নাই। তিনি সম্রাটের কেবল শ্বশুর ছিলেন না। কিন্তু উত্তম সেনানী ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী,—এই জন্যও সম্রাটের শোকের মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছিল। সুতরাং একের বিরহে দুই বিষয়ের বিয়োগ জন্য সম্রাট্‌কে ক্লেশ অনুভব করিতে হয়। শাহজহাঁ, শ্বশুরের সমাধিক্ষেত্র, স্ব-পিতার সমাধি-ক্ষেত্রের উপকণ্ঠে স্থাপিত করিবারই বিধান করিলেন। ভগিনীপতি জহাঁগীর ও শ্যালক আসফ খাঁ—একত্র অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার ভাগ্য-গগন, যেমন সুশোভন, তেমন আর কাহারই হইতে পায় নাই। তাঁহার সঞ্চিত-সম্পত্তি, ৯০০০ নয় হাজার মুদ্রা। তিনি ৯০০০ নব-সহস্র-তুরঙ্গ-নায়ক। ঐ পদের বেতন ষোল কোটী, কুড়ি লক্ষ "দাম"। তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া মরেন। এতদ্ভিন্ন লাহোরে তাঁহার এক সুরম্য হর্ম্ম্য ছিল*। ঐ প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। তাঁহার মৃত্যু-কালে সর্ব্ব-সমেত ২,৫০,০০,০০০ দুই কোটী, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের, সম্পত্তি ছিল। তাঁহার ভবনে ত্রিশ লক্ষ টাকার মণি-মাণিক্য, তিন লক্ষ অসরফি (৪২ বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা), নগদ ১২,৫০,০০,০০০৲ বার কোটী, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, ত্রিশ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন এবং তেইশ লক্ষ টাকার নানাবিধ দ্রব্য ছিল।

(৫) আবদুল হামিদ লাহোরির বাদশাহনামা।

* দারা শুকো, উত্তর কালে উহার অধিকারী হন।

৩। মনীজা বেগম।

দুই পুত্রের পর যিয়াস-পত্নী, যে কন্যা গর্ভে ধারণ করেন, তিনিই মনীজা। কোয়াসিম খাঁ, তাঁহার পতি। মনীজার শ্বশুরের নাম মির মুরাদ (৬)। কোয়াসিম খাঁর কবিত্ব, লোক-প্রথিত। তিনি বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা ইস্‌লাম খাঁর অধীনে খাদাঞ্চিগিরি করিতেন। ঐ কার্য্যে তিনি যশোভাজন হইয়াছিলেন। মনীজা, নুরজঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। কিছু পরে কোয়াসিন খাঁ, নুরজঁহার ভগিনীপতি হওয়ায়, সম্রাট্ জঁহাঁগীরের প্রীতিপাত্র হন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয়, গভীর ভাব ধারণ করে। কোয়াসিম খাঁর সুরসিকতা দেশ-বিখ্যাত। একটা গল্পের প্রসঙ্গ করিলে, সকলে বুঝিবেন, কোয়াসিম, খাঁর খাদাঞ্চিগিরি অপেক্ষা কবিত্ব অধিক প্রশংসনীয় কি না।

(৬) তিনি খোরাসানের অন্তর্গত 'জুওয়েন' নামক প্রসিদ্ধ প্রদেশের সাইদ-পরিবার ভুক্ত ব্যক্তি। অকবর, স্বীয় পৌত্র শাহজহাঁকে বন্দুক শিখাইবার জন্য ইঁহাকে নিযুক্ত করেন। তিনি গুলি ছুড়িতে নৈপুণ্য লাভ করেন। তিনি লাহোরের বক্সী ছিলেন। ৪৬ ছচল্লিশ বৎসর বয়সে লাহোরে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। তাঁহার কোয়াসিম খাঁ ও হাশিম খাঁ নামে দুই পুত্র ছিলেন।

একদা পাতসা (জহাঁগীর), কোয়াসিম খাঁকে পানার্থে বারি প্রার্থনা করেন। কোয়াসিম, সম্রাট্‌কে যে সৌখীন ও লঘু পাত্রে পানীয় প্রদান করেন, তাহা বারির ভার-বহনে অশক্ত হইল। জহাঁগীর-হস্তে পানীয় পাত্র, বিন্যস্ত হইবা-মাত্র তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। পাতসা, একটী কবিতার এক-চরণ আবৃত্তি করিলেন,—

'"এই জলাধার অতি মনোহর। কিন্তু তথায় জল, বিশ্রাম-স্থান পাইল না।'

তদ্দণ্ডেই কোয়াসিম, এইরূপে উহার পাদ-পূরণ করিয়া দিলেন—

'বারি-পাত্র, প্রণয় দুঃখ দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।'

জহাঁগীরের রাজত্বের শেষাবস্থায় তিনি আগরার সুবাদারি করিতেন। তত্রত্য ধনাধ্যক্ষতা তাঁহার আয়ত্ত ছিল। জহাঁগীরের মৃত্যুর পর শাহজঁহা, দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিলে পর ৫,০০০ "পাঁচ হাজারী" এই সম্মান লাভ করেন। বাঙ্গালায় শাসন-কর্ত্তা ফিদাই খাঁর স্থানে তিনি বাঙ্গালার গবর্ণর হন।

খরম্ (শাহজঁহা) যখন যুবরাজ, তখন শাহজঁহা, রাজদ্রোহিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি বঙ্গদেশে পর্ত্তুগীজদের অত্যাচার শুনিতে পান (৭)। তখন তাহারা বল-পূর্ব্বক এ-দেশীয়গণকে খ্রীষ্টান করিত। খরম, কোয়াসিম খাঁর প্রতি উহাদিগকে হুগলী হইতে তাড়িত করিবার ভার দেন। ১০৪১ হিজিরার শাবনে (১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে) তদনুসারে কোয়াসিম খাঁ, নিজের দুই পুত্রকে (ইনায়ৎউল্লা এবং আল্লা য়ার্ খাঁকে) এক দল সেনা দিয়া পাঠান। ১০৪১ হিঃ, ২রা জিলহিজ্জায় (১৬৩২ খ্রীঃ, ১১ই জুনে) হুগলীর অবরোধ হয়। ১০৪২ হিঃ, ১৪ই প্রথম রবি (১৬৩২ খ্রীঃ, ১০ই সেপ্টেম্বর) উহা অধিকৃত হয়। সাড়ে তিন মাস পর্ত্তুগীজেরা যুদ্ধ করে। শেষে মুসলমানেরা, গির্জার নিকটে "গড়খাই" জল-শূন্য করিল—এবং খাল খনন করিয়া গির্জাকে গুলি-গোলা দ্বারা উড়াইয়া দিল। তৎপরেই দুর্গ অধিকৃত হয়। সাড়ে তিন মাস অবরোধে দশ হাজার পর্ত্তুগীজ, প্রাণ হারায়। ৪,৪০০ চারি হাজার চারি শত পর্ত্তুগীজ, বন্দীভূত হয়। তাহাদের অধীনস্থ ১০,০০০ দশ সহস্র ব্যক্তির উদ্ধার সাধন হইল। সহস্র মুসলমান, সমরে ধর্ম্মার্থে প্রাণত্যাগ করে। কোয়াসিম খাঁ, ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টম্বরে (হুগলী-জয়ের তিন দিন পরে) পরলোক-গত হন। আগরার সমীপস্থ 'অটম্ব বাজারের' "জামি মস্‌জিদ" এই কোয়াসিম খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। (৮)

৪। খদীজা বেগম।

ইনিই নুরজঁহার অব্যবহিত অগ্রজা ভগিনী। হাকিম বেগ-নামক এক ভদ্র ব্যক্তি, ইঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জহাঁগীরের রাজ-সভার একতম উমরা। তাঁহাদের দুয়ের অন্য বৃত্তান্ত, অত্যন্ত অজ্ঞেয়। খদীজা বেগম, ঘিয়াসের চতুর্থ সন্ততি।

৫। মিহ্‌রুন্নিসা।

কাল-ক্রমানুসারিণী তালিকায় এখানেই খদীজার কনিষ্ঠা ভগিনীর (মিহ্‌রুন্নিসার) বিষয় বলা উচিত। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে

(৭) হুগলীতে ইহারা বহু পূর্ব্ব হইতে অধিকার পায়। হুগলীর বন্দেল গির্জায় ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষোদিত আছে।

(৮) Padistan, I, pp 435-437.

তাঁহার সবিস্তর বৃত্তান্ত, ইতিপূর্ব্বেই বর্ণনা করা গিয়াছে। সুতরাং আবার তদ্বিবরণ বিবৃত হইল না।

৬। ইব্রাহীম খাঁ ফৎজঙ্গ।

ইনিই খিয়াসের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হন। নুরজহাঁ, ইহাঁর অগ্রজা। ইনি বঙ্গ ও বিহারের শাসন-কর্তৃত্ব পান। বৃহদায়তন কি ক্ষুদ্রায়তন ভারতের কোন ইতিহাসেই কুত্রাপি ইহাঁর নির্দ্দেশ দেখি না।

ইব্রাহিম খাঁ ফৎজঙ্গ, মাতুলানীকে পত্নী-পদে গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম— 'হাজি হুর্ পর্ওয়ার খানম্।' আওরঙ্গজেবের রাজত্বের মাঝা-মাঝি সময় পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন বর্ত্তমান ছিল।

শাহজাঁহার রাজদ্রোহিতার সময়ে ইব্রাহীম নিহত হন। নিজ-পুত্রের সমাধি-মন্দিরের সমীপে ইহাঁর মৃত্যু ঘটে। পুত্র, যৌবনের উদ্ভিন্ন সুখাবস্থায় মৃত্যু-মুখে নিপতিত হন। ভাগীরথী-তীরস্থ রাজমহলের সান্নিধ্যে তাঁহার কবর হয় (৯)।

এই বার চতুর্থ আসফ খাঁর সন্ততিদের বিবরণ বলিবার সময় উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে সেই বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

ক। শাইস্তা খাঁ (মির্জা আবু তালিব)।

চতুর্থ আসফ্ খাঁর প্রথম পুত্র, মির্জা আবু তালিব। কিন্তু শাইস্তা খাঁ বলিয়াই তিনি প্রখ্যাত। ইতিহাসের প্রায় সর্ব্বত্র তাঁহার উক্ত সংজ্ঞা সমধিক প্রচলিত। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাচীন পুরাবৃত্তেও, তাঁহার ঐ নামের নির্দ্দেশ সমধিক অবলোকিত হয়। ফলতঃ, সাধারণের নিকট শাইস্তা খাঁ-নামেই তিনি সমধিক বিদিত ও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নুরজহাঁ, তাঁহার পিতৃষ্বসা (অর্থাৎ পিসী)। তিনি মহারাণী নুরজহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি আওরঙ্গজেব বাদসার মাতুল। আওরঙ্গজেব, প্রথমতঃ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পুনা-প্রদেশের শাসন-ভার সমর্পণ করেন। তদুপলক্ষে শিবাজীর সহিত শাইস্তা খাঁর যে বিরোধ ঘটনা হইয়াছিল, এই স্থানেই তাহার বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

শাইস্তা খাঁ ও শিবাজী।

১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে শাইস্তা খাঁ, দাক্ষিণাত্যের নানা দুর্গম স্থান ও দুর্গ অধিকার করিয়া পুনার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন শিবাজী, পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছেন। শিবাজী, যে গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই-খানেই শাইস্তা খাঁ, অবস্থিত হইবেন, স্থির করিলেন। খাফি খাঁ, স্ব-প্রণীত "মুনটখবল্ লুবাব" পুস্তকে শিবাজীকে "নরক-কুক্কুর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতেই লোকে তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইলেন।

শাইস্তা খাঁ, ঐ স্থান হইতে সৈন্য-দল প্রেরণ করিয়া শিবাজীকে বন্দী করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি তথায় গিয়াই যে ২ দুইটী বিষম নিয়ম করিলেন, তাহা এই—

(ক) কোন লোকেই—বিশেষতঃ, কোন মারহাট্টাই—বিনা টিকিটে সহরে বা সৈন্য-দলে লব্ধ-প্রবেশ হইতে পারিবেন না। তবে যাহারা পাল-

---

(৯) তুজুক, ৩০১ পৃঃ।

সার কর্ম্মচারী, তাঁহাদিগকে ঐ নিয়মের অধীন হইতে হইবে না।

(২) অশ্বারোহণ-নিপুণ কোন মহারাষ্ট্রীয়কেই কর্ম্মচারিত্ব-পদে গ্রহণ করা হইবে না।

এই কঠিন নিয়মে শিবাজী, পদে পদে পরাস্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে নিরুৎসাহ ভাবেরও আবির্ভাব হইল। তদবস্থায় তিনি দুর্গম, দুরারোহ, পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে নিত্যই নব নব নিকেতন নির্ব্বাচন করিতে হইত। একদা শিবাজীর কতিপয় পদাতি, কোতয়ালের নিকট ২০০ লোকের "পাস" গ্রহণ করে। তাহারা বর-যাত্রী বলিয়া জানায়। সন্ধ্যা-কালেই তাহারা নগরে প্রবেশ করে। পরে আর এক দল প্রবিষ্ট হয়। নিশীথে ঐ দুই সম্প্রদায়, মিলিত হইল। নিদ্রিত স্ত্রী ও পুরুষ হত ও আহত হইল। তাহারা শাইস্তার অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিল। তাঁহার পুত্র আবুল্ ফৎ খাঁও, আক্রান্ত ও শেষে হত হন। শাইস্তার ২ দুই পত্নীর মধ্যে একের প্রাণ-দণ্ডও ঘটিল।

প্রভাতে শাইস্তার সেনানী রাজা যশোবন্ত, আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শাইস্তা এই মাত্র বলিলেন—"আমার প্রাণ-সঙ্কটে আমি ভাবিয়াছিলাম, মাহারাজ! আপনি নিজের কার্য্যেই (মহারাজের কর্ম্মেই) ব্যস্ত ছিলেন।"

এই দুর্ঘটনার সমাচার, সম্রাটের গোচর হইলে, সম্রাট্, উভয়েরই উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন। পরে যুবরাজ মোয়াজিমকে দক্ষিণাপথের সুবাদারি প্রদত্ত হইল। তৎপরেই শাইস্তা, বঙ্গের সুবাদারি পাইলেন।

যখন আওরঙ্গজেব বাদশা, দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত, শাইস্তা খাঁ, তাহার কিছু পরে বঙ্গেশ্বরের পদে অধিরূঢ়। তিনি ১৬৬৪ (*) খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন-কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া যশস্বী হন। তিনি একাদিক্রমে অবাধে নির্ব্বিবাদে ঐ দীর্ঘকাল-ব্যাপী রাজত্ব-সম্ভোগে সমর্থ হন নাই। ঐ ২৬ ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে কেবল অল্প সময়ের জন্য আর দুই জন সুবাদারি পাইয়াছিলেন। ৩ তিন বৎসর মাত্র, ঐ ২ দুই সুবাদারের শাসন-কাল। নিম্নের তালিকায় বিষয়টী ঠিক্ বোঝা যাইবে,—

১। শাইস্তা খাঁ ··· ১৬৬৪—১৬৭৬ খ্রীঃ।
২। ফিদাই খাঁ ··· ১৬৭৭—১৬৭৮ খ্রীঃ।
৩। সুলতান মহম্মদ, যুবরাজ আজিম } ১৬৭৮-১৬৭৯ খ্রীঃ।
৪। শাইস্তা খাঁ ···১৬৭৯—১৬৮৯ খ্রীঃ।

ফলে, শাইস্তা খাঁ, সুচারু-রূপেই স্বীয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

ফরাসিদের চন্দননগরের কুঠি, তাঁহারই সুবাদারির সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ওলন্দাজেরাও, ঐ সময়েই চুঁচুড়ায় কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ের আর একটী ঘটনা, বিশেষ উল্লেখ্য। বিশেষতঃ, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার নির্দ্দেশের গুরুত্ব অনুভূত হইবে। শাইস্তা খাঁর আমলে বাঙ্গালায় প্রজাদের কত সুখ-স্বাস্থ্য ছিল, তাহা বিজ্ঞাপিত করিতে হইলে—ইহা বলাই যথেষ্ট যে, তখন ১৲ এক টাকায় ৮/০ আট মণ চাউল বিক্রীত হইত।

আওরঙ্গজেবের সিংহাসনাধিরোহণ-সময়ে শাইস্তা খাঁ, তদ্বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। অধিক কি, তিনি ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত ছিলেন। এতন্নিব-

(*) পর্য্যটক বার্ণিয়ার, ১৬৬৬—১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ শাইস্তা খাঁর রাজ্য-কাল বর্ণনা করিয়াছেন। তালিকায় দৃষ্ট হইবে, তাহা ভ্রমাত্মক।

ন্ধন শাইস্তার কোন বিপদ্-ঘটনার সূচনাই দেখিতে পাই নাই। সে যাহা হউক, ইহার পরে সম্রাট্ আওরঙ্গজেব, যৎ-কালে সুজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তৎ-কালে শাইস্তা খাঁ, আগরার শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োজিত হন। ইহা "কীড়গাঁ" সমরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। তদনন্তর শাইস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রদত্ত হয়। তিনি তত্রত্য প্রধান সেনানীর পদে বৃত হইয়া তাবৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইহার পরেই বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা মীরজুম্লার মৃত্যু হইল। শাইস্তা, তৎ-পদে সমারূঢ় হইলেন। তখন তাঁহার উপাধি হইল—"মির্আল্ উমরাও"।

শাইস্তা খাঁ, বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া অনেক অত্যন্ত অসংসাহাসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। সেটী অতিশয় প্রয়োজনীয় কার্য্য। সেই কার্য্যের জন্য তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি ও প্রাধান্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বতন কোন শাসন-কর্ত্তাই, সেই কর্ম্ম সমাধা করিতে পারেন নাই। তদুপলক্ষে বাঙ্গালা দেশ ও আরাকান প্রদেশের ইতিবৃত্ত, অনেক জ্ঞাত হওয়া যায়। উক্ত স্থান-দ্বয়ের অতীত ইতিবৃত্তের বিস্তর কথাই, সেই সূত্রে প্রকটিত হয়। আরাকান-রাজ, সুজার প্রতি অসাধু ব্যবহার করিয়াও, কোনপ্রকার শাস্তি পান নাই। এই নিমিত্ত তিনি অতি উদ্ধত ও সাহসী হইয়া উঠেন। অধিক কি, তিনি বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশ, লুণ্ঠন করিতেও, ভরসা করিয়াছিলেন। শাইস্তা খাঁ, আরাকান-নৃপতিকে পরাভূত ও বশীকৃত করেন। ঐ ভূমি-পাল, পরাজিত হওয়ার পর হইতেই, চট্টগ্রামের স্বাধীনত্ব রবি অস্তমিত হইলেন। তদবধি সুতরাং পরাস্ত রাজার রাজ্য (চট্টগ্রাম), বাঙ্গালার সীমা-ভুক্ত হয়।

শাইস্তা খাঁ, কিরূপ সমর-কুশল বীর পুরুষ ছিলেন, বক্ষ্যমাণ ঘটনায় তাহারও নিদর্শন রহিয়াছে।

তাঁহার অভিযান-প্রণালী, বঙ্গোপসাগর ও তন্নিকট স্থানের ঘটনাবলী জানিবার পক্ষেও উপস্থিত বিবরণে বিস্তর কার্য্যকারিণী হইবে।

আরাকান-প্রদেশ, "মগের মুলুক"(+) খ্যাত। সেই "মগের মুলুক"—পর্টুগালবাসী অনেক খ্রীষ্টান্ দাস-দল ও ইয়ুরোপীয় বিস্তর জাতীয় লোকের নিবাস-নিকেতন হইয়া উঠে। পর্টুগিজেরা, আরাকানে আসিবার অগ্রেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও নিকটস্থ কোন কোন প্রদেশও, অধিকৃত করিয়াছিলেন। যথা—গোয়া, ডিউ, সিংহল দ্বীপ, কোচিন, মলাক্কা। আরাকান-রাজ্য, ঐ সকল প্রদেশ হইতে বিতাড়িত, পলায়িত, রাজ-ভয়-ভীত, সদা-সন্ত্রস্ত, দুষ্কর্ম্ম-নিরত ও অসাধু চরিত জন-গণের বসতি-ভূমি হইয়া দাঁড়াইল। বস্তুতঃ, বলিতে কি—ইহা যেন প্রকারান্তরে উক্ত জাতীয় প্রাণি-পুঞ্জের উপনিবেশে পরিণত হইল। তাহারা নামতঃ খ্রীষ্টান। তাহাদের কার্য্য-প্রণালী ও নিয়মাবলী, অ-খ্রীষ্টানোচিত। কেন না, জীবনের ঘটনা দেখিলে, তাহাদিগকে ঘৃণিত বলিতে কাহারই সঙ্কোচ হয় না। ঘৃণার্হকে সকলেই ঘৃণিত বলিবে, তাহার আর সন্দেহ কি? তাহারা নির্দ্দয়-হৃদয়ে আত্মীয় স্বজন-গণকেও হলাহল-প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইত না। কেবল পরস্পরকে হত্যা করা নয়—ধর্ম্মযাজক-দিগকেও কখন কালকূটের সাহায্যে, কখনও বা অন্য উপায়েও তাহারা রবি-সুত-সদনে প্রেরণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিত না! উক্ত

(+) ঐ নামের সঙ্গেই অরাজকতার ছবি, আমাদের নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হয়।

খ্রীষ্টানগণের কবল হইতে কাহারই নিষ্কৃতি পাইবার যো ছিল না।

এই অতি দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে, স্থান-প্রদানের কারণ কি? মোগল-বাদসাদের প্রতাপে ও বল-দর্পে আরাকান-নরপালকে, স্বীয় রাজ্যের সম্মুখে সীমা-সংরক্ষণার্থে উহাদিগকে চট্টগ্রাম-বন্দরে বাস করাইতে হইয়াছিল। উহারাই সেনাদিগের প্রতিরূপ। প্রতিরূপ কেন? যেন উহাদিগকে ভগবান্ আরাকান-সংরক্ষণ-নিবন্ধন তদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদর্থে বিনা করে তাহাদিগকে ভূরি ভূমি প্রদত্ত হয়। তাহারা অতিশয় নির্ভীক ও দুর্দ্দমনীয়। লুণ্ঠনাদি ভিন্ন অপর কোন উপায়ে তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সম্ভাবনা ছিল না। ক্ষুদ্র নৌকায় এবং ছোট ছোট পান্‌সির সাহায্যে তাহারা নিকটস্থ সমুদ্রে নৌকাদি লুঠ্ করিত; গঙ্গার শাখা-প্রশাখায় প্রবিষ্ট হইত এবং নিম্ন বঙ্গের দক্ষিণ-দিক্-স্থিত জনপদ লুণ্ঠন করিত। হাট-বারে কিংবা পরিণয়-দিবসে বা অন্য কোন উৎ-সবের দিনে—যে সময় ঐ সকল লোক একত্র সম্মিলিত হইত,সেই সময়ে ঐ দস্যুরা সমুদ্রতীর হইতে ৬০।৭০ বাট সত্তর ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত আসিয়া হঠাৎ জনতার মধ্যে উপস্থিত হইত এবং তাহাদের দ্রব্য-সম্ভার, ভারে ভারে লুণ্ঠন করিত। পশ্চাৎ তত্রত্য লোকদিগকে বন্দী করিয়াও আনিত। শেষে সব হতভাগ্য, দাসত্বে নিযুক্ত হইত। গঙ্গার উপকূলস্থিত অনেক সুন্দর সুন্দর দ্বীপ, বসতি-শূন্য হই-য়াও, তখন কত বন্য জন্তুর আবাস-স্থানে পরিণত হয়! এই দস্যুরা, বন্দীদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। তাহারা যুবা-দিগকে, হয় তাহাদের দলে রাখিত; নচেৎ গোয়া, সিংহল, সেণ্টটমাস ও অন্যান্য স্থানের পর্টুগিজদিগের নিকট বিক্রয় করিত। হুগলী-স্থিত পর্টুগিজেরা, নিঃসন্দেহে ঐ সকল দুর্ভাগা বন্দীদিগকে ক্রয় করিত। কিন্তু প্রধানতঃ 'কোপ্‌ডান্‌গলমস' নামক অন্তরীপের নিকট 'গণিস্' দ্বীপে এই ব্যবসায় চলিত। পর্টুগিজ-শাসনের পতন-কালে, অন্যান্য ইয়ুরোপ-বাসীরাও,চট্টগ্রামের দস্যুদের সহিত মিলিত হইয়া এই ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের পিতা-মহ জাঁহাগীরের অধীনে হুগলীতে পর্টুগিজেরা, বাস করিত। তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের সম্বন্ধে কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন না এবং ইহাদের বাণিজ্যে তিনি অনেক লাভের আশা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সম্রাট শাহজঁহার রাজত্ব-সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। হুগলী-বাসী পর্টুগিজেরা, আরাকানের লুণ্ঠন-কারীদিগকে উৎসাহ দেওয়াতে এবং মোগল-দের অধীনস্থ তাহাদের বহুসংখ্যক ক্রীতদাস-দিগকে উদ্ধার করিতে অস্বীকার করাতে, শাহজঁহা, এক বার তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি তাহা-দিগকে ভয় দেখাইয়া প্রভূত অর্থের দাওয়া করেন; কিন্তু পর্টুগিজেরা, ঐ টাকা না দেওয়ায়, শাহজঁহা, হুগলী-অবরোধ করেন এবং তত্রত্য সমুদয় অধিবাসীকে আগরায় ক্রীতদাস-স্বরূপ আনিতে আজ্ঞা দেন।

এই বন্দীদিগের যন্ত্রণার পরিশেষ ছিল না। বালক-বালিকা, পুরোহিত এবং মঠধারীরা সকলেই সমভাবে কষ্ট পান। সুন্দরী স্ত্রীলোক সকল (কি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা, সকলেই) সুলতানের অন্তঃপুরে দাসী হইয়া থাকিত। বৃদ্ধা কিংবা কুশ্রী-স্ত্রীলোকগণ, উমরাওগণের ভবনে বিতরিত হইত। ছোট ছোট ছেলেদিগকে খোজা করিয়া চাকর রাখা হইত এবং অধিকাংশ বৃদ্ধ-দিগকে প্রলোভন দেখাইয়া বা হস্তি-পদ-তলে

চূর্ণ করিবার ভয় দেখাইয়া, খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করান হইত। তন্মধ্যে কেবল অতি সামান্য সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বীরা, যীশুখ্রীষ্ট ও আগরার মিসনারিদিগের সাহায্যে, গোয়া এবং অন্যান্য পর্টুগিজদের উপনিবেশে আনীত হইত। হুগলীর দুর্ঘটনার পূর্ব্বে মিসনারিরা, শাহজঁহার ক্রোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। সম্রাট জঁহাগীরের রাজত্বকালে লাহোরে প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টানদিগের গির্জ্জা ও আগরার গির্জ্জা-গুলি, সম্রাট, সেই সময় ভাঙ্গিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। হুগলী-অবরোধের কিছু দিন পূর্ব্বে এই দস্যুরা, আরাকান্-রাজ্যে গোয়ার রাজ-প্রতিনিধির হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। সেই সময়ে দস্যুদের সর্দ্দার 'বল্‌টেন্ কল্‌নল্' এত বিখ্যাত ও প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে ব্যক্তি, অরাকান্-রাজ-কন্যার পাণি-গ্রহণও করিয়াছিল। গোয়ার রাজ-প্রতিনিধি, অতি গর্ব্বিত ও ঈর্ষা-পরবশ। সেই কারণে, উল্লিখিত প্রস্তাবে তিনি সম্মত হন নাই; বরং তিনি বলিয়াছিলেন যে, এ ভ্রান্তির জন্য পর্টুগিজ-রাজ, নিজ-বংশোদ্ভবের নিকট ঋণী হইতে পারেন না। দস্যুদের এরূপ প্রস্তাবে কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না। জাপান, পেগু, ইথিওপিয়া এবং অন্যান্য স্থানের পর্টুগিজদিগের সহিত ইহাদের আচার-ব্যবহারের সামঞ্জস্য ছিল। ভারতে পর্টুগিজ-শাসনের অধঃপতনের কারণ, তাহাদের দুষ্কর্ম্ম ও দৈব-নিগ্রহ। এ কথা, তাহারা নিজ-মুখেই প্রকাশ করে। পূর্ব্বে তাহারা অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। সমস্ত ভারত-রাজ্য, তাহাদের সহিত বন্ধুতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিত। তাহারা সাহসী, সদাশয়, ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আধুনিক পর্টুগিজদের ন্যায় ইহারা পাপমতি ও নীচ-প্রবৃত্তি ছিল না।

শাইস্তা খাঁর লক্ষ্য হইল, কিসে তিনি ঐ লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী মগ-দস্যুদিগকে প্রদমিত করিবেন। তিনি যে সুকৌশলে উল্লিখিত মগ-দস্যু-দলকে আয়ত্ত ও বশতাপন্ন করেন, তাহাতেই তাঁহার মতিমত্তা ও দূরদর্শিতা প্রকাশিত। উহাই তাঁহার বুদ্ধি-শালিতার মহাসাক্ষ্য দান করিতেছে। ঢাকা-সহর, শাইস্তার শাসন-কেন্দ্র। তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে কত ব্যবধান! সেই সুদূর দেশে গতিবিধি করিতে হইলে, কত কত খাল, নদ-নদী, উপ-নদী, শাখা-নদী, গর্ত্ত-গহ্বর অতিক্রম করিতে হয়, তাহার কি সংখ্যা আছে? অনায়াসে বা অনায়াসে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইতে হইলে, যে উপায় উদ্ভাবিত করা আবশ্যক, শাইস্তা খাঁকে তাহাই করিতে হইল। সে উপায় এই,—তিনি ওলন্দাজ-শাসন-কর্ত্তার নিকট রাজ-দূত প্রেরণ করেন। দূত, ওলন্দাজ,-গবর্ণরের নিকট বিজ্ঞাপন করিল,—"আপনার সেনারা, রণ-তরী সজ্জীকৃত করিয়া আরাকান অবরোধ পূর্ব্বক লুণ্ঠন করুক। আরাকান অধিকৃত হইলে, আপনি ও আমার প্রভু, উহার সমান অধিকারী হইবেন।" ওলন্দাজ-শাসন-কর্ত্তা, ঐ প্রস্তাবের তাৎপর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি শাইস্তা খাঁর কূট-বুদ্ধির ভিতর লব্ধপ্রবেশ না হইয়া মনে কোনই অনিষ্টাশঙ্কা স্থান দেন নাই। ওলন্দাজ-গবর্ণর, বরং বুঝিলেন, তাঁহার দুইটী লাভ হইবে।

(ক) উহাতে বাণিজ্য-কার্য্যের সুযোগ ঘটিবে।

(খ) অন্তর্দীয় আনুকূল্যে আরাকানের অর্দ্ধাধিপত্য চলিবে।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া শাসনকর্ত্তা, ২ দুই বিশাল সমর-পোত সুসজ্জিত করিয়া ঢাকায় প্রেরণের আজ্ঞা করিলেন।

সেই ২ দুই সমর-পোতে শাইস্তা খাঁর সৈন্য সামন্তগণ, আরোহণ পূর্ব্বক অতি সহজে আরাকানে উপনীত হইবে, এই মাত্র উক্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। সুচতুর শাইস্তা খাঁ, স্ব-দলে ক্ষিপ্রকারিতা-প্রভাবে চট্টগ্রামে আসিয়াই বিঘোষিত করিলেন,—"তোমাদের শাসনের ও শান্তি বিধানের কারণ বাদসা (আওরঙ্গজেব) অত্যন্ত সমুৎসুক। তদর্থে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—বদ্ধপরিকর। স্পষ্ট বলিতে কি, তোমরা সম্রাটের বিষ-দৃষ্টিতে নিপতিত। আর, ও-দিক্ হইতে ওলন্দাজেরা, বিপুল-বিক্রমে বাহিনী লইয়া দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা সম্রাটের সাহায্যার্থেই আসিতেছে। এখন আর তোমাদের নিস্তারের পথ নাই। আমি তোমাদের ত্রাণার্থে এক সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেছি। সে প্রস্তাব এই,—'তোমরা আরাকান-নৃপতির অধীনতা-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন কর। তাঁহার প্রদত্ত বেতনেও জলাঞ্জলি দাও। তোমরা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার কর। তোমাদের বেতন দ্বিগুণ হইবে। আর, তোমরা বিনা করে বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদিত করিতে পাইবে'।"

মগ-সেনাদল, প্রলোভন-কর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শাইস্তা খাঁর সমভিব্যাহারে ঢাকা যাত্রা করিল। বঙ্গের সুবাদার শাইস্তা খাঁ, প্রথমতঃ বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করেন। তাহাদের সাহায্যে আরাকান-রাজকে নির্ম্মূল করিয়া তিনি শগু-দ্বীপ অধিকৃত করিলেন। তৎ-পরেই দস্যুদের প্রতি সুবাদারের সমাদরের মাত্রার খর্ব্বতা। বাঙ্গলা-দেশের ইতিবৃত্তে শাইস্তা খাঁর ইহা এক প্রধান কীর্ত্তি। এই ঘটনায় সম্রাটে ও সুবাদারে সৌহার্দ্দ-সূত্র দৃঢ় হয়।

আবদুর রহিম খাঁ খানাডের পুত্র শাহ-নাওয়াজ খাঁর কন্যার সহিত তিনি পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হন। এই কামিনীর নামাদি বিবরণের সহিত পাঠকের পরিচয় হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্‌বৃত্তান্ত, গাঢ়-অন্ধকারাবৃত। ১১০৫ হিজিরায় (১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) আগরা সহরে শাইস্তার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয় (‡)। পূর্ব্বোক্ত পত্নী ভিন্ন তাঁহার অপরা ভার্য্যা ছিল। শাইস্তার ২ দুই পুত্র ও ২ দুই পুত্রী। তাঁহাদের নাম—

(/০) আবু তালিব।
(৵০) আবু ফৎ খাঁ।
(৶০) পুত্রী (নাম অজ্ঞাত)।
(।০) পুত্রী (নাম অজ্ঞাত)।

(/০) জ্যেষ্ঠ তনয় আবু তালিব, পিতার মৃত্যুর অগ্রেই (১১০৫ হিজিরার পূর্ব্বেই) দেহ বিসর্জ্জন করেন।

(৵০) দ্বিতয় তনয় আবু ফৎ খাঁর প্রসঙ্গ সংগ্রহ করা অসাধ্য।

(৶০) } দুই কন্যার একতমা, রুহ-
(।০) } লাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অপরা, জুল্‌ফাকর্ খাঁ নুস্‌রাট্ জঙ্গের পত্নী হইয়াছিলেন।

খ। বক্সানিয়ার্।

শাহজঁহার রাজত্বের ২০ বিংশতি বৎসরে (১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) আসফ্ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র বক্সানিয়ার ২০,০০,২০০ কুড়ি লক্ষ, দুই শত সৈন্যের অধ্যক্ষতা পদ প্রাপ্ত হন।

---

*(‡) তখন আওরঙ্গজেবের ৩৮ আটত্রিশ বৎসরের রাজত্ব চলিতেছিল।

গ। চতুর্থ আসফ খাঁর তৃতীয় তনয়।

তাঁহার অজ্ঞাত নামের সঙ্গে সকলই অজ্ঞাত।

ঘ। তাজবিবি।

তাঁহার বিবরণ, পর-প্রস্তাবে বলা যাইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কবিতা।

(১)

আমার হৃদয়-মাঝে কে আজি দাঁড়ায়ে আছে,
বিজলি খেলিয়া কে-গো সহসা দাঁড়াল কাছে?
দেখে ও রূপের সাজ হাসিল ধরণী আজ;
ও বুঝি কবিতা-রাণী—প্রাণের প্রতিমা খানি
আসিয়াছে বুঝি আজ দেখি এই শূন্য প্রাণ—
আঁধার জীবন-মাঝে করিতে আলোক দান।

(২)

অধরেতে আধ-হাঁসি মরি কি সুন্দর হায়—
অস্ফুট জোছনা-রাশি সোহাগে জড়ায়ে রয়।
কুন্তল লুটিছে পায়, মরি কি সুন্দর হায়!
সোহাগে হাসিছে ওই স্নেহের প্রতিমা-খানি,
আঁধার, আলোকময় করিছে আলোক-রাণী।

(৩)

এস তোমা বুকে ক'রে কাটাব দিবা-যামিনী,
হৃদয়-কুটীরে রাখি তোমারে হৃদয়-রাণি!
ভুলেছি হৃদয় ব্যথা,—ভুলেছি ধরার কথা,
কে তুমি কে তুমি বালা—সুরপুর সুউজ্জ্বলা—
বাঁধিয়াছ আজি এই পাগল পরাণ খানি;
কোথা হ'তে এলে তুমি বল গো হৃদয়-রাণি!

(৪)

অথবা অথবা ভুল সাধ ছিল কি অসাধ,
বুঝি-নি কিছুই কিন্তু ছিঁড়িল কঠিন বাঁধ,
পশিলে পরশি করে, এ মোর আঁধার-ঘরে,
ভুলিনু হৃদয়-জ্বালা পরিনু তোমার মালা,
অতুলন-রূপ-পানে অনিমেষে চেয়ে' রই।
হৃদয় শিহ'রে উঠে কেমনে কেমন হই।

(৫)

অভাগি, হৃদয় মাঝে যদি লো এসেছ আজ—
দাঁড়াও ক্ষণেক-তরে সাধিব আপন কাজ।
প্রাণের অতৃপ্ত আশা, হৃদয়ের ভালবাসা,
যা আছে পরাণে এই সকলি দিইব সই।
আজি এই ভগ্ন হিয়া ঢালি তব প্রাণ প'রে
লুকায়ে রহিবে সখি অভাগী জনম-তরে।

(৬)

কেন বা কিসের তরে কেমনে বুঝায়ে কই,
মরুভূমে ছোটে বান তোমার পরশে সই,
দেখিয়া তোমার খেলা জুড়াল প্রাণের জ্বালা,
ঘুচিল আঁধার মেলা, তুমি লো আলোক-মালা,
তবে এস এস—সখি, এলে যদি দয়া করে,
দাঁড়াও আরাধ্যতমা ভিখারী হৃদি-কুটীরে।

(৭)

কবি শুষ্ক হৃদে তুমি সাক্ষাৎ প্রকৃতি বাণী,
কি দিয়ে পূজিব তোমা বল গো কবিতা-রাণি,
পূজিতে পারে না কবি, শশি-তারা ফুল-রবি,
আপনি প্রকৃতি-রাণী পূজে ও প্রতিমা খানি;
কি জানি কি দয়া করে' আসিয়াছ প্রাণ-সখি!
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি প্রাণ-ভরে তোমা দেখি।

(৮)

দেখিয়া হৃদয় শূন্য কাঁদিয়াছি অবিরল
তাই কি এসেছ দেবি! মুছাইতে অশ্রু-জল!
অনন্ত ভাবের সিন্ধু যাঁহার করুণা-বিন্দু
সেই' পদে বার বার করি আমি নমস্কার।
পাঠালেন যিনি তোমা মম হৃদি শূন্য দেখি,
সেই পদে নমস্কার করি আমি প্রাণ-সখি!

(৯)

ওই দেখ, দেখি তোমা হাসিছে ধরণী আজ;
নীরব প্রাণের মাঝে করি গো আপন কাজ

অভাব অশান্তি ঘোর, ঘুচেছে সকল মোর
ঘুচিল বিষাদ-মলা তব দরশনে বালা
হেরিতেছি সুখস্বপ্ন স্বপ্নময় এ জীবনে ;
পাইয়া তোমায় দেবি! জাগে কত ভাব প্রাণে।

(১০)

আমি শুধু মনে মনে হাঁসিয়ে প্রাণের হাসি
ওই শ্রীচরণ-তলে রহিব আনন্দে ভাসি'।
অশান্তি বা অভিমান, আজি দিব বিসর্জ্জন ;
দিইব ঢালিয়া প্রাণে, বাঁধিব প্রাণের টানে,
নির্জ্জন কুটীর হৃদে রাখিব তোমায় ধরি'—
ভাসিব আনন্দ-নীরে সুখময় হাস্য করি'।

(১১)

হৃদয়-আসনে তোমা, বসায়ে কবিতা-রাণী
জুড়াব প্রাণের জ্বালা হেরি ও প্রতিমা-খানি।
ত্যজিয়ে মনের দুঃখে আনন্দে হাসিব সুখে,
আকুল ছায়ার মত, থাকিব গো অবিরত ;
তুমি ঢালিয়াছ সুধা এই অভাগিনী প্রাণে—
নাচিছে পরাণ মোর আজি আনন্দ তুফানে।

(১২)

দরিদ্র-কুটীরে আজি চল চল প্রাণ সই,
দেখিয়া তোমায় যেন আনন্দে বিভোর হই ;
বিস্ময় বিহ্বল মনে, আশাময় প্রলোভনে
কত কথা ভাবি এই, আঁধার জীবনে সই,
ভাবি বুঝি আলোকেতে ডুবে রবে এ জীবন,
খেলিবে জীবনে বুঝি, আলোক তপন কোন।

(১৩)

আসিলে সাঁজের বেলা চঞ্চল তটিনী কূলে,
বসিয়া তোমায় শুধু ভাবিতাম আঁখি তুলে।
ঝরিত নয়নে বারি, অন্তর আকুল করি ;
হেরিতাম তারাদলে, বিষাদ জড়তা ফেলে,—
নীরব প্রাণের মাঝ উঠিত কতই কাঁদি ;
আজিগো আনন্দে তোমা রাখিব হৃদয়ে বাঁধি।

(১৪)

আজি গো পেয়েছি তোমা করি বহু অন্বেষণ,
দেখিব ও রূপরাশি বিস্ফারিয়ে এ নয়ন ;
হুঙ্কারিয়ে কোলাহল, ফেলিয়ে আনন্দ-জল,
রেখেছি আনন্দে তুলে, আজিরে বিষাদে-ভুলে,
হৃদয় মাঝেতে তোমা রাখিয়াছি প্রাণ সই—
ভাবিলে তোমায় যেন কেমন কেমন হই।

(১৫)

বিষাদ মাখান হৃদে কবিতা শান্তির খনি,
আঁধারে আলোকময়ী প্রাণের প্রতিমা খানি।
নিত্য সে সুধার রাশি, নিত্য সে আনন্দ হাসি
প্রাণের সোহাগ ফুল, নাহি তার সমতুল,—
কবির জীবনে সেই আনন্দ আলোক রাশি,
আয়রে কবিতা-রাণি হৃদয়ে আনন্দে ভাসি,

(১৬)

চির জীবনের সাধ পুরাই আনন্দে মোর,
নিভুক্ আজিকে এই আধার হৃদয়-ঘোর।
এস গো কবিতা রাণি, হেরি ও প্রতিমা খানি
পেয়েছি তোমারে সই ছাড়িব না প্রাণময়ি ;
আঁধার জীবনে তুমি আলোক করেছ দান—
তুলেছ প্রাণের মাঝে আনন্দের কি তুফান!

(১৭)

এত দিন যে জীবন ছিল অন্ধকারে সই,
তোমার পরশে তাহা হইল আলোকময়ী ;—
প্রকৃতির মহাদান—সাধনার পরিণাম—
তুমি পুরায়েছ আশা, দিয়াছ গো ভালবাসা—
প্রাণের আরামে আমি থাকিব গো চিরদিন,
গাহিব কবিতা গাথা হরষে হয়ে বিলীন।

(১৮)

ফুটিয়াছে জ্ঞান-চক্ষু তোমার পরশে সই—
আঁধারে আলোক তুমি সদাই আনন্দময়ী,
পাইয়া তোমারে সই, কেমন কেমন হই ;
ঘুচেছে জ্বলন মোর, হেরে ছাস্য রূপ তোর ;
বিষাদের দুঃখ নীতি, ভুলেছি সকলি আজ—
পেয়েছি তোমায় হৃদে করি গো তোমার কাজ।

(১৯)

প্রাণের কালিমা মোর ঘুচে গেছে এইবার,
জেলেছ আলোক বাতিচলে গেছে অন্ধকার।
দুঃখের জীবন মোর দিনু পদতলে তোর,
ভুলিনু বিষাদ গাথা, ভুলিনু ধরার কথা ;
নির্জ্জন হৃদি-মন্দিরে করিতেছি আবাহন—
এস গো কবিতা-দেবি পাত চির সিংহাসন।

নলিনীবালা।

বাঙ্গালী বৈশ্য।

প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-বিভাগ, বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন সময়ের কার্য্য। এক্ষণে তাহার স্বার্থকতা নাই। তদ্দর্শনে ঔপন্যাসিক জাতিবিদ্‌গণ অসবর্ণের অবৈধ মিলনকে নব বর্ণ উৎপত্তির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া চাতুর্বর্ণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন।

পৌরাণিক-রূপকে ব্রহ্মা হইতে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। শূদ্রকে এক বংশের বিভিন্ন শাখা ভিন্ন অপকৃষ্ট জ্ঞান করা অসঙ্গত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এক-দেহ-মধ্যে পৃথক্ অঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছে। মূল জানিতে সকলের কৌতূহল হইয়া থাকে। তাহা অজ্ঞেয় হইলে কল্পনার সাহায্যে একটী ভিত্তি স্থাপিত হয়। চিন্তাকে প্রণালী-বদ্ধ করিবার জন্য কিংবা বোধসৌকার্য্যার্থ শ্রেণী-রচনা আবশ্যক। শ্রেণী যে প্রকারে বিভক্ত হইবে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে সঙ্করত্ব জন্মে। শ্রেণীর মৌলিকতা, কল্পিত-বিষয়-মাত্র। সেই শ্রেণীটি যদি রূপান্তরিত করা যায়, সঙ্করত্ব থাকিবে না। অতএব সঙ্কর শব্দ, দোষ-প্রকাশক নহে। শ্রেণীবিশেষে নর-নারীর সংখ্যা-ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ করিতে হইয়াছে। পরে তাহা নিষ্প্রয়োজন হইলে তদুৎপন্ন সন্ততি কর্ত্তৃক নূতন শ্রেণী প্রাদুর্ভূত হয়। এই প্রকারে বঙ্গে মুখ্য, কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণ কুলীন হইতে বংশজ নামে চতুর্থ শ্রেণী উৎপন্ন। বংশজগণ কৌলীন্যে সঙ্কর। বংশজ বা ভঙ্গ কুলীন বলিলে যেমন জারজত্ব-দোষ স্পর্শে না, সেইরূপ বর্ণ সঙ্করে উক্ত প্রকার গ্লানি নাই। অধুনা সর্ব্বত্র নর-নারীর অনুপাত সমান, সেই স্থানে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ও সঙ্কর বর্ণোৎপত্তি ক্ষান্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে এক বংশীয় লোক, বৃত্তিভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের বিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যবসায়ের পরিবর্ত্তন হইলে, বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইতেন।

"পুত্রেগৃৎসমদস্য চ শুন কোয়স্য শৌণকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥"
(বায়ুপুরাণ)।

"নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"
(হরিবংশ)।

কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, সভ্যতার উৎপত্তি হইল। তৎ-সহকারে বহুবিধ বৃত্তি উৎপন্ন হয়। তখন চতুর্বিধ ব্যবসায়ে—সংকুলান না হওয়ায়, নবোত্থিত বৃত্তি-গ্রহণ-কারী, স্বীয় অবলম্বিত জীবিকানুসারে নূতন নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ-কুমার উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত এবং ব্রাহ্মণী-শূদ্রবৎ গণ্য।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ,
কর্ম্মণা জায়তে দ্বিজঃ।"

ভিন্ন-বংশীয় লোক, সমধর্ম্মী হইলে, আমাদের বর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। হিমালয়ের উত্তর-নিবাসী শক-জাতি, ভারতের নানা স্থানে বসতি স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে বর্ণভেদের উচ্চাবচ সম্মান-অবহেলাকারী সন্ন্যাসীদিগের বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া তদনন্তর বর্ণগৌরব-বাক্রান্ত ক্ষত্রিয়-শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে পরিহর, প্রমরা, চালুক্য ও চৌহান রাজপুত, শকবংশাবতংস।

কাশ্মীরীয় বৌদ্ধমতাবলম্বী শকরাজা কণিষ্ক কর্ত্তৃক যে অব্দ প্রচলিত হয়, তাহা আমরা শকাব্দ নামে ব্যবহার করি। চীন ও জাপানে ও এই সংবৎ চলিত আছে।

ভারতে মুসলমানগণের অধিকার হইবার কিঞ্চিৎ অগ্রে বা সমকালে ব্রাহ্মণগণ ও রাজপুতগণ, নেপালে প্রবিষ্ট হইয়া মগর, গুরঙ্গ ও নেওয়ার জাতিকে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। যে সকল মগর, ব্রাহ্মণ্য নীতির অনুগত হইল, তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক, সূর্য্যবংশ প্রভৃতি সম্মানিত মূল আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদিগের দ্বারা থাপা, ঘরটি ও রাণা কুল উৎপন্ন। এই নব ক্ষত্রিয় খস্ নামে অভিহিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মগর পল্লীতে উদ্ভূত সন্তানগুলিও উপবীতধারী; অপিচ উক্ত নব ক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত। এবংবিধ বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বংশের সংমিশ্রণে এক অভিনব ভাবের উদয় হইলে, তদ্দ্বারা উহাদের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া তিব্বত ও ভারতীয় বাক্যের মিশ্রণে খস্‌কু নামধেয় পৃথক্ উপভাষায় পরিণত হয়। গুরঙ্গগণ উপবীত প্রাপ্ত হয় নাই। সামাজিক সম্মানে তাহারা ক্ষত্রিয়ের নিম্নে ও বৈশ্যের উপরে স্থান পায়। যে সকল গুরঙ্গ, সুদূরে বাস করে, তাহারা অদ্যাপি ম্লেচ্ছভাব রক্ষা করিয়া বৌদ্ধ মতানুবর্ত্তী আছে। তথাপি খস্‌দিগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, উহাদের ব্যবহার ও বিশ্বাস রূপান্তরিত হইতেছে। বৃটিশ গুর্খাসেনা-দলস্থ সেই প্রকার গুরঙ্গগণ, বিদেশে অবস্থান-কালে হিন্দু-সমাজে বাস করিতে হয় বলিয়া, তদনুযায়ী শৌচাচার ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। নেওয়ার জাতি ৬৯ ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বুদ্ধমার্গী ১৬, মধ্যপথাবলম্বী ৩৮ ও শিবমার্গী ১৫টী শ্রেণী। মধ্যপথানুসরণকারিগণ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় পুরোহিত দ্বারা গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করে। নেওয়ারি বর্ণমালা স্বতন্ত্র। তাহাদের স্বকীয় সাহিত্য আছে। তাহাদের শিল্পাদিতে চীন দেশীয় ভাব বিদ্যমান। চীন অক্ষরে কোন উচ্চারণ প্রকাশ করে না। তাহা একটী ভাবব্যঞ্জক চিহ্ন। পাঠক, আপন অভ্যাস অনুযায়ী এক অক্ষরে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করেন। উক্ত বর্ণমালায় দুই সহস্রাধিক অক্ষর আছে। তত্রত্য রাজা হিন্দু, তজ্জন্য নেপালে হিন্দুত্ব সম্মানিত। যদি হিন্দু গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত না হয়, তাবৎ গুরঙ্গ ও নেওয়ারেরা হিন্দু হইবে, সন্দেহ নাই। নেওয়ারদিগকে পরাজিত করিয়া গুর্খারাজ, নেপালকে একচ্ছত্র করিয়াছেন। জেতৃ-জাতি, তাহাদিগকে সেনা-দলে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। নেওয়ারেরা বাণিজ্যে রত। এ অবস্থায় জোষাগণ এখন আর তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিতে পারিবেন না। তাহাদিগকে বৈশ্য হইতে হইবে।

মণিপুর এবং ত্রিপুরার পরম বৈষ্ণব বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়দিগকে দর্শন করিলে তাঁহারা শারীরিক লক্ষণানুসারে যে মঙ্গোলীয় বংশীয়, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কামরূপে 'আহম' মগগণ, রাজত্ব আরম্ভ করিয়া শাক্ত-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান অত্যাচারে মগ যাজকেরা চট্টগ্রাম হইতে পলায়নপর হইলে, তত্রত্য মগ অধিবাসিগণ হিন্দু হইতে থাকে। দুর্গাপূজা করিয়া ছাগবলি ও পূর্ব্ব আচারানুসারে অন্যত্র কুক্কুট-বলি ও প্রদান করে। এক্ষণে তাহারা পূর্ব্ব উপদেষ্টা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বৌদ্ধ-মতে দীক্ষিত হইতেছে। এক পরিবারে কালীচরণ ও বরকত আলি এই দুই ভিন্ন নাম দৃষ্ট হইবে।

ভুটিয়া বা তিব্বতীয়গণ, নেপাল হইতে কেবল বৌদ্ধমত শিক্ষা করে নাই। তাহাদের তান্ত্রিকতা ঐ স্থান হইতে প্রাপ্ত। অধুনা ভুটানে দেবগণের মধ্যে শাক্ত মূর্ত্তি অনেক। দার্জ্জিলিঙ্ (তান্ত্রিক আচার্য্য স্থলী) অধিত্যকায় রুদ্রাক্ষ ও জটাজুটধারী ভুটিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। শিবিকাবাহী, শিখাধারী ভুটিয়াকে নারায়ণ শব্দ উচ্চারণে ক্লান্তি অপনোদন করিতে শ্রবণ করি। নেপালী ও হিন্দুস্থানীদের সহিত একত্র অবস্থান করায় উহাদের হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাত চলিয়াছে। বিশেষ চেষ্টা করিবার লোক থাকিলে, তাহাদিগকে হিন্দু করা দুষ্কর নহে। তখন ধর্ম্মের ধারাবাহিকতার মধ্যে আনয়ন করিবার জন্য, ঐ জাতিকে শূদ্রত্ব প্রদান করিয়া শাস্ত্রীয়তা রক্ষা করিতে হইবে।

ভুটিয়ারা, হিন্দু হইলেও নেপালী-শূদ্রের ন্যায় শূকর ও কুক্কুট মাংস ভোজনে অনুরক্ত থাকিবে। হিন্দুদের যে প্রদেশে মাংস-বিশেষ-ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল ও স্পর্শদোষ প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই স্থান কোন সময় প্রাধান্য লাভ করায়, উক্ত আচার অনেক স্থলে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ হয়; কিন্তু তাহা হিন্দু-ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক নিয়ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সন্ন্যাসীরা অন্ন বিচার করেন না। সর্ব্ব সাধারণের এ বিষয়টী অনুধাবন করা উচিত। তাহা হইলে আচার-বিশেষকে হিন্দুত্বের স্থায়ী লক্ষণ বলিয়া ভ্রম জন্মিবে না।

পূর্ব্বে যে জ্ঞান, স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত, এক্ষণে তাহা পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছে। জ্ঞান ও নীতি, কার্য্যে পরিণত হইয়া বিশ্বাস এবং ব্যবহার রূপে পরিগণিত হইলে, অপরের সহিত প্রভেদ উৎপাদন করিয়া যে শ্রেণী উদ্ভাবন করে, তাহাকে কোন এক ধর্ম্ম কহে। জ্ঞান উন্নতিশীল ও বিশ্বাসের অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং তৎসহকারে ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন ঘটে। ভাষা যেমন নির্ম্মাণ করিবার সামগ্রী নহে, ধর্ম্মও কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না; এজন্য তাবৎ ধর্ম্ম ও সমুদয় ভাষা, সনাতন বলিয়া গণ্য। কিন্তু ধর্ম্মের ও ভাষার পুষ্টি-সাধন মনুষ্যের করায়ত্ত। যাহা নবধর্ম্ম ও নবীন ভাষা বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহা কোন একটী মূলের পরিণাম মাত্র। সকল বিষয়ে ক্রমবিকাশ চলিয়াছে, তাহা অবশ্যম্ভাবী।

ঘটনাক্রমে বাধ্য হইয়া অনেক সময় দ্বিতীয় ভাষা অবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু মাতৃভাষাকে সকলে বর্জ্জন করিতে পারে না। রোমের আধিপত্য-কালে, ইয়ুরোপে লাটিন প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ফরাশী জাতি প্রবল হইলে, তাহাদের ভাষাকে ইয়ুরোপীয়েরা দ্বিতীয় ভাষা করে। এক্ষণে ইংরাজী তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। ভারতে মুসলমান-রাজত্বে যে কারণে পারস্য, লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অধুনা ইংরাজী সেই সূত্রে আমাদের দ্বিতীয় ভাষা হইয়াছে। হিন্দু-রাজ্যে সংস্কৃত গৌণ ভাষা ছিল। মাতৃ-ভাষা পরিত্যাগ করা যেমন সম্ভবপর নহে, স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াও, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব।

ধর্ম্ম, ভাষা, রাজ্য, জাতি বা বাণিজ্যের জীবনী-শক্তি না থাকিলে লুপ্ত হয়। অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া যেমন সতেজ রাখিতে হয়, উপরি উক্ত বিষয়ে সেইরূপ সদা উন্নতির জন্য চেষ্টা না করিলে তাহার জীবন্তভাব রক্ষা পায় না। ধর্ম্ম ও জাতির জীবনী শক্তি হ্রাস পাইতেছে কিংবা বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বাপর অবস্থার তুলনা দ্বারা তাহা নির্দ্ধারিত হইবে।

হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি করিতে হইলে, তাহার সংকীর্ণতা দূর করিয়া উদারতা বৃদ্ধি করা উচিত। জাতি-ভেদ, হিন্দুত্বের একটী প্রধান লক্ষণ। অতএব তাবৎ জাতিকে উন্নত করিতে সযত্ন হওয়া বিধেয়। আমাদের বিভিন্ন জাতির এক-প্রাণতা, ধন ও অধিকার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

হিন্দু-জাতি কায়িক, বাচিক ও বৈষয়িকভেদে ত্রিবিধ। ১ম, শারীরিক লক্ষণ যথা,—কাশ্মীরিগণ ককেশীয়, নেপালীরা, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়গণ কোলেরীয় জাতির উদাহরণ। সাধারণতঃ অনেক লোক কোলের ককেশীয়-ভাবাপন্ন বা সঙ্কর। বর্ণ অর্থে যদি রঙ্ বুঝায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদিতে গৌর, শ্যামল প্রভৃতি মিশ্রবর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা সঙ্কর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। কোন প্রচণ্ড লেখকের মতে দ্বিজাতি শব্দের অর্থ দুই জাতি। অতএব আর্য্য ও অনার্য্যের মিশ্রণে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, এই ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। ২য়, ভাষানুযায়ী। যথা—আর্য্য, বাঙ্গালী। তুরাণী, তৈলঙ্গী। সঙ্কর বা সেমেটিক্ আর্য্য, উর্দ্দুভাষী হিন্দুস্থানি জাতি। আমাদের হিন্দু নামে সেমেটিক শব্দ। ৩য়, জীবিকানুগতিক জাতি। ইহা দুই প্রকার। যথা—প্রাচীন ও নবীন।

প্রাচীন।—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

নবীন।—মালাকার, তন্তুবায় প্রভৃতি।

আমাদের ধারাবহ প্রকৃতি প্রযুক্ত এক্ষণকার ব্যবসায়ানুযায়ী জাতি, পূর্ব্বকালের কোন একটী ব্যবসায় অনুসারে গণ্য হয়। যেমন মালাকার প্রভৃতি শূদ্র।

জীবিকার তারতম্যে সামাজিক সম্মানের ইতর-বিশেষ আছে। তদনুসারে বাঙ্গালী-হিন্দু এক্ষণে চতুর্ব্বিধ।

১। ব্রাহ্মণ।

২। সৎশূদ্র (জল আচরণীয়) বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি।

৩। শূদ্র (অনাচরণীয়) সুবর্ণ-বণিক, গোয়ালা, প্রভৃতি।

৪। অন্তজ (অস্পৃশ্য) চণ্ডাল, বাগ্দী প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ ভিন্ন, পৃথিবীর অন্যত্র প্রকারান্তরে জাতিভেদ প্রচলিত আছে। ইয়ুরোপে বর্ণভেদ ও স্পর্শদোষ না থাকিলেও, অভিজাতবর্গ, সাধারণ লোকের সহিত আহার বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। তবে নীচ মহৎ হইতে পারেন। তখন তিনি অনাচরণীয় থাকেন না, ইহা তথাকার সামাজিক জীবনীশক্তির নিদর্শন। অধুনা বাঙ্গালায় অনেকে উচ্চশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে সযত্ন হইয়াছেন। আত্ম-সম্মান বোধ না থাকিলে মহৎ হইতে পারা যায় না। সৎশূদ্রের মধ্যে বৈদ্য ও কায়স্থ-গণ ক্ষত্রিয়, মধ্যম শূদ্রের সুবর্ণ-বণিকেরা বৈশ্য ও অন্তজ শ্রেণীস্থ চণ্ডালজাতি শূদ্রত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে, ইহা তাঁহাদের জীবন্ত-ভাবের পরিচায়ক।

আপন উন্নতির জন্য স্বয়ং সচেষ্ট হইতে হয়। স্বজাতির অধিকার-বৃদ্ধি, অপর শ্রেণী দ্বারা হইতে পারে না। নবীন-জাতি-ভুক্ত যাঁহারা আপনাদিগকে যে প্রাচীন জাতির অন্তর্গত বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে তদনুযায়ী উপপদ ও শৌচাচার গ্রহণ করিতে হইবে। কায়স্থগণ, বিবাহাদির সংকল্পে দাসমিত্র স্থলে বর্ম্মমিত্র বাক্য পাঠ করুন। স্ত্রীলোকের পক্ষে দাসীর পরিবর্ত্তে দেবী উপাধি ব্যবহার কর্ত্তব্য। অশৌচাদি আচারে ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার গ্রহণ করিবেন। উপনয়ন-সংস্কার যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা বিধেয়।

বাঙ্গালায় সৎশূদ্রের অন্তর্গত জাতিগুলি এমন সদাচার-নিরত যে, ভারতের অন্যান্য স্থলের শূদ্রের তুলনায় তাঁহারা দ্বিজাতি এবং বৈদ্য, কায়স্থ ও নাপিত ভিন্ন অপর সকলে, বৈশ্য-বৃত্তিধারী। কাংস্য-বণিক, গন্ধ-বণিক ও স্বর্ণকারগণ পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে বৈশ্য মধ্যে পরিগণিত ও যজ্ঞোপবীতধারী। অতএব বাঙ্গালার সৎশূদ্রগণ, শাস্ত্রাধ্যায়ী ও ক্রিয়াবান্ হইয়া শূদ্র নাম পরিত্যাগ করিতে সযত্ন হউন। গন্ধবণিক, কাংস্যকার, শঙ্খকার কর্ম্মকার, তৈলী, তন্তুবায়, তাম্বুলী, মোদক, বারুই, কুম্ভকার, মালী ও সংগোপ জাতি দাস উপাধির পরিবর্ত্তে বৈশ্যোচিত ভূতি উপাধি ব্যবহার করুন।

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতিদত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ।
(কূর্ম্মকর্ত্তৃক যম-বচন)

মাড়য়ার-নিবাসী বণিককে ভূতি উপপদ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রাজস্থান ও গুর্জ্জর নিবাসী বৈশ্য সকলে উপবীত গ্রহণ করেন না। কেহ বা গৃহস্থ হইয়া প্রৌঢ় বয়সে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির নামের সহিত ক্ষত্রিয়ত্ব রহিয়াছে। ক্ষমতার অভাবে তাঁহারা সে সম্মানের অধিকারী নহেন। বাঙ্গালার বৈদ্যগণকে এক্ষণে শূদ্র বলিয়া স্বীকার করাইতে পারা যায় না, ইহা তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনার ফল। অপরাপর জাতি শাস্ত্রালোচনা করিলে উচ্চ হইতে পারিবেন। হিন্দুর জন-সংখ্যায় ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ শূদ্র নামে ঘৃণিত। তাঁহাদের মধ্যে সমর্থ লোক রীতিমত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যবসায় আরম্ভ করিলে নিশ্চয় গৌরবান্বিত হইবার পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবেন বৈদ্য জাতিতে যেমন রাজা রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কার্য্য-বিশেষের ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার জন্য অন্য জাতিতে তদ্রূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক। বৈদ্যদিগের উপবীত গ্রহণের সম্মান, রাজা রাজবল্লভ দ্বারা অর্জ্জিত।

মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সংস্রবে থাকিয়া আমাদের প্রচলিত জাতি-ভেদের প্রতি ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। লোক যে জাতীয় হউক, তাহার গুণ ও ক্ষমতার মান্য হইয়াছে। অধিকাংশ ব্যক্তি যোগ্যতা লাভ করিলে সেই জাতি অবশ্যই শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে, তজ্জন্য কতকগুলি জাতির এক্ষণে বৈশ্যত্বের প্রস্তাব অসাময়িক হইতেছে, এমন জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। ভারতে অধিকাংশ লোক জ্ঞানালোক-বর্জ্জিত, তাহাদের মতে বর্ণভেদ সম্মানের নিদান। এই হেতু সুশিক্ষিত ব্যক্তি সামাজিক সম্মানের সময় বর্ণভেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত।

তমোলুক ইতিহাস। (৫)

পৌরাণিক কাল।

পাঠক! এখন তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে পুরাণ কি বলে, দেখা যাউক। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন যে, মহাভারতের পরে,—বৌদ্ধ ও গ্রীকগণের সময় অতিক্রম করিয়া, একবারে পৌরাণিক কালে উপস্থিত হওয়া কি যুক্তি সঙ্গত? কেননা, কেহ কেহ পুরাণের সময় ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে (৫৯) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন

(৫৯) See R. C. Dutt's History of Civilization in Ancient India vol. III, Book V, P. 211.

এবং বলেন, ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে বিতাড়িত করিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি। ইহা যে কেবল ইঁহাদের স্বকপোল কল্পিত, এরূপ বোধ হয় না। কারণ গোঁড়া হিন্দুরাও প্রকারান্তরে ইহার সমর্থন করিয়াছেন; যখন বেদব্যাস বুঝিলেন, ব্রাহ্মণগণ অল্পবীর্য্য হইতেছেন, লোকের ধারণাশক্তি ক্রমেই হীন হইয়া আসিতেছে,—ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বেদ আর সেরূপ কণ্ঠস্থ থাকে না,—তখন তিনি বেদের বিভাগ সাধন করিলেন। বেদ বিভাগ করিয়াও ব্যাসের মন পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ধ্যানযোগে বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের প্রতিভা এরূপ কম হইয়া আসিতেছে যে, তাঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ অনেকেই বেদরূপ কঠিন পর্ব্বত ভেদ করিয়া, ধর্ম্ম ও অর্থরূপ মহারত্ন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন না। অতএব সুললিত মধুর ভাষায় কোমল উপন্যাসাদির সহিত বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাই পুরাণ সৃষ্টির আদি কারণ। (৬০) ইহাই পুরাণ সৃষ্টির আদি কারণ হইলে সুললিত মধুর ভাষায় কোমল উপন্যাসাদির সহিত বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া, হিন্দু ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধির সহিত বৌদ্ধধর্ম্মকে বিতাড়িত করাই পুরাণে সৃষ্টির কারণ, ইহা অসম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না।

যাহাহউক, মহাভারতের পরে পুরাণ হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। বিশেষতঃ মহাভারত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসের লেখনী প্রসূত, ইহার সামঞ্জস্য রাখিবার জন্যও মহাভারতের পরেই পৌরাণিক কালের বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম। এজন্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন।

বরনগরী তাম্রলিপ্তি, বহু পুরাকাল হইতে একটী প্রথিতনামা তীর্থস্থান বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত স্থান যে একটী সিদ্ধপীট বলিয়া পরিগণিত, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদি হইতে আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, নিম্নে তাহা সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণ, শাস্ত্রীয় অন্যান্য গ্রন্থ এবং অপরাপর পুস্তকাদিতে স্থানে স্থানে তাম্রলিপ্তি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মপুরাণেই উক্ত স্থানের বিষয় বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই হেতু পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থ আমরা উক্ত পুরাণ হইতে কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মার তনয় দক্ষপ্রজাপতিকে নিহত করেন। ব্রহ্মহত্যা বশতঃ দক্ষ-শরীর-বিশ্লিষ্ট-মস্তক মহাদেবের পাণি-সংস্পৃষ্ট হইয়া যায়,—যোগীশ্বর উহা কোন প্রকারেই স্বীয় করপল্লব হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কি উপায়ে ঐ শিরঃ হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, এই বিষয়ের পরামর্শ লইবার অভিপ্রায়ে শূলপাণি অমরবৃন্দের সমীপে উপনীত হইলেন। দেবতাগণ তাঁহাকে পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ পরিদর্শন করিতে যুক্তি প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"পুরা দক্ষবধে যস্মাৎ তচ্ছিরঃ শিকরে শিবঃ।
দদর্শ ভদ্রমাখ্যোক্তং তীর্থযাত্রাঙ্ককারয়ে ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের পর দক্ষের মস্তক মহাদেবের হস্তে ছিল, সেই

(৬০) বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিত 'খিল হরিবংশের' অষ্টাদশ মহাপুরাণের বিজ্ঞাপন দেখ।

মস্তক দেখিয়া তিনি তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন।

এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিলেন, কিন্তু হায়! তথাপিও ঐ শিরঃ তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না। অবশেষে শূলপাণি, হিমাদ্রির অত্যুচ্চ শিখরদেশে উপবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

ব্রহ্মপুরাণ এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেনঃ—

"ভূতলে সর্ব্বতীর্থানি পর্য্যটিয় বিনির্গতং।
তস্মাদ্ভীতো হরোগত্বা স্থিতবান্ গিরিগহ্বরে॥"

অর্থাৎ—পৃথিবীস্থ সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও হস্ত হইতে শিরঃ বিমোচন হয় নাই, সেই ভয়ে মহাদেব গিরিগহ্বরে শয়ন করিয়াছিলেন।

তদনন্তর বিষ্ণু মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শূলপাণি বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেনঃ—

"ত্বয়া, জ্ঞাপ্তঃ পুরা যস্মাৎ কর্ত্তুং তীর্থাটনং ময়া॥
কৃতং তীর্থাটনং তস্মাৎ কস্মাৎ পাপান্নহীয়তে॥"

আপনি (বিষ্ণু) পূর্ব্বে আমাকে সকল তীর্থ ভ্রমণ করিতে বলিলে, আমি সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ঐ পাপ হইতে কেনই বা বিমুক্ত হইলাম না?

ভগবান্ বলিলেনঃ—

"অহংতে কথয়িষ্যামি যত্র নশ্যতি পাতকং।
তত্র গত্বা ক্ষণান্মুক্তঃপাপাত্তর্গো ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ—যেখানে গমন করিলে জীব ক্ষণকাল মধ্যে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সকল পাপ বিনষ্ট হয়, তোমায় সে স্থানের মাহাত্ম্য বলিব!

এই বলিয়া ভগবান্ সেই স্থানের মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণনা করিতেছেনঃ—

"অস্তি ভারতবর্ষস্য দক্ষিণাস্তাং মহাপুরী,
তমোলিপ্তং সমাখ্যাতং গূঢ়ং তীর্থ বরং বসেৎ।
তত্র স্নাত্বা চিরাদেব সম্যগেষ্যসি মৎপুরীং
জগাম তীর্থরাজস্য দর্শনার্থং মহাশয়ঃ॥"

অর্থাৎ—ভারতবর্ষের দক্ষিণে তমোলিপ্ত নামে মহাতীর্থ আছে, তাহাতে গূঢ় তীর্থ বাস করে। সেখানে স্নান, করিলে লোক বৈকুণ্ঠে গমন করে। অতএব মহাশয়, আপনি তীর্থরাজের দর্শনের নিমিত্ত গমন করুন।

দেবাদিদেব ইহা শ্রবণ মাত্রেই তাম্রলিপ্তাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বর্গভীমা এবং জিষ্ণু নারায়ণের মন্দিরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র সরসী-নীরে অবগাহন করিলেন। স্নানান্তে দক্ষ-শিরঃ তাঁহার পাণি হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা:—

"পুরীং প্রবিশ্যাথ বিলোকনাদ্ভবং জলাশয়-স্যাশুজগাম সন্নিধিং।

সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণতিং বিধায়চ স্পর্শাৎ শিরোভূমিতলং জগাম॥

ভ্রষ্টং শিরঃ সমালোক্য সর্ব্বঃ সর্ব্বগতিং হরিং।
প্রণম্য মনসা স্নাত্বা বিষ্ণু মূর্ত্তিমলোকয়ৎ॥"

অর্থাৎ—অনন্তর ভর্গ, পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক শীঘ্র জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে হস্ত হইতে শিরঃ পতিত হইল। করকমল হইতে মস্তক বিমুক্ত হইলে তিনি সকলের উদ্ধারকারক যে বিষ্ণু তাঁহার দর্শন করিয়াছিলেন।

সেই অবধি এই স্থানে—কথিত ক্ষুদ্র সরোবর—"কপালমোচন" নামে অভিহিত হইতে থাকে, এবং তাম্রলিপ্তি একটী প্রধান তীর্থস্থান মধ্যে পরিগণিত হয়।

পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—

"পাপাদ্ যস্মাৎ বিমুক্তোঽস্মি যস্মান্মুক্তং করাৎ শিরঃ।
কপাল মোচনং নাম তস্মাদেব ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ—এখানে পাপ হইতে এবং হস্ত হইতে শিরঃ মুক্ত হইল, অতএব ইহার নাম "কপালমোচন" হইবে। মহাদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন;—

"কপাল মোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্ট্বা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ—কপালমোচনে (তমোলিপ্তের জলাশয়ে) স্নান করিয়া জগৎপতির ও বর্গভীমার মুখ দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

তাম্রলিপ্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"ইতি সর্ব্বেষু কালেষু ... সর্ব্বশঃ।
তাম্রলিপ্তাৎ পরং স্থানং ... ন বিদ্যতে।"

অর্থাৎ—নারায়ণ বলিয়াছিলেন যে, তমোলিপ্ত অপেক্ষা সকল কালে বিশেষ কোন কোন যুগে কোন তীর্থই শ্রেষ্ঠ নহে।

কাল সহকারে রূপনারায়ণ নদের স্রোতঃ প্রবাহে উপর্য্যুক্ত স্থলটী (কপালমোচন নামক সরোবর) বিলুপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে যে স্থানে প্রাচীন জিষ্ণু-নারায়ণের মন্দির দণ্ডায়মান ছিল, যেস্থল এক্ষণে নদীগর্ভে নিহিত—তথায় অদ্যাপিও বারুণী উৎসবে পুণ্য সঞ্চয় অভিলাষে জনগণ অবগাহন করিয়া থাকে। তমোলুকে প্রতিবৎসর মাঘীপূর্ণিমা, পৌষ সংক্রান্তি, অক্ষয় তৃতীয়া এবং বৈশাখী সংক্রান্তি, এই চারিবার মেলা হইয়া থাকে।*

মৎস্য পুরাণের পূর্ব্বদেশ বর্ণনায় তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথাঃ—

"অঙ্গা বঙ্গা মদগুরকা অন্তর্গিরি বহির্গিরী।
সুহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া মার্গবাগেয় মালবাঃ॥ ৪৪
প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শাল্ব মাগধ-গোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥৪৫"
চতুর্দ্দশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ। (৬২)

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত শ্লোকটীর আর এক চরণ (অর্থাৎ "ততঃ প্রবঙ্গা মাতঙ্গা মলয়া মলবর্ত্তকাঃ) বৃদ্ধিসহ শব্দকল্পদ্রুমে দৃষ্ট হয়। (৬৩)

উক্ত মৎস্য পুরাণের অন্যত্রেও লিখিত আছে—

"পাঞ্চালান্ ... মৎস্যান্ মাগধাঙ্গাং স্তথৈব চ।
ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈব চ॥" ৫০
একবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ। (৬৪)

মার্কণ্ডেয় পুরাণের পূর্ব্বদেশের বর্ণনাতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ রহিয়াছে। যথাঃ—

"অন্য দেশা যাদৃশাশ্চ প্রাচ্যান্ দেশান্ নিবোধ মে।
অন্ধারকা মুদ্গরকা অন্তর্গিরা বহির্গিরাঃ॥ ৪২
যথা প্রবঙ্গা বঙ্গেয়া মানদা মানবর্ত্তিকাঃ।
ব্রহ্মোত্তরা প্রবিজয়া ভার্গবা জ্ঞেয়মল্লকাঃ॥ ৪৩
প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ মদ্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
মল্লা মগধ গোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥" ৪৪
সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। (৬৫)

উক্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণে কূর্ম্মরূপী ভগবানের কোন্ অংশে কোন্ কোন্ দেশ অবস্থিত, তদ্বর্ণনায় লিখিত আছে—

"কলাযা মেখলামুষ্ট তাম্রলিপ্তৈক পাদপাঃ।
বর্দ্ধমানাঃ কোশলাশ্চ মুখে কূর্ম্মস্য সংস্থিতাঃ॥" ১৪
অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। (৬৬)

উক্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর দেবী মাহাত্ম্যে দেবীঃ স্তুতিতে ভীমাদেবীরও নামোল্লেখ রহিয়াছে। যথাঃ—

"তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্র মূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥" ৫১
একনবতি তমোঽধ্যায়ঃ। (৬৭)

* প্রতিমা, প্রথমভাগ, ১৪৩—৪৫ পৃষ্ঠা ও রহস্য-সন্দর্ভ, ৭ম পর্ব্ব, ১৪৫—৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬২) মৎস্য পুরাণম্, বঙ্গবাসীযন্ত্রে মুদ্রিতং, ১৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬৩) শব্দকল্পদ্রুমঃ পুনঃপ্রকাশিতঃ, ১৬০০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬৪) মৎস্য পুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬৫) মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ৯৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬৬) মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ১৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

ইহাতে কেহ বলিতে পারেন যে, ইনি তমোলুকের ভীমাদেবী কি হিমাচলবাসিনী কোন ভীমাদেবী, তাহার নিশ্চয় কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তমোলুক ভিন্ন হিমাচলে কিম্বা অপর কোন স্থানে 'ভীমাদেবী' নামে কোন দেবী আছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত শ্রুত হওয়া যায় নাই; বিশেষতঃ কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে—

গোকুলে গোমতী নামা তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।" (৬৮)

এই পোষক প্রমাণ থাকায় তমোলুকেই ভীমাদেবী অধিষ্ঠিত, সপ্রমাণ হইতেছে।

সিদ্ধজামল তন্ত্রে হরগৌরী সম্বাদে শ্রীগুরু স্তোত্র ও ভীমাদেবীর নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথাঃ—

"কালী দুর্গা কমলা ভুবনা ত্রিপুরা ভীমা বগলা
পূর্ণা শ্রীমাতঙ্গী ধুমা তারা এতাবিদ্যা ত্রিভুবনসারা
নগুরোরধিকং নগুরোরধিকং।।"

মুণ্ডমালা তন্ত্রে একাদশপটলে মহাবিদ্যা-স্তোত্রেও ভীমার উল্লেখ রহিয়াছে। যথাঃ—

"ষোড়শীং বিজয়াং ভীমাং ধূমাঞ্চ বগলামুখী"। (৬৯)

উক্ত তন্ত্রের মহাবিদ্যাকবচেও লিখিত আছে,—

"ছিন্না ধুম্রা চ ভীমা চ ভয়ে পাতু জলে বনে।" (৭০)

শ্রীমদ্‌বরাহমিহিরাচার্য্যের বৃহৎ সংহিতাতে তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। যথাঃ—

"আগ্নেয়্যাঙ্গ-বঙ্গ-কোশল-গিরিব্রজা মগধ-পুণ্ড্রমিথিলাশ্চ।
শনৈশ্চর চারো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ। (৭১)

উক্ত বৃহৎসংহিতার অন্যত্রেও লিখিত আছে,

"উদয়গিরি-ভদ্রগৌড়ক-পৌণ্ড্রোৎকল-কাশি-
মেকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদ-তাম্রলিপ্তিক-কোশলকা বর্দ্ধমানশ্চ।।" ৭
কূর্ম্মবিভাগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ। (৭২)

জ্যোতিস্তত্ত্বেও তমোলিপ্তির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

"প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রীগৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষাদয়াশ্রয়ঃ।।" (৭৩)

এখানে একটী কিংবদন্তী আছে যে, "চম্পাই নিবাসী চাঁদ সওদাগরের নববিবাহিতা পুত্রবধূ বেহুলা, বিবাহ যামিনীতে ফণি-দংশনে স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় মৃত পতির শবকে ভেলা সহযোগে অসংখ্য গ্রাম ও নদী পার হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে 'নেতা' নাম্নী কোন রজকী দেবতা-বর্গের বস্ত্রাদি ধৌত করিত। বণিক-কামিনী তাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া তাহারই সাহায্যে দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার পতি ও তদীয় অন্যান্য সহোদরদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া পুনঃ স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন।" (৭৪)

ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। কারণ 'মনসার ভাসান' নামক পুস্তকে এই ঘটনা ত্রিবেণীর কোনস্থলে হইয়াছিল, উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "অদ্যাপি ত্রিবেণীর

(৬৮) বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' দ্বিতীয়খণ্ড, কবিকঙ্কণচণ্ডী, ৭ ও ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬৯) প্রাণতোষিণী তন্ত্র, ৪র্থ সংস্করণ, হারমোনিয়াল যন্ত্রে মুদ্রিত, ৩০০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৭০) প্রাণতোষিণী তন্ত্র, ৪র্থ সংস্করণ, হারমোনিয়াল যন্ত্রে মুদ্রিত, ৩০১ পৃষ্ঠা দেখ।

(৭১) বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

(৭২) বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৭৩) স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেন বিরচিত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি ২৯৭ পৃষ্ঠা ও শব্দ কল্পদ্রুমঃ, পুনঃ প্রকাশিতঃ, ২৪৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৭৪) তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

বাঙ্কাঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে 'নেতা ধোবানীর পুকুর' নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে।" (৭৫) তাহা হইলে উক্ত ঘটনা ঐ স্থলেই হওয়া সম্ভব। ফলতঃ 'নেতা ধোবানীর পাট' বলিয়া একখানি প্রস্তরকে বহুকালাবধি তমোলুকের রজকেরা প্রতি আষাঢ় ষড়শীতি সংক্রান্তি দিবসে পূজাদি করিয়া থাকে, এবং ঐ প্রস্তরপাট স্বতন্ত্র গৃহ-মধ্যে রক্ষিত হইয়া আছে। ইহা কেবল নেতার ভক্তির চিহ্ন মাত্র।

এখানে 'খাটপুকুর' নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। ইহার সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, নরপতি তাম্রধ্বজ সরোবরটী খনন করাইয়া তন্মধ্যে সপ্রাচীর মন্দির প্রস্তুত করতঃ পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ বারিরাশি উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। ঐ মন্দিরের বর্ত্তমান চূড়াটী লোকের মনে এই সংস্কারকে দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই সরোবর প্রতিষ্ঠা কালীন সাধারণের আচরিত বিঘ্নও দ্বারা প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা না করিয়া একটী মন্দির দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত।

বঙ্গের শেষ বীর। *

(সমালোচনা।)

বাঙ্গালায় প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের বড়ই অভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহই এত দিন ঐতিহাসিক উপন্যাস ছিল। হারাণচন্দ্রের 'বঙ্গের শেষ বীর' বাঙ্গালার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস হইল। নচেৎ রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা, মাধবী-কঙ্কণ প্রভৃতি প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। সে গুলি ইতিহাস ও উপকথার কাহিনী। অবশ্য বঙ্কিম বাবুই সর্ব্বপ্রথম ইহার পথপ্রদর্শক। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আমরা একমাত্র রাজসিংহকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে চাই,—নহিলে মৃণালিনী কি আনন্দমঠ, দুর্গেশনন্দিনী কি সীতারাম,—ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। রাজসিংহেই বঙ্কিম বাবু প্রকৃত ইতিহাসের অবতারণা করেন। তৎ সূত্রে তদানীন্তন মোগল সাম্রাজ্যের ও হিন্দু সাম্রাজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচিত হয়। আর হারাণ বাবুর "বঙ্গের শেষ বীর" গ্রন্থে আমরা প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয় পাইয়াছি। লেখার মৌলিকত্বে ও অপূর্ব্বত্বে ইহা কোন অংশে বঙ্কিম বাবুর 'রাজসিংহ' হইতে হীন নহে। বরং খাঁটী বাঙ্গালী চরিত্র বলিয়া 'শেষ বীর' আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে।

বঙ্গের পাঠকগণ, শিক্ষা-গুণে কি ফলের

---

(৭৫) 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

* বঙ্গের শেষ বীর—ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য ৸৹ বার আনা। কলিকাতা, ২৮ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীটে উক্ত গ্রন্থকারের নিকট ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্ত

স্বপে বলিতে পারি না, ইতিহাসের আজিও সম্যক্ আদর করিতে চাহেন না। আজিকার এ দুর্দ্দিনে, ইতিহাসের এরূপ হতাদর, কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। বাঙ্গালার কি ভারতের, যে দুই চারি পৃষ্ঠা ইতিহাস বিদ্যালয়ের বালকে শিক্ষা করে, তাহাতে তো স্বদেশের গৌরব ও স্বজাতির বীরত্বের কাহিনী যথেষ্ট সুবিচারের সহিত লিখিত থাকে। তাহাই পাঠ করিয়া ইতিহাস সমাপ্ত হয়! ইহা জানিয়াও আবার রাজপুরুষগণের মধ্যে নাকি ভারতের ইতিহাস পাঠ সম্বন্ধে, অনেক বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে! যাহা হউক, ইতিহাস যদি সত্যই এত কঠোর হয় যে, কোমল-প্রকৃতি বঙ্গীয় পাঠকের তাহা কোন কালেই সহিবে না, তাহা হইলে যে কেহ মুখ-রোচক করিয়া স্বদেশের লুপ্ত গৌরব, স্বজাতির অমর কীর্ত্তি দেখাইতে প্রয়াস পাইবেন, তিনি সকলেরই ধন্যবাদ-পাত্র ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন! তাঁহার সদুদ্দেশ্য, উচ্চ অভিপ্রায় ও কঠোর পরিশ্রম সর্ব্বথা সার্থক হইবে। আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়, বঙ্গের কবি উপন্যাসিক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়, এই বিষয়ে ধৃত ব্রতী। কৃতীও তিনি হইয়াছেন। হারাণ বাবু সুলেখক, সুকবি, ভাবুক ও চিন্তাশীল, তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

"বঙ্গের শেষ বীর" খাঁটী ঐতিহাসিক উপন্যাস। পাঠক ইহাতে একাধারে ইতিহাস ও উপন্যাস—দুইই পাইবেন। ইতিহাস পাঠে অনিচ্ছুক উপন্যাসপ্রিয় পাঠক এ মধুর উপন্যাস পাইয়া পুলকিত হইবেন, এবং উপন্যাস-পাঠক-বিমুখ ঐতিহাসিক, ইহাতে বঙ্গীয় এক মহাবীরের প্রকৃত ইতিহাস জানিবেন। উভয়ই যাঁহার ত্যাজ্য, তিনিও ইহা পাঠ করিলে অপূর্ব্ব কাব্য ও নাটকের প্রচুর আনন্দ-লাভ করিবেন। এই গ্রন্থখানি বস্তুতঃ এমনই কৌশলে ও আশ্চর্য্য শক্তিতে রচিত যে, উপন্যাসের অংশ বাদ দিয়া দেখিলেও, গ্রন্থের অঙ্গহানি না হইয়া বরং একটী সরল—প্রাঞ্জল, মধুর—মনোহর বীর-কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। আর, ইতিহাসের অংশ-টুকু ছাটিয়া ফেলিলে, একটী অপূর্ব্ব উপন্যাস ও কাব্য পাঠ করা যায়। এই কৌশল ও সুদক্ষতা বড় কম কথা নহে। প্রকৃত প্রতিভা না থাকিলে, এমন ভাবে কেহ লেখনী ধারণ করিতে পারে না। ধন্য হারাণচন্দ্রের কবিত্ব-ময়ী লেখনী! ধন্য তাঁহার সর্ব্বভেদিনী দৃষ্টি, ধন্য, তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ ক্ষমতা। অনেকের মনে হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের অবসানের সহিত বাঙ্গালায় উপন্যাস পাঠের সাধ ঘুচিবে। কিন্তু হারাণচন্দ্রের দুলালী, মোহনমালা, শেষ বীর, প্রভৃতি যাঁহারা পড়িবেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব মত পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। হারাণচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত শিষ্য। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় মিষ্ট করিয়া উপন্যাস বলিতে পারেন। তিনি সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের অবতারণায় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ।

জগৎ জুড়িয়া কলঙ্ক আছে, বাঙ্গালী ভীরু,—বাঙ্গালী কাপুরুষ। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়াই না কি বখতিয়ার খিলিজি, বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল! স্বদেশ-ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র, মৃণালিনীতে সেই ইতিহাসের অবতারণা করিয়াছেন ও কৌশলে বুঝাইয়াছেন যে, প্রকৃত কথা তাহা নহে। আত্মদ্রোহিতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতাই, বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বঙ্গের সুসন্তান হারাণচন্দ্র এখন "বঙ্গের শেষ বীরে" খাঁটী বাঙ্গালা ধরণের অবতারণা

করিয়া, লোকের সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বাঙ্গালার এই মহাকলঙ্ক অপনোদন করিলেন। এরূপ স্বদেশ-ভক্তি মন্ত্র-উদ্দীপনা-পূর্ণ বঙ্গীয় উপন্যাস ‘আনন্দমঠের’ পর এই প্রথম দেখিলাম। কিন্তু সে “আনন্দ মঠ” ও বঞ্চনা-মূলক “বঙ্গের শেষ বীর” ঐতিহাসিক বস্তু।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনী বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আর, আমাদের হারাণ বাবু, সেই জীবনীর আংশিক ঘটনা লইয়া, ইতিহাসের কঙ্কাল লইয়া এই মহারাজের অপূর্ব্ব কাব্য-প্রতিমা গঠন করিয়া দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন। এই আদর্শ পুরুষসিংহ, এক দিন দুর্দ্ধর্ষ মোগল-গ্রাস হইতে জননী রূপ জন্ম-ভূমিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই বঙ্গবীর, সত্যই যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত মোগল সৈন্য নিহত করিয়া হিন্দুর লুপ্ত রাজ্য উদ্ধারপূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে অষ্টাদশ বর্ষ-কাল রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বঙ্গবীর-স্বদেশের দুর্গতিতে কাতর হইয়া, স্বাধীনতার এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, দেশ স্বাধীন করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহার জীবনে সে আশা ফলবতীও হইয়াছিল। তিনি সমগ্র বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা আপন শাসনে আনিয়াছিলেন,—বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্য-বর্গের মধ্যে একতা স্থাপন করিয়া, বাঙ্গালী জাতির দুরপনেয় কলঙ্কমোচন করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরিসীম সাহস, অদম্য উৎসাহ, অপূর্ব্ব বীর্য্য, লোকে-শিক্ষনীয়। তিনি বিপদে অবিচলিত, চিন্তায় স্থির, সর্ব্বদা কার্য্য-কুশল। তাঁহার আশ্চর্য্য তেজ, আশ্চর্য্য উৎসাহ, আশ্চর্য্য বীরত্ব! স্বদেশের জন্য তেমন করিয়া কাহারও প্রাণ কাঁদে কি? স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, তেমন অকুতোভয়ে, তেমন অতুল সাহসে কেহ বুঝি জীবন উৎসর্গ করিতে জানে না! যাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্বয়ং ভারত-বিজয়ী মোগল সম্রাট অকবর। প্রতাপ, জীবন-ব্রত-পালনের জন্য আজীবন যে মহা-সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি স্বদেশের কল্যাণের জন্য সকলই করিতে প্রস্তুত ছিলেন। স্বীয় কন্যাকে আদর করিতে করিতে ভগিনীকে একদিন বলিয়াছিলেন,—“ভগিনী! যে ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে শুধু নারীর প্রাণ লইয়া বাঁচিলে আমাদের চলিবে না। অবস্থা-বিশেষে আমাদিগকে কুসুম অপেক্ষা কোমল এবং বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হইতে হয়। ইহাই রাজধর্ম্ম। আমার উদ্দেশ্য সাধনের কেহ অন্তরায় হইলে, আমি যে কোন উপায়ে সে অন্তরায় দূর করিব। গুরু হউন, সন্তান হউন, স্ত্রী হউন, কিছুতেই আমার লক্ষ্যচ্যুতি ঘটিবে না। অধিক কি, ভগিনী! এই যে প্রাণাধিক কন্যাকে লইয়া এত আমোদ-আহ্লাদ করিতেছি, কর্ত্তব্য বোধ করিলে এবং আবশ্যক হইলে, এই কন্যাকেও আমি মারিতে কুণ্ঠিত হইব না।” কে বিশ্বাস করিবে, ইহা ক্ষীণ-প্রাণ বাঙ্গালীর উক্তি! কে বিশ্বাস করিবে, সত্য সত্য এমন দিনও আসিয়াছিল, যে দিন প্রতাপ, সত্য সত্যই সেই প্রাণাধিক কন্যার জীবনাধিক স্বামীর প্রাণবধ করিতেও নিজ-অসি উত্তোলন করিয়াছিলেন? তাঁহার জামাতা, সত্যই গোপনে তাঁহার মহদুদ্দেশ্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল। জানিতে পারিয়া প্রতাপ, দেশের মঙ্গলের জন্য কন্যার চির-

বৈধব্যও স্মরণ করিলেন না! ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার মহত্ব! এমন অলৌকিক জীবনী, এমন অপূর্ব্ব চরিত্র লইয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। প্রতাপ, যেমন মহা-তেজস্বী, মহাবল এবং উক্তি দয়ায়, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায়, স্বদেশ-হিত-ব্রতে বীরাগগণ্য, এই লেখকও তেমনই সেই উচ্চ ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া, তেমনই উচ্চভাবে, উচ্চ আদেশে সে কাহিনী বর্ণন করিয়াছেন। এমন করিয়া, বঙ্গায় বীরের বীরত্ব ও মহত্বের কাহিনী আর কেহ লেখেন নাই। এমন মধুর, মনোহর, মর্ম্ম স্পর্শিনী ভাষায়—এমন মধুর উদ্দীপনার ভাব ও ভাষার আশ্চর্য্য সমন্বয় করিয়া, এমন বীর-কাহিনী এত এত দিন কেহ বলে নাই। গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত করুণ-রস ও বীররসের অপূর্ব্ব মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় তাহা পাঠ করিতে করিতে দেশ-কাল সকলই ভুলিয়া গিয়া বার বার মুক্তকণ্ঠে গ্রন্থকারকে সাধুবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। হারাণ চন্দ্রের "প্রতাপ" জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় তেজাল; এরূপ আদর্শ বীর-চরিত্র।

কিন্তু, এই 'প্রতাপ' চরিত্রে অলৌকিক ও অসাধারণ গুণরাশির সমন্বয় থাকিলেও গ্রন্থ-নায়ক, নিষ্কলঙ্ক ছিলেন না। অদৃষ্ট দোষে তাঁহাকে গুরুহত্যা পাতক বহন করিতে হইয়াছিল। তাহাতে একটা কথা বলিবার আছে। তাঁহার পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায় দেশের শত্রুতা সাধন করিয়া আসিয়াছেন এবং প্রতাপ প্রকৃত বীরের ন্যায় চির দিন তাহা সহ ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। শেষে নিষ্ঠুর অদৃষ্টের তাড়নায় তাঁহাকে পিতৃব্যহত্যায় লিপ্ত হইতে হইল, তখন তাঁহার সে কলঙ্কও বিস্মৃত হই। বরং সেই কলঙ্কেও তাঁহার মূর্ত্তি বিম্বিত দেখিয়া হই! কবি হারাণচন্দ্র এরূপ আশ্চর্য্য নাটকত্বের সহিত এই বসন্ত রায়ের হত্যাটী সংসাধিত করিয়াছেন যে, সহৃদয় পাঠকের প্রতাপের এই গুরুহত্যার পাতকও তাঁহার নিজের দোষ বলিয়া মনে হয় না! এই উজ্জ্বল চরিত্র, এত দিন সুকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বৌ ঠাকুরাণীর হাটে" অতি নিষ্ঠুর নর পিশাচরূপেই প্রকাশিত ছিলেন! যিনি কবি ও স্বদেশ-ভক্ত, তাঁহার লেখনী, বঙ্গায় বীরের চরিত্র এমনই বীভৎস রূপে চিত্রিত করিয়া রাখিতে পারে, ইহা একরূপ আশ্চর্য্যের কথা বটে! পিতৃব্য-হত্যা জনিত প্রতাপের চরিত্রের কলঙ্ক অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের লেখনী কি এজন্য কলঙ্কিত নয়? আমরা হারাণ বাবুর প্রতাপ-চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি যথার্থই কবির হৃদয় লইয়া বীরের আদর বুঝিয়া, স্বজাতীয় সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বঙ্গের কোহিনূরের মলিনতা শূন্য করিয়া, স্বজাতির মুখোজ্জ্বলা বিধান পূর্ব্বক ধন্য হইলেন!

প্রতাপ মহিষী 'পদ্মিনী'ও প্রতাপের প্রতিকৃতিতে গঠিত! এমন মণি-কাঞ্চন-সংযোগ সুদুর্লভ।

বঙ্কিম বাবুর সীতারাম, স্ত্রীকে হারাইয়া একদিন কাঁদিয়াছিলেন, "হায়! স্ত্রীকে হারাইয়া কি নন্দা ও রমাকে পাইলাম? আমার উচ্চ লক্ষ্যের সহায়, আমার সিংহাসনের মহিষী হইবার যোগ্যা স্ত্রীকে কি পাইব না? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সে সিংহ-বাহিনী কৈ?"

সীতারাম, যাহা পান নাই, প্রতাপ তাহা পাইয়াছিলেন। প্রতাপ অন্তরে যে মহতী আশাকে স্থান দিতেন, সাধ্বী পদ্মিনী, সযত্নে তাহা পরিবর্দ্ধন করিলেন। তিনি সর্ব্ব-প্রকারে পতির উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সহায় ছিলেন। এই

চরিত্রের অবতারণাতেও হারাণ বাবুর উচ্চ আদর্শের প্রশংসা করিতে হয়।

ভাগ্যবান্ প্রতাপের দুই বন্ধুবরও অতুল্য। তাঁহারা তিন জনেই বীর, তিন জনেই সমবয়স্ক, তিনজনেই একই উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিশোর বয়সে, বনে শিকার করিতে গিয়া, তিনি জনের যে কথা হয়, তাহা শুনিয়াও বিস্মিত হইতে হয়! প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জীবনে বড় কি?"

"সূর্য্যকান্ত। ভক্তি।"

"শঙ্কর। জ্ঞান।"

"প্রতাপ। কার্য্য!"

"ভক্তি, জ্ঞান ও কার্য্য" এই তিনের মিশ্রণ করিও, সংসারে বিজয় লাভ করিবে।" গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে, বন্ধুত্রয়ের জীবনেও তাহাই দেখাইয়াছেন। সূর্য্যকান্ত স্বদেশ ভক্তিতে মাতোয়ারা। শঙ্কর, জ্ঞানে সুপণ্ডিত এবং ভক্তিতে বিভোর। প্রতাপ, ধর্ম্মে ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় অটল-অচল। তিন জনে ভিন্ন হইলেও, এক হইয়া, ত্রিধারা স্রোতস্বতীর ন্যায় একই মহা-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন! সূর্য্যকান্ত, স্বদেশ ও ভক্তির উত্তাল তরঙ্গমধ্যে, হৃদয়ের প্রেম-বাসনা সকলই জলাঞ্জলি দিলেন। শঙ্কর-আজীবন ভক্তি-প্রাণ। যুদ্ধে, কারাগারে, রণক্ষেত্রে, শিবিরে—সর্ব্বত্র সেই ধর্ম্মগত-প্রাণতা। সেই উদ্বেগহীন প্রফুল্লবদন, সেই দিব্যোল্লাস! কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! শঙ্করের সেই কিশোর বয়সের কথা—"দেবতার মন্দির, দেবতাই রক্ষা করিবেন। তুমি আমি কি গর্জ্জিত মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ হইতে একটী তৃণও তুলিয়া লইতে পারি?"

তার পর 'ফুলজানি'—কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। অভেদ্য দুর্জ্জয় প্রস্তর-দুর্গে ক্ষীণপ্রাণা কোমলকুসুম! ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর ভিতর কি প্রগাঢ় প্রেম-তরঙ্গ! হায় বীরবালা! তেমন কোমলা হইয়াও সে প্রেম-বজ্র অপেক্ষা কঠিন করিতে সমর্থ হইয়াছিলে! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার আত্মত্যাগ! পাঠক! সমালোচক এখানে অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহসী নহেন। বাঙ্গালা, মোগল অত্যাচারে পীড়িত হইয়া, আপনার প্রেম, রূপ, জীবন, যৌবন, সর্ব্বস্ব পদ-দলিত করিয়া, অপূর্ব্ব উদ্দীপনায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘুমন্ত মানুষকে ডাকিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে! বাঙ্গালীর রূপবতী কিশোরী কন্যা, বাঞ্ছিত বস্তু নিকটে পাইয়াও বীর-ভাবে বলিতেছে,—"বীরবর! আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই বলিলাম, নহিলে এ কথা কেহ শুনিত কি না সন্দেহ। * * * আমি অপরিণীতা হইয়াও পতির ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি। ভার্য্যা, পতির ধর্ম্মের সহায়। আমার যিনি পতি হইবেন, তিনি বীর-ধর্ম্মে দীক্ষিত! তাই আমি আপনা হইতে সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি!"

"দুই জনেই নীরব। মাথার উপর সেই সুনীল আকাশ, পদপ্রান্তে সেই স্থির যমুনা, পার্শ্বে সেই নীরব বনস্থলী।"

তার পর, যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ,—অগণিত মোগল সৈন্য। রাজপুত-কলঙ্ক অকবর-জ্বালক মানসিংহ তাহার অধিনায়ক। প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বঙ্গীয় বীরগণ, তখন মরণ-ভয় তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত! হায়! আশা বুঝি ফুরাইল, হিন্দুর সৌভাগ্য-সূর্য্য বুঝি চির-অস্তমিত হইল!—কিন্তু দেখ, বঙ্গের বীর তখনও দৃঢ়, তখনও অবিচলিত। অহো! কি মর্ম্মান্তিক বিড়ম্বনা,—বাঙ্গালী বীর বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতকতায় আজ সকলই হারাইলেন। সব ফুরাইল।

জগৎ জুড়িয়া কলঙ্ক, বাঙ্গালী দুর্ব্বল,

ভীরু, কাপুরুষ। এস ভাই এস,—এ দুঃখের দিনেও এস সেই অতীত-কাহিনী স্মরণ করি। বেশী দিনের কথা নহে, সাড়ে তিন শত বৎসরেরও কম,—ইহারই মধ্যে কি সেই আদর্শ বাঙ্গালী, পুণ্যশ্লোক প্রতাপাদিত্যকে ভুলিয়া যাইব? এত 'উচ্চশিক্ষার' ফল কি এই? স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রীতি কি ইহারই নাম?

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা।

সপ্তম অধ্যায়।

বিজ্ঞান যোগ।

বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদাহৃতং।
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "আমাগত চিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে,যোগীদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে কোন্ যোগী এই "আমাগত চিত্ত" হইতে পারে, তাহাই প্রথম জিজ্ঞাসার বিষয়। ইহার উত্তরেই এই সপ্তম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। "আমার তত্ত্ব এইরূপ—এই তত্ত্বজ্ঞানেই আমাগত চিত্ত হওয়া যায়। এইজন্য এই সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত—গীতায় ঈশ্বরতত্ত্ব প্রধানতঃ বিস্তারিত হইয়াছে। (শঙ্কর)।

ভগবদ্গীতাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশ ১ হইতে ৬ অধ্যায়; দ্বিতীয় অংশ ৭ হইতে ১২ অধ্যায়। আর তৃতীয় অংশ ১৩ হইতে ১৮ অধ্যায়। জ্ঞানের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় জীবতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব ও ঈশ্বর তত্ত্ব ও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ তত্ত্ব। জীবে জীবে সম্বন্ধ, জীবে জগতে সম্বন্ধ ও জীবে ঈশ্বরে সম্বন্ধ ও জগতে ঈশ্বরে সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধ তত্ত্বও জ্ঞানের মূল জিজ্ঞাসার বিষয়। দর্শনশাস্ত্র প্রধানতঃ এই তত্ত্ব আলোচনায় নিরত। ধর্ম্মশাস্ত্রেরও ইহাই প্রতিপাদ্য।

জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বমীশতত্ত্বং তৃতীয়কম্।
দ্বিতৈকাদর্শ তত্ত্বেষু তত্তদ্যুক্ত্যা নিরূপিতম্॥
(অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিঃ)

যে দর্শনশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ, তাহাতে এই সকল তত্ত্ব ও এই তত্ত্ব জ্ঞানে আমাদের অধিকার, ইহার মীমাংসা থাকে। গীতাশাস্ত্র সূত্রাকারে হই-

কৃষ্ণভক্ত্যৈব যত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতং॥"

লেও ইহাতে এই সকল তত্ত্ব পূর্ণরূপে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। আজি পর্য্যন্ত কোন দেশের কোন দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রে গীতার ন্যায় কোথায় এই সকল তত্ত্ব এতদূর সুমীমাংসিত হয় নাই। এইজন্য গীতা—সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম ও দর্শন গ্রন্থ।—এইজন্য গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান—এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে অবতার না বলিয়া ব্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ও সমসাময়িক ঋষিগণ পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে সকল বিষয় এস্থলে বিস্তারিত উল্লেখ করা সম্ভব নহে।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে জীবের স্বরূপ ও সেই জ্ঞানলাভের জন্য সাধনার পন্থা বিবৃত হইয়াছে। (বলদেব)। ব্রহ্মত্ব লাভ করিবার জন্য সাধনার তত্ত্বও বিবৃত হইয়াছে (রামানুজ)। ইহাতে কর্ম্মসন্ন্যাসাত্মক সাধনার তত্ত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে—যোগবলে জ্ঞেয় 'ত্বং' পদার্থের তত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে (মধুসূদন)। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাস্য ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, (বলদেব) এবং 'ভক্তি' শব্দ বাচ্য ঈশ্বরের উপাসনা-প্রণালীও বিবৃত হইয়াছে (রামানুজ)। এই ছয় অধ্যায়ে ধ্যেয় প্রতিপাদক 'তৎ' পদার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (মধুসূদন) এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয়—অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, জীব, জড়, ত্রিগুণ প্রভৃতি তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতার প্রথম খণ্ডে জীবতত্ত্ব, এবং জীবে জীবে ও জীবে ঈশ্বরে সম্বন্ধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে, ঈশ্বরতত্ত্ব, এবং ঈশ্বরের সহিত জীবের ও জগতের সম্বন্ধতত্ত্ব বিবৃত

হইয়াছে। আর তৃতীয় খণ্ডে জগৎ তত্ত্ব ও জগতের সহিত জীবের সম্বন্ধ তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়। সৎ-অস্তিত্ব বা কর্ম্মশক্তি; চিৎ-চৈতন্য বা জ্ঞানশক্তি, আর আনন্দ-স্বাভাবিক পূর্ণতা। অজ্ঞেয় ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানে এই তিন লক্ষণের দ্বারা জ্ঞেয়। জীব ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বভাব, তৎ, ত্বম্ + অসি; ঐ তিন শক্তি জীবে তিনরূপে প্রকটিত:— কর্ম্মশক্তি will মানস শক্তি feeling এবং জ্ঞানশক্তি intellect reason জীব যত ব্রহ্মের দিকে এক মাত্র সত্ত্বার ধারণার Ideal of reason পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই তাহার এই তিন শক্তির পূর্ণ বিকাশ ও সম্প্রসারণ হইতে থাকে। মানুষ সাধনাবলে ক্রমে ক্রমে সচ্চিদানন্দময় হইবার পথে অগ্রসর হয়।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে, জীবতত্ত্ব বুঝাইয়া এই কর্ম্মবৃত্তি কিরূপে ও কতদূর পর্য্যন্ত বিকাশিত হইতে পারে—ঈশ্বর জগৎরক্ষাকল্পে যে ভাবে কর্ম্মহীন হইয়াও কর্ম্ম করেন, তাহার কল্পনা করিয়া, সেইভাবে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কিরূপে সম্প্রসারিত হইতে পারে, এক কথায় কর্ম্মী মানুষ কিরূপে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই বুঝান আছে। গীতার দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে, ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইয়া, আমাদের মনোবৃত্তি feeling কিরূপে ভক্তিবলে সম্প্রসারিত করিয়া অবশেষে পূর্ণ আনন্দময়ত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই দেখান হইয়াছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে ও জীব সম্বন্ধে মনোবৃত্তি কিরূপে পরিচালিত হইলে তবে ভক্তির পূর্ণতা লাভ হয়, কিরূপে তাহা হইতে পূর্ণানন্দে অবস্থান করা যায় তাহারই পন্থা দেখান হইয়াছে। গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান কতদূর সম্প্রসারিত হইতে পারে, জ্ঞান কতদূর সম্প্রসারিত হইলে জীবজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে একীভূত হয়, কি সাধনায় সেই জ্ঞান লাভ হয়, মানুষ চিন্ময় হইতে পারে, তাহাই বুঝান হইয়াছে।

অতএব যে সাধনা বলে, যে পন্থা অবলম্বন করিলে মানুষ তাহার কর্ম্মবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি পূর্ণরূপে সম্প্রসারিত করিয়া তাহার পরম আদর্শ সচ্চিদানন্দময়ের নিকটে যাইতে পারে, গীতায় তাহা অতি বিশদরূপে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মানুষকে পূর্ণরূপে বিকাশিত করিবার এমন প্রণালী আর কোন দেশের

আমাতে অর্পিয়া মন, আমার আশ্রয়ে
হ'লে যোগরত পার্থ শুনহ যেরূপে
নিঃসংশয়ে পূর্ণরূপে জানিবে আমারে। ১

কোন দর্শন বা ধর্ম্ম-গ্রন্থে পাওয়া যায় না। গীতার ধর্ম্ম পূর্ণধর্ম্ম। আর সকল ধর্ম্ম আংশিক। কোন ধর্ম্মে কর্ম্মের আংশিক বিকাশ আছে (যথা বেদের কর্ম্মকাণ্ড) কোথাও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ আছে (উপনিষদ্) কোথাও কর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ আছে (বৌদ্ধধর্ম্মচক্র) কোথাও ভক্তির পূর্ণ বিকাশ আছে (গৃষ্টধর্ম্ম) কোথাও প্রেমের পূর্ণ বিকাশ আছে (বৈষ্ণব ধর্ম্ম) কিন্তু গীতার ন্যায় কোথাও ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ নাই। এমন পূর্ণ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন আদর্শ কোথাও নাই। এই জন্য গীতাবক্তাকে, পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া ব্যাস প্রভৃতির ন্যায় পণ্ডিতও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল গূঢ় ও দুর্ব্বোধ্য বিষয় অল্প কথায় এস্থলে বুঝিবার বড় সম্ভব নাই।

(১) আমাতে—পরমেশ্বরের (শঙ্কর, স্বামী)।

আমার আশ্রয়ে—পরমেশ্বরের আশ্রয়ে। যে কেহ কোনরূপ পুরুষার্থ লাভ জন্য প্রার্থী হয়, সে তৎসাধন উপায়ভূত অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম বা তপদান প্রভৃতির আশ্রয় লয়। কিন্তু এইরূপ যোগী কেবল পরমেশ্বরকেই আশ্রয় করেন। (শঙ্কর)।

যোগরত—ষষ্ঠাধ্যায়ে বিবৃত যোগেরত (মধুসূদন)।

পূর্ণরূপে জানিবে আমারে—সমস্ত বিভূতি বল শক্তি ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি গুণসম্পন্ন পরমেশ্বরকে। (শঙ্কর, স্বামী, মধু) অধিষ্ঠান, বিভূতি পরিকর সহিত ঈশ্বরকে (বলদেব)। বেদান্তমতে ব্রহ্ম 'অবাঙ্মানসগোচর'। তিনি 'নেতি নেতি' বাচ্য। তাঁহাকে জানিবার কোন স্বরূপ লক্ষণ নাই। তিনি সাধারণ জ্ঞানে অজ্ঞেয়। তবে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আংশিকরূপে উপলব্ধি করা যায় এই পর্য্যন্ত। অতএব তাঁহাকে পূর্ণরূপে কিরূপে জানা যাইতে পারে? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম-সম্বন্ধ রহিত, তিনি আমাদের এ জ্ঞানের অতীত। তবে তাঁহার সগুণ ভাব—এই জগত ও জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা রূপে—আমাদের জ্ঞানগম্য। "তজ্জলান্" জন্মাদ্যস্য যতঃ—ইহাই আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র

বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান সবিশেষে
কহিব তোমারে আমি ; জানি যাহা আর
এ জগতে না থাকিবে জ্ঞাতব্য তোমার। ২

মূলসূত্র। যিনি এ জগত সম্বন্ধে পরম পুরুষ প্রকৃতির নিয়ন্তা রূপে আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত, চেষ্টা করিয়া আমরা সেই সম্বন্ধ সূত্রে তাঁহার সমগ্র জানিতে পারি। সৃষ্টি পালনে, তাঁহার যে জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য বিভূতির বিকাশ অনুভব করা যায়, কেবল আমরা তাহারই সমগ্র জানিতে পারি। এবং সেই "এক বিজ্ঞানে আমাদের সর্ব্ব-বিজ্ঞান লাভ হয়।

বেদান্ত হইতে বুঝাযায় যে, ব্রহ্ম অবাঙ্‌মানস গোচর হইলেও তাঁহাকে জানা যায়। "তমেবমবিদি-ত্বাতি মৃত্যুমেতি," আত্মা বা অরে দৃষ্টব্য, শ্রোতব্য নিদিধ্যাসিতব্য"—ইত্যাদি শ্রুতি এ কথার প্রমাণ। এ জ্ঞানে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি না সত্য, ব্রহ্ম কখন জ্ঞেয় হইতে পারেন না, এ দার্শনিক তত্ত্বও সত্য। কিন্তু যোগ সাধনা দ্বারা যে প্রজ্ঞালোক জন্মে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে, জ্ঞাতা স্বরূপে বা দ্রষ্টার স্বরূপে জানিতে পারা যায়। আমাদের এই সাধারণ জ্ঞান যোগ বলে লোপ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধ ভূমিতে আরোহণ করিয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই জ্ঞানের রূপকে একীভূত করিয়া তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

অতএব আমরা একথা বলিতে পারি যে, সাধনা-বিশেষ বলে, আমরা এই সাধারণ জ্ঞানে সগুণ ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ, এই জগত ও জীব সম্বন্ধে তাঁহার সম্বন্ধ দ্বারা জানিতে পারি। আর যোগবলে এই জ্ঞান-ভূমি অতিক্রম করিয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে, ইদং ও অহংকে আত্মা ও অনাত্মাকে, একীভূত করিয়া কর্ম্ম ও অকর্ম্মকে একীভূত করিয়া সেই দ্বৈত বোধের সীমা অতিক্রম করিয়া তবে নির্গুণ অব্যয় ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারি।

এতত্ত্ব অতি গূঢ়। সমগ্র ইউরোপীয় দর্শন অদ্যাপিও একথা বুঝিতে পারে নাই। কেবল আর্য্যঋষির নিকট এই মহাতত্ত্ব প্রতিভাত হইয়াছিল। পরে এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

(২) বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান—অনুভব সহিত জ্ঞান। (শঙ্কর) অপরোক্ষ জ্ঞান (গিরি) জ্ঞান—শাস্ত্রীয়

সহস্র মনুষ্য মাঝে কেহ কদাচিৎ
সিদ্ধি তরে করে যত্ন, সিদ্ধার্থীর মাঝে,
কদাচিৎ কেহ জানে স্বরূপে আমারে। ৩

বা শাস্ত্রজন্য জ্ঞান (স্বামী, মধু)। আর বিজ্ঞান অনুভূত অনুভূত (নিদিধ্যাসন) জনিত জ্ঞান। প্রমাণ দ্বারা বিচার পরিপাক হইলে—বিরোধী জ্ঞান নিরাসন পূর্ব্বক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই বিজ্ঞান (মধুসূদন)। গীতার ৬ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিষয়ী বা জ্ঞাতা আমি, আর এই আমরা বিষয় বা জ্ঞেয় এই উভয়াত্মক যে জ্ঞান, যা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, অথবা অহং ও ইদং এই উভয় সংমিশ্রণে যে জ্ঞান, তাহাই এস্থলে জ্ঞান পদবাচ্য। আর বিজ্ঞান যাহা, তাহা এই বিষয় জ্ঞান বিরহিত, অহং ও ইদং এই উভয়ের অতীত ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান (রামানুজ)। রামানুজের এই অর্থ বড় গভীর দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। কিন্তু এস্থলে বিস্তার করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

না থাকিবে জ্ঞাতব্য তোমার—অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধন জন্য আর কিছু জানিবার আবশ্যক থাকিবে না (শঙ্কর)। শ্রুতিতে আছে "এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞানং ভবতি।" একমাত্র চিন্ময় সৎ বস্তুর জ্ঞান লাভ হইলে, বেদান্ত হইতে জাত মনোবৃত্তি লাভ করিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ধারণা জ্ঞানে বদ্ধমূল হইলে এই বাহ্যভূত মায়া-কল্পিত জগতের আর কিছু জানিতে বাকি থাকে না (মধুসূদন)।

(৩) সিদ্ধি তরে করে যত্ন—সমগ্র জীব মধ্যে কেবল মানুষই জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু এই মানুষদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ প্রকৃত জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। লক্ষের মধ্যে একজন প্রকৃত জ্ঞানী, ধার্ম্মিক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কেননা যাহার সত্ত্বশুদ্ধি না হয়, সে আদৌ জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে না। তাহার প্রকৃত জিজ্ঞাসার উদয় হয় না, আর যাহাদের জিজ্ঞাসার উদয় হয়, জ্ঞান লাভের জন্য প্রকৃত চেষ্টা হয়, তাহাদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। কেননা যে জ্ঞান লাভ করার জন্য সাধনা বড় কঠিন। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন পরিপাকে তবে আত্মসাক্ষাৎকার হয় (মধুসূদন)। এই জন্য ১৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,

ভূমি অপ্‌ তেজ বায়ু অনিল আকাশ
মন বুদ্ধি অহঙ্কার—এই আটরূপে
আছয়ে বিভক্ত যাহা প্রকৃতি আমার। ৪

ইহাই অপরা; আর ভিন্ন ইহা হতে
পরমা প্রকৃতি মম—জেন মহাবাহু
জীবরূপী করে যাহে জগৎ ধারণ। ৫

বহুজন্ম পরে জ্ঞানবান আমাকে প্রাপ্ত হয়। কেবল প্রক্তন পুণ্য থাকিলে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। (স্বামী)।

সিদ্ধার্থী—যাহারা মোক্ষের জন্য মোক্ষমার্গে সাধনা করে (শঙ্কর)।

(৪) এই আট রূপে—সাংখ্য মতে প্রকৃতি নিত্য ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ বা শক্তিময়ী। সৃষ্টির পূর্ব্বে বা প্রলয় অবস্থায় এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া রাখে। সেই অবস্থায় সৃষ্টি হয় না। পরে স্পন্দাদি উপস্থিত হয়। প্রথমে সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া তমঃ শক্তির স্ফুরণ হয়। সেই রূপে রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। ও এইরূপ রজ শক্তিও কার্য্যকারী হয়। সেই সময় হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রথমে মহত্ত্ব বা বুদ্ধি-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব; অহঙ্কার হইতে মন; আর প্রকৃতির তামসিক বিকারে এই অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র—অর্থাৎ রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র, গন্ধ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র ও শব্দ-তন্মাত্র আর এই সাত প্রকৃতি বিকৃতি হইতে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ স্থূল ভূতবর্গ এই পঞ্চদশ ও মন এই ষোড়শ বিকৃতি উৎপন্ন হয়। মূল প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্য জন্যই এইরূপে বিকৃত হয়। এজন্য সাংখ্যমতে পুরুষ প্রকৃতি সাত প্রকৃতি-বিকৃতি ও ষোড়শ বিকৃতি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

বেদান্ত মতে প্রকৃতি স্বাধীন বা নিত্য নহে। তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি হয় নাই। জগৎস্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্ম। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। শ্রুতি মতে "ঈক্ষতি" বা ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার কল্পনা করিয়া তবে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি জ্ঞান পূর্ব্বক, সুতরাং প্রকৃতি বলিয়া জগৎ স্রষ্টা কিছু নাই। তবে ব্রহ্মের যে শক্তি বা মায়া এই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ রূপে থাকায়, তাঁহাকে প্রকৃতি বলিতে বৈদান্তি-কের কোন আপত্তি নাই। কেন না এ প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহা মননাত্মক। তাহাকেও ত্রিগুণাত্মক বলা যায়। তাহা হইতে উক্তরূপে তত্ত্ব উৎপত্তির কল্পনা করা যায়। সাংখ্য ও বেদান্তের এইরূপ সামঞ্জস্য গীতায় সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, সাংখ্যের উক্ত মূল প্রকৃতি ও সাত প্রকৃতি বিকৃতি এই আটকে সমষ্টিরূপে প্রকৃতি বলে। কপিলসূত্রের প্রথমে আছে "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ।"

মূল শ্লোকে ভূমি প্রভৃতি পঞ্চভূত স্থলে পঞ্চসূক্ষ্ম-ভূত বা পঞ্চতন্মাত্র বুঝিতে হইবে, মন অর্থে মনের কারণ অহঙ্কার বুঝিতে হইবে। বুদ্ধি বলিতে মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে। আর অহঙ্কারকে অবিদ্যাসংযুক্ত অব্যক্ত বা মায়া (বেদান্তমতে) অথবা মূলপ্রকৃতি (সাংখ্যমতে) বুঝিতে হইবে। (শঙ্কর ও স্বামী)। স্বামী আরও বলেন যে, এই অষ্ট প্রকৃতি হইতে, তাহাদের ষোড়শ বিকারও বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব (পুরুষ ব্যতীত) পাওয়া যাইবে। পরে ১৩ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতি আমার :—ঐশ্বরীমায়া শক্তি (শঙ্কর) বা ত্রিগুণাত্মিকা স্বভাব (মধু) অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য উপাধি-ভূতা জগতের উপাদান স্বরূপ ত্রিগুণযুক্ত প্রকৃতি বা মায়া বা জগৎ কার্য্যরূপে পরিণাম যোগ্যাশক্তি (গিরি) সাংখ্য দর্শনের স্বাধীন নিত্য চৈতন্যরূপা প্রকৃতিকে ঐশ্বরীমায়া শক্তিরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াই গীতায় সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের একীকরণ বা সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। সাংখ্যের বহুপুরুষবাদও এইরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। সাংখ্যের বহু পুরুষ আর বেদান্তের জীবাত্মা গীতায় ব্রহ্মের পরাপ্রকৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

(৫) অপরা—নিকৃষ্টা (শঙ্কর) জড়ত্ব হেতু নিকৃষ্ট (স্বামী)। ক্ষেত্র লক্ষণ প্রকৃতি বলিয়া নিকৃষ্ট (মধুসূদন)। এই প্রকৃতিই সংসার বন্ধন হেতু (শঙ্কর)।

পরা—শ্রেষ্ঠা (স্বামী, শঙ্কর)।

জীবরূপী—চেতনাত্মক, ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণযুক্ত,

(প্রাণধারণ নিমিত্তভূত (শঙ্কর, স্বামী, মধুসূদন)। অবিদ্যা উপাহিত চৈতন্যই জীব (পঞ্চদশী ১:৬-১১) গীতার ১৫ অধ্যায়ের ৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

করে যাতে জগৎ ধারণ—যাহা চৈতন্যরূপে জগতের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া আছে (শঙ্কর)। যাহা স্বকর্ম্ম দ্বারা এই জগৎ ধারণ করে (স্বামী)।

শ্রুতিতে আছে "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরণানীতি।

জীবরূপী-ব্রহ্মের পরাপ্রকৃতি এই জগৎ ধারণ করে, এই মহা তত্ত্ব বুঝা বড় কঠিন। ইহার একার্থ এই যে, জগতে যে কিছু বস্তু আছে, কেহই কেবল জড়ময় বা কেবল চৈতন্যময় নহে। সামান্য তৃণ হইতে সকল বস্তুই জীব, সকলই জড় চৈতন্যাত্মক, সকলেই দেহদেহী আছে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আছে। শুধু তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজগতে এই জড় চৈতন্যের সমাবেশ আছে বলিলেও যথেষ্ট হয় না। সামান্য ধূলিকণাও এই জড় চৈতন্যাত্মক। সকলেই জীব জড়ের সমাবেশ আছে। সকলেই চৈতন্য-কূটস্থ আছে। কিন্তু সর্ব্বত্র চৈতন্যের প্রকটভাব নাই। তাহার সাধারণতঃ তিন অবস্থা: জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা। মানবে সেই চৈতন্যের জাগ্রত অবস্থা; অন্য প্রাণীতে ও উদ্ভিদে তাহার স্বপ্নাবস্থা আর জড়ে তাহার সুষুপ্ত অবস্থা। জড়ে জড় গতি, উদ্ভিজ্জে ও প্রাণীতে জৈব-শক্তি, আর উচ্চতর জীবে ইচ্ছাশক্তিরূপে সেই জীবরূপী পরাপ্রকৃতি বিকাশিত আছেন। তাহাই চৈতন্যের একরূপ অভিব্যক্তি। যাহা হউক, এ সকল তত্ত্ব এস্থলে আর বিস্তার করিয়া বুঝিবার স্থান নাই।

এই মহাতত্ত্বের আর একরূপ অর্থও হইতে পারে। জড় জগত জ্ঞেয়। কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানেই তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। যদি কোন জ্ঞাতা না থাকিত, তবে জ্ঞেয় জগৎ থাকিত না। দ্রষ্টা না থাকিলে বস্তুর রূপ (আকৃতি ও বর্ণ) কোথায় থাকিত? বিজ্ঞান, দর্শন স্বীকার করিতেছে যে, বর্ণ আমার মনে কল্পিত। বাহ্য পদার্থে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা হইতে কোন শক্তি আমার চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে; তাহার ফলেই এই 'রূপ' জ্ঞান হয়। অনেক দার্শনিক বাহ্য জগতের অস্তিত্ব—দেশ কালের অস্তিত্ব—আমাদের জ্ঞানের বাহিরে স্বীকার করেন না।

অতএব এই জগৎ থাকিতে হইলে, তাহার জ্ঞাতা অবশ্যই থাকিবে। যদি কোন জ্ঞাতা না থাকে, তবে জগৎ থাকিতে পারেনা। এই তত্ত্ব কতক বুঝিতে হইলে জর্ম্মাণ দার্শনিক সপেনর প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুকরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের কথোপকথন-চ্ছলে তাঁহার "World as will and Idea." পুস্তকে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

Subject :—as I am liked to individuals, so thou art joined to thy sister *force*, and has never appeared without her. No eye hath seen either me or thee naked and isolated, for we both are mere abstractions. It is in reality *one* being that perceives itself and is perceived by itself, but whose real being cannot consist in either perceiving or in being perceived, since these are devided between us two.

Both subject and object :—we are then inseparably joined together as necessary part of one whole (the world as idea or phenomena) which includes us both, and exists through us.

সর্ব্বভূতযোনি :—ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত উচ্চ-নীচভাবে অবস্থিত, চিৎ-অচিৎ-মিশ্রিত সর্ব্বভূতের উৎপত্তি করেন, এই ঈশ্বরের পরা ও অপরা প্রকৃতি। ইহার মধ্যে পরা প্রকৃতি চিৎ, ইহাই ক্ষেত্রজ্ঞ। আর অপরা প্রকৃতি—জড় বা ক্ষেত্র। জড় প্রকৃতি ক্ষেত্র বা দেহরূপে পরিণত হয়, আর ঈশ্বরের অংশভূত চৈতন্য ভোক্তারূপে দেহে প্রবেশ করিয়া নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাহাকে ধারণ করে (স্বামী)।

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে—

"মম যোনি মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহং।"

অন্যত্র গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে,—

"মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

আমি জগতের উৎপত্তি প্রলয় :—এই দুই প্রকৃতি দ্বারা আমি জগতের কারণ। অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ (শঙ্কর)। লয়কালে সর্ব্বভূত সেই পর মেশ্বরেই বিলীন হয়, সৃষ্টিকালে তাহা হইতেই সমুদায় উৎপন্ন হয়, (রামানুজ)। মায়িক স্বপ্নময় প্রপঞ্চের মায়াবী ঈশ্বরই উপাদান (মধু)। গীতায় অন্যত্র আছে, মমাধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরং।"

শ্রেষ্ঠতর—আমা ব্যতীত জগতের আর অন্য কোন কারণ নাই। আমিই জগতের একমাত্র কারণ (ভাষ্য)। পরমার্থ সত্য অন্য কারণ নাই (মধু)।

আমারে গ্রথিত—এই জগত আমাতে অনুস্যূত বা অনুবিদ্ধ (শঙ্কর)। সমস্ত জগত চৈতন্য গ্রথিত (মধু)। অথবা ভেদনাত্মক হিরণ্যগর্ভে সমস্তই স্বপ্ন-দৃষ্ট (মধু)।

ফুলধনু।

(১)

ফুল মধুকালে ফিরি' ত্রিভুবন
ফুলবাণক্ষেপে হইয়া আলা,
একদা মদন নিজ ফুলবনে
পশিলা জুড়াতে শ্রমের জ্বালা।
কাননে কুসুম শোভিছে মধুর
ছড়ায়ে মোহন মধুর বাস ;
মলয় সমীর পরশ-শীতল
অলসে অবস ফেলিছে শ্বাস।
সুরব কোকিল নীরবে বসিছে
ঘেঁসিয়া প্রাণের পেয়সী পাশে ;
সরসী-সলিলে বিকচ নলিনী
নীরবে চাহিয়া নীরবে ভাসে।
পশিয়া মদন কুসুম-শয়নে
নীরবে মুদিলা যুগল আঁখি ;
আরোপিত-বাণ বিজয়-নিশান
কুসুম ধনুরে শিয়রে রাখি'।
ধীরে ধীরে আসি' ঘুমের প্রবাহ
নিমেষে চেতনা হরিল তাঁর,—
কুসুম উপরি কুসুম-প্রতিম
শোভে মনসিজ-শরীর-ভার।
মানসে যেমতি প্রভাত সময়ে
অমল কোমল কমল' পরে
নব তপনের তরল কিরণ
সরল সোহাগে ঝরিয়া পড়ে !

(২)

নীরব সকল মধু-সহচর
মদনের ফুলধনুর ভয়ে,
পীড়িত পরাণে পাইল আরাম
জগতের নর-রমণীচয়ে।
না বহে পবন ধনুর সকাশে,
পাছে ছুটে ফুল-সায়ক তাঁর,
পবনের প্রিয় লহরী বালিকা
সরসী-উরসে নাচে না আর।
সহকার-বনে সোণার লতিকা
নীরবে নয়ন বাঁকায়ে চায়,—
আহা কি মধুর সে মুখ-চাহনি,
প্রেমের প্রবাহ ঝরিল তায় !
নিশার কুমদী হেরিতে মদনে
সভয়ে মেলিলা নয়ন দুটি'—
সহসা আসিয়া রসিক পবন
পাছে পরিমল লয় গো লুটি' !
সাঁজের গগনে রাঙা রবি ছবি
থমকিয়া যেন রহিল চেয়ে,
হেরিবারে কিবা কোমল কিরণ
অতনুর তনু আছিল ছেয়ে।

(৩)

হেথা মদনের মানস-মোহিনী
নাথের বিরহে কাতরা রতি
বিষাদ-বচনে বিষাদ-নয়না
ডাকিয়া কহিলা সখীর প্রতি,—
"সই লো ! হৃদয় দহিছে বিষম,
পরাণ মানে না প্রবোধ আর ;
সারাদিন সখি, না দেখি তাহারে
তিলেক থিরহ সহে না যা'র।
নিঠুর পুরুষ কপট প্রণয়ী,
মরমে নাহিলো করুণা-লেশ ;
অবলা-মানসে মজায় কেবলি
দেখায়ে মোহন শোহন বেশ।
প্রাণেশ-বিরহে প্রেমিকা-পরাণে
বহে শোক-স্রোত কেমন ধারা,
নিপট-কঠিন বিলাস-প্রয়াসী
ভাবিয়া কভু কি দেখে লো তা'রা ?

যদি লো সজনি! দেখিত-ভাবিত,
তবে কি নয়নে বহিত জল?
জনম অবধি হায় লো ভুগিনু
তবু না বুঝিনু পুরুষ-ছল।"

(৪)

চাহি' সহচরী রতি মুখখানে
কহিলা হরষ-মধুর-স্বরে,—
অধর হইতে যেন বা সুধীরে
সুরভি মধুর অমিয় ঝরে!—
"পুরুষ-হৃদয় নহে লো কঠিন,
কঠিন নিঠুর রমণী-প্রাণ;
"পুরুষ"-পরাণ স্নেহের বাঁশরী,
উঠে শুধু তাহে প্রেমের তান!
বিলাস কাননে মেলি' সখি সব
ছিলে মোহকর প্রমোদে মাতি',—
জান ত কেমনে ভাঙিল সে ঘোর
লীন ভাতি হেরি ভানুর ভাতি।
এই কতকাল কমল-শয়নে
দেখিনু শয়ান মানস-নাথে,
প্রভাতে যতনে পরালে যে হার
সেই প্রেমহার শোভিছে মাথে।
যাও ত্বরা করি যাও পাশে তাঁর
বিরহ-বেদন বুঝিয়াছ ত?
যাও রতি-সতী নাথের সকাশে,
বিহর হরষে মনের মত।"

(৫)

পশিয়া রূপসী কুসুম-আবাসে
হেরিলা শয়ান মানস-চোরে,—
ফুলের শয়নে মগন শরীর
মগন গভীর ঘুমের ঘোরে।
নিরখিয়া ধনী কুসুম ধনুরে
লাগিলা ভাবিতে মনের মাঝে,—
"এই পোড়া ধনু বড় বিষময়,
নিয়ত নিরত নিঠুর কাজে।
এই ধনু তরে কত অভিশাপ
নবনারীগণ নাথেরে দেয়;
সে সব শ্রবণে শুনি' দিবানিশি
কেমনে রতির পরাণে সয়?
অবোধ বিধাতা বড়ই নিঠুর,
দিলা হেন ভার প্রাণেশ' পরে',—
দিবস যামিনী হেন আলাতন
হেন বা সহিব কিসের তরে?
বিলাস-সরস হেন মধুমাসে
কভু না লভিনু সুখের স্বাদ;
বাসনা-অনল জ্বলিছে কেবলি,—
একি রে বিধির বিষম বাদ!
হেথো শচীসতী লয়ে দেবরাজে
মগন সদাই রভস সুখে,
কমলার সনে কমলা-বিলাসী
বিহরে সতত হসিত মুখে।
যত সুরনারী মনের হরষে
বাঁধা চিরবাঁধে প্রণয়ী সনে;
আমি রে দুখিনী বিধির বিধানে
বিহীনা কেবলি প্রাণের ধনে!
না জানি হে বিধি, রতি অভাগিনী
পদে তব কিবা করেছে দোষ!
সবাই সুখিনী এ সুখ-স্বরগে,
মোর প্রতি তব কেবলি রোষ!
না দিব প্রাণেশে থাকিতে জীবন
সাধিতে তোমার নিঠুর কাজ;—
বিষের সদন এ পোড়া ধনুরে
এখনি অতলে ফেলিব আজ।
বাঁচিবে যুবক বাঁচিবে যুবতী,
বাঁচিবে জগতে পরাণী যত;
আমোদ আলসে থাকিবে সদাই
হাসিবে খেলিবে মনের মত।"

(৬)

এত বলি' ধনী নব রোষভরে
যেমনি ধরিলা ধনুকখান,

হায় রে! আপনি নিঠুর নীরবে
ছুটিল বিষম কুসুম বাণ!
সে বাণ-আঘাতে হ'য়ে অচেতন
রতি পড়ে রতি পতির গায়;
চমকিয়া কাম চকিতে চাহিলা,—
"কি হ'ল সহসা?" সুধিলা তায়।
বুঝিয়া তখন কি আবেশ-বশে
প্রেয়সী সতীর এরূপ গতি,
হরষে মদন হাসি মনে মনে
হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলা অতি।
কুসুম-কোমল কামের পরশে
ক্রমশঃ সতীর চেতনা হয়;
মিলিলা উভয়ে প্রেমের মিলনে
রতি-চিত রোষ পাইল লয়।

(৭)

নব লাজভরে মদন-লালসা
নীরবে ঢুমিলা বদনখানি;
নীরবে হাসিয়া ধনু দেখাইলা
হেলায়ে সুনাল মৃণাল-পাণি।
বুঝিয়া মদন মুচকি হাসিয়া
তুলিয়া ধনুরে লইলা করে;
নিরখিয়া রতি হাসিয়া কহিলা,—
"ও আলা আবার কিসের তরে?"
বেড়িয়া উভয়ে উভয় গ্রীবায়
প্রাসাদে তখন পশিলা আসি;
হেন অঘটন করিয়া স্মরণ
হাসিলা কতই মধুর হাসি!
কবি কহে হাসি, "কাম-বিলাসিনী!
ফুলধনু মনে ক'রোনা ছল;
কে জানে কখন টুটি প্রাণমন
ছুটিবে আবার বিষম কল!"

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

দার্শনিক মতভেদ। (৭)

এক্ষণে আমরা বেদান্তীর সৃষ্টিবাদে উপনীত হইলাম। পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রুতি পরমব্রহ্মতত্ত্বকে একদা নির্গুণ (Non-Relative) এবং সগুণ Relative) বলাতে কোন দোষ বা বাধ সম্ভবে নাই। যাহা বাধ বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির দোষ।• যাহা অচিন্ত্য ও তর্কাতীত, তাহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত এবং তর্কারূঢ় করিতে গেলেই অসঙ্গত বোধ হইবে। যাহা নির্গুণ, তাহাকে কার্য্য-কারণাত্মক গুণবিশিষ্ট পদার্থের ন্যায় ভাবিতে গেলেই বাধ (Contradiction) উপস্থিত হইবে। যে সগুণ মানসিক জ্ঞান নিজেই অসম্পূর্ণ ও দুষ্ট, সেই মানসিক জ্ঞানে সুতরাং সম্পূর্ণ নির্গুণ আত্মার সগুণত্ব দোষাই বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু যে পরমার্থজ্ঞানে সগুণত্বই কল্পিত, সেই পরমার্থজ্ঞানে আত্মা কল্পিত গুণ বর্জ্জিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ বা কেবলভাবে বিশুদ্ধ নির্গুণ বলিয়াই সাক্ষাৎকৃত হন।

যাহা কেবল নির্গুণ, তাহা আমাদের সামান্য জ্ঞানে নিষ্ক্রিয়; কারণ, যাহা গুণবিশিষ্ট, তাহাই ক্রিয়াশীল। সৃষ্টি বলিলেই ক্রিয়া বুঝায়। ক্রিয়া না ঘটিলে সৃষ্টি হয় না। সুতরাং অদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্মবাদে সৃষ্টিবাদ অসঙ্গত হয়। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর তাই বলিলেন:—

"ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ; অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ ব্যবহার গোচরত্বাৎ, ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদন পরত্বাচ্চেত্যেতদপি ন বিস্মর্তব্যম্।"

মনে করিও না যে, সৃষ্টিশ্রুতি সকল পরমার্থ-বিষয়িনী। মনে করিও না যে, শ্রুতি যে সৃষ্টি বলিয়াছেন সেই সৃষ্টি সত্য। তবে

সৃষ্টি কাহাকে বলে? অবিদ্যার দ্বারাই নাম-রূপযোগ্য কল্পনা প্রাদুর্ভূত হওয়াকে সৃষ্টি বলে। সুতরাং অপরমার্থ জ্ঞানেই সৃষ্টি কল্পিত হয়। তাই যদি হয়, তবে শ্রুতিতে নানা সৃষ্টিবাদ ও সৃষ্টিবাক্য দৃষ্ট হয় কেন? তাহার কারণ এই, যাহারা অপরমার্থজ্ঞানী তাহাদিগকে পরমার্থজ্ঞানে লইয়া যাইবার জন্যই শ্রুতি সৃষ্টিবাক্য সমূহ বিন্যাস করিয়াছেন। শঙ্কর বলিতেছেন, একথা যেন বিস্মৃত হইও না, তোমার যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে, সগুণ ও সক্রিয় সৃষ্টিবাদ হইতে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবাদ প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টিশ্রুতি সমূহের অভিপ্রেত।

তবেই আচার্য্যের কথায় দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈতবাদে সৃষ্টিকল্পনা সম্ভাবিত নহে। তাহাতে কেবল ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই। তিনি নিত্যকাল বর্ত্তমান,—নিজ স্বরূপে ও নির্গুণ ভাবে বিদ্যমান। আমাদের মানসিক জ্ঞানে জগৎ ব্যাপারে যে অনন্ত কার্য্যকারণ প্রবাহ দেখিতেছি, এ তবে কি? এই কার্য্যকারণ প্রবাহ, রূপ ও নামধারী হইয়া কালস্রোতে যাহা জগৎসংসাররূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহা তবে কি? তাহা অনন্ত পরিবর্ত্তন প্রবাহ, তাহা কেবল আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রবাহ। নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন নিত্য বিদ্যমান, এই পরিবর্ত্তন প্রবাহ তেমনি অনিত্য ও নিত্য অবিদ্যমান। যাহা নিত্য অবিদ্যমান, সেই অবিদ্যমানতার প্রবাহের নিত্যতা উপলব্ধি হইতেছে বলিয়া সেই ক্রিয়াশীল সগুণত্বকেও সত্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। কিন্তু তাহা বাস্তবিক সত্য নহে, তাহা অলীক। তাহা চিরকালই অবিদ্যা; তাহা আজ একরূপ, কাল অন্যরূপ। যাহা চিরকালই অবিদ্যা, তাহারই জ্ঞানের নাম অবিদ্যা বা মায়া। আর যাহা চিরকালই বিদ্যমান, তাহারই জ্ঞানের নাম বিদ্যা। এই অবিদ্যার সৃষ্টিজাল কেন? জীবকে প্রকৃত বিদ্যাতে লইয়া যাইবার জন্যই অবিদ্যার সৃষ্টি-জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। এই চির অবিদ্যা সংসার স্রোত নিত্য বিদ্যমানকে প্রতিপন্ন করিতেছে। তাই আচার্য্য বলিলেন, ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টিবাক্য সমূহের উদ্দেশ্য। তাহ যদি হয়, তবে ত সৃষ্টিবাদ সমূহ ব্রহ্মোপাসনা। সৃষ্টিবাদ সমূহ যখন ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদক, তখন সকল সৃষ্টিবাদই ব্রহ্মোপাসনা। কারণ, ব্রহ্মোপাসনা দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

ব্রহ্মজ্ঞানে লইয়া যাইবার জন্য যদি সৃষ্টি-বাদ হয়, তবে তাহা কাহাদের জন্য? যাহারা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন, যাহাদের মনে জগতের কেবল কার্য্য কারণাত্মক ভিন্ন অন্য জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় না, প্রকৃত নিত্য বস্তুজ্ঞান যাহাদের জন্মে নাই, তাহাদের নিমিত্তই সৃষ্টিবাদ। অজ্ঞানীকে প্রকৃত বস্তুজ্ঞানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যদি সৃষ্টিবাদের জল্পনা হয়, তবে সেই সৃষ্টিবাদের অধিকারী অজ্ঞানী জীব, এবং তাহার আলোচ্য বিষয় এই জগৎ সংসারের প্রকৃত কার্য্যকারণ-প্রবাহ। কি প্রকারে জগৎ এই স্থূলরূপে আসিয়া পরিদৃশ্যমান হইতেছে, অজ্ঞানীকে তাহারই প্রকৃত তত্ত্ব খ্যাপন করা সৃষ্টিবাদের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্ব যদি জগতোৎপত্তির প্রকৃত রহস্য-জ্ঞান না দিতে পারে, তবে তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইবে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানে লইয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং এই সৃষ্টিবাদ প্রকৃত কার্য্য কারণাত্মক বিজ্ঞান সম্মত হওয়া চাই। বিজ্ঞান সম্মত বলিয়াই তাহা সাংখ্য তত্ত্বজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টিবাদের অধিকার বেদ্য—The Knowable, এবং

সেই Knowable এর নিগূঢ় রহস্য জ্ঞানই সৃষ্টিবাদ ও তত্ত্বজ্ঞান। এজন্য বৈদিক সৃষ্টি-বাদ মাত্রই বিজ্ঞান (Science) সম্মত। যাহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে, বেদে তাহার স্থান নাই। কারণ তাহা সম্মতরূপে গৃহীত হইতে পারেনা।

এক্ষণে কথা এই যে, শ্রুতিতে ত অনেক প্রকার সৃষ্টিবাক্য আছে; তাহারা যদি সকলই বিজ্ঞান-সম্মত হয়, তবে নানাবিধ বাক্য হইল কেন? বেদান্ত-দর্শন সেই বৈদিক সৃষ্টিবাক্য সমূহেরই সমন্বয় সাধন করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহারা সকলেই একই বিজ্ঞান-সম্মত, সকলই জগৎ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা; কেবল বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন আকারে বিন্যস্ত হইয়াছে। কোন অধিকারীর নিমিত্ত কিয়দংশ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, অপরের নিমিত্ত অপরাংশ। কি ছান্দোগ্য, কি তিত্তিরীয়, কি আরণ্যক, কি ঐতরেয়, কি শ্বেতাশ্বতর, সমুদায় শ্রুতিতে একই সৃষ্টিবাদ বর্ণিত হইয়াছে। এক শ্রুতি যে ভাগ হইতে সৃষ্টিবাদ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অন্য শ্রুতি হয়ত তাহার পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন; নহিলে কোন শ্রুতিতে অবৈজ্ঞানিক কোন কথাই নাই। তদ্রূপ নৈয়ায়িক যে স্থল হইতে সৃষ্টিবাদ বুঝাইয়াছেন, সাংখ্য তৎপূর্ব্বে গিয়াছেন। বেদান্ত কোথা হইতে সৃষ্টিবাদ গ্রহণ করিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এই প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইবে।

নির্গুণ, সগুণে পরিণত না হইলে সৃষ্টি সম্ভবে না। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি নির্গুণ, সগুণে পরিণত হইয়াও স্বরূপে বিদ্যমান থাকেন। কেবল একপাদেই সেই নির্গুণ সগুণে পরিণত হইয়া জগৎরূপে পরিদৃশ্যমান হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন :—

"যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ॥

"যেমন ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) স্বীয় শরীরস্থ তন্তু বাহির করিয়া আপনাকে আচ্ছাদন করে, তেমনি পরম পুরুষ পরমেশ্বর স্বীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা সর্ব্বত্র গুপ্তভাবে রহিয়াছেন।"

মুণ্ডকেও সেই কথা :—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

"ঊর্ণনাভ যেমন স্বশরীর হইতে তন্তু বাহির করে এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশলোম উৎপন্ন হয়, তেমনি অক্ষর হইতে সমুদায় বিশ্ব পরিণাম-প্রাপ্ত বা ব্যক্ত হইয়াছে।"

এই বেদান্তবাক্যে প্রতীত যে, ব্রহ্মসত্ত্ব হইতে এই বিশ্বের বিকাশ; কিরূপ বিকাশ? যেমন ঊর্ণনাভদেহ হইতে তন্তুর বিকাশ; যেমন বৃক্ষ হইতে ফলের বিকাশ, যেমন কুসুম-কলি হইতে প্রস্ফুটিত কুসুমের বিকাশ, যেমন প্রস্ফুটিত মুকুল হইতে ফলের বিকাশ; যেমন দেহ হইতে কেশ লোমাদির বিকাশ। যেমন আমাদের সামান্য জ্ঞানে এই সমস্তের বিকাশ, তেমনি এই স্থূল পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, এক সূক্ষ্ম বিশ্বের বিকাশ, তেমনি সেই সূক্ষ্ম বিশ্ব ব্রহ্ম-সত্ত্বের বিকাশ। সূক্ষ্ম বিশ্ব ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত বা ব্যকৃতি, এবং সূক্ষ্ম বিশ্ব বা অব্যক্তের বিকাশই ব্যক্ত জগৎ।

এই স্থূল শরীরী ব্যক্ত জগৎ যে সূক্ষ্ম শরীরী অব্যক্তের বিকাশ হইবে, একথা সম্ভা-বিত। কিন্তু যিনি অশরীর, নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে সূক্ষ্ম শরীরী অব্যক্তের বিকাশ হইবে কিরূপে?

তবে কথা এই, সূক্ষ্ম শরীর কি? এই সূক্ষ্ম শরীর শক্তিময় শরীর। যদি শক্তি কি বুঝিতে পারিতাম, তবে বলিতে পারিতাম, শক্তির বিকাশ নির্গুণ সত্ত্ব হইতে সম্ভাবিত

নহে। কিন্তু সামান্য জ্ঞানে যখন বস্তুতত্ত্ব সম্ভাবিত নহে, তখন এমত কথা বলিবার যো নাই যে, শক্তি যে বস্তু, ব্রহ্মসত্ত্ব সে বস্তু নহে। সত্ত্ব পদার্থ যে এক, তাহার যুক্তি পূর্ব্বপ্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্ত্বপদার্থ যদি এক হয় এবং সূক্ষ্মশরীরী শক্তি যদি সত্ত্ব হয়, তবে যে তাহারা একই বস্তু, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

যাঁহরা জড়বাদী, তাঁহাদেরও মতে জড় আর কিছুই নহে, তাহা শক্তিরই রূপ। হার্বার্ট স্পেন্সারের উক্তি এই :—

"Matter and Motion, as we know them, are differently conditioned manifestations of Force."—First Principles, page 169.

অন্যত্র :—

"Whence it becomes manifest that our experience of *force*, is that out of which the idea of Matter is built. Matter, as opposing our muscular energies, being immediately present to consciousness in terms of force ; and its occupancy of Space being known by an abstract of experiences originally given in terms of force ; it follows that forces, standing in certain correlations, form the whole content of our idea of Matter."

Ibid. page 167.

জড় যে শক্তিরই বিকাশ, তাহা প্রথম উদ্ধৃত বাক্যে উক্ত হইয়াছে। যে যুক্তি দ্বারা স্পেন্সার তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা দ্বিতীয় বাক্যে প্রদত্ত হইয়াছে। তবেই জড়বাদী বলিলেন, জড় কি, না শক্তি ; কিন্তু শক্তি কি, তাহা আমি জানি না। স্পেন্সারের উক্তি এই :—

Supposing him (the man of Science) in every case able to resolve the appearances, properties, and movements of things into manifestations of Force in Space and Time ; he still finds that Force, Space and Time pass all understanding."—

Ibid page 66.

সুতরাং সামান্য জ্ঞানে বস্তুতত্ত্ব কিছুরই জানিবার যো নাই। তাই যদি হয়, তবে কিরূপে বলিতে পারি, শক্তি ব্রহ্মসত্ত্বেরই বিকাশ নহে? এ সম্বন্ধে স্পেন্সার কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"Force as we know it, can be regarded only as a certain Conditioned effect of the Unconditioned Cause—as the relative reality indicating to us an Absolute Reality by which it is immediately produced."

First Principles, page 170.

স্পেন্সারও বলেন যে, এই শক্তি সেই নির্গুণ সত্তারই সাক্ষাৎ বিকাশ। কিরূপে শক্তি তাঁহাকে প্রকাশ করিতেছে তাহারও যুক্তি দিয়া শেষ এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

"We have seen how, from the very necessity of thinking in relations, it follows that the Relative is *inconceivable*, except as related to a real Non-Relative. We have seen that unless a real Non-Relative or Absolute be postulated, the Relative itself becomes Absolute ; and so brings the argument to a contradiction."

তবে স্পেন্সারও বলিলেন, শক্তিকে সগুণা বলিলেও যখন কিছুই বুঝা গেল না, তখন সেই সগুণ যে নির্গুণেরই বিকাশ নহে, একথা যুক্তিসঙ্গত না হয় কেন? যদি বল, যুক্তিসঙ্গত নহে, তবে হয় বল, যে সগুণ, নির্গুণ কিছুই নাই, না হয়, সেই শব্দদ্বয় পরস্পর বিরোধী। তাহা হইলে, হয় সগুণই নির্গুণ হইয়া দাঁড়াইতেছে, না হয় তোমার যুক্তিই বিরোধিনী।

এজন্য বেদান্ত বলিয়াছেন, সগুণ-ভেদ মায়া ও কল্পিত জ্ঞান মাত্র। ব্রহ্মের এই মায়া বিস্তার কিসের জন্য? ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য। তবেই দেখা যাইতেছে, বেদান্ত সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া যে ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন, এই বিশ্বসৃষ্টি ঊর্ণনাভের তন্তু সৃষ্টিবৎ, একথা অতি পরিষ্কার ও যুক্তি-সঙ্গত কথা। বুঝা গেল সগুণসত্ত্ব নির্গুণেরই বিবর্ত্ত মাত্র। এক্ষণে কথা এই, সেই নির্গুণ সত্ত্ব কিপ্রকার? তাহা কি অচেতন জড়-সত্ত্ব? যখন জড়ই কিছুই নাই, জড়ই যখন শক্তিরই মূর্ত্তি, তখন

সেই শক্তি জড় নহে, তাহা চিৎ শক্তি। নির্গুণ নিজে যখন চিৎ, তখন তাহার প্রকৃতিও যাহা, তাহাও চিৎ। নির্গুণ নিজে যখন আনন্দময় চিৎ, তখন সগুণও সেই আনন্দময় চিতেরই বিকাশ। সুতরাং যে ব্রহ্ম সগুণরূপে সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্পন্ন, তিনি সেই নির্গুণ সচ্চিদানন্দেরই সূক্ষ্মরূপ বা বিকাশ মাত্র। অতএব সেই সচ্চিদানন্দের সূক্ষ্ম মূর্ত্তিমান সগুণ ব্রহ্ম জ্ঞানময় ঈশ্বর—জ্ঞান যাঁহার আত্মা এবং জ্ঞান যাঁহার সমস্ত সূক্ষ্ম শরীর, ঐশ্বর্য্য ও রূপ। সেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কর্ত্তা :—

ঈশ্বর জ্ঞানময়।

এই জ্ঞানময় ঈশ্বর হইতে জগতের বিকাশ হইল কি রূপে এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন,—"হে শ্বেতকেতো এই জগৎ পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ ছিল।" এইরূপে সৃষ্টিবাদ আরম্ভ করিয়া পরে বলিলেন:—

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।"

"সেই অদ্বিতীয় সৎ ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব বা নামরূপে ব্যক্ত হইব।"

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, যিনি সদ্‌বস্তু, তিনি চিদানন্দস্বরূপ, এ জগতে যদি কিছু বস্তু থাকে, তাহা চিৎপদার্থ; অচিৎ জড়, শক্তির বিকাশ; শক্তি পদার্থই প্রকৃত বস্তু। সেই শক্তিপদার্থ চিতেরই বিকাশ। সুতরাং চিৎই প্রকৃত বস্তু। তাই যদি হয়, তবে আমাদের চিদ্‌জ্ঞান কিরূপ? যাহা চিৎশক্তি, তাহা কখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। স্বধর্ম্ম বা স্বভাব বশতঃ তাহা নিয়তই সচেষ্ট। চেষ্টা না থাকিলে সেই চিন্ময় পুরুষ আনন্দস্বরূপ হইতে পারেন না। কারণ, আনন্দ চেষ্টা বা আলোচনা-সম্ভূত। যাহা জ্ঞানময় চিদ্‌শক্তি, সেই চিদাত্মার আলোচনাও চিন্ময়। জ্ঞানই তাঁহার আলোচনা। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে।"—মুণ্ডক।

যিনি সামান্যতঃ সকলই জানিয়া সর্ব্বজ্ঞ, এবং সকলই বিশেষরূপে জানিয়া সর্ব্ববিৎ, তাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সেই তপস্যাপ্রভাবে নামরূপ ও অন্নময় জগতের বিকাশ হইয়াছে।

এক্ষণে কথা এই, যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাঁহার সেই জ্ঞানের বিষয় কি? আবার সৃষ্টিতত্ত্বের সেই সাধারণ নিয়ম। যেমন উর্ণনাভ স্বশরীর হইতে তন্তু বাহির করিয়া জালের সৃষ্টি করে, তদ্রূপ চিন্ময় ব্রহ্ম স্বশক্তিরই আলোচনা করিলেন। সেই শক্তিই তাঁহার অব্যক্ত শরীর। সেই অব্যক্ত হইতে বহুবিধ নাম ও রূপের বিকাশ হইল। যাহা পূর্ব্বে অব্যক্তাবস্থায় ছিল, তাহা আলোচনা প্রভাবে নানা নাম ধারণ করিল; নানা নামধারী হইয়া নানারূপে ব্যক্ত হইল। তিনি ঈক্ষণ করিলেন কি? সেই অব্যক্তই তাঁহার দৃষ্টি ও আলোচনার বিষয় হইল। সেই অব্যক্তই সৃষ্টি-বীজ ও পরমেশ্বরের মায়ারূপ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল :—

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।"
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ব্রহ্মানন্দবল্লী। ৭ম অনুবাক।১।

অসৎই জগৎ বিকাশের পূর্ব্বে ছিল। সেই অসৎ হইতে এই পরিদৃশ্যমান সৎ-জগতের সমুদ্ভব। কিরূপে সমুদ্ভব? আত্মা আপনি আপনাকে সৃজন করিলেন। কিরূপে আপনি আপনাকে সৃজন করিলেন? যেমন উর্ণনাভ তন্তুর সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টি স্বদেহ হইতেই সমুদ্ভূত হইল। তিনি নিজেই নিজের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হইলেন। সেই অসৎই

অব্যক্ত সৃষ্টিবীজ,—প্রকৃতি—মায়া—জগতের উপাদান কারণ। এই অসৎ কোথায় ছিল? ব্রহ্মসত্ত্বেই নিহিত ছিল। কতকাল নিহিত? অনাদিকাল নিহিত। যতকাল সেই সচ্চিদানন্দ বিদ্যমান।

কি সাংখ্য, কি বেদান্ত, উভয়ই বলেন, এই অব্যক্তই জগতোৎপত্তির কারণ এবং অনাদি। বেদান্তী বলেন, এই অব্যক্ত মায়াময়, যেহেতু তাহা নিয়তই পরিণাম-প্রাপ্ত হইতেছে। তাহা ব্রহ্মেরই সূক্ষ্মরূপ। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কি স্থির হইয়াছে, তাহা হার্বার্ট স্পেন্সার বলিতেছেন :—

"Alike in the external and internal worlds, the man of science sees himself in the midst of perpetual changes of which he can discover neither the beginning nor the end. If, tracing back the evolution of things, he allows himself to entertain the hypothesis that the universe once existed in a diffused form, he finds it utterly impossible to conceive how this came to be so; and equally, if he speculates on the future, he can assign no limit to the grand succession of phenomena ever unfolding themselves before him. In like manner, if he looks inward, he perceives that both ends of the thread of consciousness are beyond his grasp; nay even beyond his power to think of as having existed or as existing in time to come."

First Principles, page 66

এই অব্যক্ত হইতেই যে ব্যক্ত জগতের বিকাশ, তাহা বেদান্ত বলিয়াছেন, সাংখ্যও বলিয়াছেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানেও স্থির হইয়াছে :—

"An entire history of anything must include its appearance out of the imperceptible and its disappearance into the imperceptible. Be it a single object or the whole universe, any account which begins with it in a concrete form, is incomplete; since there remains an era of its knowable existence undescribed and unexplained."

অন্যত্র :—

"While the general history of every aggregate is definable as a change from a diffused imperceptible state to a concentrated perceptible state and again to a diffused imperceptible stare; every detail of the history is definable as a part of either the one change or the other."

H. Spencer—First Principles.

এই অব্যক্ত নিয়ত পরিণামী বলিয়া বেদান্ত তাহাকে মায়া বলেন। এই পরিণাম-প্রবাহ নিত্য বলিয়া সাংখ্য তাহাকে সৎ বলেন। হার্বার্ট স্পেন্সার কি বলিতেছেন দেখুন :—

"Hence there may be drawn these conclusions—First, that we have an indefinite consciousness of an absolute reality transcending relations, which is produced by the absolute persistence in us of something which survives all changes of relation. Second, that we have a definite consciousness of relative reality, which unceasingly persists in us under one or other of its forms; * * * * and that the relative reality, being thus continuously persistent in us, is as real to us as would be the absolute reality could it be immediately known."

First Principles—page 161

তবেই দেখা যাইতেছে, বেদান্ত যে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের বিকাশ বলেন, তাহা বিজ্ঞান-সম্মত। চিন্ময়ের শক্তি ত্রিবৃৎ—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া। সেই জ্ঞান হেতু নামের সম্ভব এবং ইচ্ছা ও ক্রিয়া হেতু রূপের উৎপত্তি। জ্ঞান যে নামের সৃষ্টি করে, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সেই নামকে আকারিত করিয়া রূপের সৃষ্টি করে। অথচ সেই নাম ও রূপ এক সঙ্গেই সমুৎপন্ন। চিৎশক্তি নিত্যসক্রিয় হইয়া নিত্য নাম ও রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। মোক্ষমূলর এই নামরূপ সম্বন্ধে বলেন :—

"Brahma was before the creation of the world (ব্যক্ত জগৎ) and had always something to think upon. What is this something? The Vedanta answers—Names and Forms. * * * As thought by Brahma before the creation of the world, these name-forms were non-manifest (অব্যাকৃত). In the created world they were manifest (ব্যাকৃত) and many.'

The Vedanta Philosophy.

এই অব্যাকৃত নাম রূপ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? বেদান্ত বলেন, এই জগৎ অসতেরই বিকাশ। যাহা কঠশ্রুতিতে অব্যক্ত

বলিয়া অভিহিত, তাহাই তিত্তিরীয় শ্রুতির অসৎ। এই 'অসৎ কোথায় ও কি অবস্থায় ছিল? তিত্তিরীয় উপনিষৎ আবার বলিয়াছেন:—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

ব্রহ্ম যে কেবল সৎস্বরূপ হইয়া সত্যস্বরূপ (The Absolute Reality) হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। সেই সত্ত্ব কিরূপ? না, চিন্ময় সত্ত্ব। সেই চিন্ময় সত্ত্বই জ্ঞঃ স্বরূপ হইয়া সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ। এই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগৎসৃষ্টির মূলকারণ (First Cause)। তাঁহার উপাদান কি?—অব্যক্ত, মায়া, প্রকৃতি। এ সমস্ত কথাই পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিলেন, যিনি সত্ত্বস্বরূপ তিনিই জ্ঞানস্বরূপ। শুধু কি জ্ঞানস্বরূপ? যাহা চিৎ তাহা অনন্ত। যাহা সৎ, তাহা অনন্ত, নহিলে তাহার সত্ত্বস্বরূপে দোষ পড়ে। সত্ত্ব যদি অনন্ত না হয়, তবে তাহা সত্ত্ব হইল না। সত্ত্বের সীমা থাকিলে, সেই সীমার পরে কি আছে, তাহা অবশ্য সত্ত্ব হইবে। আবার তাহার পরে যাহা আছে, তাহাও সত্ত্ব। সুতরাং সত্ত্বের অনন্ত পারম্পার্য্য ঘটিয়া একীভূত অনন্ত সত্ত্বই হইয়া পড়ে। যদি বল, সত্ত্বের কোন সীমার পর আর সত্ত্ব নাই; একান্ত অভাব যদি সত্ত্ব হয়, তবেই তাহা থাকিতে পারে, যদি না হয়, তবে তাহা থাকিতে পারে না। অতএব অত্যন্ত অভাবের অস্তিত্ব নাই, সুতরাং অত্যন্ত অভাব থাকিতে পারে না। অত্যন্ত অভাব যদি সত্তা হয়, তবে তাহা কেবল সতের সঙ্গে একীভূত হইয়াছে। অতএব, যাহা সত্ত্বস্বরূপ ও কেবল-সৎ, তাহার সীমা থাকিতে পারে না। যাহার সীমা নাই, তাহাই অনন্ত। এজন্য বেদান্তবাক্যে যিনি চিন্ময় জ্ঞানসত্ত্ব, তিনি অনন্ত। আমাদের সামান্য জ্ঞানে এইরূপে ব্রহ্মের জ্ঞান হয় বলিয়া বেদান্ত তাহাকে অগ্রে বলিয়াছেন সত্যং, পরে বলিলেন জ্ঞানং, তৎপরে বলিলেন অনন্তং।

যাহা জ্ঞঃ স্বরূপ ও চিৎসত্ত্ব তাহা তবে অনন্ত। অব্যক্তচিৎ অনন্ত। অনন্ত হইয়া অনাদি কাল এবং অনন্ত দেশ-ব্যাপ্ত। যাহা অনন্ত দেশ-কাল-ব্যাপ্ত তাহাই মহান্। সাংখ্যের অব্যক্ত প্রধান এইরূপ মহত্তত্ত্বে পরিণত। যাহা মহান্ চিৎসত্ত্ব, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। সাংখ্যের অনন্ত ও দেশকালব্যাপ্ত মহত্তত্ত্ব এজন্য অব্যক্তের সত্ত্বস্বরূপ। যাহা অনন্ত সত্ত্ব তাহা অনন্ত মূর্ত্তি বা রূপের বীজ স্বরূপ। যাহা অনন্ত চিৎসত্ত্ব তাহা অনন্ত নামেরও বীজ স্বরূপ। এই মহত্তত্ত্বই বেদান্তের হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ কি? যাহাতে সমুদায় রূপ ও নামের লয় হয়, সেই গর্ভই হিরণ্যগর্ভ। আর যে বীজের সম্প্রসরণে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি, তাহাই বিরাট। বেদান্তসার বলেন, এই মহত্তত্ত্বই একদা হিরণ্যগর্ভ রূপ মহা লয়স্থান, আবার ব্রহ্মাণ্ডের মহান্ আবির্ভাব স্থান। যিনি এইরূপে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, তিনিই বিরাটপুরুষ। অনন্ত-সত্তাই হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষ। তাহাই সমস্ত নামরূপের আধার। সেই মায়াময় অব্যক্তের সত্ত্বগুণ প্রধান মহান্, অনন্ত ও সমষ্টি-শরীর। এই শরীরই চৈতন্যের শক্তিময় উপাধি। উপাধি কি? যাহা সমীপস্থ থাকিয়া আপনার গুণ বস্তুতে আরোপ করে তাহাই উপাধি। এই সত্ত্ব-উপহিত চৈতন্যকে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান বলা যায়। এই সমষ্টি অজ্ঞান বা মায়া-উপহিত চৈতন্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, অব্যক্ত (সর্ব্বকার্য্যের বীজ) অন্তর্যামী, জগৎকারণ এবং ঈশ্বর প্রভৃতি নাম দ্বারা অভিহিত হন।

"ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা। এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বং গুণকং সদসদব্যক্তমন্তর্যামিজগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে।" বেদান্তসার। ১৩।

শ্রুতির "সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম" কি, তাহা এক্ষণে বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতেছে। ব্রহ্ম এইরূপেই বিদ্যমান। সাংখ্যের সহিত বেদান্তের প্রধান বিভিন্নতা এই যে, বেদান্ত কেবল সৎ, নিত্যবস্তু, নির্গুণ ব্রহ্মপদ হইতে জগৎ ও জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব দেখিয়াছেন, তাই তাহার নিকট অনন্ত ও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগৎ মায়াময় প্রহেলিকারূপে প্রতীয়মান হইয়াছে, সাংখ্য এই জগতের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল সত্তাভূমিতে দাঁড়াইয়া সেই নির্গুণ ব্রহ্মসত্ত্বকে দেখিয়াছেন। সাংখ্য তাই সেই নির্গুণ ও নির্লেপ সত্ত্বকে একদিকে রাখিয়া শুদ্ধ প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাই তিনি সগুণ ঈশ্বরতত্ত্বকে এক পার্শ্বে রাখিয়া কেবল প্রকৃতির পরিণামতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তীও সেই প্রকৃতির বিকার সমূহ গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির প্রতি পরিণামে ব্রহ্মকে দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার নিকট সেই ব্রহ্ম এক মাত্র কারণরূপেই বর্ত্তমান। কার্য্য ও বিকার সমস্ত সেই কারণেরই ব্যাকরণ বা ব্যাকৃতি মাত্র। যাহা কারণে লীনাবস্থায় সূক্ষ্মরূপে ছিল, বিকারাবস্থায় তাহার স্থূল বিকাশ মাত্র। সকল বিকারই সেই অদ্বৈত ব্রহ্মের রূপ বা বিবর্ত্ত—modes of the unconditioned Being। সাংখ্য ও বেদান্তের অধিকার তাই বিভিন্ন হইয়াছে। কারণ, দুই জনে দুই বিভিন্ন ভূমিতে দাঁড়াইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

আমরা যে মহত্তত্ত্বকে বিবৃত করিলাম, সেই মহান্ অনন্তদেশকালকে হার্বার্ট স্পেন্সার Absolute space বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

"That which we know as Space being thus shown, alike by its genesis and definition to be purely relative, what are we to say of that which causes it? Is there an Absolute Space which relative Space in some sort represents? Is Space in itself a form or condition of absolute existence producing in our minds a corresponding form or condition of relative existence? These are unanswerable questions. Our conception of Space is produced by some mode of the Unknowable; and the complete unchangeableness of our conception of it simply implies a complete uniformity in the effects wrought by this mode of the Unknowable upon us."

First Principles. Page 165.

তবেই স্পেন্সারও বলিতেছেন, এই অনন্ত দেশকাল, পরব্রহ্মেরই রূপ; তিনি সেই রূপেই বর্ত্তমান। এই অনন্ত চিন্ময় সত্ত্ব স্বভাবতঃই সক্রিয়। কারণ, জ্ঞান ক্রিয়া ব্যতীত থাকিতে পারে না। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রীয়াশালিনী জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধিতত্ত্বের বহু হইবার ইচ্ছা নিবন্ধন অহংজ্ঞানের উদয় হয়। অহংজ্ঞান না হইলে সৃষ্টি বা ক্রিয়া হয় না। ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অহংজ্ঞানের সঞ্চার। এই অহংজ্ঞান সঞ্চারের সহিত আকাশের উৎপত্তি। যে অব্যক্ত অনন্ত বীজে সর্ব্ব রূপ ও নাম নিহিত ছিল, তাহা সর্ব্ব নাম রূপের নিষ্পাদক হইয়া মহান্ আকাশ নামে অভিহিত। এই আকাশ কোন নূতন পদার্থ নহে, তাহা অব্যক্ত অনন্তেরই সূক্ষ্ম রূপান্তর মাত্র। তিত্তিরীয় শ্রুতি বলিলেন :—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।

"সেই অনন্ত পরমাত্মা হইতে মূর্ত্তিমান পদার্থের অবকাশস্বরূপ সর্ব্ব নাম রূপের নির্ব্বাহক শব্দগুণপূর্ণ আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে।"

সেই মহত্তত্ত্ব রূপ Absolute space

হইতে এই সূক্ষ্ম সগুণ (Relative) আকাশ উৎপন্ন। এই আকাশই যে স্পেন্সারের Space তাহা আকাশবোধক "অবকাশ" শব্দের ব্যবহারে প্রতীত হয়। সর্ব্বস্থলেই এই "অবকাশ" শব্দ দ্বারা আকাশভাবের প্রকাশ হইয়াছে। সাংখ্যকার স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ।"

বিজ্ঞানাচার্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

"নিত্য যে দিক্ ও কাল, ইহারা আকাশ প্রকৃতিভূত প্রকৃতির গুণ বিশেষ; অতএব দিক্ ও কাল এই উভয় বিভু বলিয়া নিরূপিত হইল। "যাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য তাহাই বিভু"—শ্রুতিতে এইরূপ বিভু শব্দের অর্থ উক্ত আছে; সুতরাং উক্তরূপ বিভুত্ব বা সর্ব্বব্যাপকত্ব আকাশেও উৎপন্ন হইতেছে।"

বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন, আমাদের যে খণ্ড আকাশ ও কালজ্ঞান হয়, আমরা বলি ঘটাকাশ দশ বৎসর, দুই দিবস ইত্যাদি খণ্ড আকাশ ও কালজ্ঞান এই সামান্য সূক্ষ্ম আকাশ জ্ঞান হইতে উৎপন্ন, অথবা এই বিশিষ্ট খণ্ডজ্ঞান হইতে অবিশেষ আকাশজ্ঞানের অভ্যুগমের উৎপত্তি।

আমাদের আকাশজ্ঞান পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতা গুণেরই প্রকাশক, অতএব তাহা বিভুরই রূপ—a mode of the Conditioned Absolute. এইরূপে সগুণসূক্ষ্ম আকাশ বা আকাশ তন্মাত্র পরমেশ্বরেরই বিকাশক রূপে তাঁহা হইতেই সমুৎপন্ন। তাহা ব্রহ্মেরই লিঙ্গ স্বরূপ। তা এই ছান্দোগ্যে আকাশ শব্দ ব্রহ্মবাচক হইয়াছে। বেদান্ত দর্শন বলিয়াছেন—

"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।" ১।১।২২।

যে ব্রহ্মসত্তায় আকাশ পরিপূর্ণ, সেই সত্তা শব্দরূপের আধার বলিয়া শ্রুতিতে আছে :—

"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা।"

আকাশই নাম রূপের নির্ব্বাহক বা নির্ব্বাহকর্ত্তা। সর্ব্বনামরূপের কারণ হইয়া তাহা সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও লয়স্থান হইয়াছে। সুতরাং তাহা ঈশ্বরের কারণশরীর। সাংখ্য মতেও তাহা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। আকাশ যে ব্রহ্মসত্ত্বে পরিপূর্ণ, সেই নিত্যজ্ঞানসত্ত্ব নিয়তই সক্রিয়; সুতরাং সত্ত্বের ক্রিয়া জনিত অনন্ত আকাশ অনন্ত শব্দে পরিপূর্ণ। যেখানে ক্রিয়া সেই খানেই গতি (Motion) আছে। কারণ, ক্রিয়ার শব্দ হেতু কম্পন উৎপন্ন। কম্পনের প্রতিরূপই গতি। গতি হেতু স্পর্শ। সেই অনন্ত অব্যক্ত সক্রিয় হইয়া শব্দ ও স্পর্শ-পূর্ণ। তাহাতে একদা শব্দ স্পর্শ দুই আছে। যেখানে আকাশ (Space) আছে, সেইখানেই, সত্ত্বজ্ঞান ক্রিয়া জনিত শব্দ ও স্পর্শ দুই আছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"আকাশাদ্বায়ুঃ।"

এ কথার কিছু এমত তাৎপর্য্য নহে যে, বায়ু (Motion) (গতি) পূর্ব্বে ছিল না, আকাশ তাহার সমুৎপাদক। সমস্তই অব্যক্ত সত্ত্বে লীন ছিল; অব্যক্ত সত্ত্বের ক্রিয়া-হেতু কি কি জগৎকারণের বিকাশ হইয়াছে, তাহাই শ্রুতি একে একে বলিতেছেন। যেখানে শক্তি আছে, সেই খানেই গতি আছে। শক্তি যেমন অনন্ত, গতিও তেমনি অনন্ত। অনাদি কাল হইতে কম্পনের (গতির) কখন বিরাম হয় নাই। সংসার গতি চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। অব্যক্ত প্রকৃতিতে যাহা নিহিত অবস্থায় (Potential Energy) রূপে ছিল, তাহাই যখন সক্রিয় (Actual Energy) হইল

তখন অবশ্য গতি, বা কম্পন * বা স্পর্শের উৎপত্তি হইল। অনন্ত আকাশে অনন্ত সত্ত্বে এই গতির অবস্থান ও প্রবাহ। প্রতি প্রবাহে, প্রতি কম্পনে তালের (Rhythm) সম্ভব † তাল-ক্রমে যেমন এই কম্পনের প্রবাহ চলিয়াছে, অমনি নব নব রূপাবির্ভাবের কারণ হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"হে গৌতম, এই বায়ু সূত্র স্বরূপ। মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ সমস্ত ভূত বায়ু-সূত্রে গ্রথিত আছে।"

"বায়ু না বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি।"

বায়ুর এই গতিসূত্রে যে সর্ব্বজীব আশ্রিত রহিয়াছে, কঠশ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন :—

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।৬বল্লী।

"এই সমস্ত জগৎ-প্রাণ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত ও কম্পিত বা চেষ্টমান হইতেছে। সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক। সেইরূপে যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।"

এস্থলে ত্রেজিত শব্দের অর্থ কম্পিত। বেদান্ত দর্শন বলেন বায়ু-বিজ্ঞানের এই কম্পনাত্মক ব্রহ্ম অতি ভয়ানক। জগতের সমস্তই কম্পনে অবস্থিত! কি ভয়ানক! সেই ভয়ানকের ধ্যানে জীব গৌণভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অমৃত হন। কম্পন হইতে সেই কম্পনের আত্মা স্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধি হয় বলিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিলেন :—

"কম্পনাৎ।" — বেদান্ত দর্শন—১।৩।৩৯।

এই বায়ু বা কম্পন বা গতি হইতেই সমুদায় জীব পরিণাম প্রাপ্ত হন। হার্বার্ট স্পেন্সারও সেই কথা বলেন:—

"Absolute rest and permanence do not exist. Every objects, no less than the aggregate of all object, undergoes from instant to instant some alteration of state. Gradually or quickly it is receiving motion or losing motion; while some or all of its parts are simultaneously changing their relations to one another. And the question to be answered is—what dynamic principle, true of the metamorphosis as a whole and in its details, express these ever changing relations?"

পরের অধ্যায়ে একথার উত্তর দিয়াছেন। কথার উত্তর পরিণাম ও লয়—Evolution and Dissolution. এই বিশ্ববিসারী বায়ু বা কম্পনই পরিণাম ও লয়ের হেতু। পরিণাম ও লয় হইতেই সমস্ত জগৎ সততই আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। জগৎ সেই আবির্ভাব ও তিরোভাবের নিত্যপ্রতিমা। সেই আবির্ভাব ও তিরোভাব যে দেবতত্ত্ব হইতে সংঘটিত হইতেছে, তাহাই বেদের বায়ুদেবতা। যেমন আকাশের দেবতা ইন্দ্র ও ব্যোমকেশ, তেমনি সমস্ত জগতাবির্ভাব ও তিরোভাবের দেবতা বায়ু। এই বায়ু দেবতার ধ্যান অতি ভয়ানক। সেই মহারুদ্র বজ্রমুদ্যত দেবতার ধ্যান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া উঠেন :—

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
কঠ, ৫ব, ১০।

"যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানা বস্তুভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে তত্তদ্বস্তুরূপ হইয়াছেন এবং সমুদায় পদার্থের বাহিরে আছেন।"

এই বায়ু কিসের জনক? এই বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"বায়োরগ্নি।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

* এই বায়ু আত্মা হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম বায়ুর আত্মা। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, বায়ু-বিজ্ঞানই মোক্ষ হেতু। বেদান্ত দর্শনে "কম্পনাৎ" সূত্র দেখ।

† সঙ্গীত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, হরগৌরীর (প্রকৃতি পুরুষের) নৃত্য হইতে তালের উৎপত্তি। হার্বার্ট স্পেন্সারের The Rhythem and Motion দেখ।

বায়ু হইতে যে অগ্নির উৎপত্তি হয়, একথা বৈজ্ঞানিক মাত্রই জানেন। হার্বার্ট স্পেন্সার তদর্থে বলিতেছেন:—

"Conversely, Motion that is arrested produces, under different circumstances, heat, electricity, magnetism, light, * * * * we have abundant instances in which heat arises as motion ceases."

First Principles—page 198

বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি বটে, কিন্তু বায়ুর পূর্ব্বে কি অগ্নি ছিল না? বায়ু বল, অগ্নি বল, আকাশ বল, সমস্তই ছিল; সমস্তই সেই অব্যক্তে লীন ছিল, সৃষ্টিকালে কেবল তাহাদের বিকাশ হইল। যে প্রকার পরম্পরা-ক্রমে এই তন্মাত্র সকলের বিকাশ বা পরিণাম, শ্রুতিতে তাহাই কথিত হইয়াছে। বেদান্ত মতে, তাহারা সকলেই ব্রহ্মের উপাধি, শক্তি, বা মায়া-কল্পিত রূপ—যেরূপে নারায়ণ নারদকে বলিয়াছিলেন, হে নারদ, আমার এই মায়া কল্পিত রূপ, এই মায়ারূপ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কল্পিত—যাহাকে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও "Modes of the Unconditioned" বলিয়াছেন। এই অগ্নিই দেবতা; এই অগ্নিই সূর্য্য-দেব বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাকেই কঠ শ্রুতি বলিয়াছেন:—

লোকাদিমগ্নিং"

"যম নচিকেতাকে সমুদায় সৃষ্ট বস্তুর আদি স্বরূপ অগ্নির বিষয় বলিলেন।"

এই অগ্নি কিরূপে সৃষ্ট বস্তুর আদি স্বরূপ? আকাশ যে সত্বরূপে ওতঃপ্রোত, যে সত্বরূপ বায়ু দ্বারা * অবিরত সঞ্চালিত, তাহাতে সেই সঞ্চালন প্রক্রিয়া দ্বারা অগ্নির সম্ভব হইল। অগ্নি সেই সত্ত্ব সমুদায়কে সৃষ্টি-ব্যাপারে আনিলেন। আনিলেন কিরূপে? অগ্নি হইতে সত্ত্ব পদার্থের আণবিক বিয়োগ (Repulsion) এবং সম্প্রসারণ ঘটিল যেমন বিয়োগ দ্বারা সম্প্রসারণ ঘটিতেছে, অমনি যোগ (Attraction) দ্বারা সম্মিলন ঘটিতেছে। এই বিয়োগই বিরাগ এবং যোগই রাগ। এই বিয়োগ শক্তি যম নামেও অভিহিত। ** কোন কোন স্থলে এই রাগ ও বিরাগ প্রেম এবং দ্বেষরূপেও বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য বলিয়াছেন, এই রাগ ও বিরাগ হেতুই সৃষ্টি—"রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ।"

ছান্দোগ্যে আছে:—

"তদৈক্ষত তত্তেজোঽসৃজত।"

তিনি আলোচনা করিয়া তেজের সৃষ্টি করিলেন। নৈয়ায়িকদিগের পরমাণুবাদ সম্ভবতঃ এই শ্রুতি হইতে সমুদ্ভূত। এই পরমাণুর সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণে কেমন সৃষ্টি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বৈশেষিক দর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অগ্নিশক্তি হইতে নৈয়ায়িকদিগের অধিকার। সাংখ্য ও বেদান্ত তিত্তিরীয় শ্রুতি অবলম্বনে অগ্নি-পূর্ব্ব আকাশ ও বায়ু তন্মাত্রে গিয়াছেন। এই দুই শ্রুতির মীমাংসা বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে প্রদত্ত হইয়াছে।

বায়ু-বিচলিত ব্রহ্মাণ্ডপূর্ণ আকাশ যেমন নিত্যশব্দময় হইয়া নামের উৎপাদক হইয়াছে, সেই বায়ুৎপন্ন অগ্নিময় আকাশ তেজ দ্বারা তেমনি রূপময় হইয়াছে; যেহেতু অগ্নিই সকল রূপের নিদান। কারণ, অগ্নির ত্রিবিধ-রূপ—রক্ত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। অগ্নির যে রক্ত-রূপ তাহা তেজের, শুক্লরূপ জলের এবং কৃষ্ণরূপ অন্নের বা পৃথিবীর। এই তেজ

* বায়ু শব্দের নিরুক্তি এই:—"বায়ুর্বাতের্বেতের্বা স্যাদ্গতি কর্ম্মণঃ।"—যাহা সতত গতিশীল তাঁহাকে বায়ু বলে। নিরুক্তভাষ্য বলিয়াছেন:—"সততমসৌ যাতি গচ্ছতি।"

** এই বিয়োগশক্তি অগ্নি বা সূর্য্য হইতে উৎপন্ন, এজন্য যম সূর্য্যতনয়।

সূর্য্যে, বিদ্যুতে প্রকাশিত। এই ত্রিবৃৎ বর্ণ হইতে সকল বর্ণের উৎপত্তি। সকল বর্ণের উৎপত্তি দ্বারা জগৎ রূপময় হইয়াছে। শক্তি প্রভাবে অগ্নি আকাশসত্বকে বিয়োজিত করিয়া নিয়তই যেমন বহুসত্ব করিয়াছে, তেমনি সেই সত্ব সমূহকে রূপ দিয়াছে। বিয়োজন ও সম্প্রসারণ যদি অগ্নির কার্য্য হইল, তবে কোন্ কারণশক্তি আবার সেই বিয়োজিত সত্ব সমূহকে একত্রিত করিয়া এক একটী মূর্ত্তি গড়িয়াছে? সে শক্তি জলের। জলই নারায়ণ। নারায়ণ শ্বেতবর্ণ বিষ্ণুরূপী হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অগ্নি বলদেব, জল নারায়ণ। অগ্নি বিয়োগ শক্তি দ্বারা যেমন বিভাগ করিয়া দিতেছেন, জল যোগ (Attraction) শক্তিদ্বারা একত্রিত করিয়া অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চিরদিনই করিতেছেন। তাঁহারা নিত্য দেবতা। নারায়ণ রসরূপী হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তরূপে অনন্ত বিশ্বাকারে পরিদৃশ্যমান হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরে আছে :—

একৈকং জলং বহুধা বিকুর্ব্বন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহর ত্যেষ দেবঃ।

ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥"—৫ অ ৩।

"এই মায়াময় সংসার-ক্ষেত্রে বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বেশ্বর এক জলকেই নানাস্থানে নানারূপে বিকৃত করিয়া বিবিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মহাপুরুষ সর্ব্ব পদার্থের ও সমস্ত প্রাণিবর্গের অধিপতি।"

অতএব, কি সাংখ্যের পরিণামবাদ, কি নৈয়ায়িকদিগের পরমাণুবাদ, কি বেদান্তীর সৃষ্টিপ্রকরণ, সকল সৃষ্টিবাদই কারণরূপী ব্রহ্মতত্ত্বে লইয়া যায়; সকলই বিজ্ঞান-সম্মত হইয়া পরস্পর সুসঙ্গত হইয়াছে। স্পেন্সারও সেই কথা বলেন :—

"The Atomic hypothesis, as well as the kindred hy pothesis of an all-pervading ether consisting of molecules, is simply a necessary development of those universal forms which the actions of the Unknowable have wrought in us. The conclusions logically worked out by the aid of these hypotheses, are sure to be in harmony with all others which these same forms involve and will have a relative truth that is equally complete."

First Principles—page 167.

বেদান্তী সকল সৃষ্টিবাদকেই কল্পিত বলেন। স্পেন্সারও তাহাদিগকে (Hypotheses) বলিয়াছেন। বিজ্ঞান আর কিছুই নহে, তাহা সুসঙ্গত কল্পিতবাদ (Hypotheses) পূর্ণ। স্পেন্সারও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন *।

বেদান্ত বলেন—"আকাশ নামরূপের নির্ব্বাহক", বেদান্ত আরও বলেন—"ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন, আমি নামরূপের বিকাশ করিয়া বহু হইব।"—এই দুই কথাই আমরা সৃষ্টিবাদে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি, বিয়োগ-জনক অগ্নি হইতে যোগের উৎপত্তি।

সাংখ্যকারের এই কথা উপনিষদ্বাক্যে প্রতিপন্ন। উপনিষদ্বাক্য এই :—

"অগ্নেরাপঃ।"

অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি। এ জল ভৌতিক দৃশ্যমান জল নহে। জলের যাহা সত্ব সেই রসসত্বই কারণ-জল। অগ্নির প্রশান্তিতে রসের উদয় হয়। রসের উদয় না হইলে সংযোগ (Attraction) হয় না। আণবিক আকর্ষণ দ্বারা পরমাণু সমষ্টির সংযোগ ঘটে। সংযোগ ঘটিলে তবে এক এক মূর্ত্তির সৃষ্টি সম্ভব হয়। অগ্নি সদৃশ (Homogeneous) সত্বরাশিকে বিসদৃশ (Heterogeneous) পরিণামে আনে, সেই বিসদৃশ পরিণামে যখন অগ্নির শমতা হয়, তখন আণবিক আকর্ষণ

* তাঁহার "The data of philosophy' নামক অধ্যায় দেখ।

ঘটে। সেই আকৃষ্ট পরমাণুপুঞ্জে আবার অগ্নির সমুদ্ভব হইলে তাহা হইতে অন্য বিসদৃশ পরিণাম হয়। তাহাই স্পেন্সারের (Redistribution of matter) সেই বিসদৃশ পরিণাম হেতু Compound Evolution ঘটে। এইরূপ যত বিসদৃশ পরিণাম হয়, ততই বিভিন্ন ঘটের আবির্ভাব। এই আণবিক আকর্ষণকে শ্রুতি রাগ বা রস বলিয়াছেন। সেই রস অগ্নির শমতায় ঘটে বলিয়া অগ্নি হইতে রসের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এই রাগ-বিরাগ এক সঙ্গেই সম্ভাবিত হয়। অগ্নির শমতা অগ্নি হইতেই উৎপন্ন; কারণ, তাহা অগ্নিরই অবস্থা-বিশেষ মাত্র।

এই রসশক্তিই শ্রুতির বরুণ এবং পুরাণের সোম। অগ্নির বিভিন্ন শমতানুসারে বিভিন্ন শৈত্যাবস্থা। এই শৈত্যাবস্থার ঘনতা অনুসারে আকর্ষণের ঘনতা। যোগবাশিষ্ঠে এই কথাই উপদিষ্ট হইয়াছে :—

"সর্ব্বং তূষ্ণাত্মকং কিঞ্চিত্তেজোঽর্কাগ্নাভিধং বিদুঃ।
শীতাত্মকন্তু সোমাখ্যমাভ্যামেব কৃতং জগৎ॥"

উষ্ণাত্মকতেজকে (Heat) অর্ক বা অগ্নি এবং শীতাত্মক তেজকে সোম, এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই অগ্নি ও সোম দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

শৈত্য এবং উষ্ণতা, তেজের এই দ্বিবিধ অবস্থা হেতু আকর্ষণ এবং বিশ্লেষণ অনবরতই ঘটিতেছে এবং অনবরতই জগতের সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে। তাই যোগবাশিষ্ঠ আবার বলিলেন, অগ্নি ও সোম ইহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্য বা বিকৃতি এবং কারণ বা প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান। উভয়ই উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। একবার অগ্নির জয়, সোমের পরাজয়; অন্যবার সোমের জয় অগ্নির পরাজয়।

"অয়োবোমৌ মিথঃ কার্য্যকারণে চ ব্যবস্থিতে।
পর্য্যায়েণ সমং চেতৌ জয়েতে পরস্পরম্॥"

বিশ্বের সৃষ্টি এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে অবিচ্ছেদে প্রবাহিত বলিয়া ভাগবৎ বলিয়াছেন :—

"সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নিত্যশঃ।"

বৈশেষিক দর্শনও বলিয়াছেন, যে শৈত্যে বস্তুর অণুসমূহ পরস্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। আণবিক আকুঞ্চন (Contraction) শৈত্যের কার্য্য।

"অপাং সংঘাতঃ বিলয়নঞ্চ তেজঃ সংযোগাৎ।"
বৈশেষিক দর্শন—৫।২।৮।

জলের সংঘাত (ঘনীভাব—Solidification) এবং বিলয়ন (দ্রবীভাব—Fusion) এই দ্বিবিধ পরিণামই তেজ-সংযোগ দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। ঘনীভূত ও দ্রবীভূত করা জলের কার্য্য, তাহা আবার তেজের কার্য্য হইল কিরূপে? একথা কি বিজ্ঞান-সম্মত? ভগবান্ কণাদ বলিলেন, যে শৈত্যের কার্য্য ঘনীকরণ ও দ্রবীকরণ, তাহার ও কারণ তেজ। * আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ভগবান্, বশিষ্ঠদেবকে বলিয়াছেন, এক তেজের দ্বিবিধ অবস্থা হইতে উষ্ণতা এবং শৈত্যের উৎপত্তি। সুতরাং সেই অগ্নি হইতে যে শৈত্যের কার্য্য ঘটিবে, একথা বিচিত্র নহে। এই কথা বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া বেদান্ত বলিয়াছেন—অগ্নি হইতে জলের উদ্ভব। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে এই কথার সিদ্ধান্ত দেখুন।

"In treating of the general effects of heat, we have seen that its action is not only to expand bodies, but to cause them to pass from the solid to the liquid state, or from the latter state to the former, according as the temperature rises or falls; then from the liquid to the aeriform state or, conversely.'
"Ganot's Natural Philosophy.

* শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিয়াছেন,—"যদি কোন বস্তুর উপাদান কারণের অন্য উপাদন কারণ থাকে, তাহা হইলে সেই প্রথম উপাদান কারণই প্রকৃত পক্ষে সত্য।"—১১।২৪।

বৈজ্ঞানিক মিলার বলিয়াছেনঃ—

"Heat and Cold are, in fact, merely relative terms; cold implying not a negative quality antagonistic to heat, but simply the absence of heat in a greater or less degree."

যোগবাশিষ্ঠের কথার সহিত মিলারের কথা মিলাইয়া দেখুন। দেখিলেই প্রতীত হইবে :—

"অগ্নেরাপ।"

তৎপরে পঞ্চম সূক্ষ্মভূতের কথা। সৃষ্টি-কার্য্যের পঞ্চম কারণ—পৃথিবী। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।"

জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।

পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, অগ্নির শৈত্যই রস নামে অভিহিত এবং এই শৈত্য হইতে আপবিক আকুঞ্চন বা আকর্ষণ ঘটে বলিয়া জাত্যন্তর পরিণাম হয়। এই জাত্যন্তর পরিণাম হইতে বহুর সৃষ্টি হয়। অগ্নি রূপের কারণ; রস রূপকে একাধারে আনে, পৃথিবী শক্তি দ্বারা বহুর সৃষ্টি হয়। এই কারণশক্তি দ্বারা কিপ্রকারে বহুরূপের সৃষ্টি হয় তাহা পর্য্যালোচনা করিতে গেলে এই জাত্যন্তর পরিণাম কথাটী একটু পরিষ্কার করা চাই।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৃথিবীর সৃষ্টি-প্রকরণ মহা কর্ম্মবিপাক। সৃষ্টি ব্যাপারে নিয়তই ক্রিয়া চলিয়াছে। এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আকাশসত্ত্বের অবিরাম গতি। এই গতির মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই। বায়ু অবিরাম গতিতে যে তেজের উৎপত্তি করেন, সেই তেজ হেতু পরমাণু পুঞ্জের বিরাগ ও রাগের উৎপত্তি হয়। এই রাগ-বিরাগের ফল এই যে, যে পরমাণু যাহার আত্মীয় বা হিতকর, সেই পরমাণু তাহাকে আকর্ষণ করে এবং যে যাহার অনাত্মীয়, সে তাহাকে দ্বেষ করিয়া পরিত্যাগ করে। তাহা হইতেই স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদের সম্ভব হইয়াছে। এই স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ বশতঃ পরমাণু পুঞ্জ নিয়তই ত্যাগ ও গ্রহণ করিতেছে। প্রকৃতি কখন ক্ষণকালের জন্য একভাবে থাকিতে পারে না। সেই প্রকৃতির এই রূপ নিত্য-পরিণামিনী শক্তি বশতঃ তাহার জাত্যন্তর পরিণাম ঘটে। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেনঃ—

"জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"

"প্রকৃতির আপূরণ বশতঃ জাত্যন্তর পরিণাম হইয়া থাকে।"

পরিণামিনী প্রকৃতির পূরণ কি? পরিবর্ত্তনই তাহার পূরণ। এক পরিবর্ত্তন হইতে অন্য পরিবর্ত্তন ঘটিল, আবার সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নানা পরমাণুর বিশ্লেষ ঘটিল। সুতরাং যাহা একবার সদৃশ ছিল, আবার তাহাতে বিসদৃশতার সঞ্চার হইল। যেমন বিসদৃশতার সঞ্চার, অমনি বিজাতীয় ভেদ। সুতরাং যাহা স্বজাতীয়, তাহা কেবল মুহূর্ত্তের জন্য স্বজাতীয়। স্বজাতীয় না হইতে হইতে আবার বিজাতীয় হইল। তাই হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেনঃ—

"The homogeneous is instable and must differentiate itself"

First Principles.

অনবরতই এই জাত্যন্তর পরিণাম ঘটে বলিয়া এক হইতে ক্রমশঃই বহুর উৎপত্তি হইতেছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, সৃষ্টিকালে সেই জল (জল অর্থে জল-দেবতা সোম বা বরুণ, বেদান্তমতে সকল পদার্থই চিৎ শক্তির বিকাশ) ভাবিল বা আলোচনা করিল আমরা বহু হইব ও জন্মিব। অনন্তর জল অন্নের সৃষ্টি করিলঃ—

"তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যামঃ প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত।"

এই বেদান্ত বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, জল হইতে উৎপন্ন পৃথিবী-শক্তি আকৃষ্ট সদৃশ পরিণামকে আবার নিয়ত বিসদৃশ পরি-

গামে আনিয়া বহুর সৃষ্টি করে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সাংখ্যের এই জাত্যন্তর পরিণাম তত্ত্ব অতি বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহাই জগতের বহুত্বের কারণ। তাঁহার সিদ্ধান্ত এইঃ—

"A further step in the inquiry disclosed a secondary cause of increasing multiformity. Every differentiated part is not simply a seat of furtheir differentiations, but also a parent of further differentiations; since in growing unlike other parts, and by so adding to the diversity of forces at work, adds to the diversity of effects produced. This multiplication of effects proved to be similary traceable throughout all nature."

First Principles—page—548

বিজাতীয় পরমাণু পুঞ্জ বিসদৃশ বহুর সৃষ্টি করে কিরূপে? বিসদৃশ পরিণাম হইতে আবার স্বজাতীয় পরিণাম হয়। স্বজাতীয় পরিণাম হইতেই এক একটী Aggregate প্রস্তুত হয়। যে নিয়মে এই স্বজাতীয় পরিণাম ঘটে, তাহাকে স্পেন্সার Segregation বলিয়াছেন।

"Completely to interpret the structural changes constituting evolution, there remained to assign a reason for that increasingly distinct demarcation of parts, which accompanies the production of differences among parts. This reason we discovered to be the segregation of mixed units under the action of forces capable of moving them."

জাত্যন্তর পরিণাম-প্রকরণে যখন সদৃশের যোগ হইয়া Segregation ঘটিতেছে, তখনই এই ঘোর পরিণাম পরিপাকের মধ্যে স্থিরতা বা সাম্যের সম্ভাবনা ঘটিতেছে। অনবরতই পরিবর্ত্তন হইতেছে বটে, তথাপি স্থিরতা একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু এই স্থিরতা বা সাম্য এক অদ্ভুত প্রকার সাম্য। সকল সদৃশ পরিণাম বিসদৃশে যাইতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যেই স্থিতি ঘটিতেছে। সুতরাং এই স্থিতিকে চঞ্চল বলিতে হইবে। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই সচল সাম্যকে *Equilibrium mobii* বা Moving Equilibrium বলিয়াছেন। রাগ বিরাগের পরিণাম চক্রে কখন যে সামঞ্জস্য ঘটিতেছে, তাহা কল্পনাতেও আসে না। কল্পনাতীত হইলেও প্রাকৃতিক ক্রিয়াতে তাহা সম্ভাবিত হইয়াছে। এই দেখুন, আমাদের শরীর ত নিত্য ক্রিয়াশীল, তাহাতে অনবরতই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এমন মুহূর্ত্ত নাই যখন শরীরে সৃষ্টি ও লয় হইতেছে না; অথচ তন্মধ্যে দেহের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সাংখ্যকার প্রকৃতির এই ক্রিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত সূত্র করিলেনঃ—

"সাম্যা বৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্।"—৩।৪২।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন,—

"প্রকৃতির সাম্য বৈষম্য দ্বারা এক প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি ও প্রলয় এই উভয় কার্য্য ঘটিতেছে। যখন সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য হয় তখনই সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং উহাদের সাম্যাবস্থাতেই প্রলয় হয়। স্থিতিও সৃষ্টির মধ্যে নিবিষ্ট, অতএব তাহার পৃথক কারণ বিচারের প্রয়োজন নাই। সুতরাং ঐ প্রকৃতি সৃষ্টিরও কারণ; অতএব জানা যাইতেছে যে, প্রকৃতিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ।"

সাংখ্যসূত্র বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ বলিতেছেন :—

সাম্যাৎ প্রকৃতেঃ সদৃশ পরিণামাৎ প্রলয়ঃ। বৈষম্যাৎ প্রকৃতের্মহদাদিভাবেন বিসদৃশপরিণামাৎ সৃষ্টিঃ।"

প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্য বা সদৃশ পরিণাম হইতে প্রলয় এবং তাহার মহদাদিভাবে বিসদৃশ পরিণাম হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে।

হার্বার্ট স্পেন্সার বলিতেছেন :—

"Evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion, during which the matter passes from an indefinite, incoherent homogeneity to a definite, coherent heterogeneity."

First Principles—page 396.

প্রকৃতিতে যদি এই সাম্যের উদয় না হইত, তবে বস্তুর স্থিতি এবং এই জগতের পরিদৃশ্যমান রূপ ঘটিত না; তবে সামান্য জ্ঞানে জগৎসত্তার প্রতীতি হইত না। সুতরাং এই সাম্য বা স্থিতিই জগতের উৎপাদন

করিতেছে। তাহা একদা জগতের প্রলয় ঘটাইয়া নানারূপের সৃষ্টি করিতেছে এবং জগৎ-সত্তার প্রতীতি জন্মাইতেছে। এই অদ্ভুত স্থিতি-হেতু যে জগৎ-সত্তার প্রতীতি, তাহাকে বেদান্ত কাজেই মায়া বলিয়াছেন। এই বহুরূপ সৃষ্টিকারিণী অদ্ভুত সাম্য-শক্তিই "পৃথিবী" নামে বেদান্তে অভিহিত হইয়াছেন।

সুতরাং এই "পৃথিবী" শক্তির প্রধান সাধর্ম্য এই, তাহা রস-ঘটিত পরমাণু পুঞ্জের আকুঞ্চন বা আকর্ষণকে ঘনীভূত করিয়া তাহাতে কাঠিন্য (Segregation) জন্মাইতে পারে। শ্রুতি বলিতেছেন :—

"তদ্‌যদপাং শর আসীৎ তৎসমহন্যত সা পৃথিব্যভবৎ।"

সৃষ্টিকালে জলের যে শর (মণ্ডবৎ পদার্থ) হইয়াছিল, সেই শর সংহত বা কঠিন হইলে তাহা পৃথিবী হইল *।

রাগ বিরাগের এই সংহত করিবার শক্তি "পৃথিবীর"। সদৃশ এবং বিসদৃশ পরিণাম চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য (Equilibration) আছে। রাগ-বিরাগের যে নিয়ত গতি চলিতেছে, এই সামঞ্জস্য শক্তি বা ঈশান † (The adjuster) নিয়ন্তা, সেই গতিকে নিয়মিত করিয়া দিতেছেন। এরূপে নিয়মিত করিতেছেন—যদ্দ্বারা সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও ঠিক কার্য্য করিতেছে। হার্বার্ট স্পেন্সর বলিতেছেন :—

"And further inquiry made it apparent that for the same reason, these moving equilibria have certain self-conserving powers, shown in the neutralization of perturbations, and the adjustment to new conditions. This general principle of Equilibration was traced throughout all forms of Evolution."

First Principles—page 549.

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদান্তমতে রক্ত, শুক্ল এবং কৃষ্ণভেদে অগ্নির ত্রিবিধ রূপ। মৃৎতত্ত্ব কৃষ্ণরূপী। এই কারণ শক্তি "পৃথিবী" অগ্নিরই শেষ পরিণাম। অগ্নির বা অর্কের প্রথম কার্য্য বিরাগ (Repulsion) দ্বিতীয় কার্য্য রাগ (Attraction) এবং রাগ-বিরাগের শেষ ফল, রাগের অত্যন্ত ঘনীকরণ শক্তি। রাগ হেতু একবার বস্তুর স্থিতি না ঘটিলে আবার তাহার জাত্যন্তর পরিণাম কার্য্য আরম্ভ হয় না। এই ঘনীকরণ শক্তি কৃষ্ণরূপিণী; এজন্য, পৃথিবীর অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণ। পৃথিবীকে শিলাদিরূপে কুত্রাপি শ্বেতবর্ণ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে; তাহা নিয়মের নিপাতন মাত্র। যত কৃষ্ণ, শ্বেত লোহিত তত নহে; সুতরাং কৃষ্ণরূপই পৃথিবীর স্বাভাবিক; অন্যরূপ ঔপাধিক। পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরাও পৃথিবীর রূপকে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিশব্দে উপদেশ করিয়াছেন। *

অগ্নির এই ত্রিবৃৎ শক্তিকে শ্রুতি এক অজা শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "শ্রুতি চরাচর বিশ্বের উৎপত্তির নিদান স্বরূপ তেজ, অপ্‌ ও অগ্নির সমবায়কে ছাগী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। যেমন লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা ছাগী বহু সন্তান প্রসবিনী, সেইরূপ, তেজ-অপ্‌-অগ্নিলক্ষণা ত্রিবর্ণা ভূত-প্রকৃতিরূপা অজাও নিজানুরূপ বহু সন্তান (Multiplicity of effects) প্রসবিনী।" †

শ্রুতিবাক্য এই:—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।—শ্বেতাশ্বতরে।

জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কি প্রকার অনন্তকারণ-

---

* পুরাণেতেও এই কথা। মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বের ১৮৩ অধ্যায় দেখ।

† এই ঈশান দেবতা, কারণ, তিনি শক্তির নিয়ন্তা।

* শারীরিক ভাষ্য—২।৩।১৩ বেদান্ত সূত্র।

† শারীরিক ভাষ্য—১।৪।১০ বেদান্ত সূত্র।

রূপী হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটাইতেছেন, ঘটাইয়া অনন্ত দেশে ও অনন্ত কালে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। অনন্ত মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ও পঞ্চ-মহাভূত এ সমস্তই তাঁহার কারণ-শরীর—তিনি সেই উপাধিগত হইয়া কারণ তত্ত্ব সমুদায়ের সহিত একাত্ম সগুণ ঈশ্বর। ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র অগ্নি, যম, বরুণ, ঈশান প্রভৃতি দেবগণ সেই ঈশ্বরেরই অঙ্গস্বরূপ*। ঈশ্বরের এই কারণ তত্ত্ব সমুদায়, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও কার্য্য করিতেছে—অনন্তরূপী হইয়া কার্য্য করিতেছে। যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই এই কারণ সমূহকে দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবে—দেখিতে পাইবে, ভগবান অষ্ট প্রকৃতির অষ্ট ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। অনন্ত নভোমণ্ডল দেখ, অনন্ত আকাশ চতুর্দ্দশ ভুবনে পরিব্যাপ্ত। প্রতি ভুবন অগণ্য নক্ষত্র-রাজি-বিরাজিত। প্রতি ভুবনে অগ্নি কারণরূপী হইয়া একএক সূর্য্যমণ্ডলের সৃজন করিয়াছেন—সে সূর্য্য-মণ্ডলের কেন্দ্রস্থানে এক এক অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দেবতা রহিয়াছেন, সেই সূর্য্য প্রতি ভুবনের কেন্দ্রস্থানীয় হইয়া ভাস্যমান রহিয়া-ছেন। প্রতিভুবন পরীক্ষা করিলে যে প্রক-রণ ও কারণতত্ত্বের বিকাশ, এই পৃথি-বীতেও সেই কারণতত্ত্বের বিকাশ। এই পৃথিবীকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহা কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে? তাহার অভ্যন্তরদেশ অগ্নিময়, সেই অগ্নিশিখা সহস্র ফণায় মণ্ডলাকৃতি হইয়া উপরের রস ও জলের স্তর ধারণ করিয়া আছেন; সেই রসের স্তর হইতে রসায় কঠিন মৃত্তিকাময় স্তর সমুদ্ভূত হইয়াছে। অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে যে পৃথিবীর উৎপত্তি, এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, এই পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশ। তাই পুরাণ বলিয়াছেন, পৃথিবী অনন্ত ফণাযুক্ত বাসুকীর মাথায় স্থাপিত। বলদেব অগ্নিদেবতা; বলদেবের প্রতীক অনন্ত নাগ। বলদেবের মৃত্যুকালীন তিনি এই অনন্ত নাগরূপী হইয়াছিলেন। নারায়ণ কখনই এই অগ্নিরূপী বলদেব ছাড়া নহেন। অনন্ত শয্যায়ও নারায়ণ এই অনন্ত ফণাযুক্ত নাগবেষ্টিত হইয়া আছেন। আবার দেখ, আমাদের দেহাভ্যন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখ, সেখানেও সেই কারণ-তত্ত্ব সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাভারত বলিতেছেন:—

"ভৃগু কহিলেন, তপোধন, অপরিমেয় পদার্থই মহৎ শব্দ বাচ্য হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত অপরিমেয় বলিয়াই মহাভূত নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জগতে যে কোন পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যগণের দেহ পঞ্চভূতাত্মক। চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, রুধিরাদি দ্রব পদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদায় পদার্থই এইরূপে পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।"

মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়—ভৃগু ও ভরদ্বাজ সংবাদ।

ভগবান এই 'পৃথিবী' রূপ কারণশক্তি ধারণ করিয়া জগতের বহুরূপের কারণ হইয়া-ছেন। অগ্নির তৃতীয় রূপ কৃষ্ণবর্ণ। এই কৃষ্ণশক্তিই অব্যক্তের অষ্টম পরিণাম। তাই পুরাণে ভগবানের এই কৃষ্ণশক্তি অষ্টম কারণ-অবতার। এই শ্রীকৃষ্ণ পুরাণে উপেন্দ্র নামেও পরিচিত। যে অদিতিনন্দন দেবেন্দ্র আকা-শের কারণ ও অধীশ্বর, উপেন্দ্রও সেই অদিতি-নন্দন, হইয়া দেবেন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ কারণ-শক্তি। এই কৃষ্ণ-শক্তিই বিষ্ণুর অবতার।

* তাই ভাগবৎ বলিয়াছেন, "বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতস, অশ্বিন, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র এবং চন্দ্র এই একাদশ দেবতা জন্মি-লেন।"—১১।২৪ দেখ

বিষ্ণু রাগরূপী রসময়। সেই রস হইতে গন্ধের উৎপত্তি। যে হেতু, পৃথিবী সকল গন্ধের আধার।

অতএব, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কারণ-ব্রহ্ম-রূপে সৃষ্টি ব্যাপারে সমাসক্ত থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় নিজ কারণ-শরীরে বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্বের কারণ শরীর আর কিছুই নহে, তাহা ব্রহ্মেরই শক্তিময় সূক্ষ্ম (faint) রূপ। শক্তি দ্বিবিধ—জ্ঞান ও ইচ্ছাজনিত ক্রিয়া। আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্তই ভগবানের ক্রিয়া শক্তির পরিচায়ক, যেমন অব্যক্ত হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানশক্তির পরিচায়ক। এই ক্রিয়া জ্ঞান-শক্তিরই আনন্দময় সমষ্টি-ক্রিয়া। এই সমুদায় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চিন্ময় ভগবান নামরূপের কারণ হইয়া বহুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভগবানের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি একাত্ম, যেহেতু জ্ঞান ক্রিয়া ব্যতীত থাকিতে পারে না, ক্রিয়া জ্ঞান ব্যতীত সম্ভাবিত নহে। জ্ঞান ও ক্রিয়া এজন্য ব্রহ্মের পরিচায়ক। ব্রহ্মকে দেখিতে চাও, তাঁহার জ্ঞান ও লীলার আলোচনা কর। ভগবানের কর্ম্মকর্তৃত্ব বিভূতি স্বরূপ দেবগণ—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, অর্ক, যম, পর্জ্জন্য, ঈশান, শ্রীকৃষ্ণাদি—সকলেই তাই ক্ষত্রিয়। সেইরূপে ভগবান বিদ্যমান বলিয়া তাঁহারা ক্ষত্রিয় বর্ণ। বর্ণের অর্থই রূপ—যেরূপে ব্রহ্ম বিদ্যমান।

এই জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্মের রূপ বর্ণন করিয়া আমরা কারণ-ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছি। কারণ-ব্রহ্মই সৃষ্টিতত্ত্বের কারণবাদ। এই কারণবাদ কি সাংখ্য, কি বেদান্ত, উভয়েই একরূপ। প্রভেদ এই, বেদান্তে প্রতি কারণ-তত্ত্বে ব্রহ্ম পরিচিত, সকল কারণ-রূপই—Modes of the Unknowable, এজন্য সকল কারণ তত্ত্বই ব্রহ্মের "বিবর্ত্ত"। সাংখ্যে সে প্রকারের কারণতত্ত্ব সমুদায়ের পরিচয় নাই। সাংখ্য, কারণতত্ত্ব সমুদায় অব্যক্ত প্রধানের পরিণাম রূপে আলোচনা করিয়া সর্ব্বশেষে সেই প্রধানের পর পুরুষতত্ত্বে আরোহণ করিয়াছেন। বেদান্ত বলিয়াছেন, এই অব্যক্ত মায়া; কারণ, বেদান্ত সকল বিষয়ই এক ব্রহ্মেরই পরমার্থ পক্ষ হইতে দর্শন করিয়াছেন। সেই বেদান্ত আবার বলিয়াছেন, লৌকিক জ্ঞানে চেতনাচেতনের বিভেদ অপরিহার্য্য। সুতরাং যে জড়জ্ঞান অপরিহার্য্য, সাংখ্য সেই লৌকিক পক্ষ হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করাতে অব্যক্ত প্রকৃতিকে জড়রূপে ধরিয়া লইয়া তাহারই সপ্তবিধ কারণ-পরিণাম বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপ বিবরণ দিবার কালীন সাংখ্য পুরুষকে এক পার্শ্বেই স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, পুরুষতত্ত্ব শেষের কথা। বেদান্ত অব্যক্তকে ব্রহ্মের মায়িক উপাধি রূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন, সাংখ্য অন্য ভাষায় সেই উপাধিরই অর্থ ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, প্রকৃতি, পুরুষে আপনারই গুণ আরোপ করিয়া জবাস্ফটীকবৎ একসঙ্গে অন্ধপঙ্গুমত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। নির্গুণ হইতে সগুণের পরিণাম অচিন্ত্য,—সাংখ্য সে কথা না তুলিয়া তত্ত্বজ্ঞানমূলক সৃষ্টিবাদ বিবৃত করিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিলে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে, সেই তত্ত্বজ্ঞানে পুরুষার্থ সাক্ষাৎকৃত হইবে। বেদান্তও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মের সূক্ষ্ম কারণদেহ-কেমন নামরূপের নির্ব্বাহক, সেই বেদান্ত তত্ত্ব আমরা পর্য্যালোচনা করিয়াছি। সেই তত্ত্ববিবরণেই দৃষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মের কারণশক্তি সমূহ স্থূল জগতেরই সাধারণ নিয়মাবলী। তাই সাংখ্য বলিয়াছেন, অষ্ট প্রকৃতি-তত্ত্ব সমুদায় অবিশেষ, এবং ষোড়শ

বিকৃতি তাহারই বিশেষ ভাব। সাংখ্য বিশেষ হইতে অবিশেষ তত্ত্বের অনুমান করিয়া সর্ব্বশেষে পুরুষ তত্ত্বে উঠিয়াছেন। সাংখ্য ও বেদান্তের প্রাকৃতিক কারণতত্ত্ব কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত, * তাহা আমরা এই প্রস্তাবে প্রদর্শন করিলাম। ব্রহ্মের সূক্ষ্ম কারণদেহ পঞ্চ কোষাত্মক হইয়া কেমন বহু জীবময় সূক্ষ্ম শরীরে ব্যাকৃত হইয়াছে, পরবারে সে বিষয় গৃহীত হইবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

সেকালের এবং একালের ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা লিখি, তাহাতে ব্রাহ্মসাধারণের অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিরক্তি অসন্তোষ ক্রোধ হিংসা, বিদ্বেষ, মূর্ত্তিমান আকারে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা লিপিবদ্ধ এবং মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এজন্য তিনি নিন্দুকের রসাল জিহ্বার কলে পতিত হইতেছেন কিনা, জানিনা, আমি তাহা নব্য ভারতে ছাপাইয়াছি বলিয়া ক্রোধ তরল হইয়া জিহ্বার সাহায্যে বমিত হইতেছে। অবস্থা এইরূপ, এক ব্যক্তি বহুলোকের ধনরাশি ঠকাইয়াছে, সে যেন অপরাধী নয়, কিন্তু যে তাহা ব্যক্ত করিতেছে, সে-ই অপরাধী। একজন অন্যের ধন চুরি করিয়া বা অন্যের মহা অনিষ্ট করিয়া অশান্তির আগুন জ্বালিতেছে, সে যেন অপরাধী নয়, যে তাহা প্রতিকারের চেষ্টা করিবে, সেই অপরাধী। বুদ্ধি, বিদ্যা, চাতুর্য্য, ধার্ম্মিকতা, সকলেরই বাহাদুরী! বলিহারি যাই।

আমি নিজে ব্রাহ্ম,—যে সকল দোষের কথা বলি তাহাতে আমিও দুষ্ট। নিজে দুষ্ট হইয়াও দোষের কথা লিখি কেন? তোমাদের পরশ্রী কাতর মনে আমার প্রতি যে অভিসন্ধি আরোপ করার ইচ্ছা থাকে, তাহা কর। করিয়া সুখী হও, এবং স্বর্গ মর্ত্তের ধর্ম্মপথ আবিষ্কার কর। আমার মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল ভিন্ন অন্য কোন কামনা নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন যে অমৃত বৃক্ষের বীজ রোপন করিয়াছিলেন, মহাত্মা কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং বিনয়ের অবতার রামতনু এবং রাজনারায়ণ যাহার জন্য শরীরের রক্ত জল করিয়া অমর চরিত্র-রত্ন লাভ করিয়াছেন, সেই বৃক্ষে আজ কাল বিষময় ফল ফলিতেছে, ইহা ভাবিলে প্রাণে দারুণ জ্বালা উপস্থিত হয়। হায়, হায়, কি সোণার বৃক্ষে কি ফল ফলিতেছে!!

এই পৌষ মাসে আমি একদিন দেবগৃহে দেবোপম চরিত্র শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বাবুর শ্রীচরণ সন্দর্শনে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ, রামতনু এবং রাজনারায়ণ এখন ব্রাহ্ম

---

* "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ" দেখ। সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ কিরূপ বিজ্ঞান সম্মত, তাহা প্রত্যেক পদার্থের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তাবলি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কিরূপ বিশেষ তত্ত্বের পর্য্যালোচনাক্রমে [illegible] সেই সমস্ত অবিশেষ তত্ত্বে পৌঁছিয়াছেন, তাহা উহার গ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হইবে। সাংখ্যাচার্য্যগণ তাহা [illegible] ক্রমে লাভ করিয়াছেন। সাংখ্যসূত্র সকল অবলম্বন মাত্র।

সমাজের ভিত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, ইহাদের তিরোধান হইলে ব্রাহ্মসমাজের যে হীনাবস্থা হইবে, তাহার বিষয় আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনা হইয়াছিল, বিজয়কৃষ্ণ, রামকুমার এবং শিবনারায়ণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রতি মানুষের একভোটে (One man one vote) ধর্ম্মসমাজের মঙ্গল হইতে পারে না, প্রতিষ্ঠ চরিত্র প্রবীণ ব্যক্তিগণের কথা শিথিল চরিত্র যুবকগণের দ্বারা উপেক্ষিত, অবহেলিত হইতে পারে, কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন, ধর্ম্মসমাজ আবার সাধারণের কি? সাধারণের সমাজ হইলেই দুর্নীতি প্রশ্রয় পাওয়া অপরিহার্য্য। আর যে সকল কথা হইয়াছিল, অদ্যকার প্রস্তাবের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। রাজনারায়ণ বাবুর সহিত আলোচনার পর ব্রাহ্মসমাজের অনেক কথা ভাবিয়াছি। যত ভাবিয়াছি, ততই বেদনা পাইয়াছি। মনে দারুণ চিন্তা এবং হৃদয়ে বেদনা লইয়া কলিকাতা আসিয়া আবার যে সকল কথা শুনিলাম এবং যে সকল ঘটনা ঘটিতে দেখিলাম, প্রাণ তাহাতে অবসন্ন। ভাবিতেছি, সমাজের হইল কি?

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মূল মন্ত্র ছিল, উদারতা এবং ধর্ম্মনিরপেক্ষতা। এই উদারতা এবং ধর্ম্মনিরপেক্ষতার গুণে এদেশে অমৃত ফল ফলিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ, রামতনু, রাজনারায়ণ সেই উদারতা এবং নিরপেক্ষতার ফল। এই সকল মহাজনেরা কি করিয়াছেন, কি দেখাইয়াছেন, অল্পাধিক পরিমাণে অনেকেই জানেন, সুতরাং বিবৃতির প্রয়োজন নাই। ইহাদের সংস্পর্শে এবং চরিত্র ছায়ায় মহাত্মা কেশবচন্দ্রের উদয়। কেশব চন্দ্রের উদয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের চরমোন্নতি, একই কথা। তাঁহার জীবন এবং সকল ধর্ম্ম-সমন্বয়, একই কথা। তিনি বিশ্বজনীন উদারতা এবং স্বাধীনতার মহা সম্মিলন সংঘটন করিয়া যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বহুযুগ লাগিবে। তাঁহার জীবনাদর্শে কলিকাতার প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, বৈলোক্যনাথ, উমেশচন্দ্র, শিবনাথ প্রভৃতি এবং মফঃস্বলের আরো অনেক মহাজনদিগের অভ্যুদয় হয়। শেষে কি কুক্ষণে এবং কি অলক্ষণে যে বিষপোকা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিল, ভাবিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। শিবনাথ এবং আনন্দমোহন উদারতায় ধর্ম্মাধিপত্যের বিভীষিকা দেখিয়া স্বাধীনতা-বনাম স্বেচ্ছাচারিতার নিশান হস্তে লইয়া কলিকাতার রাস্তায় অবতরণ করিলেন। কুচবেহার-বিবাহ অনুকূল হইল—প্রতিবাদ ও আন্দোলন উঠিল। প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের অর্থ, অবাধ পরনিন্দা। চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল, বড় ছোট, জ্ঞানী মূর্খ, ভক্ত অভক্ত, সবাই সমান, সকলেরই এক ভোট। ভোটবাদিগণ দলে দলে জুটিলেন। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার অসংযত ও উশৃঙ্খল সমালোচনা-প্রবাহ বহিতে লাগিল। কখন দেখি, কেহ সুলভ সমাচারকে পদ দ্বারা মর্দ্দন করিতেছেন, কখনও দেখি, কেহ কেশব বাবুর নাম মৃত্তিকায় অঙ্কিত করিয়া পাদুকা দ্বারা আস্পর্দ্ধা সহকারে মর্দ্দন করিতেছেন। সে সকল ঘৃণিত কথার উল্লেখ করিতেও দুঃখে হৃদয় অবসন্ন হয়। এইরূপে মহাজন-নিন্দার গরল উঠিল। বুঝি বা সেই পাপের ফল এখন ব্রাহ্মসমাজ ভুগিতেছেন।

ক্রমে সাধারণ-ব্রাহ্ম সমাজ-প্রতিষ্ঠিত হইল, উপাসনার প্রকাণ্ড মন্দির উঠিল। ইহার

ট্রষ্ট-ডিডে লেখা আছে, কোন ব্যক্তি বা কোন ধর্ম্মের নিন্দা এই মন্দিরে হইবে না। কিন্তু স্বকর্ণে শুনিয়াছি, এই মন্দিরে বিজয়কৃষ্ণ আনন্দ করতালি তুলিয়া কেশবচন্দ্রের নিন্দা ঘোষণা করিয়াছেন। রামকুমারের সহিত এই সময়ে কয়েকবার মফঃস্বল ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তখন দেখিয়াছি, তাঁহার মুখে অন্য কথা নাই, কেবল কেশব বাবুদের নিন্দা। প্রতিদিন এজন্য বহুবার তাঁহার সহিত বিবাদ করিতাম। সাত বৎসর পর তিনি স্বীকার করিয়াছেন, নিন্দা করিয়া অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন। নিন্দা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কিনা, কে জানে, বিজয়কৃষ্ণ এবং রামকুমার ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নব-নব সাধন পথ আবিষ্কার করিয়া দল বাঁধিতেছেন। নিন্দা যখন মানুষের মূল মন্ত্র হয়, হিংসা এবং ক্রোধ তাহার আশ্রয় লয়। প্রতিহিংসা এবং ক্রোধ ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্ম-হৃদয়ে এমন বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, ধর্ম্ম, উদারতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা, পুণ্য, পবিত্রতা, সৎসাহস ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল। একথা যখন পত্রিকায় ঘোষিত হইতে লাগিল, তখন লাইবেল কর, এই মূল-মন্ত্র উঠিল। আমি লিখিব কি, লজ্জায় মরিয়া যাই, নিন্দা-গরল পান করিয়া যে সকল মহাজনদিগের অভ্যুদয় হইতেছে, তাঁহাদের অনেকেরই না, আছে চরিত্র, না আছে ধর্ম্ম, না আছে সৎসাহস, না আছে পুণ্যের জোর। তবে আছে কি?— ভীরুতা, কাপুরুষতা, পাপ স্পৃহা, অহঙ্কার, হিংসা, বিদ্বেষ, বিলাসিতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, আত্মম্ভরিতা এবং এবম্বিধ অশেষ গুণরাশি। এক সময় এমন ছিল, যখন এদেশের লোকেরা ব্রাহ্মের নাম শুনিলেই শ্রদ্ধা করিত, আর এখন? এমন ব্রাহ্ম নাম শুনিলেই সকলে কর্ণে অঙ্গুলি দেয়। ইহার কারণ কি? কারণ কি কিছু নাই? ব্রাহ্ম বলিলেই এখন অনেকে বুঝেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া প্রতারণা করিতে পারে, যে ব্যক্তি অন্যের নিন্দা দ্বারা নিজের সহস্র দোষ ঢাকিতে পারে, সেই ব্রাহ্ম। কি দুঃখের কথা!! মহাজনদিগের মহত্ত্ব স্মরণ ও চিন্তনে মানুষের মহত্ত্বের উদয় হয়। নিন্দা কীর্ত্তনে আত্মা কলুষিত হয়, চরিত্র নমিত হয়। নিন্দা-বিষপানে ব্রাহ্ম সাধারণের কি অপকার করিয়াছে, যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

প্রতি ব্যক্তিই সমান, বড় ছোট, জ্ঞানী মূর্খ, সাধক অসাধক, ভক্ত অভক্ত, সকলই সমান, সকলেরই এক ভোট!! স্বাধীনতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা কেহ কখনও শুনিয়াছ কি? স্বাধীনতার মহা কেন্দ্র ইংলণ্ডেও কৃতি ও পণ্ডিত লোকের আদর, বৃদ্ধ ও বুদ্ধিমানের আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আর এখানে সবাই সমান!! চরিত্রবান শিবনাথ আর অগঠিত চরিত্র আমি সমান। তাঁহারও এক ভোট, আমারও এক ভোট!! ত্রিংশ বৎসর ব্যাপী সাধনার ফলে যে উমেশচন্দ্রের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাকে অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক নবীন যুবক ব্রাহ্ম ভোট-সমতায় আজ অনায়াসেই উড়াইয়া দিতেছে! দিতেছে, দিক। ফল হইতেছে কি? কেমন ব্রাহ্ম সকল উৎপন্ন হইতেছেন? কেমন প্রচারক সকল দেখা দিতেছেন? লিখিব কি, যেন চরিত্র-হীনতার মহামেলা মিলিয়াছে। সয়তানে সয়তানে কোলাকুলি হইতেছে, চরিত্রহীনে চরিত্রহীনে মিলন হইতেছে, তারপর একদল অন্যদলের বাপান্ত করিয়া মহাকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে কোন সৎকাজ যে না হইতেছে, এমন নহে, সৎ-

কাজের তুলনায় অসৎকাজের বোঝাই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে; ঝগড়া এবং বিবাদ, অন্তর্কলহে সমাজ ডুবিতেছে। পূর্ব্বে বিনয় ছিল ব্রাহ্মের প্রধান লক্ষণ, এখন বিলাস তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে অমায়িকতা ও মধুরতা ছিল ব্রাহ্মের অঙ্গের ভূষণ, এখন আত্মম্ভরিতা এবং অহংসর্ব্বস্বভাব সে স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্বাস এবং ভক্তি ছিল ব্রাহ্মের একমাত্র অন্নজল, এখন সম্মান, কুলগৌরব, টাকা ও পদ মর্য্যাদা সে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে সেবা, চরিত্র, অনুরাগ, প্রেম, সত্য ও জ্ঞান পিপাসা ব্রাহ্মের বিশেষত্ব ছিল, এখন প্রশংসা পিপাসা, হিংসা ও স্বার্থ সকল সৎগুণের স্থান অধিকার করিতেছে। পূর্ব্ব গন্যের মহত্ব স্মরণ এবং চিন্তন ব্রাহ্ম-জীবনের মহত্বলাভের একমাত্র অবলম্বন ছিল, সেই স্থলে এখন পরনিন্দা, পরচর্চ্চা শোভা পাইতেছে। আর সর্ব্বোপরি অনুদারতা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছে। পৃথিবীর আর সকলেই নগণ্য, সকলেই পতিত সকলেই চরিত্রহীন, কেবল এ ধরায় ব্রাহ্মই একমাত্র মোক্ষের অধিকারী! এইরূপ অহঙ্কার ছোট বড় সকলকে আক্রমণ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। তুমি হিন্দু, তোমার ছায়া মাড়াইলে ব্রাহ্মের পতন হয়, কেননা তোমার রুচি-বোধ নাই, তুমি পৌত্তলিক। তুমি খ্রীষ্টান, তোমার ধারে বসিলেও ব্রাহ্মের অকল্যাণ হয়, কেননা, তুমি উপধর্ম্ম মানিয়া চল। হায়, হায়, হায়, এইরূপ করিয়া অহঙ্কার ব্রাহ্ম-শিশুদিগকে বধ করিতেছে। আমি শত মুখে বলিব, এই অহঙ্কার ও সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষার মূল বিদ্যালয় সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ। সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজে নিন্দুকের আদর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এখন নিন্দুকের দলে পরিপূর্ণ! নিন্দা-বিষে ব্রাহ্মসাধারণ জর্জ্জরিত!

এই সকল কথা ভাবিলে সেকালের এবং একালের ব্রাহ্মের পার্থক্য বুঝা যায়। সেকালের ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ, রামতনু, রাজনারায়ণ, ইঁহাদের সমতুল্য লোক আর নাই। মধ্য-যুগের ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, উমেশচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শিবনাথ ভুবনমোহন প্রভৃতি। কেশবচন্দ্র বাদে এই সকল মহাজনগণের সকলেই জীবিত। এখনকার নব্য ব্রাহ্ম, হিংসা বাবু, ক্রোধ-বাবু, পরনিন্দা-বাবু, বিলাসিতা বাবু, প্রতারণা-বাবু, অহঙ্কার-বাবু। এই নব্য ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহই আর ঐ সকল মহাত্মাদিগের মহত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতেছেন না। কারণ কি? কারণ এই,—সকলের ধারণা হইয়াছে,—সকলেই সমান, সকলেরই সমান অধিকার। আর কারণ এই—পরনিন্দার গরল পান করিয়া সকলেই বুঝিতেছেন, অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই দোষ আছে, কেহই মহাপুরুষ নহেন। সাক্ষাতে কেহ কাহারও দোষ বলিবে না, ছোট ছোট ছেলেরাও অসাক্ষাতে বলিবে, মহর্ষির এই দোষ, প্রতাপবাবুর এই দোষ, শিবনাথ বাবুর এই দোষ। সাম্যশিক্ষার বিদ্যালয়ে বৈষম্য শিক্ষা যে দিতে চায়, তাহার লাঞ্ছনার শেষ নাই। একটু একটু এখন এই বৈষম্য শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া শিবনাথও অপদস্থ হইতেছেন; এবং বুঝিবা মনস্তাপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্ব ছাড়িয়াছেন। দোষ-কীর্ত্তন শিক্ষাই এখন ব্রাহ্ম-সাধারণের বিশেষ শিক্ষা। সুতরাং চরিত্রানুপ্রাণন এ যুগে অসম্ভব। এ যুগে নিজের স্বার্থ সাধন, স্বাধীনতার [illegible]

স্বেচ্ছাচার, এই সকলই আদর পাইবে। পতনের আর কি অবশেষ আছে?

হিন্দু সমাজের লোকের বিশ্বাস, শত পাপ করিয়া গঙ্গাস্নান করিলে তাহা ক্ষালন হয়। এই বিশ্বাসে অবাধে সম্বৎসর সকলে পাপ কার্য্য করে, বৎসরান্তে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হয়। ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছে, মাঘোৎসবে চক্ষের জলে ভাসিয়া মাতামাতি করিলেই সকল পাপ দূর হয়। এই বিশ্বাসে সম্বৎসর ধরিয়া লোকেরা যাহা তাহা করে, মাঘোৎসবের সময় মহা ধুমধামে কান্নাকাটীর হাট বসাইয়া উদ্ধার হওয়ার আয়োজন করে। ভ্রান্ত বিশ্বাস। যাহার অন্তর পরিশুদ্ধ হয় নাই, শত গঙ্গাস্নান তাঁহার কি করিবে? সেই প্রকার, তাহা... ...ন্তর পবিশুদ্ধ হয় নাই, শত অনুষ্ঠান বা ...াৎসব তাহার কি করিবে? বৃথা ... থা ক্রন্দন। প্রকৃত চরিত্রব ...কর অভ্যুদয় দেখিতেছি না ...র মুখ অবনত হয়, সাধারণ ব্রাহ্ম... ...টীও মানুষের মত মানুষ—একটীও প্র... ...বিশ্বাসী ধার্ম্মিক সৃজন করিতে পারে নাই। এমন একটীও ধার্ম্মিক সৃজন করিতে পারে নাই, যাহার রাগ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই, যিনি চরিত্রে অটল, ভক্তি বিশ্বাসে উজ্জ্বল, যিনি বিলাসিতা-হীন ও সংযমী বীর। বরং যে সকল ধার্ম্মিক ইহার আশ্রয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দূরে যাইতে বাধ্য করিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ, রামকুমার, শিবনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে আর কাহাকে কাহাকে দূরে যাইতে বাধ্য করিয়াছে, ভবিষ্যৎবংশীয়েরা সে বিচার করিবে। মত নিরপেক্ষতা এবং সহিষ্ণুতার অভাবে, এই সমাজ ক্রমে ক্রমে অতি সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ স্থানে আশ্রয় লইতেছে। মফঃস্বলের সমাজ সকল উঠিয়া যাইতেছে, যাহা আছে, তাহার সহিতও যোগ ছিন্ন হইতেছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্বেচ্ছাচারিতা ও ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের নিশান উড়াইয়া সত্বরে কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব কাণ্ডের আয়োজন করিতেছে। সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, মত দৃঢ়তাহীন, চরিত্রনীতিও ধর্ম্মহীন—কিম্ভূত-কিমাকার এক জীব শ্রেণীর অভ্যুদয় হইতেছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এখন মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এখন মরিয়া বাঁচিতে ইচ্ছা হয়। তেব দেখিয়াছি, এখন মরিতে পারিলেই বাঁচি।)

সাহিত্য-সম্বাদ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাঙ্গালা শব্দ সমালোচনার জন্য একটী সমিতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কল্পনা যদি কার্য্যে পরিণত হয় তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এ একটী প্রধান ঘটনা। আজকাল নূতন পুঁথি আবিষ্কৃত হইতেছে। সন তারিখ না থাকিলে পুঁথির ভাষা দেখিয়া গ্রন্থ রচনার সময় নির্দ্দেশিত হইতেছে। অথচ বাঙ্গালা ভাষার স্তর পর্য্যায় এখনও নির্ণীত হয় নাই। বীরভূম, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কুমিল্লা, মৈমনসিংহ বা চট্টগ্রামে সাধারণ লোকের মধ্যে যে ভাষা এখনও প্রচলিত রহিয়াছে, সে ভাষায় কেহ একখানি বই রচনা করিলে, তাহা কলিকাতা ও হুগলীর লোকের নিকট প্রাচীন পুঁথি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আমরা এখানে একটী উদাহরণ দেই।

"হাটৎ গোটাল পয়সা নিম"

কলিকাতা অঞ্চলের সহস্রে একজন এ ভাষা বুঝিবেন কি না সন্দেহ। অথচ এই ভাষা এখন দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচলিত। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার স্তর-পর্য্যায় সম্যক নিরুপিত হইলেও কেবল ভাষা পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থের রচনা কাল নিরূপণ করা নিরাপদ নহে। প্রদেশীয় ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা ও ক্রম-পর্য্যায় নিরূপণ হওয়া আবশ্যক। গ্রীয়ারসন সাহেব গবর্ণমেণ্টের আদেশে প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার নমুনা যদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে শব্দ-সমালোচনার সাহায্য হইতে পারে। যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে কালক্রমে সব জেলার ভাষা ন্যূনাধিক একরূপ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। তখন প্রদেশীয় ভাষার অমিশ্র উদাহরণ সংগ্রহ করা কঠিন হইবে। প্রস্তাবিত নমনা সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার নহে। একটী আখ্যায়িকা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রার্থনা করিলে সদাশয় শিক্ষিত লোকে সহজে সে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। কতকগুলি নিত্য ব্যবহৃত শব্দের বিভক্তি ও ক্রিয়ার তালিকা করিয়া দিলে প্রদেশীয় ভাষায় তাহার প্রতিরূপ সংগ্রহ করা সহজ হয়। মুরসিদাবাদ অঞ্চলে কোথায় কোথায়ও ইঁদুরকে "আলোক ধেড়ে" বলে। দিনাজপুর অঞ্চলে শাকের "ঘণ্টকে" শাকের "প্যালকা" বলে। ভাষার নমুনা ও শব্দের তালিকা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সংগৃহীত হইলে তবে শব্দ-সমালোচনার সুবিধা হয়। এডুকেশন্ গেজেটের সুযোগ্য সম্পাদক কছুদিন উড়িয়া, মারহাট্টা ও আহমী ভাষার নমুনা প্রতি সপ্তাহে পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সহিত ঐ সকল ভাষার আদান প্রদান সম্বন্ধ আছে। হিন্দী ও উড়িয়ার সহিত আমাদের যত নিকট সম্বন্ধ, মারহাট্টার সম্বন্ধ তত নিকট না হইলেও, শ্রীক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির সমাগম স্থলে মারহাট্টার নিকটও আমরা উপকৃত হইয়াছি। বর্গীরা যেমন ক্ষতি করিয়াছে, তেমন উপকারও করিয়াছে। ইহার একটী উদাহরণ দেই। উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব লিখিবার সময় স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র আমাকে "গুণ্ডিচা" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। রথের সময় জগন্নাথ দেবকে মন্দির হইতে লইয়া রথে চড়াইয়া ক্রোশান্তে একটা বাগান বাড়ীতে রাখা হয়। পুনযাত্রায় সেখান হইতে মন্দিরে ফিরাইয়া আনা হয়। টীকে বাঙ্গালী যাত্রীরা "মাসামার ব ড়িয়ারা "মৌসীমাঘর" বলিয়া থাকে াকে গুণ্ডিচা শব্দে অভিহি রহাট্টা ভাষার সাহায্য লইয়া যেরূপ অর্থ করি, উড়িষ্যার দ্বিতীয় খণ্ডে ডাক্তার বাহাদুর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মারহাট্টা ও বাঙ্গালা শব্দের তুলনা করিয়া এ সম্বন্ধে যে সাহায্য করিয়াছেন, পণ্ডিতেরা তাহা চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিবেন। অনার্য্য ভাষার নিকটেও বাঙ্গালা ভাষা কিছু ঋণী আছে। "আঁকুপাকু" শব্দের সমালোচনায় এডুকেশন-গেজেটের স্তম্ভে এ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শব্দ-সমালোচন-সমিতি উপযুক্ত ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিলে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট উপকার হইবে।

"মাণিক চাঁদের গান" রঙ্গপুর অঞ্চলে

প্রচলিত। গ্রীয়ারসন সাহেব ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় সে গানটী প্রকাশিত করেন। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, গানটী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত। এ গানে চৈতন্য নিত্যানন্দের নাম সংযোজিত আছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে বাবু দীনেশ চরণ সেন বখতিয়ারের আক্রমণের পূর্ব্বে, বাঙ্গালা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বে, যখন বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক আচরণে পরত (৮০০—১২০০ খ্রীঃ) তখন এই গানটী রচিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে সকল বিবরণে গানটীকে নবরচন বলিয়া বোধ হয়, সে বিবরণগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তিনি বাদ দিয়াছেন। কেবল ভাবের ও ভাষার উপর নির্ভর করিয়া তিনি গ্রীয়ারসন নির্দ্দিষ্ট সময়ের চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে "মাণিক চাঁদের গানের" সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথচ সে গানের ভাষা অদ্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত। বৌদ্ধভাব ও হিন্দুভাবের পার্থক্য জাতীয় জীবনে বা সাহিত্যে নির্দ্দেশ করা যে প্রখর ও সূক্ষ্ম বিবেচনার কার্য্য, কিছুই তিনি করেন নাই। যদি কেহ বলেন, মাণিক চাঁদের গান ঊনবিংশ শতাব্দীতে রঙ্গপুর অঞ্চলে রচিত হইয়াছে, আমাদের বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না। বিম্ব দাড়িম্ব কদম্বের তুলনা নাই, সুতরাং রচনা প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্ব্বতন—এরূপ প্রমাণ যথেষ্ট নহে। প্রাচীন বাঙ্গালায় বুদ্ধদেবের প্রতি অবজ্ঞা আছে, ইহাতে নাই—এ প্রমাণের প্রথম অংশটুকুর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। যে দেশে কড়ি দিয়া বিনিময়কার্য্য পূর্ব্বে হইত এবং অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে দেশে কড়ি দিয়া রাজকর দিবার প্রথার উল্লেখ দেখিয়া সাত আট শত বৎসর অগ্রসর হইবার কারণ দেখা যায় না। এইরূপ মতবাদ দেখিলে ভাষা সমালোচনার আবশ্যকতা যথেষ্ট অনুভূত হইবে, সেইজন্য আমি এ কথার উল্লেখ করিলাম। মাণিক চাঁদের গানের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ভাবিও রামের নাম চিন্তিও এক মনে
লইলে রামের নাম কি করিবে যমে॥
অধমে না নৈল নাম জীবের আলিসে
অমৃতের ভাণ্ড তন্ন গরাসিল বিষে॥
পেটে থাইতে যে জন রামের নাম লয়
ধনুক বাণ লৈয়া রাম ভক্ত সঙ্গে যায়॥
রাম নামের নৌকা খান শ্রীগুরু কাণ্ডারী
দুই বাহু পসরিয়া ডাকে আস পার করি॥
রামের বন্দন হইল মস্তক উপর।
থুইয়া রামের গুণ সিদ্ধার গুণ গাই
যাকে বন্দিলেই সিদ্ধি পাই॥
মাণিক চন্দ্র রাজা বঙ্গে বড় সতি
হাল থানায় মাসডা সাধে দেড় বুড়ি কড়ি।*
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায়
অষ্টমী পূজার দিনে পাঁটা গোটে লয়।
খড়ীবেচা হিয়ে যে খড়ী ভার যোগায়
তার বদলী ছয় মাস পাল খায়॥
পাতাবেচা যে পাত আটি যোগায়
তারে বদলী ছয় মাস পাল খায়॥
ঐত মাণিকচন্দ্র রাজা সরুয়া নালের বেড়া
একজন লেকজন কেবে যে খাইছে তার
দুয়ারত ঘোড়া।
ঘিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া।
কারো মাডাল কেহ না যায়
কারো পুষ্করীর জল কেহ না খায়॥
ভাটি হৈতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলক কৈল কড়ি।

আছিল দেড় বুড়ি খাজনা লৈল পোনার গণ্ডা ॥
নাঙ্গল বেচায় জোঙ্গাল বেচায় আরো
বেচায় ফাল
খাজনার তাপতে বেচায় দুধের ছাওয়াল।
রাঁড়ি কাঙ্গাল দুঃখীর বড় দুক্ক হইল
থানে থানে তালুক সব ছন হইয়া গেল।
ছোট রায়ত উঠে বলে বড় রায়ত ভাই
প্রধানের বরাবর সবে চল যাই।
কি আজ্ঞা বলে প্রধান সকল।
যেত রায়ত পরামস করিয়া প্রধানের বাড়ী
বৈলে চৈলে গেল।

গানটী দীর্ঘ। পড়িলে আমোদ পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, ভাব ও ভাষা দেখিয়া দীনেশ বাবু মুসলমান আমলের বহু পূর্ব্বে এই গানের রচনা কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, মুসলমান আমলের বহু পূর্ব্বে কি এই শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল? "হালখানা" "মাসড়া" 'খাজনা' "মুলকৎ", "তালুক" "বরাবর"?

এবার পারিশ নগরে ওরিয়েণ্টাল কন গ্রেসের (International congress of orientalists) মিলন হইয়াছিল। এই সভায় মুসো বলী জয়দত্ত ও নকুল রচিত পশু-চিকিৎসা গ্রন্থ সম্বন্ধে, মুসো স্পেয়া প্রাচীন ভারতে অক্ষক্রীড়া সম্বন্ধে, মিঃ সিবেল প্রাচীন তামিল সাহিত্য সম্বন্ধে, মুসো গেলা সিংহলের ব্যাধ জাতি সম্বন্ধে, বুদ্ধঘোষ প্রণীত মনোরথ পূরণীতে উল্লিখিত কুজ্জুত্তরা ও শামবতী আখ্যায়িকা সম্বন্ধে আচার্য্য হার্ডী, জৈমিনীয় গৃহ্য সূত্র ও শ্রৌত সূত্র সম্বন্ধে আচার্য্য বুহলর, ব্রাহ্মণ ও সবিত্রী সম্বন্ধে কৌণ্ট গুবর্ণতী, গান্ধারে হুয়েন্থ সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে মুসো ফুচা এবং ভরত বংশ সম্বন্ধে অপার্ট সাহেব এক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। অপার্ট সাহেব বলেন, ভরত বংশের সহিত ত্রিৎসু বংশীয়দিগের জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ ছিল না। ভরত বংশীয়েরা অনার্য্য সামরিক জাতি। কাম্বোডিয়ার রাজা যশোবর্ম্মা সম্বন্ধে মুসো আয়মুনে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। কাম্বোডিয়ার গিরিলিপি প্রাচীন হিন্দু চরিত্রের নূতন চিত্র প্রদর্শন করে। সে হিন্দুগণ চিন্তাশীল দার্শনিক পণ্ডিত নহেন, পরবাষ্ট্র জয়ী সমর কুশল বিজেতা। ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার নমুনা সংগ্রহে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, গ্রীয়ার্সন সাহেব একটী প্রবন্ধে তাহা বর্ণন করেন। উদয়পুরের মন্দির গাত্রে যে সকল খোদিত লিপি আছে, বেবর রাবিটী তাহাদের সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাক্তার লুয়েডা বলেন, জাতকের গদ্যাংশ গাথা অংশের পরবর্ত্তন এবং এ অংশ সিংহলে রচিত হইয়াছিল। সিংহলবাসী বিক্রম সিংহ —মহাবংশের অনুবাদক সিংহলী অক্ষরের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে, ডাক্তার ওয়ারটেল জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে, মুসো লাবানী পুর্সি বৌদ্ধ অনুত্তর যোগতন্ত্র সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মহা মহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তিনটী প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেগুলি পড়িবার সময় হয় নাই। আচার্য্য রিসডেবিস একটী প্রবন্ধে বলেন যে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের উৎপীড়ন কথা অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই। ভাবরা অশোক শাসনে "অনাগত ভয়ানী" একটী শব্দ আছে, জৈন গ্রন্থে "অবশ্যীয়া" এবং "নিশিবিচয়া" দুটী শব্দ আছে, ইহাদের অর্থ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। এই সভায় কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান। ভারতীয় নাট্য শাস্ত্র, আপ

স্তবীয় মন্ত্রপাঠ, শিক্ষা সমুচ্চয় এবং রাজতরঙ্গিণী। রুসিয়ার সম্রাটের সাহায্যে "বিব্লিয়থিকা বুদ্ধিকা" নামে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইতেছে। বিলাতের পালী গ্রন্থ সভা যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিবেন না, রুস বৌদ্ধ গ্রন্থ সভা হইতে সেই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। শিক্ষা সমুচ্চয় ইহারাই প্রথম খণ্ড। ধর্ম্মপদ নামক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের খরোষ্ট্রী অক্ষরে লিখিত একখানি হস্ত লিপির কিয়দংশ এক ফরাসী পণ্ডিত মধ্য আসিয়ায় এবং এই গ্রন্থেরই অপর অংশ এক রুস পণ্ডিত ঐ স্থানে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সভায় এই দুই অংশ একত্র করা হইয়াছিল। পুঁথিখানি অতি প্রাচীন, ভাষা পালী, অশোক পালীর সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে, এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত কোন পালীর সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই, পুঁথিখানি ভূর্জ্জপত্রে লিখিত। প্রাচীন উদ্যান বা বর্ত্তমান সোয়াট প্রদেশে বিবিধ বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের প্রতিকৃতি ডাক্তার ওয়াডেল দেখাইয়াছিলেন। মহাভারতের একখানি প্রাচীন হস্তলিপি দেখান হইয়াছিল। মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়া বিস্তর পাঠান্তর ধরা গিয়াছে। এবং মহাভারতের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

এ মাসে বাঙ্গালা ভাষায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :—

১। ৺জয় নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন সঙ্কলিত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ২য় সংস্করণ।

২। দৈনিক সম্পাদক বাবু ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত প্রণীত মদনমোহন॥

৩। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত কবিরাজী শিক্ষা।

৪। বাবু ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত আলিবাবা (প্রহসন) ও প্রেমাঞ্জলি।

৫। বাবু সতীশ চন্দ্র রায় এম, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত পদকল্পতরু তিন খণ্ড।

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইয়াছি।

১। বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক বাবু বিহারীলাল সরকার প্রণীত তিতুমীর।

২। জন্মভূমি সম্পাদক—বাবু যোগেশচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত বঙ্গের শেষ বীর।

৩। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত কমলকুমার।

৪। শ্রীকৃষ্ণবিহারী দাস গুপ্ত প্রণীত জ্যামিতিসার।

৫। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত বি-এ, প্রণীত। যুবক বন্ধু।

৬। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত রাজা হরিশ্চন্দ্র।

৭। শ্রীরসময় লাহা প্রণীত পুষ্পাঞ্জলি।

৮। শ্রীবিহারীলাল মিত্র প্রণীত প্রেমরহস্য।

৯। শ্রী রাধাগোবিন্দ কর প্রণীত রোগিপরিচর্য্যা।

১০। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার প্রণীত শালফুল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বঙ্গভাষা।

আহা, দীনা বঙ্গভাষা!
ভাঙ্গে নাই যেন তন্দ্রার অলস,
মুছে নি শীতের কুহেলি-তমস,
কেবল উষার অরুণ-পরশ
বহিয়া আনিছে আশা;
আহা, দীনা বঙ্গভাষা!
আহা, দীনা বঙ্গভাষা!

আধখানি কথা ফুটিছে শরমে;
আধখানি ব্যথা লুটিছে মরমে,
ঝলকি ঝলকি তবু মধুক্রমে,

ক্ষরিছে তমসানাশ :
আহা, দীনা বঙ্গ-ভাষা !
ছিলে মুগ্ধা কামপুষ্পিত শয়নে,
শিরিষকোমল অলস রচনে,
ভাঙ্গিল কুহক, দুন্দুভির স্বনে
জাগিয়া উঠিলে কবে ?
রৌদ্র, বীর-রসে উঠিলে মাতিয়া,
বাঁশরী-আলাপ ক্ষণেক ভুলিয়া,
তেজস্বিনী সমা দিলে কাঁপাইয়া,
বিস্ময় মানিনু সবে !

শুনাইলে ব্যাস, বাল্মীকি ঐ বঙ্গে,
ডুবিল কৌরব বিদ্বেষ-তরঙ্গে,
পিতৃসত্য লাগি ভ্রাতা ভার্য্যা সঙ্গে
হন রাম বনবাসী !

দেখাইলা—ভীষ্ম, পার্থ, যদুপতি,
দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী সতী ;
উদিল তৃষিত বঙ্গে জ্ঞানজ্যোতি,
নিবিড় তমিস্র নাশি।

আবার যথায় ব্রজকুঞ্জবন,
"ললিত লবঙ্গলতাপরিশীলন—"
ভুলিয়া,—শুনিব গাহিছে কেমন,
তোমার বৈষ্ণব কবি ;—

"সহিতে না পারি' মুরলীর ধ্বনি—"
প্রেমে মাতোয়ারা ধায় গোপধনি,
দেখিব তথায় রাধা, ব্রজ-মণি,
ভক্তের 'মাধুর্য্য ছবি।'

প্রতীচ্য প্রাচ্যের ভাব সংমিশ্রণে,
সেজেছ কি এক অপূর্ব্ব-শোভনে ;—
ধ্রুবজ্যোতি সম উজলি কিরণে
সাহিত্য-জগদাকাশে !

মধুর ভাণ্ডার আনিলে লুটিয়া,
ত্রিদিবের গন্ধ আনিলে বহিয়া,
নব আনন্দে উঠিলে ফুটিয়া,
কোমল কোরকাবাসে !

অয়ি সালঙ্কার ! স্বভাব সুন্দরি !
মধুর, করুণ রস-অবাশ্বরি !
কবিতার চির-প্রিয়-সহচরি
যেয়ো না উন্মাদ-লাজে !

ধন্য, ধন্য, হে ভাববৈচিত্রে
নহ তুমি দীন,—তব ছন্দে ছন্দে
যৌবন পুলক ; তব পদে পদে
বসন্ত ঢুমিয়া আছে !

শ্রী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

উপেক্ষায়।

কি জানি কিসের তরে পরাণ গিয়াছে ছেড়ে
হেথায় পড়িয়া আছে খোসা খানি তার,
চোকের পলক দিয়ে বেঁধে গেছে ধোকা দিয়ে
বসে আছে তাই চেয়ে শীর্ণ কলেবর।
সে নাকি চোকের ভ্রম, জলন্ত অনল সম
জ্যোতিতে নীহার দেখে নয়ন তরল।
আবেশ তরঙ্গ ছুটে আঁখি কুলে ফুটে ওঠে
নীরবে গড়ায়ে পড়ে এক ফোঁটা জল।
ছোট্ট ভাঙ্গা প্রাণ খানি যতনে তুলিয়া আনি
সে খোসায় পূরে দিতে চায় মন্দ প্রাণ।
পারেনা সাহস ভরে শেষে পাছে ভেঙ্গে চুরে
সাধেতে সাধিয়া বাদ হয় খান খান।
নিজের পরাণ লয়ে চুপে এক পাশে গিয়ে
পরাণের কথা গুলি গেঁথে দিতে চায়।
খুঁজিয়া হৃদয় খানি না পায় কোথায় জানি
গিয়াছে ; কাঁদিছে বসি কার উপেখায়।
হায় এ খোসার পাশে খোসাই বসিয়া আছে,
পরাণ ছাড়িয়া গেছে না জানি কোথায়॥
সুমধুর জ্যোছনায় ধরিয়া চুমিতে চায়
আঁখির জ্যোতিতে মিশি কোথায় লুকায়।
শরত চাঁদিমা রাশি কি হইবে ভালবাসি
কেজানে মেঘের খেলা না জানি কোথায়।

ভাঙ্গা প্রাণে মৃদু আলো রয়েছে যা' এই ভাল
অধর নয়নে তার কভু দেখা যায় ;

মরমের কথা গুলি যতনে ঢাকিয়া ফেলি।
নীরবে দেখিছে তায় সরমের কোলে।

পবিত্র মুকুতা চয় জনম লইলে তায়
যতনে ফেলিছে ছিঁড়ি,(পাছে)লোকে কিছু বলে

ভিতরেতে ফল্গুনদী বহিতেছে নিরবধি
উপরে বালুকা রাশি ফেলেছে ঢাকিয়া।

কত শত পদতল দলিতেছে অবিরল
ভিতরে শীতল জল হায় পাশরিয়া।

আধ ভাঙ্গা চোক দুটী পাতার আড়ালে লুটি
কার আশে মিটি মিটি সদা সচঞ্চল।
দেবে বলি যত্ন করি বসে আছে হাতে ধরি
ক্ষুদ্র একটী প্রাণ অমল কোমল।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

কাক-জ্যোৎস্না।

১

আবরি অম্বর
ফুট জলধর
ঢাকা শশধর
মিটি মিটি কর
উষার প্রায়,

২

অনিল নিথর
যত তৃণ জড়
স্তব্ধ তরুবর
আঁকা পটপরে
দিকের গায়।

৩

দ্বিপহরা নিশি
কি কুহক পরশি
মোহ ধারা বরষি
চেতহরা দিশি
অবাক দেখা।

৪

অচেতন নর
না চরে খেচর
যেন চরাচর
কবিতা ছত্র
মূরছা লেখা।

"শ্রীবঁাট।"

বালিকা।

উষার অধর-প্রান্তে বাল-অরুণের
প্রথম হাসিটী যেন বিশ্ব-বিমোহন;
কি মধুর জাগরণ শান্তি কণিকের
মানবের প্রাণে প্রাণে করে উদ্বোধন।
শরতে দূর্ব্বার শিরে নির্দ্দোষ—নির্ম্মল
পরশ-বিহীন যেন শিশিরের কণা;
আপন গৌরবে স্নিগ্ধ মধুর উজ্জ্বল,
অথচ একটু তাপ গায়েতে সহেনা।
ব্রত-অবসানে যেন ত্রিদিব-বালার
ভাসাইয়া দেয়া ফুল—দেব-নিবেদিত
পুণ্যময় স্মৃতিটুকু; অশুচি ধরার
বক্ষেতে আসিয়া হায় হয়েছে পতিত!
নির্ব্বাত নিষ্কম্প স্থির উদার সরল
মহাসাগরের মত পড়ি বক্ষঃস্থল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত।

সতত সৌভাগ্যরূপ সুধা সরোবরে,
বিকচ কনক-পদ্ম তুমি, হে রাজন্।
শৈশবে নিরখি তব চারু চন্দ্রানন,
লক্ষ্মীর পড়িল দৃষ্টি তোমার উপরে;
করিলেন কোলে মাতা সেইক্ষণে। পরে
জীবনের পথে যত করিছ গমন,
সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে যশঃ, মান, ধন।
এ সংসারে কজন এ তিনে লাভ করে?
কার্য্য তৎপরতা, আর সংকল্প সাধন,
এই দুই অস্ত্র তব সংসার-সমরে,
যার বলে, হে ভূপতি কুলের-ভূষণ,
জয়ী তুমি কার্য্যক্ষেত্রে ধন্য তুমি নরে!
তব বংশ-পটে লেখা রবে অনুক্ষণ
"মহারাজা সূর্য্যকান্ত" নাম স্বর্ণাক্ষরে।

শ্রীরাঃ

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা।

৩২। ভূপ্রদক্ষিণ—পরিব্রাজক শ্রীচন্দ্রশেখর সেনের ভূপ্রদক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শন, শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ৬১নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ডায়মণ্ড জুবিলী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ টাকা। গ্রন্থকারের কয়েকটী ভ্রমণ বৃত্তান্ত নব্যভারতে

প্রকাশিত হইয়াছিল। ঘরপ্রিয় বাঙ্গালী ঘর ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারেন, চন্দ্রশেখর বাবু তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়কে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। প্রায় আট শত পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইয়াছে। এত বড় একখানি বই লিখিতে তাঁহার পরিশ্রমও যথেষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, রুষ, লাপলাণ্ড প্রভৃতি সমগ্র য়ুরোপ এবং আমেরিকা, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে গ্রন্থকারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। পড়িলে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যায়।

চন্দ্রশেখর বাবু নব্যভারত পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ। তিনি আমাদিগের উপকারী বন্ধু। এস্থলে আমাদের দ্বারা তাঁহার অধিক প্রশংসা-প্রচার শোভা পায় না। আমরা সঙ্কুচিত ভাবে বিশেষ সতর্কতার সহিত দুই একটী কথা লিখিতেছি। এ পুস্তকে এত বিষয় বিষদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, যিনি পড়িবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থকারের রচনাপ্রণালীর এবং ভাষার আমরা তেমন সুখ্যাতি করিতে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখিত। বিভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত বিভিন্ন স্মারক চিহ্নে চন্দ্রশেখর বাবুর গৃহ সুশোভিত। তাঁহার মুখে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হয়। ভ্রমণকারীর সাহস, অধ্যবসায় ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা তাঁহাতে যথেষ্ট আছে। কিন্তু চিত্রকরের চারুকৌশল তাহাতে নাই। সুমেরু প্রান্তে নগর জনপদ শূন্য, নরনারী শূন্য, তৃণ লতা শূন্য বরফ রাশির উপরে কঠোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ন্যানসেন লিখিয়াছেন, পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছে, আখ্যায়িকা পাঠেও এমন উৎসাহ হয় না, কখন ভাবের আবেশে চক্ষে জলধারা বহিয়াছে, কখন মনুষ্যত্বের মহিমায় আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি। আর ধনজন পরিপূর্ণ কোলাহলময় জীবন্ত গ্রাম নগরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বাবু চন্দ্রশেখর সেনের হস্তে ম্লান, মৃত ও শীতল হইয়া পড়িয়াছে; এ দুঃখে আমরা ম্রিয়মাণ। তবে একথা আমরা নিঃসন্দেহে লিখিতে পারি, ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশের বিবরণ এমন বিস্তৃত রূপে কোন বাঙ্গালী গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষায় আজপর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। এজন্য চন্দ্রশেখর বাবুকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। এত অর্থ ব্যয় এবং প্রভূত পরিশ্রম করিয়া তিনি যদি এদেশে আদর ও সম্মান না পান, তবে বড়ই পরিতাপের কথা তাঁহার উদার মত, নিরপেক্ষ পরিদর্শন-মন্তব্য, সহৃদয়তা, যাহা বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থে আছে, তাহা পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয় এবং চন্দ্রশেখর বাবুকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। এই গ্রন্থ প্রচার দ্বারা বিদেশ ভ্রমণে একজন লোকের ইচ্ছাও যদি জাগ্রত হয়, তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

৩৩। **পরিমল**—শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট বিলাতী বাধাই ১৷৷০, বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের আমরা যে প্রশংসা করিয়াছি তৎপর অধিক আর কিছু বক্তব্য নাই। দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম যে, এই পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণের তুলনায় ইহা প্রায় নূতন গ্রন্থ। গ্রন্থকারের প্রতিভা ও কৃতিত্বের স্ফুট বিকাশ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

৩৪। ঊষা।—বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। বাবু যোগেন্দ্রনাথ নব্যভারত-পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার কবিতা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। নব্যভারতে তাঁহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া অধিক কথা বলিতে আমরা সঙ্কুচিত, কিন্তু সত্যের অনুরোধে কিছু বলিতে হইল।

পুস্তকখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে সর্ব্বাগ্রেই ইহা লক্ষিত হয় যে, গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে প্রাচীন কবিদিগের রীত্যানুসারে 'মধুরেণ আরভেৎও মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই দুইটী বাক্যের স্বার্থকতা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের প্রথমেই "উৎসর্গ" এবং পুস্তকের শেষে শান্ত "শীর্ষক কবিতা। এ দুইটী কবিতাই অতীব মধুর, গভীর ভাব পূর্ণ ও প্রগাঢ় ভক্তিব্যঞ্জক। এ দুইটী কবিতাতেই লেখক যেমন কবিত্বের তেমনই ভাষাচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই দুইটী কবিতা পাঠেই বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার স্বভাব কবি এবং কালে তাঁহার কবিত্ব আদর্শ স্থানীয় হইবে। কবির "উৎসর্গের" রচনা নূতন ধরণের এবং উৎসর্গের পাত্রটীও নূতন ধরণের। কবি ভাব ও ভক্তিতে গদ গদ তাই তাঁহার সুন্দর কবিতা গুলি

'কবিতা প্রসূনে যাঁর বিমণ্ডিত নীলাম্বর'
'ভাবের তরঙ্গে যাঁর তরঙ্গিত চরাচর'

তাঁহাকে বই আর কাহাকেও উৎসর্গ করিতে পারিলেন না। এই অত্যুৎকৃষ্ট সুমধুর উৎসর্গ রচনাতেও একটী দোষ ঘটিয়াছে। আমরা মনে করি, পাঠক পাঠিকা মাত্রেই সে দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন। কবি উৎসর্গের প্রথম পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আবার বেশী করিয়া লিখিতে যাওয়ায় এই দোষটি জন্মিয়াছে। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবি যতক্ষণ তাঁহার উৎসর্গের প্রথমাংশ লিখিতেছিলেন, ততক্ষণ তিনি ভক্তির স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছেন; সুতরাং ভাব-সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁহার সম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল। যখন প্রথমাংশ শেষ করিয়া শেষাংশে উপনীত হইয়াছেন, তখন তিনি ভক্তি স্রোতে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন; তাঁহার নয়নদ্বয় দৃষ্টিহীন; কাজেই ভাব-সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁহার লক্ষ্য একেবারেই হারাইয়াছেন। আমরা কবিতা পড়িতে বসিয়াছি, কেবল ভক্তি-স্রোতে ভাসিয়া ডুবিয়া সন্তুষ্ট হইব কেন? বিশেষতঃ এমন অপূর্ব্ব ভাবমাধুরী একবার পাইয়া কে হারাইতে চায়? আমাদের মতে এই সুমধুর উৎসর্গ রচনায়,

'মধ্যাহ্ন প্রদোষ ঊষা যাহার আরতি গায়,
তাঁহার চরণে আমি অর্পিলাম এ ঊষায়।'

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই কবির ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল। শান্ত শীর্ষক শেষ কবিতাটী, যাহার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রতি ছত্রে ছত্রে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রেম ও ভক্তি রসে সিঞ্চিত। উহা যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনই সুমধুর। কবিতাটী পড়িলেই বুঝা যায় যে উহা কবিবর হেমচন্দ্রের "দশমহাবিদ্যার" কোন কোন অংশের অনুকরণে লিখিত। এ অনুকরণের জন্য আমরা যোগেন্দ্র বাবুকে বিশেষ দোষ দিই না; কারণ হেমবাবুর দশমহাবিদ্যা পাঠ করিবার পর, মহাভক্ত নারদ ঋষির প্রেম ও ভক্তির বর্ণনে কবিতা লিখিতে গেলেই, ঐ অনুকরণ আপনিই আসিয়া যায়। হেমবাবুর

"আনন্দ ধ্বনি করি, মুখে বলি হরি হরি,
নারদ ঋষির সুললিত নয়নে,

অস্তাচলে, হেনকালে, ত্রিভঙ্গ নাচে তালে,
দিচে ত্রিভু গানে ত্রিভুবন প্রলাপে।”

ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুললিত কবিতা পাঠ করিলে কাহার শ্রুতি হইতে সে মাধুরী বা কাহার হৃদয় হইতে সে ভাবগাম্ভীর্য্য একেবারে বিলুপ্ত হয়? পক্ষান্তরে অনুকরণ করিতে বসিলেই বা কয়টী লোক তেমন সুন্দর অনুকরণ করিতে পারে?

“বেদনা” সমাপ্ত করিয়াই কবির সমুদ্র বর্ণনা পাইলাম। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থেরই এক এক প্রকার অতুলন সৌন্দর্য্য আছে; কিন্তু কয়টী লোক সেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়? দেখিতে পাইলেই বা কয়টী লোক সেই সৌন্দর্য্য আপন বর্ণনায় প্রতি-ফলিত করিতে পারে? যিনি জীবনে এক দিনের জন্যও বায়ু বিতাড়িত সমুদ্র বক্ষে বিচরণ করিয়াছেন কবির—

“উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত, ঊর্ম্মিমালা বিক্ষোভিত,
ফেনময় অনন্ত সাগর,
অট্ট অট্ট হাসে যেন, উদ্দাম তাণ্ডবে মাতি
শূন্যমনে করিছে সমর!”

এই কয়টী পংক্তি পাঠ মাত্রেই যে তাঁহার নয়নে সেই উত্তাল তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ ফেন-কণা পুঞ্জ সুশোভিত অসীম নীলাম্বুরাশি ভাসিয়া উঠিবে, ইহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। “সূর্য্যের সৃষ্টি” নামক কবিতাতে কবি মহতী কল্পনা শক্তির ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই কবিতা রচনায় সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্ট নামক প্রধান কাব্যের কোন কোন অংশের আভাস আসিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার কল্পনা সম্পূর্ণরূপে কবির নিজের এবং রচনাও সেই কল্পনার অনুরূপ।

“সহস্র সহস্র অদ্ভুত বিদ্যুৎ
ধায় চক্রাকারে ধাঁধিয়া আঁখি”

ইত্যাদি কয়েক পংক্তিতে সূর্য্য সৃষ্টির বিভীষিকা অতীব সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুইটী ও অপর দু একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাতে কবি বিশ্বস্রষ্টার অপার মহিমা কীর্ত্তনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

কবির স্বভাব বর্ণনা প্রকৃতিই মনোহর। জড় প্রকৃতির যে অবস্থা বা যে দৃশ্য বর্ণনে তিনি যেখানে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই খানেই তাহা অতীব সুন্দররূপে ফুটাইয়াছেন। প্রকৃতি সুন্দরীর রূপ বর্ণনে তাঁহার শব্দ বিন্যাস বা ভাব-লালিত্যের অভাব কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার বসন্ত যামিনীর কৌমুদী বসন ও শিরে চারুচন্দ্ররূপ শীতোজ্জ্বল সিন্দুর-বিন্দু, নবকিশলয় পরিদোদুল্যমান নয়নমোহন চাঁদের কিরণ, আর তিমির সাগরে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত সান্ধ্যআকাশের লোহিত দিনমণি, কল্পনামাত্রেই সকল হৃদয়ই অপূর্ব্ব আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। কবির বর্ণনা যেরূপ সুন্দর, তদনুরূপ মাঝে মাঝে দু একটী মনোমুগ্ধকর উপমাও দেখিতে পাওয়া যায়। উপমাগুলিতে কেমন একটু নূতনত্ব আছে, তাই উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শান্তিময়ী রজনীর তৃতীয় প্রহরে যখন সমস্ত জগৎ স্থির ও নিস্তব্ধ এখন

“কচিৎ শ্বাপদ শব্দ,
কচিৎ পেচক রব,
পক্ষ বিধূনন,
স্তব্ধতার রাজ্যে যেন
বিদ্রোহী প্রজার দল
করে কুমন্ত্রণ”

স্থানান্তরে নিষ্কাম নির্ম্মম সদানন্দময় চিত্ত যেন

“স্পন্দহীন ক্লেদহীন
তুষারের সম”

আবার নীলবসনাবৃতা কণকবরণী রাধারাণীর রূপমাধুরীর উল্লেখে—

"কিবা ক্ষীণ বিদ্যুতে, কণক তনুয়া,
কণক লহরী যাই
যেন অন্ধকারে, শরত ইন্দু
কিরণ উগারে তাই"

এই কয়টী অভিনব উপমাতেই তাঁহার উপমা-সৌন্দর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এইখানে আমাদের বলা কর্ত্তব্য যে, ভাব ও সৌন্দর্য্যের তরঙ্গে পরিচালিত হইয়া বন্ধুবর দুই একস্থলে উপমাতে প্রকৃত অস্বাভাবিকত্ব আনিয়া ফেলিয়াছেন। যখন আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন ও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসিতে থাকে, তখন তদুপরি আর রামধনুর উদয় সম্ভবে না। কিন্তু কবি অপরূপ শিখিপাখাধারী ভগবানের রূপরূপ বর্ণনস্থলে লিখিয়াছেন

"কিবা শোভে অঙ্গে শিখি-পাখা
শিখিপাখা শোভে শিরে,
ঘন কাল মেঘে দামিনী ঝলসে
রামধনু তদপরে"

এ উপমাটী কল্পনায় অতীব মধুর, ইহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু ইহার অস্বাভাবিকত্ব ইহার মধুরতাকে কয়েকাংশে বিলুপ্ত করিয়াছে।

বঙ্গীয় বালবিধবার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন কে না করিয়া থাকেন? বড় ছোট কত কবি কত নূতন নূতন ভাবে বালবিধবার দুঃখে কাঁদিয়াছেন; কিন্তু বালবিধবার চিরদুঃখময় জীবনের মধ্যেও যে তাহার হৃদয়ে সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করিতে পারে, ইহা কয়জন কবি দেখাইয়াছেন?

যার সরমে যেই সোণার কমল
ভাসিতেছে চিরদিন হয়ে বিমল,
করিছে বর্ষিছে যাহে পীযূষ নির্ম্মল
করিছে মানস মম আনন্দ আলয়'

বালবিধবার মুখ-বিনিঃসৃত এই কথা কএকটি কাব্য জগতে এক অতীব গম্ভীর ও উচ্চভাবের অবতারণা করিয়াছে। এই কয়টীই হিন্দু বালবিধবার আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের গূঢ় মন্ত্র।

কবি তাঁহার 'খুকু' টীকেও বেশ সুন্দর সাজে সাজাইয়াছেন। কিন্তু এ সাজে তাঁহার বিশেষ বাহাদুরী নাই। বঙ্গের আধুনিক সুমিষ্ট কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তাঁহার 'চাঁদ' ও 'তারা' গুলিকে লইয়া এবং তাঁহার সাজাইবার কায়দাটুকু পর্য্যন্ত শিখিয়া আসিয়া কবি আপন 'খুকু' কে সাজাইয়াছেন। সুতরাং এ সাজের প্রশংসা কতকাংশে রবিবাবুর প্রাপ্য।

অতঃপর কোন বিশেষ কবিতার বিষয় আর উল্লেখ না করিয়া আমরা সাধারণ মন্তব্য স্বরূপে কয়েকটী কথা বলিয়া এই সমালোচনা শেষ করিব। কবিতাগুলি রচনায় কবি ছন্দ-মাধুরী ও শব্দ-বিন্যাসের বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে কবির "স্বর্গের ছবি" ও "শোকসঙ্গীত" এই দুইটী কবিতাই প্রকৃত উদাহরণ স্থানীয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। একস্থলে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"পায়ের প্রণাম সেই জলদবরণ
বিস্তারি কোমল ভুজ-মৃণাল যুগল,
বেষ্টিল অন্তরীরে"

কবিকল্পনায় অনেক জিনিস দেখিয়াছি, কিন্তু পুরুষের ভুজমৃণাল এই প্রথম দেখিলাম।

প্রত্যেক একটী কবিতার রচনা বা কল্পনার ভাবগতিতে বেশ বুঝা যায় যে, সে গুলি গ্রন্থকারের যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসেই লিখিত।

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য এই যে, ভগবৎ-ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়ী এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অতীব মধুর ও প্রীতিকর হইয়াছে। ইহাতে ছন্দবিন্যাসই বলুন, আর ভাব বিন্যাসই বলুন কল্পনা বিন্যাসই বলুন সকল বিষয়েই বিশেষ উৎকর্ষ প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে সামান্য যে সমস্ত দোষ আছে, ইহার গুণেই তাহা ঢাকিয়া গিয়াছে।

৩৫। পৌরাণিকী—আলো ও ছায়া প্রণেতৃ প্রণীত। একলব্য ব্যাধ-তনয়। বড় সাধ দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। চণ্ডালের সন্তান বলিয়া ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে উপেক্ষা করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের এই জাতি-বিবেক-রহস্য বুঝা যায় না। গ্রন্থকর্ত্রী মহাভারতকে অতিক্রম করেন নাই। মহাভারত দ্রোণাচার্য্যের চরিত্র-রহস্য সম্যক প্রকাশিত করেন নাই। ব্রাহ্মণের সন্তান পেটের দায়ে ক্ষত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। পৈতৃক ব্রাহ্মণ

গুণ স্বোপার্জ্জিত ক্ষত্র গুণের সম্মিলনে কিরূপ ধারণ করিল, জানিতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা মিটে না, দ্রোণ-চরিত্র রহস্য পূর্ণ রহিয়া যায়। দ্রোণ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারি। সংখ্যায় হীনতর হইলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষ প্রকৃতই অধিকতর বলশালী ছিল। ভীষ্ম দ্রোণ দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিলে কাপুরুষতার দুরপনেয় কলঙ্ক তাঁহাদের ললাটে চিরদিনের জন্য লিপ্ত হইত। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, দুর্য্যোধন অবিনীত ও অসদাচারী জানিয়াও দ্রোণ ক্ষত্রতেজে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি সূতপুত্র কর্ণকে ধনুর্ব্বেদ শিখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, একলব্য চণ্ডালতনয় বলিয়া তাঁহাকে তিনি কেন উপেক্ষা করিলেন, তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, বুঝা যায় না। গ্রন্থকর্ত্রী দ্রোণ-চরিত্রের এ রহস্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন নাই। একলব্য নিষ্ঠা ও সাধনায় ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলে নীচাশয়ের ন্যায় দ্রোণাচার্য্য তাঁহার নিকট যে গুরুদক্ষিণা যাচ্ঞা করিয়া লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রন্থকর্ত্রী মহাভারতের পদাঙ্কে অনুসরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ চণ্ডালতনয় অনার্য্য একলব্য আর্য্যব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যকে আর্য্যগুণে অতিক্রম করিয়াছেন। আর্য্যরচিত মহাভারতই ইহার প্রমাণ-একলব্যের গুরুভক্তি ভীমার্জ্জুনের মোহকরী, সে গুরুভক্তির চিত্র এ ভক্তিবিহীন সাম্য স্বাধীনতার যুগে দেব-চিত্রের ন্যায় গৃহে গৃহে শোভা করে আমাদের কামনা। সে চিত্রখানি চিত্রকরী অদ্ভুত কারুকৌশলে রচনা করিয়াছেন;—

"তোমারে বরিয়া গুরু, রচি মূর্ত্তিতব-
এই মূর্ত্তি-আনিয়াছি তপস্যার বলে
তোমারে ইহার মাঝে, একাগ্র হৃদয়ে
তোমার সম্মুখে করিয়াছি শস্ত্রাভ্যাস,
লভিয়াছি নানামন্ত্র তোমারি কৃপায়।
* * * *
কি আমি কহিব দেব? তুমি গুরু মম,
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে
তুমি এ অযোগ্য জনে ধন্য করিয়াছ
জ্ঞান দানে, শক্তি দানে। না হয় উচিত
তব সনে বাক্যব্যয়। কহিও না ইহা
অধমের, কিন্তু কহ, সুধাই তোমারে
গুরুদেব, জ্ঞানশক্তি নিরর্থক হবে,
তবে সে কেমন শক্তি জ্ঞান? আধারের
গুণে পূত, অপূত বা হবে যে আধেয়
সে আধেয় না থাকিলে কি সে ক্ষতি কার?
তোমরা ধরার দেব, লহ দেব পূজা-
দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়গণে করিছ শাসন
ব্রহ্মতেজোত্তরে; বিপ্র, পবিত্র তোমরা,
মোরা তোমাদের নহি স্পর্শযোগ্য। কিন্তু
যেই জ্ঞান শক্তিরূপি, জাতির ভাণ্ডারে
আহরিয়া সঙ্গোপনে করিছ রক্ষণ,
যার গুণে দীপ্তিময়, ব্রহ্মমুখোদ্গত
শুভ আশীর্ব্বাদ সম বেড়াও ভূতলে
জীবের কল্যাণ সাধি-মানেনা সে জ্ঞান
দ্বিজ শূদ্র বর্ণ আধারের। জানি আমি
শূদ্র শূদ্র, ক্ষত্র ক্ষত্র, বিপ্র বিপ্র হয়
জ্ঞান-পরিমাণ বলে। অস্পৃশ্য আছিনু
ইতি পূর্ব্বে, আছিলাম অযোগ্য তোমার
শিষ্য হইবার; শিষ্য স্পৃশ্য আমি আজি
ভগবন,—কর মোরে কর আশীর্ব্বাদ।"

ভয় ভাবনা সন্দেহ জীব জীবনে অবশ্যম্ভাবী। কঠোর সাধনায় একলব্য এ নিত্য-সম্ভাবী অন্তরায় হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। সেই বিপদের সময়ে একটী আকাশবাণী তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল। সেটী প্রকৃত দেব-সঙ্গীত।

আছে এ জগতে, আছে এ জগতে
গৌরব মণ্ডিত সিদ্ধি স্থান
বাসনা থাকিলে, যেতে পথ মিলে
কে যাবে, কার ব্যাকুল প্রাণ?
আছে এজগৎ মাঝারে গোপনে
গৌরব মণ্ডিত সিদ্ধি স্থান,
বাসনা থাকিলে যেতে পথ মিলে
কে যাবে কার কেঁদেছে প্রাণ?
সেথা জনমে বরণে নাহিক লাজ,
উজলে জীবন উজল কাজ,
রতন ভূষণ মোহন সাজ
বাড়াতে নারে মান।
বড় যার মন কুলীন সে জন,
সবার সেবায় মিলে সিংহাসন,
নিষাদ-তনয় সেও ক্ষত্র হয়
তেজের বীর্য্যবান্।
উচ্চ-আশা তরু হয় ফলবান,
হীন আশা হয় ধূলায় শয়ান,
হয় দেবধ্যানে ভকতের প্রাণে
দেবের অধিষ্ঠান।

'হয় দেবধ্যানে ভকতের প্রাণে দেবের অধিষ্ঠান, কথাটী অতি পুরাতন উপনিষদের কথা, কিন্তু কথাটী বড় মিষ্ট, বড় মূল্যবান। শ্রীমতী দীর্ঘজীবনী হউন।

মহাপুরুষ মোহাম্মদ।

আরব একটী সুবিস্তীর্ণ উপদ্বীপ, ইহা এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ফল সাড়ে বার লক্ষ বর্গ মাইল; অধিবাসীর সংখ্যা এক কোটী আশি লক্ষ। আরব দেশের অভ্যন্তর ভাগ উচ্চ মালভূমি ও অনুচ্চ শৈলমালায় সমাকীর্ণ। ইহার উত্তরপূর্ব্ব ও মধ্যভাগে বিশাল মরুভূমি সম্প্রসারিত। এদেশে একটীও নদী কিংবা হ্রদ নাই। সর্ব্বত্র প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি ও ভীষণ দৃশ্য সতত দেদীপ্যমান। তরুলতা শূন্য অনন্ত বালুকাময় মরুস্থলী নিরন্তর ধূ ধূ করিতেছে। মরু প্রদেশে গমনাগমনের জন্য, উষ্ট্রই একমাত্র উপায়। আরবের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতময় প্রদেশের উত্তর ভাগের নাম হেজাজ। এই হেজাজ প্রদেশেই পরম পবিত্র মক্কা ও মদিনা এবং সুবিখ্যাত জেদ্দা নগরী অবস্থিত। জেদ্দা নগরী মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি এখানে মানবের আদি জননী হাওয়ার (ইভের) প্রাচীর-বেষ্টিত সমাধি দৃষ্ট হয়।

আরবের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ সুশ্রী, দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ। ইহারা সুচতুর, বাণিজ্য-কুশল, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, উগ্রস্বভাব ও যুদ্ধানুরক্ত। ইহারা কখনও কোন বৈদেশিক জাতির পদানত হয় নাই। আতিথেয়তা আরবজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

মহাত্মা নুহের পর মহাপুরুষ ইব্রাহিম, একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার করেন। তাঁহার পুত্র মহাত্মা ইসমাইলের দ্বাদশটী পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে কায়দরের বংশধরগণ হেজাজে বাস করিতেন। কায়দরবংশে কোরেশ্ নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন; এই কোরেশ্ হইতেই মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কোরেশ্ বংশের উৎপত্তি। কোরেশ্ বংশে হাসেমের ঔরসে সুপ্রসিদ্ধ আবদুল মোত্তালেবের জন্ম হয়। তাঁহার রূপলাবণ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি তদীয় বিপুল ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ ছিল। সমগ্র কোরেশ জাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের নরপতিগণও তাঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনিই পবিত্র কাবাগৃহ ও জম্ জম্ কূপের অধ্যক্ষ ছিলেন। *

---

* কাবাগৃহ অতি প্রাচীন উপাসনা মন্দির। একেশ্বরোপাসনার এত পুরাতন মন্দির পৃথিবীতে আর নাই। প্রাচীন ইতিবৃত্ত লেখকদিগের মতে মানব জাতির আদিপুরুষ মহাত্মা আদম, এই গৃহে ঈশ্বর উপাসনা করিতেন। আদমের পুত্র মহাত্মা শিশ্ প্রস্তর ও কর্দ্দম যোগে ইহা পুনর্নিম্মাণ করেন। পরে মহাপুরুষ নুহের সময়ে মহাজলপ্লাবনে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মহাজলপ্লাবনের বহুকাল পরে মহাপুরুষ ইব্রাহিম ও তৎপুত্র মহাত্মা ইসমাইলের দ্বারা এই মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হয়। জম্ জম্ কূপের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, যখন মহাপুরুষ ইব্রাহিম স্বীয় পত্নী হাজেরা ও সদ্যপ্রসূত পুত্ররত্ন মহাত্মা ইসমাইলকে মক্কায় নির্ব্বাসিত করিয়া চলিয়া যান, তাহার কিছুকাল পরে তাঁহাদের খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জল নিঃশেষ হইয়া যায়। কথিত আছে, ঈশ্বরের অপার করুণা বলে সহসা তথায় একটি কূপের আবির্ভাব হয়; এবং উহা হইতে সুমিষ্ট জল নির্গত হইতে থাকে। হাজেরা ও তাঁহার পুত্র ইসমাইল [illegible] জলপান করিয়া, সেই নির্জ্জন মরু প্রদেশে জীবন [illegible] করেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে [illegible] জাতি ইসমাইল বংশীয়দের দ্বারা [illegible]

আবদুল মোত্তালেবের অন্যতম পুত্র আবদুল্লা পরম রূপবান্ পুরুষ ছিলেন। মক্কা নগরীস্থ ওহাবের পরম সুন্দরী কন্যা আমেনা দেবীর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের রজনীতেই আমেনা দেবীর গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল। পরে আবদুল্লা বাণিজ্যার্থ সিরিয়া দেশে গমন করেন, তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে, মদিনা নগরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

আবদুল্লার মৃত্যুর ছয় মাস পরে, ৫৭০ খীঃ অব্দের রবিওল আউওল মাসের দ্বাদশ দিবস সোমবার অতি প্রত্যুষে, মহাপুরুষ মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। জননী আমেনা দেবী, মহাপুরুষের ছয় মাস বয়ঃক্রম কালে মদিনা নগরীস্থ কোনও আত্মীয়ের গৃহে গমন করেন, তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। মাতৃহীন বালক মক্কায় আনীত হইয়া, স্বীয় পিতামহ আবদুল মোত্তালেব কর্তৃক পরম যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে আবদুল মোত্তালেবের আক্রম দশা উপস্থিত হইলে, তিনি মহাপুরুষের জ্যেষ্ঠতাত আবুতালেবের হস্তে তাঁহার লালন পালনের ভার অর্পণ করেন। আবুতালেব স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আবুতালেব তাঁহাকে লইয়া বাণিজ্যার্থ গমন করেন।

মক্কা নগরে খোয়েলদ্ নামক জনৈক অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বণিক্ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা কন্যা খোদেজা, পিতার বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হন। প্রচুর ঐশ্বর্য্য থাকায় তিনি আরবের রাণী বলিয়া অভিহিতা হইতেন। বাহ্য সৌন্দর্য্য ব্যতীত অলৌকিক গুণগ্রামেরও তিনি একমাত্র আধার ছিলেন। খোদেজা অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া, পরম পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রগণ, এবং আরবের প্রধান প্রধান সামন্তগণ তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইয়াও সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই। মহাপুরুষ মোহাম্মদ প্রথমে খোদেজা দেবীর কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়া, বাণিজ্যার্থ সিরিয়া দেশে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তদীয় ধর্ম্মভাবে বিমুগ্ধা হইয়া পরম পবিত্রা খোদেজা দেবী তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। বিবাহের পর খোদেজা স্বীয় ঐশ্বর্য্য রাশি স্বামিপদে উৎসর্গ করিয়া, অনন্যচিত্তে তাঁহার পরিচর্য্যায় অভিনিবিষ্টা হন। মহাপুরুষ এই বিপুল ঐশ্বর্য্য দীন দরিদ্রের অভাব মোচনেই পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই মহাপুরুষ মোহাম্মদের ধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল, তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তায় নিরত থাকিতেন। তাঁহার চরিত্র এত পবিত্র ছিল যে, তাঁহার চিরশত্রু মক্কার কোরেশ্‌গণও তাঁহাকে "আল্ আমিন" (বিশ্বাসী) বলিয়া অভিহিত করিত। ঐ সময় আরববাসিগণের ধর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, ইহার সংস্কার যে একান্ত

ছিত হয়, তখন তাহারা মৃত্তিকা ও বালুকা দ্বারা জম্ জম্ কূপ বদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। বহুকাল পরে মহাপুরুষ মোহাম্মদের পিতামহ আবদুল মোত্তালেব স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, বিলুপ্ত জম্ জম কূপের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। এই কূপের বিশুদ্ধ জলরাশি দ্বারা প্রায় সমগ্র মক্কাবাসীর জলকষ্ট নিবারিত হয়। মুসলমানগণ এই কূপের জল পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন।

আবশ্যক, মহাপুরুষ পূর্ব্ব হইতেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সাংসারিক অসচ্ছলতা প্রযুক্ত এতদিন এদিকে সবিশেষ মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে খোদেজা দেবীর সহিত বিবাহে সাংসারিক অভাব বিদূরিত হওয়ায়, ধর্ম্মসংস্কারে অগ্রসর হইলেন। এই সময় হইতে তিনি হেরা পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহায় দিবানিশি ঈশ্বর-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন; কেবল নিতান্ত প্রয়োজন হইলেই মধ্যে মধ্যে প্রত্যাগমন করিতেন। এই প্রকারে কয়েক বৎসর ধর্ম্ম চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া তিনি ইস্‌লাম * প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

মহাপুরুষ ইব্রাহিম ও তৎপুত্র মহাত্মা ইস্‌মাইল, আরবে একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাদের পরলোক প্রাপ্তির বহু-কাল পরেও ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ক্রমে পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। ইহার কিছুকাল পরে এদেশে ইহুদী ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। রোমকগণ প্যালেষ্টাইন ও জেরুজলম অধিকার করিলে, ইহুদিগণ তাহাদের অধ্যুষিত ভূভাগ হইতে বিতাড়িত হইয়া, আরব দেশের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী "খাএবার" নামক স্থানে আসিয়া বাস করে। ক্রমে তাহারা ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লয়। সিরিয়াবাসী একজন খ্রীষ্টীয়ান সন্ন্যাসী, এক নূতন ধর্ম্ম মত প্রচার করেন। মহাপুরুষ মোহাম্মদের আবির্ভাবের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, এই ধর্ম্ম মত আরব দেশে প্রচলিত হয়। এই সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টিয়ানেরা কাবা মন্দিরে মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট ও তদীয় জননী মরিয়মের (মেরীর) প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিত। আরবে সর্ব্বাপেক্ষা পৌত্তলিকতারই প্রাধান্য ছিল। হবল, ওদ, সোয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাস্রার, ওজ্জা, লাৎ, মনাৎ প্রভৃতি ত্রয়োদশটী প্রধান প্রধান দেবতাকে, বিভিন্ন বংশীয় লোকেরা বিভিন্ন ভাবে পূজা করিত।

ধর্ম্মের অবনতির সহিত, আরবদিগের সামাজিক এবং নৈতিক অবনতিরও একশেষ হইয়াছিল। অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় আরবগণও সর্ব্বদা আত্ম-কলহ ও গৃহ-যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত। কোন কোন বংশের মধ্যে শত শত বৎসরব্যাপী গৃহযুদ্ধের কথাও আরবের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। সামান্য সামান্য কারণে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া শত শত প্রাণীর জীবনান্ত হইত। হত্যার পরি-বর্ত্তে হত্যা করিতে না পারিলে তাহাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইত না। এই সময় আরবের সর্ব্বত্রই অশান্তি বিরাজ করিত। পরদারা, চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, সুরাপান, ব্যভিচার নরহত্যা প্রভৃতি পাপ তদানীন্তন আরব-দিগের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। ভক্তি, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, পরহিতৈষণা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি কোমল ও উৎকৃষ্ট বৃত্তি-গুলির কোনটীই তখন তাহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইত না। পরকালে তাহাদের বিশ্বাস ছিল না, পাপের শাস্তি এবং পুণ্যের পুরস্কার আছে —ইহাও তাহারা স্বীকার করিত না। সুত-রাং তাহারা কেবল ঐহিক ভোগসুখে আসক্ত হইয়া, পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সর্ব্বদা তৎপর থাকিত। এরূপ সময়ে মহাপুরুষ মোহাম্মদ সেই ভয়ঙ্কর দেশে, ভয়াবহ জাতির মধ্যে, শান্তির উন্নত পতাকা হস্তে আবির্ভূত হন। "ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, ঈশ্বর-

* ইস্‌লাম—(১) ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, (২) মুসল-মান ধর্ম্ম।

ভিন্ন উপাস্য নাই” এই মহাবাক্য তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে প্রচার করিলেন ; এবং ইহারই প্রচারের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে অবনীমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী খোদেজা দেবী ইসলাম গ্রহণ করেন, তৎপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত-পুত্র তরুণ-বয়স্ক মহাত্মা আলি ও কৃত-দাস জয়দ এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে পরম জ্ঞানী ও পবিত্রচরিত্র মহাত্মা আবুবকর-সিদ্দিক দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইহার পরে মহাত্মা ওস্মান, তাল হা, জোবের, সাদ ও আবদুর রহমান প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত কোরাসী ইস্লাম অবলম্বন করেন। তদনন্তর ক্রমশঃ চল্লিশ জন নর নারী ইস্লামের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেন।

অতঃপর মহাপুরুষ মোহাম্মদ, সমুদায় নর নারীকে সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ জন্য প্রকাশ্য ভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কোরেশ্‌গণ পৈতৃকধর্ম্মের ঈদৃশ অবমাননায় ক্রোধোন্মত্ত হইয়া মহাপুরুষের প্রতি অমানুষিক অত্যা-চারে প্রবৃত্ত হইল। ধর্ম্মপ্রচারের চতুর্থ বৎ-সরে মহাপুরুষ কোরেশ্‌বর্গকে সফা পর্ব্বতে আহ্বান করিয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “হে কোরেশ্‌গণ! তোমাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তিনি ইহাও ঘোষণা করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, তিনি অদ্বিতীয়; এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য।” এই উপদেশ পাষণ্ড কোরেশদিগের হৃদয়ে স্থান পাইল না; বরং তাহারা তাঁহার প্রতি অধিকতর কঠোর ভাবে অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কোরেশ্‌দিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, মহাপুরুষ শিষ্যমণ্ডলীকে আফ্রিকায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ধর্ম্ম-প্রচারের পঞ্চম বর্ষে তাঁহার জামাতা মহাত্মা ওস্মান, বার জন পুরুষ ও পাঁচ জন স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে আফ্রিকায় গমন পূর্ব্বক, তথাকার খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট্ নজ্জাসীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।* কিছুকাল পরে কেহ কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু পুনঃ উৎপীড়িত হওয়ায় আফ্রিকায় গমন করিতে আদিষ্ট হন। পঁচাশি জন পুরুষ ও আঠার জন স্ত্রীলোক এবং তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ তথায় গমন করিয়া, নরপতি নজ্জাসীর আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। কোরে-শ্‌গণ সেই দেশত্যাগী মুসলমানদিগকে হস্ত-গত করিবার জন্য, নজ্জাসীর নিকট বিবিধ উপহার সহ দূত প্রেরণ করিল; কিন্তু সেই ন্যায়বান্ নরপতি কিছুতেই তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। পরে কোরেশ্‌গণ মহাপুরুষ ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলী এবং আবদুল মোত্তালেবের সমগ্র বংশের উপর খড়্গহস্ত হইল। অগত্যা আবুতালেবকে আত্মীয় স্বজন-বর্গের সহিত, এক গিরিসঙ্কটে তিন বৎসর কাল অবরুদ্ধভাবে থাকিতে হয়। এই সময় তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। অব-রুদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভের অল্পদিন পরেই অন্যূন আশি বৎসর বয়ঃক্রম কালে আবুতা-লেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পিতৃ স্থানীয় জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুতে, মহাপুরুষ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আবার জ্যেষ্ঠ-তাতের মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁহার সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী পরম সাধ্বী খোদেজা দেবীও পরলোক গমন করেন, এই ঘটনার কিছু দিন পরে মহাপুরুষ, প্রিয় শিষ্য মহাত্মা আবু-বকরের কন্যা আয়েসা দেবীকে বিবাহ করি-য়াছিলেন।

* ইহাকে প্রথম হেজরৎ বলে।

আবুতালেবের মৃত্যুর পর, কোরেশ্‌গণ মহাপুরুষের প্রতি অত্যাচার করিবার বিলক্ষণ সুবিধা পাইল। তাহাদের দারুণ অত্যাচারে মহাপুরুষ মক্কার সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী তায়েফ্‌ নগরে গমন পূর্ব্বক, তথায় ধর্ম্মপ্রচার করেন; কিন্তু তত্রত্য পৌত্তলিক অধিবাসিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করাতে তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

ইহার পর একদা হজ্জব্রতের * সময় মদিনা নগরীর ক্ষমতাশালী খজরজ ও আওস বংশীয় দ্বাদশ জন লোক মহাপুরুষের নিকট আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করেন; ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা প্রদান জন্য তিনি একজন শিষ্যকে তাঁহাদের সঙ্গে মদিনায় পাঠাইয়া দেন। সেই শিষ্য মদিনায় ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলে, ক্রমশঃ নানা সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। অল্পদিনের মধ্যেই আওস ও খজরজ বংশীয় সমুদয় প্রধান প্রধান লোক পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মদিনায় ইস্‌লামের ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইলে, তত্রত্য অধিবাসিগণ মহাপুরুষকে তথায় আনয়ন জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া সত্তর জন সম্ভ্রান্ত লোককে প্রতিনিধি স্বরূপ মক্কা নগরে প্রেরণ করেন। এই সময় কোরেশ্‌গণ মুসলমানদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করাতে, মহাপুরুষ স্বীয় প্রিয় শিষ্যদিগকে মদিনায় গমন করিতে আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে শিষ্যগণ ক্রমশঃ মদিনা নগরে চলিয়া যান।

অতঃপর মহাপুরুষ স্বয়ং ও তদীয় অতি প্রিয়শিষ্য মহাত্মা আবুবকর, ৬২২ খ্রীষ্ট অব্দের জুলাই মাসে, ২ই রবিওল আউওল সোমবারে দিন, গুপ্তভাবে মদিনায় যাত্রা করেন। মহাপুরুষের মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করাকে "হেজরত" বলে, এই হেজরৎ হইতেই মুসলমানদিগের ব্যবহৃত হিজরী সন আরম্ভ হয়। পথে কোরেশ্‌দিগের হস্ত হইতে অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়া মহাপুরুষ মদিনায় উপনীত হইলে তথায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে পরম সাদরে গ্রহণ করেন।

মহাপুরুষ ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী মদিনায় গমন করিলে, কোরেশ্‌গণ তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পায়। এক বৎসর পরে তাহারা মদিনা আক্রমণ করে। মহাপুরুষও স্বীয় অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য সঙ্গে লইয়া, কোরেশ্‌দিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। বদর নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে জয়ী এবং বিপক্ষ দলের প্রধান প্রধান কোরেশ্‌গণ নিহত ও বন্দী হয়। তৎপরে বনিকিকার য়িহুদিগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, য়িহুদিগণও পরাজিত হইয়া মহাপুরুষ মোহাম্মদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় হিজরীতেই মহাপুরুষের প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমা দেবীর সহিত, তদীয় জ্যেষ্ঠতাত পুত্র মহাত্মা আলির শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদ নামক স্থানে কোরেশ্‌দিগের সহিত, মহাপুরুষের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটে। ইহাতে মুসলমান পরাস্ত হয় ও কোরেশ্‌গণ জয় লাভ করে। এই বৎসরেই ফাতেমা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম *

* জেলহজ্জ মাসে মক্কায় গিয়া কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ ও তাঁহাতে উপাসনা করা এবং মক্কার অদূরবর্ত্তী আরাফাতের পাহাড়ে সমবেত হওয়া।

* ইমাম—ধর্ম্মনেতা, ধর্ম্ম-গুরু। ইমাম হাসন হইতে তদ্বংশীয় দ্বাদশ জন মহাত্মা, সাধারণতঃ ইমাম বলিয়া অভিহিত হন।

হাসনের জন্ম হয়। পর বৎসর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জগদ্বিখ্যাত ইমাম হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম হিজরীতে কোরেশ্ দলপতি আবুসুফিয়ান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দশ সহস্র যোদ্ধা লইয়া মদিনা আক্রমণ করেন, মহাপুরুষ তিন সহস্র মাত্র সৈন্যসহ শত্রুদলের গতি প্রতিরোধার্থ তাহাদের সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধে কোরেশ্গণ পর্য্যুদস্ত হইয়া পলায়ন করে।

ষষ্ঠ হিজরীতে মহাপুরুষ মোহাম্মদ স্বীয় জন্মভূমি মক্কার ভ্রমান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোরেশ্দিগকে ইসলামে দীক্ষিত করিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করেন। জেল্কদ মাসে যুদ্ধাদি নিষিদ্ধ বলিয়া, মহাপুরুষ পনরশত শিষ্যসহ তীর্থদর্শন মানসে মক্কাভিমুখে গমন করেন, পরে কোরেশ্দিগের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে, মহাপুরুষ মোহাম্মদ এবার মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; পর বৎসর হইতে প্রতি বৎসর মক্কায় আসিয়া হজ্জকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন। এক বৎসর তিনি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আবিসিনিয়া রাজ, রোমক সম্রাট, মিসরের শাসনকর্ত্তা এবং অন্যান্য স্থানের নরপালদিগের নিকট দূত প্রেরণ করেন।

সপ্তম হিজরীর প্রসিদ্ধ ঘটনা খাএবারের যুদ্ধ। খাএবারে য়িহুদীদিগের আটটী সুদৃঢ় ও দুর্জ্জয় দুর্গ ছিল। তত্রত্য য়িহুদীগণ অন্যান্য য়িহুদীদিগের সহিত মিলিত হইয়া, মুসলমানদিগের উচ্ছেদ সাধনার্থ যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়। মহাপুরুষ তাহাদিগের ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া, চৌদ্দশত শিষ্যসহ মহরম মাসে মদিনা হইতে খাএবার অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথমতঃ কয়েকটী সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে মুসলমানগণ জয়ী হইলেও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে মুসলমানগণ মহাবীর আলীর নেতৃত্বাধীনে, দুর্জ্জয়-দুর্গ-পরিবেষ্টিত এই খাএবার ভূমি অধিকার করেন।

খাএবারের যুদ্ধযাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, মহাপুরুষ হজ্জ্‌ব্রত সম্পাদনার্থ দুই সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে মক্কায় গমন করেন। কোরেশগণ তাঁহার আগমনে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। মহাপুরুষের সদ্গুণ ও সদাচার পরম্পরায় মোহিত হইয়া, মক্কায় বহুসংখ্যক লোক এই সময় ইস্লামে দীক্ষিত হয়। মহাপুরুষ মক্কায় তিন দিন অবস্থান পূর্ব্বক, মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে বস্রার শাসনকর্ত্তা জাবালা ইস্লাম গ্রহণ করেন। মহাপুরুষ মদিনায় উপনীত হইবার কয়েক দিন পরেই, জাবালার নিকট হইতে উক্ত সুসংবাদ সহ প্রচুর উপহার প্রাপ্ত হন। পরে আম্মানের শাসনকর্ত্তা ফারোয়াবিন-আমেরের নিকট হইতেও ঐরূপ সুসংবাদ এবং উপঢৌকন আসিয়া উপস্থিত হয়।

অষ্টম হিজরাতে প্যালেষ্টিন, সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য রাজ্য-বিজেতা অদ্বিতীয় বীরপুরুষ মহাত্মা খালেদ্-বিন অলিদ ইস্লাম গ্রহণ করেন। এই বৎসর সিরিয়ার নিকটস্থ মুতার খৃষ্টানদিগের সহিত এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রথমে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শেষে মহাবীর খালেদ বিন্-অলিদ সেনাপতিত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক, অসাধারণ পরাক্রম সহকারে শত্রু সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিদলিত ও বিধ্বস্ত করিয়া, জয়পতাকা উড্ডীন করেন। এই যুদ্ধে মহাবীর খালেদের নয়খানি তরবারি ভগ্ন হওয়ায় তিনি "সয়ফোল্লা" অর্থাৎ "ঈশ্বরের তরবারি" নামে অভিহিত হন।

কোরেশ্গণ সন্ধি ভঙ্গ করাতে, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিবার প্রয়োজন

হইয়াছিল। মৃতার যুদ্ধের কিছুদিন পরে মহাপুরুষ এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে অবিলম্বে দ্বাদশ সহস্র মুসলমান যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। ১০ই রমজান এই বিশাল মুসলমান-বাহিনী মক্কাভিমুখে আগমন করিল। মহাপুরুষের পিতৃব্য মহাত্মা আব্বাস্ ও মক্কার সর্ব্বপ্রধান কোরেশ্ দলপতি আবু-সুফিয়ান প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। অতঃপর সমগ্র মুসলমান সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, মক্কায় প্রবেশ করিল। যিনি আট বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত দীনহীন নিরাশ্রয়ের ন্যায় গুপ্তভাবে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ তিনিই প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের ন্যায় মহাসমারোহে সেই জন্মভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

মহাপুরুষ মক্কায় আগমন করিয়া, কাবা-গৃহস্থিত তিনশত ষাটিটী দেবমূর্ত্তির ধ্বংস সাধন করিলেন। কোরেশ্‌গণ নির্ব্বাক্ হইয়া, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। অনন্তর মক্কার ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র সকল শ্রেণীর নরনারী দলে দলে আসিয়া, ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে লাগিল। মহাপুরুষ ইহার পর মক্কা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের দেবমূর্ত্তির ধ্বংস সাধন ও সমগ্র অধিবাসীদিগকে একেশ্বরবাদ-ধর্ম্মে আনয়ন করেন।

একাদশ হিজরীতে মহাপুরুষ হঠাৎ জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ১২ই রবিওল আউওল সোমবার (৬৩২ খ্রীঃ অব্দের ৮ই জুন) মহাপুরুষের পবিত্র আত্মা নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেল। সমগ্র আরবদেশ যেন এক প্রবল ভূকম্পনে কম্পিত হইল। আরবের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র শোকের ভীষণ ঝটিকা সমুত্থিত হইল। তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু তৎপ্রচারিত একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের জ্যোতিঃ দিন দিন প্রসারিত হইয়া, ক্রমশঃ সমগ্র ভূমণ্ডল আলোকিত করিল। আজ পৃথিবীর প্রায় ত্রিংশৎ কোটী অধিবাসী সেই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। যে আরবদেশ মূর্খতা ও কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ ছিল; যেখানে একতা, ভ্রাতৃভাব, মায়া, মমতা, ভক্তি, স্নেহ, সৌজন্য, সরলতা প্রভৃতি বিষয়মূল বৃত্তিগুলির নাম গন্ধও ছিল না, যে দেশের অধিবাসীগণ জড়োপাসনাকেই আপনাদের পারলৌকিক মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করিত; দ্বেষ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, বিবাদ, বিসম্বাদ, হত্যাকাণ্ড, ব্যভিচার প্রভৃতি যে জাতির নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও চরিত্রের প্রধান উপাদান ছিল, একেশ্বরবাদ ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষ মোহাম্মদের কঠোর সাধনা, অলৌকিক আত্মত্যাগ, অটল বিশ্বাস, অমানুষী সহিষ্ণুতা, অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠা, এবং প্রধানতঃ ঈশ্বর-চিন্তা, ঈশ্বর ভীতি ও ঈশ্বর-প্রেমের বলে, সেই পশু প্রকৃতি নরনারীর জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল. সমগ্র আরববাসী একেশ্বরবাদ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার কদাচার, কুপথা ও কুসংস্কার পরিহার পূর্ব্বক ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হইয়া উঠিল। ঈশ্বরের প্রেম তাহাদের পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিল। ক্রমশঃ তাহারা পবিত্র ভ্রাতৃভাব ও একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, এক অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী জাতিতে পরিণত হইল। পৃথিবীর তদানীন্তন প্রধান প্রধান সম্রাট ও পরাক্রান্ত জাতিগণ, সেই অল্পসংখ্যক আরবদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিল। অল্পকাল মধ্যেই আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে এশিয়ার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রায়সমগ্র প্রাচীন পৃথ্বীখণ্ডে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল।

শ্রীআবদুল করিম।

খোকার বিলাতের পত্র। (৩)

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু,—

আমি এখন চিরপ্রসিদ্ধ, মহাখ্যাত, যশ-নিকেতন, কীর্ত্তিস্থল, অত্যাদৃত লণ্ডন মহানগরে। এ বিষয়ে তোমাদের কিঞ্চিৎ অবগত হইতে বাসনা হওয়া অতি স্বাভাবিক বই কিছুই নয়। এই ঔৎসুক্যে তোমাদিগকে এ যাবত ফেলিয়া রাখা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নাই মধ্যে জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত। গুরুজন সকলের শ্রীপাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণত হইয়া ক্ষমা চাই। অবস্থা বোধে ত্রুটী মার্জ্জনীয়। কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইলাম।

সকলেই সুবিজ্ঞ মহাত্মা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত হর্শেলের নাম শুনিয়াছেন। তিনি গণনা করিয়া লণ্ডনকে ভূমণ্ডলের কেন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এত গেল ভৌগলিক গণনায়। আমরা কি এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বলিতে পারি না? শুনিয়াছি, সেকালে সমস্ত রাজপথই সমৃদ্ধিশালিনী রোম মহানগরীর দিকে ধাবিত হইত।* আমরা দেখিতেছি, কেবল রাজবর্ত্ম কেন, সমগ্র ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থ, বিদ্যা, শিল্প, কর্ম্ম সমস্তই লণ্ডনের দিকে ধাবিত। সকলের চিন্তা ভাবনা, সকলের কাজ কর্ম্ম, সকলের শিল্প বিজ্ঞান, সকলের নৈপুণ্য পটুতা, সকলের নানা আবিষ্কার প্রকাশ, সমস্তই লণ্ডনে কেন্দ্রীভূত। এই মহা লণ্ডনের বিষয় কি জানি, কি বলিব?

যে লণ্ডন মহানগরে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রকার বিভিন্ন জাতি এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমাবেশ, যেখানে অগণিত ভাষাবাদীর, বিচিত্র বিচিত্র বর্ণের, বিস্ময়জনক আচার ব্যবহারান্বিত বিবিধ কুলের বিবিধ ব্যক্তির সহবাসস্থান; বেশী কি, যে লণ্ডন্ পৃথিবীর নানা শ্রেণীর নানা জাতির একমাত্র যাদুঘর, যে লণ্ডন সহরের এমন মহিমা যে, ইহা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করিতেছে, যাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কোন্ স্থানে কি উপায়ে সামান্য একমুষ্টি উদরান্নের সংস্থান করিবে, বলিতে পারেনা, যাহারা এই অসহ্য শীতে নিশাগমন করিলে কোথায় কি প্রকারে ক্ষণেকের নিমিত্ত শিরস্থাপন করিবে, জানে না; সৎ কিম্বা অসৎ, ভাল কি মন্দ, যে দিক দিয়াই ধর না কেন, যে লণ্ডনের সমকক্ষ স্থান এ যাবত হয় নাই, এখনও নাই আর কখনও যে হয়, সে আশা অতি অল্প; সে লণ্ডনের বিবরণ দেওয়া কি সোজা কথা? তন্ন তন্ন করিয়া ইতিহাস অনুসন্ধান কর, লণ্ডনের সহিত তুলনীয় স্থানই পাইবে না; প্রাচীন হইতেও প্রাচীনতর রোম অথবা এথেন্সই ধর, মহাবীর হানিবলের কীর্ত্তিভূমি কার্থেজপুরীই বল, সেই সেই দিনের মহাসমারোহান্বিত দিব্য দিল্লীই হউক, পৌরাণিক সময়ের সেই আমাদের হস্তিনাপুর, কি অযোধ্যাই ধর, কোন স্থানই লণ্ডনের সমতুল্য হইতে অপারক। আজি কালিকার মহাগর্ব্বিত ও দর্পিত নিউইয়র্ক বা স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতার লীলাস্থল প্যারিস, মহাবলসমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যচতুর বার্লিন বা ভিয়েনা, অধুনাতন বা পুরাতন কোন নগরই লণ্ডনের তুলনায় উপযোগী নহে। প্যারিসের ২৫০০০০০ লক্ষের দ্বিগুণে, ব্রুক-লিন সম্বলিত নিউইয়র্কের সার্দ্ধসপ্তবিংশতি

* "All roads led to Rome"— Gibbon.

প্যেরের বিপক্ষে, বার্লিনের ১৬,৬৬,৬৬৬এর বিপক্ষে এবং ভিয়েনার ১৩,৩৩,৩৩৩এর বিপক্ষে, লণ্ডন সহরের জনসংখ্যা অন্যূন ছাপ্পান্ন লক্ষ তেত্রিশ সহস্র তিনশত বত্রিশ (৫৬,৩৩,৩৩২)। শুনিয়াছি যে লণ্ডনে নাকি, রোম হইতে অধিক রোমানক্যাথলিক, প্যালেষ্টাইন হইতে অধিক য়ীহুদী, এবার্ডীন হইতে অধিক স্কটলণ্ডবাসী এবং বেলফাষ্ট হইতে অধিক আইরিস বাস করিয়া থাকে। যে অভিনব সহরের বহির্ভাগ হইতে প্রত্যহ ন্যূনাধিক অষ্টলক্ষ ব্যক্তি, সপ্তদশ সহস্র শকট এতদভ্যন্তরে গমনাগমন করে, যে সহরে ধীবর পাশের ন্যায় সতত ২৫০ মাইল রেলবর্ত্ম কার্য্য করিতেছে, যে সহরের করগৃহ (Custom House) ইংলণ্ডের অপরাপর সমস্ত বন্দরের কর সমষ্টির তুল্য কর একাকীই অর্জ্জন করে, যে লণ্ডনের রাজপথগুলি একেরপর একে একে সাজাইয়া গেলে প্রায় তিন সহস্র মাইল দীর্ঘ হইবে, যে লণ্ডন ১৬,০০ শত উপাসনালয়ের অধিকারী, তদ্‌সত্বেও, যে ইহার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক তাহার অর্দ্ধেক লোকের স্থান সঙ্কুলন করিতে অসমর্থ; যে লণ্ডন সহরে জলযোগাদির নিমিত্ত (১২০০) প্রায় দশ সহস্র বিপণির সৃষ্টি, যাহার অধিবাসী উদর পূরণের জন্য অষ্টাধিক লক্ষ গোবৎস, চল্লিশ লক্ষ ভেড়া বাছুরাদি, নব্বই লক্ষের উপর পক্ষী, একশ চল্লিশ হাজার টন (এক টন প্রায় ২৮ মণ) মৎস্য বধ করেন —পানহেতু যাহার পঞ্চদশ কোটী গ্যালন (ন্যূনাধিক তিন সের) জল প্রয়োজন হয়, শান্তি রক্ষাকল্পে যেখানে ষোল হাজার পুর[illegible]লোক; হর্ষ, কৌতুক, আমোদপ্রমোদ বিলাস অভিপ্রায়ে, বেশী কি, যেখানে অন্ততঃ অষ্টাদশাধিক রঙ্গালয় এবং চারিশত সঙ্গীতালয় বর্ত্তমান, সেই লণ্ডন সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া, সুধু বিড়ম্বনা নয়, অতিশয় অর্ব্বাচীনতা, অজ্ঞানতা, মূর্খতা, মূঢ়তা। যে লণ্ডনে চতুর্দ্দশ বৎসর বসতি করার পর মহামতি মাননীয় জন ব্রাইট প্রমুখ * সুবিজ্ঞ বিদ্বান জনমণ্ডলী 'লণ্ডন সম্বন্ধে কিছুই বিদিত নই,' বলিয়া পশ্চাৎপদ, তখন, দু দিন আসিয়া, দু দিন দেখিয়া, দুদিন ঘুরিয়া, লণ্ডন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যাওয়া নির্লজ্জতা বই আর কি? বলিতে গেলে, ইহার বিষয় কিছুই জানিনা, তাতে আবার আমার ন্যায় ক্ষীণ-বুদ্ধি, অধম ব্যক্তি, আমি আর বলি কি?

দেশমাহাত্ম্য, কালমাহাত্ম্য, লোক-মাহাত্ম্য লোক বিশ্বাস করে না। আমি বিশ্বাস করি কি না, জানি না। কিন্তু মাহাত্ম্য সততই বিনীত ভাবে স্বীকার করি। বলিতে হয় বল আমার তুচ্ছলতা। পুষ্প অতি পবিত্র। দেব পূজায় সতত ব্যবহৃত। সামান্য কীট পবিত্র সুমনসের সহবাসী। তদ্‌সঙ্গেই সে দেব পূজা কালে সসম্ভ্রমে দেবতার গলদেশে লম্বিত। কীট বিশেষ যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থানের বর্ণই প্রাপ্ত হয়। সংসর্গের দোষগুণ নাই, ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কে বলিবে? বলিতে চাহিনা, আমি মাহাত্ম্যপূর্ণ লণ্ডনে আসিয়া বিজ্ঞ হইয়াছি। তবে, অভিনব স্থানের সকলই অভিনব। পাপীই কীর্ত্তন করুক, ধার্ম্মিকই করুন, ভগবানের নাম সুমিষ্ট। পাপীর মুখে কিছু বেশী মধুর নয় কি? নির্ব্বোধ হইলেও লণ্ডন সহরের কথা যাহা লেখা যায়, তাহাই শ্রবণ যোগ্য হইবার কথা। এই আশা। এই আশা বুকে বাঁধিয়া প্রথমাবধি যাহা ২ দেখিয়াছি, তাঁহা জানাইতে প্রয়াসী রহিলাম।

* See Right Hon'ble John Bright's speech at Rochdale Nov 16 1881

এই মহানগরীতে একাকী আসিয়া পড়িলাম। ট্রেনে আমরা প্রায় আট জন বন্ধু একত্রে ছিলাম। লণ্ডনে আসা মাত্র তাঁহারা নিজ নিজ জিনিষ পত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কর-সরকার আসিয়া সকলের জিনিষ পত্র গোলমাল করিয়া দিয়াছে। বাড়ীর কাছে এসে তাঁহারা কিরূপ ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, কি প্রকারে দেখাই? দু দণ্ড পূর্ব্বে বাড়ীর আত্মীয় আত্মীয়াগণকে দেখিলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন। এই সময়ে সেই সরকার মহাশয়ের উৎপাৎ কাহার ভাল লাগে? সকলের নিকট হইতেই, তিনি বেশী কম, অন্তরের কিম্বা বাহিরের, মিষ্ট বচন শ্রবণ করিলেন। তবে, অনেকের নিকটে এক আধটু টিপ্পনিও পাইলেন। সে-ই সান্ত্বনা, তাহা পাইলেই হইল। তাহার পর যত গাল দাও, সব সহ্য হয়। সংসারই টাকার দাস। যাক্; সকলেই বাড়ীর নিকটে আসিয়াছেন। বিদায় লইতে অনেকে অবসর পাইলেন না, একে একে সকলেই সরিয়া পড়িলেন। কি আনন্দের ছবি তাঁহাদের মুখে দেখিলাম! জীবনে বোধ হয় ভুলিতে পারিব না। আমার মনে হ'ল, তিন বৎসর পরে আমি যখন দেশে ফিরব, আমারও কেমন আনন্দ হবে। এই সমস্ত আশার কথা ভেবে মনকে শান্ত করিতেছিলাম; কিন্তু হ'ল কই? ইঁহারাও বিলাতাগমন করিয়াছেন, আমিও আসিয়াছি। কিন্তু আমার মনে যে প্রকার হর্ষ, সে এক অপূর্ব্ব উৎসাহ, সেই অভিনব ঔৎসুক্য উদ্যোগ আসিল না। South Eastern Railway Co. এক বড় রেল আফিস্। Charing Cross ষ্টেসন তাঁহাদের এক terminus, পূর্ব্বে এমন বড় ষ্টেসন বড় দেখি নাই। কত২ ট্রেন আসিতেছে, যাইতেছে। কি ভয়ানক হট্টগোল। কতই বা লোক। তা' আবার সমস্তই আরক্তিম-বদন মণ্ডল। কোথায় যাই, কি করি। আর যে দারুণ শীতকাল। দুর্দ্দশার সীমা কই; ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছি। দাঁড়াইবার শক্তি ঘুচিয়াছে। এই সমস্ত, এবং ইহার সহিত আরও কত কি কারণ একত্রে সংমিশ্রিত হইয়া, আনন্দ ত দূরের কথা, ভয়, দুঃখ, ক্ষোভ, কষ্টের উদ্রেক করিয়াছে। নূতন স্থানে আসিলে কি সকলেরই এই রূপ হইয়া থাকে?

সময় চলিয়া যায়। এক অজাত-শ্মশ্রু মুটেকে ডাকিলাম। সাহেবের দেশে, বলা বাহুল্য, মুটেও সাহেব। Parisএ যে প্রকার বিপদে পড়িতে হয়, এখানে অন্ততঃ সে ভয় নাই। আর বেশী কিছু পারি আর নাই পারি—স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আছে। বাক্‌শক্তি থাকা সত্ত্বেও, এ মুহূকে, আমি বোবা নই। বলিলাম, 'আমি একটী ক্যাব চাই।' তাহার ঠেলা গাড়ীতে সে আমার বাক্সটী চাপাইয়া ষ্টেসনের বাহিরে বারান্দায় গেল। আমিও তাহার সঙ্গে২ বাহিরে আসিলাম। জিনিস পত্র রাখিয়া সে গাড়ীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল। এখনও ভোর হয় নাই, গাড়ী পাওয়া দুষ্কর। তাহার ফিরিতে কিছু দেরি হইতেছে। পলাইল নাকি, ভাবিয়া একবার ভয় হইল। দারুণ শীত, তাই পাইচারি করিতে লাগিলাম। গাড়ী শীঘ্রই হাজির হইল। বাক্স তুলিয়া দিয়ে আমি মুটেকে বিদায় করিলাম। গাড়োয়ান ভায়াকে আমার বাসার ঠিকানা বলিলাম। ক্যাব্ ছুটিল।

ক্যাব্ এক প্রকার মজার গাড়ী। পশ্চি-

মের এক্কা গাড়ীর ধরণে গঠিত। সেইরূপ এক ঘোড়ায় টানে। তবে গাড়ীর শ্রী দেখিলে এক্কার সহিত তুলনা করিতে বাসনা থাকে না। এক্কার দুর্দ্দশার সীমা নাই, ক্যাবের সৌন্দর্য্যের অবধি নাই, এই পার্থক্য। এক্কায় চড়িলে হাড় পাঁজড়া ভাঙ্গিয়া যায়, সাত দিন নড়িবার ক্ষমতা থাকে না; ক্যাবে চড়িলে পৌরাণিক পুষ্পকরথে চড়িবার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এক্কার ঘোড়া যেন মড়া-খেকো; ক্যাবের ঘোড়া সুস্থ, দ্রুতগামী, বলিষ্ঠ, চিক্কণ, মসৃণ; অশ্ব নামের যোগ্য। এক্কার সহিত ক্যাবের তুলনা করিতে গিয়াই মুস্কিলে পড়িয়াছি। এখন দেখি, আকাশ পাতাল তফাৎ। এই ক্যাব-গাড়ীর পশ্চাতে চালক বসেন। প্রায় মাথার উপরে। গাড়ীর ভিতরে দুই জনের অধিক ধরা কষ্টকর। বসিতে হয় ঘোড়ার পিছনে, সম্মুখদিকে মুখ করিয়া। সম্মুখটা খোলা, চারিদিকের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যায়। আর বলিতে পারি না কি রকম গাড়ী; এ মজাদার গাড়ী দেখে যে কি প্রকার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম, বলিতে পারি না। ঘোড়া দেখিয়া আরও বেশী বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম। আমাদের লাট সাহেবের ঘোড়া এখানকার সামান্য ধাঙ্গড়ের ঘোড়ার নিকটে কোন্ ছার। গর্দ্দভের ন্যায়ও বলা যায় না। পরে অনেকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সকলেই বিলাতের ঘোড়ার প্রশংসা করেন। এ-ক্যাব দুই চাকার গাড়ী। চারি চাকার গাড়ীও পাওয়া যায়। তবে এ গুলিরই বেশী চলতি দেখিতে পাই। এই শকটের আবিষ্কর্ত্তার নামানুযায়ী এগুলিকে "Hansom" ও বলা হয়। বিলাতে গাড়ী ভাড়া বড় বেশী। সমস্তই মহার্হ, গাড়ীর আর দোষ কি। চ্যারিং ক্রস ষ্টেসনকে কেন্দ্র ধরিয়া চারি মাইল বাহুর এক বৃত্ত, তাহাকে সকলে 'four mile radius' বলিয়া জানে। ইহার (four mile radius এর) মধ্যে হইলে, প্রথম দুই মাইলে এক শিলিং দাবী করিবে। এক শিলিংএর কম ভাড়া নাই। প্রথম দুই মাইলের উপরে মাইল প্রতি ছয় পেন্স করিয়া ধার্য্য করা আছে। কিন্তু, যদি ঐ বৃত্তের বাহিরে যাইতে হয়, তবে প্রতি পর মাইলে এক এক শিলিং দিতে হয়। এত গেল দূরত্ব হিসাবে ভাড়া। ঘণ্টা হিসাবে—১ম ঘণ্টায় আড়াই শিলিং। তারপর প্রতি কোয়াটারে (১৫ মিনিটে) ৮ পেন্স করিয়া ধরে। সুধু এই নয়; গাড়ীর বাহিরে, ছাদের উপরে যদি কোন মাল লওয়া হয়, প্রত্যেকটীর জন্য দুই পেন্স করিয়া বেশী ভাড়া দেওয়া নিয়ম। যাহা হৌক, ভাড়া বেশী কম পরের কথা; এখানকার গাড়োয়ানগণ দেশের মত 'বাবু, আর কত দূর'—'কোথা যাবে'—'যেতে পারি না, মশাই'—বলিয়া ব্যতিব্যস্ত, জ্বালাতন করে না। একবার ঠিকানা বলিয়া দাও, আর চিৎকার করিবে না; পরে একেবারে বাড়ীতে হাজির।

আটটা বাজিয়া গিয়াছে। এখনও নিশাদেবী বিদায় লন নাই। অথবা ইংরাজ-রাজ্যে, ইংরাজের মহা পরাক্রম, শক্তি, সামর্থ্য, বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, আচার, ব্যবহার উন্নত, সমস্তই উন্নত দেখিয়া, লজ্জায়ই হউক অথবা পরাজয়ের ভয়েই হউক, সূর্য্যদেব দর্শন দিতে যেন নারাজ। অথবা বুঝি, দারুণ শীতে আসিয়া কষ্ট পাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। যে কারণেই হউক, এখানে তাঁহার তেমন প্রতাপ নাই। অধিক কি, সময়ে এমনও হয়, সপ্তাহ চলিয়া যায়, তাঁহার দর্শন নাই। যে সময়ের

কথা বল্‌ছি, তখন একটু ঈষদ্ আলোকের রেখা দেখা দিয়াছে। কুয়াশায়, ঘন কুয়াশায় চারিদিক বেষ্টিত, পরিপূর্ণ। হাত দুই দূরে কিছুই দেখিবার যো নাই। যে শীত—গাত্রোত্থান করাই বিড়ম্বনা—সাত পুরু কম্বলের নীচে আরামভোগ—আর একটু, এই আর দু দণ্ড, করিতে ২ ৯টা কি ৯॥০টার পূর্ব্বে প্রায় কেহই নামেন না। টক্, টক্ টক্'—আমি দরজায় শব্দ করিলাম। Mrs. Saw গৃহবর্ত্তী। তাঁহার আর ৯টা ৯॥০টা পর্য্যন্ত আরামের উপায় নাই। কর্ত্তব্যের টানে, কাজের খাতিরে, ভোরেই উঠিতে হয়। তিনি আমাকে দরজা খুলিয়া দিলেন। আমি টুপি খুলিয়া সবিনয়ে অভিবাদন করিলাম। তিনি আমার আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হন। তিনি বলিলেম—"You are an early bird" স্নেহপূর্ণ এ বাণী শুনিয়া কত আশা মনে আসিল, কত আশ্বস্ত হইলাম। হাবি-জাবি কত কি ভাবিলাম।

প্রবাসীর প্রথম কষ্ট, অবস্থানের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা। কোথায় কি প্রকারে থাকা হইবে, স্থির না থাকা বশতঃ, নূতন লোক, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অনর্থক বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলেন। পয়সা থাকিলে লণ্ডনে কিছুরই অভাব হয় না, বাজাত পরের কথা। তবে খরচের বেশী কম আছে। এক জিনিষ খাইয়া, এক প্রকার শয্যায় শুইয়া, স্থান বিশেষে সাত গুণ অর্থ ব্যয় করা যায়। ইহার প্রয়োজন কি? অধিকন্তু, কোন্ স্থান কি প্রকার, নবাগতের অবগতি নাই। প্রলোভনময় লণ্ডন সহর, নানাস্থানে দুরন্ত চতুর তস্কর বর্ত্তমান। তাই ভয়।

থাকিবার স্থানের মোটামুটি তিন প্রকার বন্দোবস্ত। থাকিতে পারা যায়, এক-নামজাদা বিখ্যাত হোটেলে। এখানে খরচ বিস্তর। প্রতি ডিনারে অবস্থানুযায়ী এবং জিনিস বুঝিয়া ২॥০ শিলিং হইতে ১০॥০ শিলিং পর্য্যন্ত মূল্য ধার্য্য হয়। কেবল এক ডিনার খাইলেই চলে না, দিবসে অন্যান্য সব আহার আছে। তাহাদের মূল্যও এই তুলনায় ধার্য্য হয়। তৎপরে রাত্রে বিশ্রামের জন্য ঘর চাই—তাহাতে রাত্রি প্রতি দুই তিন শিলিং হইতে আট দশ শিলিং পর্য্যন্ত দিতে হয়। যেরূপেই হউক, হোটেলে বাস করিতে গেলে প্রত্যহ অন্যূন দশ শিলিং করিয়া পড়িবেই পড়িবে। যিনি ইহা দিতে পারেন, তাঁহার ত কথাই নাই। সুখে স্বচ্ছন্দে, আমোদে, প্রমোদে, মহাসম্মানের সহিত থাকিবেন। কিন্তু সে সঙ্গতি অনেকের না থাকা সম্ভব। যাঁহার নাই, তিনি কোথায় যাবেন? বিলাত-বাস কি তাঁহার জন্য নয়?

আগমনের পূর্ব্বে কোন প্রকার বন্ধুত্বসূত্রে, অথবা অন্য কোন উপায়ে প্রবাসী যদি কোন পরিবারের সহিত থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, সেই তবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। নিশ্চয়ই হোটেলে বাসের স্বচ্ছন্দতা সর্ব্বাধিক; বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা; তদসঙ্গে অর্থব্যয় বিপুল। কিন্তু পরিবারে বাস, পরিবারের মত পরিবার পাইলে মহাশান্তিজনক, স্নিগ্ধকর, পবিত্র, নির্ম্মল এবং নির্জ্জন। বলা বাহুল্য, পরিবার ভালও আছে, মন্দও আছে। দরিদ্রও আছে, ধনীও আছে। তবে গিনি সব সময়েই গিনি। ময়লা হইলেও গিনি, নূতন ঝক্ ঝক্ করিলেও তাই। এমন কি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গলিয়া গেলেও তাহার মূল্য আছে। মন্দ হইলেও পরিবারে বাস হোটেল বাস অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেয়। পরিবার যে স্থলে বাড়ী গ্রহণ করেন, সেইস্থানের বাড়ী ভাড়া

হিসাবে এবং যে ধরণে আহার বিহার করেন, সেই হিসাবে খরচ কম্ বেশী হয়। তবে সপ্তাহে দুই গিনি হইতে পঁয়ত্রিশ শিলিংএর মধ্যে এক সভ্যবিদ্ সৎপরিবারে থাকিবার স্থান ঠিক করা কোন ক্রমেই কষ্টকর নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরিবার নানাপ্রকার; সুবিধা মত পাওয়া কিছু আয়াসসাধ্য। তোমার যে প্রকার সঙ্গতি, তুমি যে পরিবারে থাকিবে, তাহারও সেই প্রকার সঙ্গতি হয়, ইহা দেখা উচিত। মনে কর, তুমি এক সম্ভ্রান্ত জমিদারের (lord) বাড়ীতে থাকিবে, স্থির করিলে। তাঁহারা যদিই বা তোমার অবস্থানের জন্য অতি অল্প মূল্য চান, তথাপিও তাঁহাদের চাল্ চলনে চলিতে তোমার অনেক পড়িয়া যাইবে। কাপড় চোপড়, বাহিরের আসবাব, আদব কায়দা রক্ষা করিতে করিতে তুমি ধ্বংস পাইবে। আর যদি তুমি সে সমস্ত না কর, মনে শান্তি পাইবে না; বুঝিবা, তাঁহারাও তোমাকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন। না দেখিয়াই বা থাকেন কি প্রকারে? তাঁহাদের বন্ধু, অনেক ধনী। এক ধনী তাঁহাদের বাড়ীতে আসিলেন; তুমি এখন পুরাতন মলিন বস্ত্র পরিয়া আছ; তোমাকে কর্ত্তা কিরূপে স্বগৃহবাসীরূপে তাঁহার বন্ধুর সহিত আলাপ করাইয়া দেন? তাহাতে যে নিজের মানহানি হয়; লজ্জাও করে। বৈকালের কাপড়, সকালের কাপড়, বেড়াবার কাপড়, ডিনারের কাপড়, কত কত কাপড় করিতে হইবে। যাক্; পরিবারে প্রবেশের পূর্ব্বে এদিকে একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। উদ্যোগ করিলে বাঞ্ছনীয় স্থান পাওয়া যাইবে না কেন? একবার সুবিধাজনক হইলে পরিবার অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই হইতে পারে না। ইংরাজ জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশের এই এক উন্মুক্ত দ্বার। আমরা বিলাত-প্রবাসী, যদিও বিদ্যা অর্জ্জন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপিও আদর্শস্থানীয়, বিজেতা ইংরাজ জাতির বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক আচার, নীতি, ব্যবহার আদি, আশানুরূপ, যথাশক্তি অবগত হওয়া আমাদের গৌণ উদ্দেশ্য—গৌণ হইলেও ইহাকে কোন মতে কম অর্জ্জনীয় জ্ঞান করি না। বিলাত বাস করা না, কেবল অর্থের শ্রাদ্ধ করা। টাকা ব্যয় ত হইতেছেই এবং হইবেই;—কিন্তু, এই বিলাত-বাস-রূপ মহা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজের এবং সুবিখ্যাত ইংরাজ-সমাজের যদি সাধ্যমত অভিজ্ঞতা না লাভ করা যায়, তবে আর হইল কি? সভা সমিতি, পাঠালয় লাইব্রেরী, ইত্যাদি নানা স্থানের অভাব এখানে নাই বটে, সেখানে অনেক মহা মহা সুবিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিচয় হইতে পারে, সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞতা সে সমস্ত স্থানে বিস্তর অর্জ্জন করা যায়—জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধির উত্তম সোপান, এ সব কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু, হাজার হইলে এ সমস্ত বাহিরের আচার, বাহিরের ব্যবহার। বাহ্যিক ব্যবহার সর্ব্বত্রই সুমার্জ্জিত। তুমিই বল না, ঘরে বসিয়া, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনীর সহিত তুমি যে ভাবে মিশিয়া থাক, স্বীয় পরিবারাভ্যন্তরে যে প্রকারে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাক, ঠিক সেই প্রকারেই কি সমাজে মিশিয়া থাক? না, কিছু বাহিরের, কিছু অতিরিক্ত, কিছু অসাধারণ তোমার মধ্যে আসিয়া পড়ে? না পড়িয়াই পারে না। না—না; পরিবারে থাকিয়া যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা পাইবে, সমাজে মিশিয়া তাহা কোন ক্রমেই পাইবে না। এ জ্ঞান অমূল্য। ইংরাজ-মহত্ত্ব অধ্যয়ন-বাসনা হইয়া থাকে যদি,

তবে তাহার বহির্ভাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইও না। বাহির ত মাথালেরও সুন্দর। ইংরাজের কেবল বাহির প্রশংসা করিলে হইবে না। ভিতরে যাও—তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর—খণ্ড বিখণ্ড করিয়া আণুবীক্ষণিক চক্ষে অবলোকন কর—মহত্ত্ব কোথায়? তার যে ভিতর বাহির সব সমান; না, না, সুধু তাহা নয়; ভিতর আরও মিষ্ট, আরও মধুর; ভিতর আরও বেশী অধ্যয়নীয়, কেননা, সেখানেই আমার সহিত তাহার বিশিষ্ট পার্থক্য। সেই পারিবারিক চরিত্রই অনুকরণীয়। সাধে কি ইংরাজ ভূপতি—সাধে কি সে সর্ব্ব প্রধান!

পরিবারে অবস্থান অপেক্ষাও বিলাতে অল্প ব্যয়ে স্থিতি ঘটিয়া থাকে। লণ্ডনে বহু সংখ্যক নিবাসালয় আছে। বোর্ডিং হাউসে তুমি সাপ্তাহিক ২০।২৫ শিলিং হইতে ৩০।৩৫ শিলিং দিয়া বেশ মধ্যম গোছের থাকার ঘর পাইতে পার। স্থান বিশেষে ইহা অপেক্ষাও কমে হয়। সে সমস্ত অঞ্চলে নিতান্ত ছোটলোকরাই থাকে। লণ্ডনের পূর্ব্বদিকে ১৫ শিলিংএ থাকা যায়। ভদ্রলোক বড় একটা কিন্তু সে অঞ্চলে থাকেন না। বোর্ডিং এর কর্ত্রীকে এখানে landlady বলে। তিনি আহার যোগাইয়া থাকেন; যাহা দিবেন, তাহাই ভক্ষণ করিতে হইবে। কম পয়সা দিলে অবশ্য খারাপ খাইতে হইবে। বোর্ডিংএর আহার প্রায়ই অতি কদর্য্য, বাজারের খাবার যেমন হইয়া থাকে, সেই প্রকার। খুব উচ্চ দরের বোর্ডিংএ (অর্থাৎ সপ্তাহে ৩০।৩৫ শিলিং করিয়া দিয়া) না থাকিলে স্বাস্থ্য-নাশের ষোল আনা সম্ভাবনা। এই সমস্ত landlady বাজারে স্ত্রীলোক; দোকানদার। পয়সা করিবার আশায় দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন। যত অল্প মূল্যের জিনিষ চালাইতে পারা যায়, ততই ত তাঁহাদের লাভ। কোন স্থানে অল্প মূল্য ভাল জিনিষ পাওয়া যায় না। তাতে আবার ভেতো বাঙ্গালী সেই পাল্লায়; কখন এ প্রকার আধ-সিদ্ধ, আধ-পোড়া, ঝলসান মাংস খাওয়া তাহার অভ্যাস নাই। বিদেশ হইতে আনীত পচা মাংস; পূতিগন্ধময়; চৌদ্দ আনা চর্ব্বি মিশ্রিত মাখম; বাজারের যত পরিত্যক্ত দ্রব্য; যেন তেন প্রকারে, মক্ষিকা হইতে শ্লেষ্মা পর্য্যন্ত সমস্ত গর্হিত ও ঘৃণিত দ্রব্যের দ্বারা সংমিশ্রিত অভিনব উপায়ে পরিপক্ক আহার গরীবের সহ্য হইবে কেন? তাহার উপরে আবার বিলাতে অজীর্ণতা রোগের যে প্রাদুর্ভাব। তাই পূর্ব্বেই সাবধান্ হওয়া উচিত। কিছু বেশী খরচ করিয়া ভাল বাড়ীতে থাক, ভাল জিনিষ খাও। পশ্চাতে, ডাক্তার মহাশয়ের প্রকাণ্ড বিল পরিশোধ করিতে হইবেনা। কোন ভাল চিকিৎসক দুই তিন গিনির কমে দেখিবেন না। এবিষয়ে আমরা ভুক্তভোগী, একটু বেশী রকম অভিজ্ঞতাই জন্মিয়াছে। এই প্রকারের নানা কারণে আমাদের কোন বিশেষ শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর বিস্তর ভুগিয়াছেন, এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন, বলিতে পারি না। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে কিছুই সিদ্ধ হইবেনা। সমস্তই বৃথা, বিফল হইয়া যাইবে। শেষে তল্পী গুটাইতে হইবে। আর একটা কথা, এখানে বলিয়া দেওয়া ভাল বিবেচনা করি। বোর্ডিংএ প্রায়ই একটা সাধারণ বৈঠকখানা থাকে। ইহার কোন মা বাবা নেই। এ এক প্রকার 'সাম্য-আবাস'। অধিবাসীগণের যাঁহার ইচ্ছা, তিনিই ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। বেশী মাত্রায় ব্যবহার করিয়াও থাকেন। এ গৃহে দুজন এক জন সর্ব্বদাই বসিয়া আছেন। নির্জ্জনতা নিতান্তই

দুর্লভ। পাঠাদি কার্য্যের জন্য দিবসের কত-কাংশ স্বয়ং একাকী থাকা, কাহার না প্রয়োজন হয়? কিন্তু, এই ঘরের উপর ভরসা করিলে সে টুকু পাইবার সম্ভাবনা প্রায় নাই। কথায় আছে, 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। সম্মুখে সহবাসী-সঙ্গী ফেলিয়া পাঠে মনোনিবেশ করা আবার বিলাতী আদব্ কায়দার (etiquette) কিছু বিপক্ষে। অবশ্য এ গৃহে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবার ক্ষমতা আছে। তুমি যদি পাঠ কর, কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। তবে এটা কিনা চলনসই নয়, তাই কেমন কেমন দেখায়। শুধু তাই নয়। তোমার মত অন্যান্য ব্যক্তিরও ত এ গৃহ ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। এ অবস্থায় গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করার কিরূপ সুবিধা হইবে, বুঝি না। তাঁহারা সততই এ কথা সে কথা, এটা সেটা, হয়ত খুঁটিনাটি কত কি করিবেন; তোমার সেখানে পাঠে মনোযোগ হইবে কি? তবে বিশ্রামাগারে সে কার্য্য করিতে পার। গ্রীষ্মকালে তাহা করিতে কোন কষ্টই হইবে না। শীতকালে কিন্তু আগুন ভিন্ন স্বচ্ছন্দতার সহিত শুইবার ঘরে বসিতেই পারিবে না। দুঃখের বিষয়, বিশ্রাম-ঘরে প্রায়ই চুল্লি বা আথা থাকে না। আথা থাকিলেত গোল চুকিয়াই গেল; না থাকিলে নিজের ব্যবহারের জন্য একটা বসিবার ঘর লওয়া বন্দ নয়। সেখানে নির্জ্জনে পাঠাদি সমস্ত কার্য্য স্বচ্ছন্দে করিতে পারিবে; নির্ব্বিঘ্নে সেখানে একজন দুইজন বন্ধুকে আনিয়া বসানও চলে। খরচ অবশ্যই কিছু বেশী পড়িতে পারে। কিন্তু তাহা বৃথা ব্যয় জ্ঞান করি না।

যাহা বলিলাম, তাহা কেমন লাগে? তাহাতেও যদি না ভাল বোধ হয়, আর এক কর্ম্ম করিতে পার। এখানে বেশ ভাল ভাল ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। একটা বসিবার, আর একটা শুইবার, অথবা একটা একটু বড় গোছের, শুইবার-বসিবার উভয় কার্য্যের জন্য ঘর ভাড়া করিতে পার। বাড়ীওয়ালা তোমাকে রাঁধিয়া, বিছানা পাট করিয়া, জুতা পরিষ্কার করিয়া দিবেন, রাত্রে আলো ইত্যাদি দিবেন, এরূপ বন্দোবস্ত তাঁহার সহিত করিতে পার। সপ্তাহে ৮।১০ শিলিং এর মধ্যে সুবিধা মত ঘর পাওয়া যায়। যেমন জিনিষ খাইতে ইচ্ছা হয়, তুমি আনিয়া দিবে, গৃহকর্ত্তী রসুই করিয়া দিবেন। যেমন খাইবে, তেমন খরচ পড়িবে। এ সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা প্রায় অসম্ভব। এক সমস্ত বাজার দর দিতে পারিলে চলে। তাহার দ্বারা আর ব্যতিব্যস্ত করিলাম না। তবে এস্থলে তোমার স্ব-ইচ্ছায় আনীত পদার্থে পীড়া হইবার আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম। প্রকৃতির রীতি কবির দুই ছন্দে স্মরণ রাখিলেই হইল—

"আপাত মধুর বটে মিষ্ট অতি হয়,
উদরের পীড়া কিন্তু জনমে নিশ্চয়।"

এই পদ্ধতি অবলম্বনে আর এক সুবিধা, বেশ নির্জ্জনতা পাওয়া যায়। বেশ বলি কেন? কখন কখন বেশী মাত্রা হইয়া পড়ে। শেষে বিরক্ত হইয়া বলিতে হয়—

"Oh! Solitude where are the charms,
That sages have seen in thy face?"

এরূপ স্থলে বাস করিলে বোধ হয় পৃথিবীতে যেন আর জনপ্রাণী ছিল না, কেবল স্বয়ং। এ ভাবে বিস্তর ব্যক্তি বাস করিয়াছেন এবং করেন, কিন্তু আমরা কত দূর পারিব, জানি না। অবস্থা চিন্তনেই শরীরে জ্বরের উদয় হয়। কাহার কাহার পক্ষে এ

প্রকার বন্দোবস্ত বিশেষ সুবিধাজনক। অনেক লোকের দিবসে ঘরে থাকিতে হয় না। কার্য্যের হেতু অথবা ক্লাশে যাইবার নিমিত্ত দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাদের বাহিরে কাটাইতে হয়। তাঁহাদের আহার এবং রাত্রে নিদ্রার সময় ব্যতীত গৃহে না আসিলেই চলে। এই প্রকার লোকের বাড়ীওয়ালার সহিত আহারের বন্দোবস্ত না করাই ভাল। রন্ধন কার্য্যাদি সমেত কেবল ঘরের খরচ ঠিক করা উচিত। নিজে বাজার করিয়া দিবেন। এই বন্দোবস্তের কয়েকটী সুবিধা আছে। একেত,পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেশী খাওয়া নয়, যাহা খাইব, স্ব ইচ্ছামত উত্তম জিনিষ খাইতে পারিব। নিজে সতর্ক হইলে অসুখের ভয় নাই। তাহার পর, আমাদের বিশ্বাসে খরচ অনেক অল্প পড়িবে। আর এক কথা, বোর্ডিংএ এক নির্দ্দিষ্ট আহারের সময় করা আছে। আপনি এখন নানা স্থানে যাইবেন, যথা সময়ে না আসিতে পারেন। আগমন করুন আর নাই করুন, আহার করুন বা নাই করুন, তাহার মূল্য দিতেই হইবে। এরূপ বন্দোবস্ত না থাকিলে আপনি গৃহে না আসিলেও পারেন। অন্যত্র আহার করিতে পারেন। দ্বিগুণ খরচ পড়িবে না। মনের ভিতর উদ্বিগ্নতা থাকিবে না। পূর্ব্বে নিজে বাজার করার কথা বলেছি; অনেকে মনে করিবেন, বাজার করা ত মহা বিড়ম্বনা,তাতে সময় নষ্ট; সে আর পোষায় না। এ মুল্লুক সম্বন্ধে বেশী কষ্টে পড়িতে হয় না। আমাদের দেশের মত, প্রাতে ধামা গামছা কাঁধে করিয়া এ মুদীর ঘর, সে মুদীর দোকান করিয়া বেড়াইতে হয় না; তিন পোয়া একক্রোশ পথ হাঁটিয়া হাটে বাজারে যাইতে হয় না। বোঝা বহিয়া বহিয়া মরিতে হয় না। এস্থানে প্রায় পদার্থেরই এক এক বাঁধা দর আছে। তাহা না থাকিলে এত প্রকাণ্ড স্থানে অবস্থিতি দারুণ ক্লেশকর হইত বটে। স্থান এবং লোক সংখ্যার তুলনায় এদেশে প্রস্তরণা নাই বলিলেই হয়। মাছ চাই, মাংস চাই; জেলে কি কসাইয়ের সহিত ঠিক কর, সে প্রত্যহ আসিয়া,কি কি চাই,জিজ্ঞাসা করিয়া যাইবে। যাহা আদেশ কর, অনতিবিলম্বেই তাহা গৃহে হাজির করিয়া দিবে। এইরূপ করিয়া সংসারের যাবতীয় সমস্ত বাজার পাট এদেশে নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। গোলমাল কিসের? বিড়ম্বনা কই? এতে যদি কষ্ট হয়, তবে আর কি করা যায়? ইচ্ছা হইলে, জিনিষ গৃহে পৌছান মাত্র নিত্য নিত্য মূল্য দিতে পার, কিম্বা সপ্তাহান্তে সপ্তাহান্তে হিসাব শোধ করিতে পার। এ দেশে বড় নগদা কারবার; সপ্তাহের পর কাহার কেহ ঋণের ধার্ ধারে না। অর্থ থাকিলে এ মহানগরীতে আর ভাবনা নাই। চাই কেবল অর্থ, তাহার পর, মনের ইচ্ছা প্রকাশ কর, সমস্তই ঘরে বসিয়া পাইবে। বাড়ীওয়ালা তোমার জিনিষ কিছু চুরি করিতে পারে। কিন্তু নিজে একটু সতর্ক হইলে, আর কত চুরি করিবে? পারিবেই বা কত? তাতে ইংরাজ জাতি সততার জন্য বিখ্যাত, সামান্য চর্ম্মকারের ব্যবহার দেখিলে চমকিত হইতে হয়।

১৯ নং বার্ণার্ড ষ্ট্রীট এক বোর্ডিং। এটী যে বেশ উচ্চ ধরণের, তাহা বলিতে পারি না। গৃহকর্ত্রী Mrs. Saw অতিশয় ভদ্র। তিনি মাতার ন্যায় প্রত্যেকের প্রকোষ্ঠে প্রত্যেকের শয্যা সুসজ্জিত সুরচিত হইয়াছে কি না, সকলের আশানুরূপ মনোমত আহার হইল কি না, কাহার কি অসুখ হইল, কাহার কি পথ্য চাই, ইত্যাদি সমস্তই স্বয়ং দেখিয়া

থাকেন। তিনি ব্যতীত এ নিবাসের অস্তিত্ব লোপ পায়, মাধুর্য্য থাকে না। এ স্থানটী বেশ সুবিধাজনক। বাড়ীর নিকটেই পাঁচ সাতটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। সর্ব্বত্রই সহজে গমন করা যায়। সহরের একেবারে অভ্যন্তরে হইলেও এটী একটু নির্জ্জন পল্লী, বেশ সুসভ্য। তেমন বেশী গাড়ীর ঘড়্ঘড়ানি, লোকের ক্রমাগত চিৎকার শোনা যায় না। বার্ণাড ষ্ট্রীটের উভয় মুখেই এক একটী উদ্যান। একদিকে Russel Square, অপর দিকে Burnswick square, বায়ু তেমন মন্দ নহে। লণ্ডন অন্তরের ভিতর থাকিয়া নির্ম্মল বায়ু পাওয়া বড় কষ্ট। যে কলকারখানা; বায়ুতে কেবল ধূম মিশ্রিত। দিবসান্তে নাসারন্ধ্রের ভিতর একেবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। বাড়ীগুলি সমস্ত ধুঁয়ায় ধুঁয়ায় কাল হইয়া গিয়াছে। বেশ রং করা নয়নরঞ্জন অট্টালিকা প্রায়ই দেখা যায় না। সমস্তই কাল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নবাগতের লণ্ডনকে অশুচগ্রস্ত সহর বলিয়া বোধ হইবে, আশ্চর্য্য কি? এই রাস্তা (Bernard street) বেশী লম্বা নহে। উভয় পার্শ্বে সর্ব্বসমেত বোধ করি অর্দ্ধ শত মাত্র গৃহ আছে। সে গুলি প্রায়ই বোর্ডিং।

আমাদের বাসা হইতে পূর্ব্ব দিকে দু পা অগ্রসর হইলেই ডান হাতি এক রাস্তা দিয়া Guilford Street নামক রাস্তায় পড়া যায়। এই নূতন রাস্তার আর দশ বার খানি বাড়ী পূর্ব্বে গেলেই 'সুবিখ্যাত' অনাথ শিশুদিগের আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এটীকে এখন 'Foundling Hospital' বলা হয়। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা টমাস্ কোরাম (Thomas Coram) ইহা সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বে তিনি কোন জাহাজের কাপ্তেনি করিতেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি লণ্ডনে বিশ্রামার্থ আগমন করেন। তাঁহার গৃহের সন্নিকটে কতিপয় অনাথ, নিরাশ্রয়, ক্ষুধার্থ, নগ্ন বালককে একদা তিনি দেখিতে পান। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার মোমের হৃদয় একেবারে গলিয়া যায়। তিনি একেবারে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। সেই অবধি এই অভাগাদিগের কোন এক সদ্গতি সংস্থান করিতে বদ্ধপরিকর হন। অসীম অর্থ ব্যয়, অপরাজিত মনের বল, বিপুল শ্রম দ্বারা কার্য্য করিয়া প্রথমতঃ হত্তন উদ্যান (Hatton Garden) নামক স্থানে এক সামান্য আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান চিকিৎসালয়টী ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সে কালে মহামতি পার্লেমেণ্ট ইহার পশ্চাতে প্রায় চতুর্দ্দশ সহস্র পাউণ্ড ব্যয় করেন। যে সময় এ আশ্রম স্থাপিত হয়, তখন শিশুকে ভর্ত্তি করাইতে কোন কষ্ট ছিল না। শুনিতে পাই, দ্বার দেশে একটী করণ্ডবিশেষ স্থাপিত হইত। কেহ কোন দীন, দরিদ্র, রুগ্ন, পতিত শিশু কুড়াইয়া পাইলে এই টুকরীতে রাখিয়া চলিয়া যাইত। প্রথম দিনেই নাকি ১১৭ জন শিশু আনীত হয়। প্রথম বৎসরের মধ্যেই তাহাদের সংখ্যা ৩২৯৬ হইয়া উঠে। তিন চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় পঞ্চদশ সহস্র অনাথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে দশ সহস্রেরও অধিক শিশু মারা যায়। এই ভয়ানক মৃত্যু দেখিয়া সকলের আতঙ্ক হয়। দেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। পার্লেমেণ্ট বাধ্য হইয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন, মৃতাবশিষ্ট শিশুগুলির সুব্যবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু, যাহাকে তাহাকে, অবস্থা বিচার না করিয়া, আশ্রম ভুক্ত করা ক্রমে নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিয়ম

ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই আশ্রমে 'অবৈধ প্রণয়-জাত সন্তান ব্যতীত অপর কোন শিশুকেই ভর্ত্তি করা হইত না; এখনও হয় না। এখন কোন শিশুকে আশ্রম-ভুক্ত করিতে হইলে শিশুর মাতাকে স্বয়ং আগমন করিয়া আবেদন করিতে হয়। বহু সন্তানের মাতা হইলে হইবে না। প্রথম সন্তানের মাতা হওয়া চাই। তিনি আগমন করিয়া সভার সম্মুখে যদি স্বীয় অতীত সৎ চরিত্রের প্রমাণ দিতে পারেন এবং শিশুর পিতা তাঁহাকে একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই সভা এই শিশু সম্বন্ধে বিবেচনা করেন, নতুবা না। দয়ার-ঠাকুর মহাত্মা কাপ্তেন কোরাম এতদর্থে তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, স্থাবর এবং অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান। সুখের বিষয়, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে সহৃদয় জনসাধারণ এহেন মহাত্মার উদ্দেশ্য অবগত হওয়া এবং অতিশয় মহৎ বলিয়া জানার চিহ্ন স্বরূপ বিপুল অর্থ সাহায্য করিয়া যুগপৎ অর্থের সদ্ব্যয় ও সৎকার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন। আজকাল এই চিৎসালয়ের বাৎসরিক আয় আট হাজার পাউণ্ডেরও উপর। ইহা শুনিয়া আমার দেশের অনেকের বিশ্বাস হইবে না! এ আয় নানা প্রকার দত্ত সম্পত্তি হইতেই উদ্ভূত, বলা বাহুল্য। হায় রে! এ অবস্থা আমাদের দেশে কবে হইবে!

এই হাঁসপাতালের সহিত সংযুক্ত একটী ছোট উপাসনালয় আছে। প্রতি রবিবারে প্রাতে এখানে অর্চ্চনা হইয়া থাকে। প্রবেশের কালে দরজায় একটী রূপার থালা ধরা হয়। সকলেই কিছু কিছু দেন, বাঞ্ছনীয়। রৌপ্য-বাসনে তাম্রমুদ্রা দেওয়া পোষায় না। স্বর্ণ দিতে পারিলে ত ভালই, রৌপ্য মুদ্রার নিম্নে আর যাইবার উপায় নাই। যাহা হউক, এ মহৎ উদ্দেশ্যে কিছু ব্যয় করা বৃথা কিংবা অপব্যয় নহে। উপাসনান্তে এই সমস্ত অনাথ বালক এবং বালিকার মধ্যাহ্ন ভোজন দেখা যায়। এ দৃশ্য বড়ই প্রীতিকর। এতদ্ ব্যতীত এখানে অন্যান্য বিস্তর দ্রষ্টব্য সামগ্রী আছে। বিলাত-প্রবাসী বন্ধুগণ এ স্থানটী একবার পরিদর্শন করেন, একান্ত বাসনা। ক্রমশঃ

বাহাদুরি।

সিংহ বাবুর পুরাতন ভৃত্য নাম গদাধর তার,
সুপুরি খরিদ করিল একদা দুটি দুটি পয়সার।
ঘরেতে আসিয়া দেখিল কাটিয়া সবি পচা পোকা ধরা;
নহেত উচিত দোকানদারের এতটা ঠকামি করা।
গরম মেজাজ মুনিব তাহার, করিল এত্তেলা তাঁরে,
তিনি কহিলেন, ফিরায়ে দিয়ে এসগে দোকানদারে।
কড়া দুটো কথা শুনাইয়ে গদা দিতে গেল ফিরাইয়া;
ফটিক কহিল, কথনো নোবোনা, কেন না নিলে দেখিয়া?
পাইয়া সংবাদ উঠিল গর্জ্জিয়া গরম মেজাজী বাবু;
কহিলেন আমি ফটিক বেটাকে নিশ্চয় করিব কাবু।
এত বলি গিয়া উকীলের কাছে জানালেন সব হাল,
উকীল কহেন নালিস দায়ের নিশ্চয় করিব কাল।
সহজ মানুস নহেত ফটিক, উকীল করিল সেহ;
দুদিকেতে যুদ্ধ বাঁধিল তুমুল, কাঁপে আদালত গেহ।
পলকের ফ্রড্, মেনের ডেমেজ্, চিটি আদি গ্রন্থ খুলি,
"কেডিএট্ এম্টর্" কহে একজন, "ওয়ারেন্টি" কহে আর;
হাকিম তখন মুদিয়া নয়ন করিছেন সুবিচার।
তর্ক অবসান, খুলিয়া নয়ন, শুনান্ হাকিম রায়—
"ক্লেম্ ডিস্মিস্" হইল প্রচার, একি হ'ল হায় হায়!
বড়ই তেজাল বাদীর উকীল, কহে, কিবা ইথে ভয়,
শীঘ্র কাপি লও, বোকা এ হাকিম, এ বিচার কিছু নয়।

এখনি আপীল করিব বায়ের টাকা ঘুশ আর চাই,
ন্ সিংহ কহিল তাহে কি ভাবনা যা চাহিবে দিব তাই।
আবার আপীল,আবার সংগ্রাম,আবার বাঁধিল গোল;
জিতিল ফটিক হারিল ন্ সিংহ, আবার বাজিল ঢোল।
কহিল উকীল, জেলার হাকিম সবগুলো এরা গাধা ;
হাইকোর্টে এর হবে রিভিসান টাকা কর কিছু গাদা।
ঘুশ টাকা রোজ লইয়া উকীল হাইকোর্টে তবে যায়,
ফটিক তখন বেচিয়া দোকান টাকা লয়ে পাছু ধায়।
দুদিকে কৌচলি কত বলাবলি করি কত কোটেসন্,
অবশেষে রায় হইল প্রকাশ, না মঞ্জুর রিভিসান্।
সাবাস্ সাবাস্ ফটিকচন্দ্র ডিক্রি পাইল তিন ;
নাহিক দোকান বিত্ত অবসান, নাহি চলে আর দিন।
উকীলের হাতে ন্ সিংহ এদিকে মদ্গেজ দিল ঘর ;
জয় জয় জয় উকীলের জয়, ঘোষ সবে অতঃপর।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণবদর্শন। (৯)

৮৪। জ্ঞান মাত্রই অবশ্যই দ্বৈত ভাবাত্মক। তাহার একদিকে বিষয় এবং অপর দিকে বিষয়ী আছে। কিন্তু জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এই উভয়ের অভিন্ন ভাবের মিলন হইতে,—তদাকার বৃত্তি হইতে, অদ্বৈত সিদ্ধি হইতে। উভয়ের ব্যবহারিক মিলন হইবা মাত্র, তদাকার বৃত্তির স্ফূরণ হয়, অদ্বৈত সিদ্ধির বিজ্ঞাপন হয় ; তবেই বিষয়-জ্ঞান সর্ব্বত্রেই ব্যবহারিক ভাবে জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বাঙ্কে আত্মবস্তুর ব্যবহারিক ভাবে জ্ঞেয় বিষয়াকার ধারণ এবং তৎসঙ্গে তাহার তদেকাত্মভাব ও অদ্বৈত-সিদ্ধি অপরিহার্য্য রূপে ইঙ্গিত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ার অব্যবহিত অন্তরালে আত্মবস্তুর (বিষয় ও বিষয়ীর) স্বরূপগত ঐক্য ব্যবহারিকভাবে ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে ; স্বগত, স্বরূপগত, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদ্বৈতভাব ব্যবহারিক ভাবে দ্বৈতভাবের আচ্ছাদন পরিধান করিয়া,ছেদ্য ও ভেদ্যবৎ—স্বতন্ত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার পূর্ব্বাঙ্কে, বিষয়ীর বিষয়াকারে পরিণতি অনিবার্য্য, বিষয়ের সঙ্গে তাহার এইভাবে অদ্বৈতভাব সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এখন এক দিক্ হইতে যেমন দেখা যাইতেছে যে, দ্বৈতভাব সিদ্ধি ভিন্ন—বিষয়-স্বরূপের পার্থক্য উপলব্ধি ভিন্ন, কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না ; তেমনি আর এক দিক্ হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্যবহারিক জ্ঞানভূত দ্বৈতভাব সিদ্ধির আকর স্থান—জনন স্থান—সমাধি=নিহিত=অদ্বৈত ভাব-সিদ্ধি—তদেকাত্ম ভাব-সিদ্ধি—তদাকার ভাব-স্ফূর্ত্তি। একটু অন্তস্তলে নিমগ্ন হইলে উপলব্ধি-ভূত হয় যে, প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার পূর্ব্বাঙ্কে বা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ী ও তৎস্বরূপ নিহিত বিষয়-মূর্ত্তি ব্যবহারিক ভাবে পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে ব্যবহারিক ভাবে দ্বিরূপে বিভক্ত করিতেছে—আপনা হইতে আপনাকে ব্যবহারিক ভাবে স্বতন্ত্র করিতেছে এবং এইরূপে এই স্বগত বিভাগের অনুবর্ত্তী হইয়া নিত্য-সিদ্ধ—স্বভাব-সিদ্ধ অদ্বৈত ভাবকে দ্বৈত ভাবের ঘন আচ্ছাদনে আবরিত করিয়া স্বগত বিষয়কে স্বকীয় স্বরূপ হইতে ইন্দ্রিয় সমক্ষে আনিয়া, স্বকীয় জ্ঞান-পথবর্ত্তী করিতেছে। ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্পূর্ণ স্থল থাকিতেছে যে, যাবতীয় বিষয় বীজ অনাদি কাল হইতে আত্মগত ব্যবহারিক জ্ঞান ভাণ্ডারের কোষ-স্বরূপ অব্যক্তে অব্যক্তরূপে নিহিত আছে। ব্যবহারিক জ্ঞানোৎপত্তির সময়,

আত্মা বিষয়ীরূপে, স্বকীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের বীজ কোষস্থিত বিষয় বিশেষের আকারে আকারিত হইয়া, পরক্ষণে দ্বৈতভাবে সেই বিষয় জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সেই বিষয়ী, যখন যে বিষয়ের আকার অদৃষ্টাধীন হইয়া পরিগ্রহণ করিতেছে, তখন কেবলমাত্র সেই বিষয়কে আত্মগর্ভ হইতে ইন্দ্রিয় সমক্ষীভূত করিয়া তদীয় ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিতেছে। ইহাতে এ সিদ্ধান্ত কখনই নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইতে পারে না যে, যাবতীয় সম্ভাব্য বিষয় ব্যাপার নিত্য অব্যক্তরূপে আত্ম-নিহিত হইয়া বিষয়ীযুক্ত আছে; বিষয়ীর ব্যবহারিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের অব্যক্ত-প্রদেশে নিখিল নামরূপ, নিখিল সংসার, কালাতীত কাল হইতে যথাযথ চিত্রিত ও সন্নিবেশিত আছে এবং প্রয়োজনানুসারে বা অদৃষ্ট ইচ্ছানুসারে সেই অব্যক্ত কোষস্থ বিষয় ব্যাপার, দেশ কালের বুদ্ধি-কল্পিত পথে ইন্দ্রিয় সমক্ষীভূত হইয়া প্রকট-লীলার অনুগত হইতেছে। এইরূপে অপ্রকট নিত্য লীলা, নিত্য বর্ত্তমান, নিত্য অক্ষুণ্ণ থাকিয়া প্রকট লীলার নিত্য স্রোত প্রবহমান হইতেছে। এই ব্যবহারিক বিষয় মিলন অবশ্যই বিষয়ীর স্বেচ্ছাধীন নহে। বিষয়ী তাহার অনাদ্যনন্ত অব্যক্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার নিহিত যে-কোন বিষয়-ব্যাপার যখনই সমক্ষীভূত করিতে ইচ্ছা করিল, তৎক্ষণাৎ যে তাহা তদীয় অব্যক্ত আত্মগর্ভ হইতে নির্ভিন্ন প্রতিভাত ও স্বতন্ত্র হইয়া, তাহার ইন্দ্রিয় দ্বারে ব্যবহারিক ভাবে সবিগ্রহ হইয়া অভিব্যক্ত হইল, এমনত কুত্রাপি সচরাচর ঘটিতেছে না। সেই সমক্ষীভূত বিষয়ের উদয়াস্ত ও স্থিতি, তাহাও তাহার স্বেচ্ছাধীন নহে। তবে তাহা কোন্ অপরিদৃষ্ট অতিরিক্ত ইচ্ছার অধীন? সেই অদৃষ্টীভূত ইচ্ছা,—যাহা নানারূপ ব্যবহারিক চিত্র বিষয়ীর জ্ঞান সমক্ষে অনুক্ষণ চিত্রিত করিয়া, তাহাকে কত প্রকার চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছাস্রোতে নীয়মান করিতেছে, তাহা কোন্ অপরিদৃষ্ট, অপরিজ্ঞাত, অনভিজ্ঞেয় স্বরূপে নিহিত আছে? যদি তাহা বিষয়ীর ইচ্ছাধীন না হইল, তবে তাহা অবশ্যই আত্ম-নিহিত বিষয়েরই ইচ্ছাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, এই আত্মার স্বরূপ-গর্ভে তদতিরিক্ত—বিষয়ীর অতিরিক্ত পদার্থ, বিষয় ভিন্ন আর কি আছে? তবে কি আত্ম-গর্ভস্থ এই বিষয়ই ইচ্ছাময় হইল? ইহারই ইচ্ছায় কি সকলই হইতেছে? সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গ সকলই কি ইহারই ইচ্ছায় সম্পাদিত? না হইবার কারণই বা কি? ইনি জ্ঞানের কোন অভিমানে অভিমানী না হইয়া, সকল স্থলেই বিষয়ীর জ্ঞানদাতা গুরু, এবং যখন জ্ঞানই শক্তির নিদানভূত, তখন অবশ্যই এই বিষয়দত্ত জ্ঞানকে বিষয়ীর আয়ত্তীভূত সমস্ত শক্তির কারণ বলিয়া মানিতে হইবে। যাহা কিছু ক্রম বিকাশের নিয়মে ব্যক্ত হয়, স্ফূর্ত্তি পায় বা বিকাশ লাভ করে, সমস্তই সসীম ও শান্ত অবস্থা হইতে অনন্ত উন্নতির দিকে প্রধাবিত, বিষয়ীতেই জ্ঞান ও শক্তির এবং সকল বিষয়ে, উন্নতির ক্রমশঃ পরিস্ফূর্ত্তি সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু আত্ম-স্বরূপ-নিহিত বিষয়াংশে তাহার কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। তখন অবশ্যই এই বিষয়স্বরূপকেই অসীম ও অনন্ত জ্ঞান শক্তির পরিপূর্ণ আধার বলিয়া মানিতে হইবে। আত্ম-স্বরূপ নিহিত এই অনির্ব্বচনীয় বিষয়ই, বিষয়ী জ্ঞান, শক্তির ও মুক্তি মোক্ষের বিধাতা—তাহার প্রেম ও আনন্দের, সুখ ও সম্পদের মহাজন স্বরূপ। তাহার সর্ব্বপ্রকার অভাব, সেই আত্মস্থ বিষয় হইতে

নির্ব্বাহিত হইতেছে। শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোক * যে-কোন অর্থে মূলে বা শঙ্কর-ভাষ্যে সঙ্কলিত বা প্রতিপন্ন হইয়া থাকুক, সে ছুটী বক্ষ্যমান বিষয়ের অর্থেও সম্পূর্ণ প্রযুজ্য হইতে পারে,—"দুই সুন্দর পক্ষী (বিষয় ও বিষয়ী) এক বৃক্ষে (আত্ম-স্বরূপ) অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন, এবং উভয়ে পরস্পরের সখা; তন্মধ্যে একটী (বিষয়ী) সুখেতে ফল ভোজন (জ্ঞান প্রেম প্রভৃতি কর্ম্মফল সম্ভোগ) করেন, অন্য(বিষয়) নিরশন (সুখ দুঃখাদি ভোগের অতীত) থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। পুরুষ (বিষয়ী) সেই বৃক্ষ মধ্যে (আপনাতে) নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্ব্বদাই শোক করিতে থাকে, কিন্তু যখন সর্ব্বসেব্য পরমাত্ম বস্তুকে ও তদীয় মহিমাকে দেখিতে পায়, (পরমাত্ম তত্ত্ব লাভ করে), তখন তাহার আর শোক থাকে না।" এই দৃশ্যমান প্রকট জগৎ, যাহা সুখ-দুঃখাত্মক ফল স্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া বিষয়ীর সমক্ষীভূত হইয়াছে, তাহা আত্ম-স্বরূপ নিহিত তুরীয় বিষয় ব্যাপারের ব্যবহারিক প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা সেই বিষয়ের ছায়া বা প্রতিকৃতিমাত্র। প্রকট বা ব্যবহারিক সৃষ্টি, আত্মস্থ নিত্য অপ্রকট বিষয়ের সেই প্রতিকৃতিতে পরিকল্পিত। সেই অপ্রকট বিষয়ই নিত্য অদৃষ্ট পদার্থ, এবং ইহসংসারের যাবতীয় ব্যবহারিক বিষয়-মিলন সেই অদৃষ্টেরই—সেই তুরীয় বিষয়েরই ইচ্ছাধীন, এবং সেই আত্মনিষ্ঠ অপ্রকট বিষয়-ব্যাপারভূত বীজকোষের প্রকট অভিব্যক্তি ভিন্ন—অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছু নহে।

৮৫। যদি বিষয়ীর ইচ্ছা তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীন হইত, যদি বিষয়-ব্যাপার মূলতঃ তাহার স্বেচ্ছাধীন হইত, তাহা হইলে তাহা তাহার সকল কার্য্যে প্রকাশ পাইত। যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ইহার ঠিক বিপরীত—অর্থাৎ অধিকাংশস্থলে অদৃষ্ট বিষয়ের ইচ্ছাতে তদীয় প্রতিবিম্বিত বিষয়-ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সেই অপ্রাকৃত ইচ্ছার অধীনতা প্রযুক্ত প্রতীয়মান সমস্ত বিষয়-ব্যাপার, একটী অনতিক্রমণীয় অপরিহার্য্য নিয়ম প্রণালীর অনুগত থাকিয়া, বিষয়ীকে অগ্রাহ্য করিয়াই যেন আপন পথে প্রবাহিত হইতেছে। সেই বিষয় ব্যাপার রাশিচক্রে ভ্রাম্যমান গ্রহগণের ন্যায় কখনও বিষয়ীর ইচ্ছার বা ভাগ্যের অনুকূল হইতেছে এবং কখনও তাহাদের প্রতিকূল হইতেছে। বিষয়ী যে পরিমাণে সেই নিয়ম প্রণালীর অনুগত হইতে সক্ষম হয়, সেই পরিমাণে সে নিত্য প্রবহমান বিষয় ও ঘটনাস্রোতের ব্যবহারিক কর্ত্তৃত্ব, কথঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে পারে। বিষয়ীর এই স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব শক্তিও স্বতঃসিদ্ধ নহে। তাহা তাহার অর্জ্জন-সিদ্ধ,—তাহা সর্ব্বত্রই তাহার স্বোপার্জ্জিত ও স্বোপার্জ্জনীয় শক্তি। তাহা সন্তুষ্ট ও সুপ্রসন্ন মৌলিক বিষয়-ব্যাপারের অর্পিত উপহার সামগ্রী। কেবল মাত্র আত্মগর্ভ নিহিত বিষয়েরই সে শক্তি নিত্যসিদ্ধ অনর্পিত ধন। বিষয়ী যখন আত্ম ও পরমাত্ম তত্ত্ব লাভ করিয়া, বিষয় ব্যাপারকে কর্ত্তৃত্বাধীন করিবার মলিন বাসনা

---

* দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষম্ পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ ৪ অঃ ৬শ্লোক।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ ঐ ৭ম শ্লোক।

পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভক্তিপরবশ ও প্রেমানুরক্ত হইয়া আত্মনিষ্ঠ—ইষ্টনিষ্ঠ হয়, তখনই কেবল প্রাকৃতিক বিষয়-ব্যাপার ব্যবহারিকভাবে যাচমান হইয়া, সর্ব্বস্থলে ভক্তের অকাম বা সকাম মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকে,—প্রকৃতি তখনই প্রিয়জনের অনুকূল হইয়া তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধ করিতে থাকে। তখন প্রকৃতি "নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের (বিষয়ীর) সর্ব্বকাম।"

৮৬। এই পূর্ণ স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারিণী কর্তৃত্ব শক্তিকে আত্মগর্ভস্থ বিষয়ীভূত বা পূর্ণ ব্যাপ্ত প্রতিপন্ন না করিয়া, বিষয়াংশগত বা প্রকৃতিগত বলিবার বিশিষ্ট কারণ এই যে, বিষয়ীকে ব্যবহারিকভাবে কেহ কোন অবস্থায় স্বতন্ত্র শক্তিমান্ দেখিতে পায় না। সে স্বকীয় স্বরূপ বা বিশ্বগত হইলেও, পরমাত্মতত্ত্বে উপনীত হইলেও, ব্যবহারিক বিষয় প্রবাহকে, নিত্য চলিষ্ণু সৃষ্টি-প্রবাহকে—জন-প্রবাহকে— সমাজ-প্রবাহকে— ঘটনা-প্রবাহকে বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার স্বতন্ত্র ক্ষমতা বা ঐশীশক্তি লাভ করিতে দেখা যায় না, বা সেই ক্ষমতার কোন প্রকারে অভিমানী হইতে দেখা বা শুনা যায় না। বিষয়ী বরং সে অবস্থায় আপনাকে নিতান্ত নিরভিমান নীরজস্তমঃ ও নির্গুণ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়ীর বা পুরুষের কোন অবস্থাতে বিষয়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র শক্তির স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না। যে সমস্ত মহাপুরুষেরা অলৌকিক শক্তি সাধ্যের অভিমান রাখেন, তাঁহাদেরও তাহা স্বতন্ত্র, অপরিমিত ও নিরতিশয় নহে,—তাহা অনর্পিত ও অনর্জ্জিত ধনও নহে। তাহাও তাঁহাদের বিষয়ার্পিত, বিষয়াধীন অর্থাৎ বিষয়ভাণ্ডার হইতে ঋণপ্রাপ্ত সামগ্রী। প্রকৃতির দুর্জ্জয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা তাহা অর্জ্জন করিয়া থাকেন মাত্র। সে শক্তির মহাজন আত্মস্থ বিষয় বা পরমাপ্রকৃতি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। প্রকৃতিকে—বা বিষয়কে পুরুষ হইতে, বিষয় হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে স্বতঃই এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তখন এই প্রকৃতি যেমন চিন্ময় ধনের মহাজন, তেমনি যাবতীয় ধনের একমাত্র মহাজন এবং পুরুষ সর্ব্বাবস্থায় তাহারই খাতক।

৮৭। সাংখ্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভগবান কপিল-কল্পিত মহত্তত্ত্ব-প্রসবিনী মূলা নাম্নী প্রকৃতি উপরি উক্ত আত্মগর্ভ-নিহিতা পরমা প্রকৃতি নহে, তাহা পূর্ব্ব বর্ণিত সমাধি-নিহিতা প্রকৃতি নহে। তাহা সেই অখণ্ড ও দণ্ডের অঙ্গে পরিকল্পিত ব্যবহারিক সৃষ্টিচক্রের প্রতিবিম্বিত মূলাধার। তাহা সেই অবাস্তব মহাচক্রের অঙ্গভূত ব্যবহারিক নাভিমূল। সেই নাভিমূল হইতে প্রতীয়মান প্রাকৃত সৃষ্টিস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা কোন ক্রমেই আত্মবস্তুভূত বিকারাতীত নিত্যধামের নিত্যসিদ্ধা নিত্যপ্রকৃতি নহে। যাঁহার অঘটন ঘটনপটীয়সী নিত্যলীলাময়ী নিত্য-অব্যক্ত ও অপ্রাকৃত ইচ্ছাক্রমে এই প্রাকৃত সৃষ্টিস্রোত পূজ্যপাদ কপিলের ছায়াময়ী প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া যথা নিয়মে প্রবাহমান হইতেছে, যথাক্রমে এই ব্যবহারিক সৃষ্টিপটের যবনিকা শনৈঃ শনৈঃ অপসারিত হইয়া নব নব বিষয়-ব্যাপার উপস্থিত ও সম্মুখীন করিতেছে। ভগবান কপিল প্রতিমূর্ত্তিভূত এই ব্যবহারিক স্রোতের আদ্যন্ত তত্ত্বের নির্ণায়ক মাত্র বলিয়া পরিচিত।

৮৮। এই আত্মস্বরূপ-নিহিত বিষয়-ব্যাপারে প্রাকৃত ব্যবহারিক সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ণিত কারণত্ব থাকাতে, শাস্ত্রাদিতে সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক, মায়িক, আহঙ্কারিক বা অবিদ্যা-কল্পিত, প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষ্য করিয়া থাকে।

বহির্দ্দেশে কোন বিষয় ব্যাপারের ব্যবহারিক প্রকটন সম্বন্ধে পূজনীয় পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস যথার্থই বলিয়াছেন যে,"হৃদয়ে আছিল,ব্যাকত হইল, দেখিতে পাইনু সে" (তাই)। চণ্ডীদাসের এই মহাজনী পদ সর্ব্বস্থলেই,সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় ব্যাপার সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে। এই বাহ্যস্ফূর্ত্ত সৃষ্টি-চিত্র, তদীয় পটের অন্তরালেথার ব্যবহারিক অনুকৃতি মাত্র—অবিকল প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যে কল্পিত দেশকালে তাহা পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া বাহ্যদৃষ্টিপথের অতিথি হইয়াছে, সেখানে তাহার মূল নাই, সত্তা নাই। তাহার মূল ও সত্তা নিত্য অপ্রকট নিত্যধামে—দেশকালের অতীত রাজ্যে। তাহার মূল ও সত্তা আত্মগর্ভে—আত্মস্থ বিষয়-গর্ভে।

৮৯। এই আত্মগর্ভ বা আত্মস্থ বিষয়-গর্ভ হইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ব্যবহারিক দ্বৈতাত্মক জ্ঞান-ভাসিত সৃষ্টির স্থূল বিষয়-ব্যাপার তদীয় মূলাধার স্থিত অদৃষ্ট স্বেচ্ছাক্রমে বিষয়ীর ইন্দ্রিয় সমক্ষে স্বতন্ত্র সাজে সজ্জিত হইয়া অবিশ্রান্তধারে প্রবাহিত হইতেছে। ধন, জন, সুখ, সম্পদ, গৃহোদ্যান, অট্টালিকা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজন এবং স্ত্রীপুত্র পরিজন প্রভৃতি আত্মবর্গ এবং অন্য যাহা কিছু, সেই অদৃষ্ট বিষয়চক্রের স্বেচ্ছাক্রমে যাতায়াত করিতেছে এবং বিষয়ীর বিবিধ সুখ দুঃখের ও শুভাশুভ কর্ম্মফলের সাক্ষাৎ প্রেরয়িতা হইয়া তাহাকে তাহার চরম পরিণামের দিকে সপ্রেমে, সস্নেহে পরিচালন করিতেছে। তাহাতে এই আত্মস্থ বিষয় সম্বন্ধে এরূপ স্তুতিবাক্য প্রযুক্ত হইবার স্থল আছে যে, "তুমি প্রেমেতে ধরেছ, প্রেমেতে বেঁধেছ, প্রেমেতে ঘিরেছ মোরে; লইয়া চলিছ অবিরাম গতি পরমাত্ম প্রেমপুরে।"

৯০। যে তদাকার সিদ্ধি, অদ্বৈত সিদ্ধি প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ার অন্তস্তলবর্ত্তী হইয়া আছে বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে তাহা ব্যবহারিক জ্ঞানভাসিত দ্বৈতভাব সিদ্ধির ঘন আবরণ ভেদ করিয়া, কোন প্রকারে চিত্তক্ষেত্রে পরিস্ফূট হইতে পারে না; কিন্তু তাহা সমাক্ পরিস্ফূট হয়—জ্ঞানের পরমাত্ম প্রকোষ্ঠে, যেখানে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়বিধ জ্ঞান পরস্পরে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে। জ্ঞানের সেই পরমাত্ম প্রকোষ্ঠে গুরুকৃপায় স্বকীয় স্বরূপের মূলাধারতলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পারমার্থিক অদ্বৈত জ্ঞানসিদ্ধির প্রতিষ্ঠা-ভূমি হইতে ব্যবহারিক দ্বৈতজ্ঞান সিদ্ধির উৎপত্তি প্রকরণ, বিষয়ী তাহার অভিনব পারমার্থিক চক্ষে নিরীক্ষণ করে।

৯১। বস্তুতঃ এই প্রাকৃত জগতের প্রকৃত বা পারমার্থিক সত্তা এই প্রকট দেশের কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। জগতের কেবল ব্যবহারিক সত্তা এখানে বুদ্ধি-কল্পিত দেশ কালাভাসে প্রতিবিম্বিত হইয়া আছে মাত্র। সুতরাং জগৎ, সত্তা ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রতীয়মান সত্তাই কেবল মাত্র ব্যবহারিক সত্তা এবং তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞানই কেবল মাত্র ব্যবহারিক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সত্ত্ব, রজঃ তমো গুণময়ী বিসদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠা প্রকৃতির সত্তা—যাহা হইতে জগতের ব্যবহারিক উৎপত্তি হইয়াছে, ত্রিগুণ সাগরশায়ী বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, হিরণ্যগর্ভ ও বৈশ্বানর প্রভৃতি ঈশ্বর সত্তা বা তাঁহাদের বিভূতি যাবতীয় অবতার সত্তা,—কীট, পতঙ্গ, পক্ষী গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি যাবতীয় জীব সত্তা, সমস্তই আত্মস্থ বিষয়গর্ভ-নিহিত

ব্যবহারিক জ্ঞান-বীজ-কোষের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত। ত্রিগুণোৎপন্ন সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক প্রভৃতি যাবতীয় লীলাময়ী তরঙ্গ রাজির ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় স্ফূর্ত্তির এই প্রকটদেশে ব্যবহারিক ভিন্ন অন্য সত্তা নাই। ইহাদের প্রকৃত অপ্রাকৃত সত্তা মায়াতীত পরব্যোমের পারমার্থিক বিষয়গত। সমাধি সমাহিত পরম সত্তাই কেবল একমাত্র প্রকৃত সত্তা। এই একমাত্র সত্তা একমেবাদ্বিতীয়মের স্বধামগত, স্বকেন্দ্রগত, স্বভাবগত, স্বগত নিত্য লীলাই প্রকৃত বা পারমার্থিক লীলা। এই পারমার্থিক লীলা নিত্য অপ্রকট, নিত্য অব্যক্ত। সমগ্র ব্যবহারিক লীলা-প্রবাহ এই অব্যক্ত ও অপ্রকট নিত্যলীলার প্রতিবিম্বিত অনুকৃতি মাত্র। অনুকৃতিকে অবশ্যই সর্ব্বত্র অসত্য বলিয়া গণ্য করা বিধেয়। কিন্তু তাহা যে পারমার্থিক বিষয়ের অনুকৃতি, তাহা সারাৎসার সত্য পদার্থ। সাংসারিক ও অন্য ব্যবহারিক বিষয়-ব্যাপারের সত্যাসত্য এই মানদণ্ডে পরিমিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য কেবল মাত্র এই পারমার্থিক সত্তা ও লীলা বিষয়ক জ্ঞানই, প্রকৃত বা অপ্রাকৃত জ্ঞান; তদ্ভিন্ন যাবতীয় প্রতীয়মান সত্তা ও লীলা বিষয়ক জ্ঞানই, ব্যবহারিক জ্ঞান মাত্র। এই ব্যবহারিক জ্ঞান, বিম্ব ও প্রতিবিম্বগত ভেদে দ্বিবিধ। ভাবাঙ্গভূত পরমাত্মতত্ত্বসম্পন্ন সাধু সজ্জন সত্তা, বিম্ব বা স্বরূপগত; তদ্ভিন্ন যাবতীয় জৈবিক বা ঐশ্বরিকাদি সত্তা, মায়া ও অবিদ্যা কল্পিত প্রতিবিম্বগত। (খ চিহ্নিত তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৯২। এখন প্রকৃত বা পারমার্থিক এবং প্রাকৃত বা ব্যবহারিক সত্তা কাহাকে বলে, এবং তাহাদের উভয়ের বিভিন্নতা কোথায়, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধসুগম করিবার চেষ্টা করিব। মনে কর, একটী অখণ্ড দণ্ড অকারণে নিরতিশয় প্রবল বেগে স্বকেন্দ্রে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন বিঘূর্ণিত হইতেছে। সেই অকারণ আবর্ত্তন প্রযুক্ত, সেই ঘূর্ণায়মান অখণ্ড দণ্ডটী, স্বকীয় ঘূর্ণিশক্তি প্রভাবে, স্বকীয় দণ্ডরূপ আবরিত করিয়া চক্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে। এখানে অখণ্ড দণ্ডটী প্রকৃত সত্তা এবং চক্রটী ব্যবহারিক সত্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। দণ্ডটীর জ্ঞানই প্রকৃত পারমার্থিক বা সত্তাগত জ্ঞান এবং চক্রটীর জ্ঞানই প্রাকৃত ব্যবহারিক বা সত্তাহীন বিষয়ক জ্ঞান। এই ব্যবহারিক সত্তা, অপ্রকৃত হইলেও, তাহা যে অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য, অনতিক্রমণীয় ও প্রকৃতবৎ পরিদৃশ্যমান, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যবহারিক জ্ঞান-ভাসিত প্রকৃতবৎ পরিদৃশ্যমান এই চক্রটীর অভিব্যক্তির হেতু আর কিছুই নহে, কেবল মাত্র অখণ্ড দণ্ডটী ও তাহার আভ্যন্তরিক বিষয়গত আবরণ ও বিক্ষেপকারিণী ঘূর্ণিশক্তি। এই ঘূর্ণিশক্তিকে গুরুদত্ত পারমার্থিক বিজ্ঞান চক্ষে সেই দণ্ড হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখ, চক্রটীর ব্যবহারিক অস্তিত্ব তখনই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং কেবল সেই অখণ্ড মৌলিক দণ্ডটী মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ঠিক সেইরূপই এই বাহ্য প্রাপ্ত বিশ্বব্যাপারের প্রকৃতবৎ পরিদৃশ্যমান সত্তা। বিষয়ীর মূলাধারভূত অব্যক্ত প্রকৃতি বা বিষয়গত ত্রিবিধ বিচিত্র শক্তিকে তাহা হইতে স্বতন্ত্র ও নির্ভিন্ন করিয়া, গুরুপ্রসাদদত্ত বিজ্ঞান দৃষ্টিতে এই প্রকট লীলার বিশ্বব্যাপারকে নিরীক্ষণ কর, তাহা হইলে তাহার কিছুই সারত্ব থাকিবে না; থাকিবে মাত্র সারাৎসার নিত্য লীলানুগত, নিত্য সমাধিসমাহিত পারমার্থিক সত্তা। ভগবানের যাব-

তীর প্রকট সত্তাই, প্রকট লীলাই, বিষয়ীর ব্যবহারিক জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিমূর্ত্তীভূত—প্রকৃত পারমার্থিক জ্ঞানে নহে। কেবল মাত্র বিষয়ীর মহীভাবময়ী প্রেম লীলার চরম স্ফূর্ত্তিতে এই পারমার্থিক ও ব্যবহারিক, অপ্রকট ও প্রকট লীলার অপরূপ সমন্বয় সম্পাদিত হইয়াছে—উভয়ের অপরূপ মিলন সংঘটনা হইয়াছে।

৯৩। এই প্রেমলীলার চরম স্ফূর্ত্তিতে বিষয়ীর ভাবাঙ্গভূত ইন্দ্রিয় সমক্ষে, তদীয় পারমার্থিক সত্তার,—তদীয় পারমার্থিক জ্ঞানের—তদীয় অখণ্ড অদ্বৈত তত্ত্বের নিত্য অব্যক্ত সমাধি-গর্ভ হইতে, এই পরমাত্মময়ী সৃষ্টিলীলা—এই ব্যবহারিক জ্ঞানাঙ্গভূতা প্রকট লীলা—এই খণ্ডাত্মিকা দ্বৈতভাবময়ী বিবিধ বিচিত্রা ত্রিগুণ-তরঙ্গ-লীলা প্রতিপলকে অভ্যুত্থিতা হইয়াই সেই পলকাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্বরণ করিতেছে। তখন প্রতিপলকে "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,"—"আনন্দ হইতে এই সৃষ্টির উৎপত্তি হইতেছে,"—আনন্দেন জাতানি জীবন্তি"—সেই "আনন্দাবলম্বনে অবস্থিতি করিতেছে," এবং সেই পলকের অবসান প্রাপ্তি হইতে না হইতে "আনন্দং প্রয়ন্ত্যাভি সংবিশন্তি"—সেই "আনন্দে বিলীন হইয়া যাইতেছে।" তখন প্রতিপলকে সেই অব্যক্ত নিরঞ্জন সমুদ্র গর্ভ হইতে, এই লীলাময়ী নিরঞ্জন বুদ্বুদরাশি জগতাকারে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াই, দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি সম্বরণ করিতেছে, তখন দেখিবে,—

"সৃষ্টিস্থিতি নাশ, হচ্ছে বার মাস,
পলক আভাস চিতগগনে। *

৯৪। বিষয়ীর জৈবিক ব্যবহারিক চক্ষে এই পরমার্থস্বরূপ অখণ্ড দণ্ডটী তদীয় বিষয় নিহিত—প্রকৃতিগত ঘূর্ণিশক্তি প্রভাবে বিশ্ব চক্ররূপ ধারণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল। সেই পরমার্থ দণ্ডটী সেই শক্তির আবরণে প্রাবৃত হইয়া আত্ম-স্বরূপ গোপন করতঃ তাহার সেই দৃষ্টিপথ হইতে তিরোহিত হইয়া-

---

* এই মর্ম্মের তিনটী সংগীত, যথা—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

তোমার যখন সময় হবে।
সেই অন্তরের ধন, প্রকট হ'য়ে, মন সাধ (প্রেম সাধ)
পুরাবে। (গুরুরূপে)
মুখ চেয়ে থাকা ভাল, কি জানি কখন আসবে সুকাল,
(তুমি) দেশে বা বিদেশে থাক, এসে দেখা দিবে।
(গুরু) (সময় হ'লে)
(পেলে) আদরে অন্তরে ধর, সদা অন্তর্গত কর,
সেযে অন্তরেরই ধন, বাইরে না রাখিবে। (তারে পরভাবি)
অন্তরের সঙ্গে রবে, সেই কৃপাসিন্ধু লয় পাবে,
সে লয়েতে আচম্বিতে, সৃষ্টিরও প্রলয় ঘটিবে।
(সমাধি সমুদ্রে ডুবে)
নব সৃষ্টি পরে উদয়, তার সর্ব্বাঙ্গ পরানন্দময়,
সমাধি সমুদ্র হ'তে, উন্মীলিয়া নিমীলিবে।
(পলকান্ত না হইতে)

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া ঠেকা।

সে যে (নিত্য) অন্তরেরই ধন।
স্বরূপে মিশে স্বরূপে আছেন জীবের জীবন।
হ'লে জীবের ভাগ্যোদয়, বহির্জগতে দেখা পায়,
একান্ত আকিঞ্চন স্থলে, মেলে আকিঞ্চন ধন।
(অকিঞ্চনে) (বর্ত্তমানে) (সবিগ্রহে)
অনাদি কাল হ'তে অব্যক্ত, প্রয়োজনে হয় অভিব্যক্ত,
ভক্তজনের প্রয়োজন, ভুলতে নারেন নিরঞ্জন। (কভু)
প্রিয়জনের প্রয়োজন হ'লে, প্রিয়জন কি থাকে ভুলে,
সদয় মূরতি ধ'রে, নয়নে দেন দরশন। (বহির্জগতে)
(ভক্তের লালিতে ঠাকুর)।
দরশন মিলিলে তার, আনন্দ হ'বে অপার,
তার সঙ্গে নিত্য ব্রজে, পাবে বাস স্থান।
নিত্য লীলা সেথানে হয়, নিত্য বিরাজে রসময়,
(সেই) নিত্য লীলা দরশনে, সফল হয় জীবন।
যদি মন যাবে সে ধামে, ছেড়না সে গুণধামে
স্বরূপে মিশায়ে তারে, তার দেহ কর ধারণ।
(তারভাব কান্তি অঙ্গে ধরি)

ছিল। এক্ষণে সদ্গুরুরূপ নিরঞ্জন বিষয় কৃপায়, তদীয় সচ্চিদানন্দ ঘন—অদ্বৈত ঘন পরমাত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষয়ী সেই পুরাতন জীবত্ব-সুলভ প্রতিবিম্বগত ব্যবহারিক জ্ঞানাঙ্গে অঙ্গীভূত চক্রটীর সর্ব্বাঙ্গে,—প্রত্যেক অঙ্গে, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন দণ্ডটী সমক্ষীভূত ও প্রতিভাত দেখিতে লাগিল। তখন সেই চক্রটী তাহার অভিনব নিরঞ্জন ইন্দ্রিয় দ্বারে অখণ্ড আনন্দঘন দণ্ডময় এবং সেই দণ্ডটী চক্রের সর্ব্বাঙ্গময় হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। তখন সেই অনির্ব্বচনীয় দণ্ডটী চক্রাতীত হইয়াও, তাহার অভিনব বিম্বগত ব্যবহারিক জ্ঞানে চক্রবর্ত্তী স্বরূপে অনুভাত হইল। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময় প্রতিবিম্বগত ব্যবহারিক জ্ঞানানুভাত চক্রটীর মূলাধারে—মূল সত্তায় উপনীত ও অনুপ্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, কাহার সাধ্য সেই চক্রাতীত সদ্বস্তু অখণ্ড দণ্ডটীর জ্ঞান লাভ করে? কাহার সাধ্য সেই ব্যবহারিক চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত, অথচ সেই সমস্ত তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী এই অপরূপ লীলাময় সৃষ্টি চক্রের—সংসার-চক্রের সম্পূর্ণ অতীত, অথচ সম্পূর্ণরূপে সেই মহাচক্রের সর্ব্বাঙ্গবর্ত্তী নিত্যবস্তুর সন্দর্শন লাভ করে? এই সৃষ্টি চক্রটী যেমন প্রতিবিম্বিত দেখিতেছি, এটী ঠিক তেমনটী নহে; এটী একটী সত্তাঘন, চিদ্ঘন, আনন্দঘন, অখণ্ড দণ্ড, যে ব্যবহারিক চক্রাকারে (বিশ্বাকারে) পরিণত হইয়া এটী লৌকিক ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রতিভাত হইতেছে, এটী সে বস্তু নহে, ইহার এ আকারও নহে; এটী তদ্ভিন্ন বস্তু—এটী পরমার্থ বস্তু। পরমাত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত না হইলে, কাহার সাধ্য এই সত্যমূল ধ্রুব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়? এই জন্যই জ্ঞানের পরমাত্মরূপ বিম্বগত ধ্রুবজ্ঞান প্রকোষ্ঠ ভিন্ন, অন্যত্র এই ধ্রুব জ্ঞান সম্ভাবিত নহে। জ্ঞানে প্রতিবিম্বগত অনাত্ম প্রকোষ্ঠে যত প্রকার যুক্তিমূলক অদ্বৈত সিদ্ধির প্রতিষ্ঠা আছে, তাহার আলোচনা ও অধ্যাপনাতে কোন ক্রমেই চিত্তের সংশয় ছেদ হইয়া এ বিষয়ে ধ্রুবজ্ঞান স্ফূর্ত্তির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই।

"না' হলে লোচন, বচনে তা পাবে না।
সে ধন নয়নাঞ্জন শ্রবণে তা সাজে না।"

একমাত্র নিরঞ্জন ভাবাঙ্গ বিহারী সদ্গুরুই বিষয়ীর প্রকৃত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তাহার অব্যক্ত, অনন্ত আত্মগর্ভস্থ বিষয়াঙ্গ হইতে ব্যবহারিক ভাবে অভ্যুত্থিত ও সমাগত হইয়া বিষয়ীকে যথা প্রকোষ্ঠে প্রতিস্থাপন করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে পারেন—তাহাকে প্রকৃত তত্ত্বের ধ্রুবজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থবান হন।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীনাথ দত্ত।

রাগিণী বেহাগ,—তাল আড়াঠেকা।

সে যে অন্তরের বিষয়।
অন্তর হ'তে, সবিগ্রহে, হয় জীবেরে সদয়॥
অন্তরে লুকান ছিল, কৃপা বেশে বাহিরে এল,
মন সাধ (প্রেম সাধ) পুরাতে জীবের, নিত্য হয় উদয়। (গুরু)
যে যেখানে চায় তারে, প্রকট হয় তারই তরে
তারে আত্মসাৎ করে, অন্তর্ব্বাঞ্ছে ধরা দেয়॥
যার ভাগ্যে দেখা ঘটে, তার সকল আশা মেটে,
অন্যে ম'রে মিথ্যা খেটে, সে কেন পাইবে তায়॥
(অসময়ে) (না চাহিলে)
বাইরে প্রকট দেখে প্রভু, বাহিরে না রেখো কভু,
অন্তরে সদা রাখিলে, প্রেম সাধ (অন্তর্ব্বাঞ্ছা) পূর্ণ হয়॥

রাজতরঙ্গিণী। (২)

রাজমালা ও বংশাবলী।

এই প্রবন্ধে আমরা কাশ্মীরের নৃপতিদিগের নামমালা ও বংশাবলী প্রদান পূর্ব্বক সময় নির্দ্দেশের চেষ্টা করিব। কহ্লণ পণ্ডিতের সময় নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে, উইলসন্, কানিংহাম্ প্রিন্সেপ ও রমেশ চন্দ্র দত্তের অনুমিত কাল প্রদান পূর্ব্বক পরে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিব। উইল্সন্ ও প্রিন্সেপ সাহেবের অনুমিত সময় ও তালিকার সহিত,রমেশ বাবুর ও বিশ্বকোষে নিরূপিত সময়ের তুলনা করিব।

কহ্লণ পণ্ডিতের মতে খ্রীঃ পূঃ ৩৭১৪ অব্দে মহর্ষি কশ্যপ কাশ্মীরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রথম গোনর্দ্দের রাজত্বারম্ভের ১২৬৬ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উইলসন সাহেবের মতে ২৬৬৬ খৃঃ পূঃ অব্দে কশ্যপ দ্বারা কাশ্মীর উপনিবিষ্ট হয়। প্রথম গোনর্দ্দ হইতেই কাশ্মীরের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে।

সংখ্যা	নাম	রাজত্বকাল	কহ্লণ রাজ্যারম্ভ	উইলসন	প্রিন্সেপ	রমেশচন্দ্র দত্ত	কানিংহাম
১	গোনর্দ্দ (১)	..	খ্রীঃপূঃ২৪৪৮	১৪০০পূঃপূঃ	১০৪৫খৃঃপূঃ	...	...
২	দামোদর (১)	...	...	...	...	...	...
৩	গোনর্দ্দ (২)	...	..	...	...	...	...
৪-৩৮	অজ্ঞাত	...	...	...	...	...	...
৩৯	লব	...	খ্রীঃপূঃ১৭০৯	...	৫৭০খৃঃপূঃ	...	...
৪০	কুশেশয়	...	১৬৬৪	...	...	...	...
৪১	খগেন্দ্র	...	১৬৩০	...	...	...	৪০০খ্রীঃপূঃ
৪২	সুরেন্দ্র	...	১৬০০	—	...	...	...
৪৩	গোধর	...	১৫৭৩	...	...	...	...
৪৪	সুবর্ণ	...	১৫৩৭	...	...	...	...
৪৫	জনক	...	১৪৭৭	...	...	...	...
৪৬	শচীনর	...	১৪৭১	...	...	...	...
৪৭	অশোক	...	১৩৯৪	...	২৫০	...	২৬৩
৪৮	জলৌক (১)	...	১৩৩২	...	...	...	২২৬

সংখ্যা	নাম	রাজত্বকাল	কহ্লণ রাজ্যারম্ভ	উইলসন	প্রিন্সেপ	রমেশচন্দ্র দত্ত	কানিংহাম	বিশ্বকোষ
৪৯	দামোদর (২)	...	১৩০২খৃঃপূঃ	...	...	...	...	...
৫০	হুষ্ক	...	১২৭৭	...	...	...	...	...
৫১	জুষ্ক	...	...	...	...	...	..	...
৫২	কনিষ্ক	...	...	...	...	৭৮খ্রীঃ	৫৮খ্রীঃপূঃ	৩৩খ্রীঃপূঃ
৫৩	অভিমন্যু	৩৫	১২১৭	৪২৩খৃঃপূঃ	৭৩	১০০	...	...
৫৪	গোনর্দ্দ (৩)	৩৫	১১৮২	৩৮৮	১০৮	১১৫	...	১১৮৪ "
৫৫	বিভীষণ(১)	৫৩	১১৪৭	৩৭০	...	১৩০	...	১১৪৯ "
৫৬	ইন্দ্রজিৎ	৩০	১০৯৬	৩৫২	...	১৪৫	...	১০৯৫ "
৫৭	রাবণ	৩০	১০৬০	৩৩৪	...	১৬০	...	১০৬০ "

সংখ্যা	নাম	কহ্লণ রাজত্বকাল	কহ্লণ রাজ্যারম্ভ	উইলসন	প্রিন্সেপ	রমেশচন্দ্র দত্ত	কনিংহাম	বিশ্বকোষ	
৫৮	বিভীষণ(২)	৩৫	১০৩০	৩১৬	...	১৭৫	...	১০৩০	„
৫৯	কিন্নর	৩৯	৯৯৩	২৯৮	...	১৯০	...	৯৯৪	„
৬০	সিদ্ধ	৬০	৯৫৩	২৮০	...	২০৫	...	৯৫৫	„
৬১	উৎপলাক্ষ	৩০	৮৯৩	২৬২	...	২২০	...	৮৯৫	„
৬২	হিরণ্যাক্ষ	৩৭	৮৬২	২৪৪	...	২৩৫	...	৮৬৪	„
৬৩	হিরণ্যকুল	৬০	৮২৫	২২৬	..	...	...	৮২৭	„
৬৪	বসুকুল	৬০	৭৬৫	২১৮	...	২৫০	...	৭৬৭	„
৬৫	মিহিরকুল	৭০	৭০৫	২০০	...	২৬৫	...	৭০৭	„
৬৬	বক	৬৩	৬৩৫	১৮২	...	২৮০	...	৬৩৭	„
৬৭	ক্ষিতিনন্দ	৩০	৫৭২	১৬৪	...	২৯৫	...	৫৭৭	„
৬৮	বসুনন্দ	৫২	৫৪২	১৪৬	...	৩১০	...	৫৪৪	„
৬৯	নর	৬০	৪৯০	১২৮	...	৩২৫	...	৪৯১	„
৭০	অক্ষ	৬০	৪৩০	১০০	...	৩৪০	...	৪৩১	„
৭১	গোপাদিত্য	৬০	৩৭০	৮২	...	৩৫৫	...	৩৭১	„
৭২	গোকর্ণ	৫৮	৩১০	৬৪	...	৩৭০	...	৩১১	„
৭৩	নরেন্দ্রাদিত্য(১)	৩৬	২৫৩	৪৬	...	৩৮৫	...	২৫৩	„
৭৪	যুধিষ্ঠির (১)	৪৮	২১৬	২৮	...	৪০০	...	২১৭	„
৭৫	প্রতাপাদিত্য	৩২	১৬৮	১০	...	৪১৫	...	১৩১	খৃঃ
৭৬	জলৌক (২)	৩২	১৩৬	২২ খৃঃ	..	৪৩০	...	১৩৬	„
৭৭	তুঞ্জীন	৩৬	১০৪	৫৪	...	৪৪৫	...	১৯৯	„
৭৮	বিজয়	৮	৬৬	৯০	...	৪৬০	.	২০৭	„
৭৯	জয়েন্দ্র	৩৭	৬০	৯৮	..	৪৭৫	...	২৪৪	„
৮০	আর্য্যরাজ	৪৭	২৩	১৩৫	৪০০খৃঃ	৪৯০	...	২৯১	„
৮১	মেঘবাহন	৩৪	২৩খৃঃ	...	...	৫০৫	৪৫০খৃঃ	৩২৪	„
৮২	শ্রেষ্ঠসেন	৩০	৫৭	...	...	৫২০	...	৩৫৮	„
৮৩	হিরণ্য	৩০	৮৭	.	...	৫৩৫	...	৩৮৮	„
৮৪	মাতৃগুপ্ত	৪	১১৭	৪৭১	...	৫৫০	...	৪১৮	„
৮৫	প্রবরসেন	৬০	১২২	৪৭৬	...	৫৫০	...	৪২৩	„
৮৬	যুধিষ্ঠির (২)	২১	১৮৫	৪৯৯	...	৬০০	...	৪৮৩	„
৮৭	নরেন্দ্রাদিত্য(২)	১৩	২২৪	৫২২	...	৫৫৩	...	৫০৪	„
৮৮	রণাদিত্য	৩০০	২৩৭	৫৪৫	...	৫৬৮	...	৫১৭	„
৮৯	বিক্রমাদিত্য	৩৮	৫৩৭	৫৬৮	..	৫৮৩	...	...	„
৯০	বালাদিত্য	৩৭	৫৭৯	৫৯২	...	৫৯৮	...	৫৫৯	„

সংখ্যা	নাম	কহ্লণ রাজত্বকাল	কহ্লণ রাজ্যারম্ভ	উইলসন	প্রিন্সেপ	রমেশচন্দ্র দত্ত	কনিংহাম	বিশ্বকোষ	হায়নুলি
৯১	দুর্ল্লভবর্দ্ধন	৩৬	৬১৫খৃঃ	৬১৫	...	৫৯৮খৃঃ	৬২৫	৫৯৬	৬২৬
৯২	প্রতাপাদিত্য	৫০	৬৫১	৬৫৫	...	৬৩৪	...	৬৩২	৬৬২
৯৩	চন্দ্রাপীড়	৮	৭০১	৭০৫	...	৬৮৪	৭১১	৬৮২	৭১২
৯৪	তারাপীড়	৪	৭১০	৭১১	...	৬৯৩	৭১৯	৬৯১	৭২১
৯৫	ললিতাদিত্য	৩৬	৭১৪	৭১১	...	৬৯৭	৭২৩	৬৯৫	৭২৫

সংখ্যা	নাম	কহ্লণ রাজত্বকাল	কহ্লণ রাজ্যারম্ভ	উইলসন	প্রিন্সেপ	রমেশচন্দ্র দত্ত	কনিংহাম	বিশ্বকোষ	হারবলি
৯৬	কুবলয়াপীড়	১	৭৫০	৭৫৮	...	৭৩৩	...	৭৩২	৭৬২
৯৭	বজ্রাদিত্য	৭	৭৫১	৭৫৮	...	৭৩৪	...	৭৩৩	৭৬৩
৯৮	পৃথিব্যাপীড়	৪	৭৫৮	৭৫৮	...	৭৪১	...	৭৪০	৭৭০
৯৯	সংগ্রামাপীড়(১)	৭	৭৬২	৭৬২	...	৭৪৫	...	৭৪৪	৭৭৪
১০০	জজ্জ	৩	৭৬৯	...	...	.	..	...	...
১০১	জয়াপীড়	৩১	৭৭২	...	৮৪১	৭৪৫	...	৭৫১	৭৮১
১০২	ললিতাপীড়	১২	৮০৩	.		৭৭৬	...	৭৮৫	...
১০৩	সংগ্রামাপীড়	৭	৮১৫	...	...	৭৮৮	...	৭৯৭	...
১০৪	চিপ্পট জয়াপীড়	১২	৮২২	...	...	৭৯৫	৮৩২	৮০৪	...
১০৫	অজিতাপীড়	৩৬	৮৩৪	...	...	৮১৩	..	৮১৬	...
১০৬	অনঙ্গাপীড়	৩	৮৭০	...	...	৮৪৯	...	..	...
১০৭	উৎপলাপীড়	২	৮৭৩	...	...	৮৫২	..	...	...
১০৮	অবন্তীবর্ম্মা	২৯	৮৭৫	...	...	৮৫৫	৮৫৪	৮৫৭	...
১০৯	শঙ্কর বর্ম্মা	১৮	৯০৪	..	...	৮৮৩	৮৮৩	৮৮৪	...
১১০	গোপালবর্ম্মা	১	৯২২	...	...	৯০২	৯০১	৯০৩	...
১১১	শঙ্কট বর্ম্মা	২	৯২২	...	...	৯০৪	...	৯০৫	...
১১২	রাণী সুগন্ধা	২	৯২৪	...	...	৯০৪	৯১৩	৯০৫	...
১১৩	পার্থবর্ম্মা	১৫	৯২৬	...	...	৯০৬	৯১৩	৯০৭	...
১১৪	নির্জ্জিতবর্ম্মা	১	৯৪১	...	...	৯২১	৯২১	৯২৩	...
১১৫	চক্রবর্ম্মা	১১	৯৪২	...	...	৯২২	...	৯২৪	...
১১৬	শূরবর্ম্মা (১)	১	৯৫২	...	...	৯৩৩	...	৯৩৫	...
১১৭	পার্থবর্ম্মা	১	৯৫৩	...	..	৯৩৪	...	৯৩৬	...
১১৮	চক্রবর্ম্মা	১	৯৫৪	...	...	৯৩৫	...	৯৩৬	...
১১৯	শঙ্কর বর্দ্ধন	২	৯৫৪	...	...	...	...	...	...
১২০	চক্রবর্ম্মা	১	৯৫৬	...	...	..	...	...	...
১২১	উন্মত্তাবন্তী বর্ম্মা	২	৯৫৭	...	...	৯৩৭	...	৯৩৮	...
১২২	শূরবর্ম্মা (২)	১	৯৫৯	..	...	৯৩৯	...	...	..
১২৩	যশস্কর দেব	৯	৯৬০	...	...	৯৩৯	...	৯৪০	...
১২৪	সংগ্রাম দেব	১	৯৬৯	...	...	৯৪৮	...	৯৪৯	...
১২৫	পর্ব্বগুপ্ত (১)	২	৯৬৯	...	...	৯৪৮	...	৯৫০	...
১২৬	ক্ষেমগুপ্ত	৮	৯৭১	..	...	৯৫৫	...	৯৫১	...
১২৭	অভিমন্যুগুপ্ত	১৪	৯৭৯	...	...	৯৫৮	...	৯৬০	...
১২৮	নন্দীগুপ্ত	১	৯৯৩	...	...	৯৭২	...	৯৭৩	...
১২৯	ত্রিভুবন গুপ্ত	২	৯৯৪	..	...	৯৭৩	...	৯৭৫	...
১৩০	ভীমগুপ্ত	৫	৯৯৬	...	...	৯৭৫	...	৯৭৬	...
১৩১	রাণীদিদ্দা	২৩	১০০১	১০০১	...	৯৮০	...	৯৮১	...
১৩২	সংগ্রাম দেব (২)	৮	১০২৪	১০২৭	...	১০০৩	১০০৫	১০০৪	...
১৩৩	হরিরাজ	১	১০৩২	...	...	১০২৮	...	১০২৯	...
১৩৪	অনন্তদেব	২২	১০৩২	...	...	১০২৮	১০২৮	১০২৯	...
১৩৫	কলসদেব	৮	১০৫৪	...	...	১০৬৩	১০৮০	১০৬৪	...

সংখ্যা	নাম	কলহণ পণ্ডিত রাজত্বকাল	রাজত্বারম্ভ	উইলসন	প্রিন্সেপ	রমেশচন্দ্র দত্ত	কানিংহাম	বীল	বিশ্বকোষ
১৩৬	উৎকর্ষদেব	} ১	১০৬২	...	.	১০৮৯	১০৮৮	...	১০৯০
১৩৭	হর্ষ দেব		১০৬২			১০৮৯			
১৪৮	উচ্চল দেব	১০	১০৬২	...	...	১১০১	...	...	১১০২
১৩৯	শঙ্খরাজ	১	১০৭২	...	..	১১১১	...	...	১১১৩
১৪০	সহ্লন	১	১০৭২	...	...	১১১১	...	...	১১১৩
১৪১	সুস্মল	১৬	১০৭২	...	...	১১১২	...	...	১১১৩
১৪২	মল্লিন	} ১	১০৮৮	...	...	...	...	...	...
১৪৩	ভিক্ষাচর		...	...	...	১১২০	...	...	১১২৯
১৪৪	সুস্মলদেব		...	...	...	১১২১	...	...	...
১৪৫	জয়সিংহদেব	২২	১০৮৮	...	...	১১২৭	...	...	১১২৯
১৪৬	পরমান্থদেব	৯	১১১০	...	...	...	...	...	১১৫১
১৪৭	বন্দিদেব	৭	১১১৯	...	...	...	...	...	১১৬০
১৪৮	বপ্যদেব	৯	১১২৬	.	...	...	...	...	১১৬৭
১৪৯	জস্সদেব	১৮	১১৩৫	...	.	...	...	..	১১৭০
১৫০	জগদেব	১৪	১১৫৩	...	...	...	...	...	১১৮৮
১৫১	রাজদেব	২৩	১১৬৭	..	...	...	...	...	১২০২
১৫২	সংগ্রামদেব(৩)	১৬	১১৯০	.	...	...	...	...	১২২৫
১৫৩	রামদেব	২১	১২০৬	..	...	...	..	...	১২৪১
১৫৪	লক্ষ্মণদেব	৩৪	১২২৭	..	...	...	...	...	১২৬২
১৫৫	সিংহদেব	১৪	১২৬১	...	...	...	...	...	১২৭৬
১৫৬	সুহদেব	১৯	১২৭৫	..	...	...	...	...	১২৯০
১৫৭	রিঞ্চনদেব	১	১২৯৪	..	...	...	...	১৩০৫	১৩০৯
১৫৮	কোটারাণী	১	১২৯৪	...	...	...	...	১৩১৫	১৩১৩
১৫৯	উদ্যানদেব	১৫	১২৯৪	...	...	...	...	১৩২০	

পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকায় ১৫৫ জন বিভিন্ন হিন্দু নরপতির নাম পাওয়া যাইতেছে। কানিংহ্যাম সাহেবের মতে ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে সংগ্রাম দেবের প্রতিষ্ঠিত যাদব বংশের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। ইহাদের পর মুসলমান আধিপত্য খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরে বদ্ধমূল হয়। ১৩৪১-১৫৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাহমীরের বংশধরগণ কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ১৫৫৯-১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'চকবংশ' তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। ১৫৮৮-১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীর দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে। ১০১২ খৃঃ গজনীর সম্রাট সুলতান মামুদ কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। ১৭৫২ খৃঃ কাবুলের দুরাণী সম্রাট আমেদসাহ আবদালী কাশ্মীর অধিকার করিয়া, তথায় আফগানজাতির আধিপত্য সংস্থাপিত করেন। ১৮১৯ খৃঃ মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রভুত্ব কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৬ খৃঃ জম্মুর রাজা গোলাব সিংহ কাশ্মীরের স্বাধীন মহারাজা বলিয়া ইংরেজ রাজের প্রসাদে ও অনুগ্রহে বিঘোষিত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় দিনে মহারাজ গোলাব সিংহের মৃত্যু হয়। তদনন্তর গোলাব সিংহের পুত্র রণবীর সিংহ পৈতৃক পদে অভিষিক্ত হইয়া, ২৭ বৎসর কাল কাশ্মীরে শাসন-

দণ্ড পরিচালনা করেন। ১৮৮৫ খৃঃ মহারাজ রণবীর সিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। এই প্রতাপ সিংহ কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজা। ডোগরা রাজপুত বংশ হইতে কাশ্মীরের মহারাজা উদ্ভূত হইয়াছেন। সারঙ্গ দেব দ্বারা জম্মুতে এই রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চাৎ যথাস্থলে ইহা প্রদর্শিত হইবে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মোগলাধিকারের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস কহ্লণ পণ্ডিত, যোনরাজ, শ্রীবর পণ্ডিত ও প্রাজ্য ভট্টের রচিত চারি খানি বিভিন্ন গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় পদ্য ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কহ্লণ পণ্ডিতের 'রাজতরঙ্গিণী'ই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয়। 'রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ সমাপ্ত করিয়া, অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ যথাস্থলে সংক্ষেপে সংগৃহীত করিব।

পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকার একাশীতিতম নরপতি মেঘবাহন হইতে জয়সিংহ দেব পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ছয়টী বিভিন্ন বংশীয় নরপতিগণের বংশাবলী প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাদের সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

মেঘবাহন তৃতীয় গোনর্দ্দের বংশধর। তিনি প্রাচীন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া, মহা পরাক্রমের সহিত কাশ্মীর সাম্রাজ্য শাসন করেন। মেঘবাহন গোনর্দ্দবংশীয় শেষ রাজা যুধিষ্ঠিরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ও অধস্তন চতুর্থবংশধর। গান্ধাররাজ গোপাদিত্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি কালে মেঘবাহনের জন্ম হয়। মেঘবাহন কামরূপের রাজতনয়ার পাণি গ্রহণ করেন। কলিঙ্গ ও উড়িষ্যা পর্য্যন্ত কাশ্মীর রাজ মেঘবাহনের পদানত হয়। উড়িষ্যায় এই বৌদ্ধ নরপতি মেঘবাহনের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রিজ্ ডেভিডস্ সাহেবের মতে ১০৪-১৪৪ খীঃ পর্য্যন্ত মেঘবাহন ৪০ বৎসর কাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে ২৩-৫৭ খৃষ্টাব্দ, বিশ্বকোষের মতে ৩২৪-৫৮ খৃষ্টাব্দ এবং সুপণ্ডিত রমেশ চন্দ্র দত্তের মতে ৫০৫-৫২০ পর্য্যন্ত মেঘবাহন কাশ্মীরে শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া, বৌদ্ধ নরপতি মেঘবাহন মগধের মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট অশোকের ন্যায় স্বরাজ্য মধ্যে প্রাণিহিংসা নিবারণের জন্য সর্ব্বত্র আদেশ প্রচার করেন।

"স পুন র্বোধিসত্ত্বানামপি সত্ত্বানুকম্পিনাম্।
চর্য্যামুদাত্তচরিতৈ র্বত্যশেত মহাশয়ঃ॥ ৪॥
তস্যাভিষেক এবাজ্ঞাং ধারয়ন্তোঽধিকারিণঃ।
সর্ব্বতো মারমর্য্যাদাপটহামুদঘোষয়ন॥ ৫॥
কল্যাণিনা প্রাণিবধে তেন রাজ্যেপ্সি বারিতে।
নিষ্পাপাং প্রাপিতা বৃত্তিং স্বকোশাৎ সৌনিকাদয়ঃ॥৬॥
তস্য রাজ্যে জিনস্যেব মারবিদ্বেষিণঃ প্রভোঃ।
ক্রতৌ ঘৃতপশুঃ পিষ্টপশু র্ভূতবলাবভূৎ॥ ৭॥"

(তৃতীয় তরঙ্গ)

(১) (মেঘবাহনবংশ।)

মেঘবাহন
- শ্রেষ্ঠসেন
  - হিরণ্য
  - তোড়মাণ
    - প্রবর সেন
      - যুধিষ্ঠির
        - নরেন্দ্রাদিত্য
        - রণাদিত্য
          - বিক্রমাদিত্য
          - বালাদিত্য
            - অনঙ্গলেখা

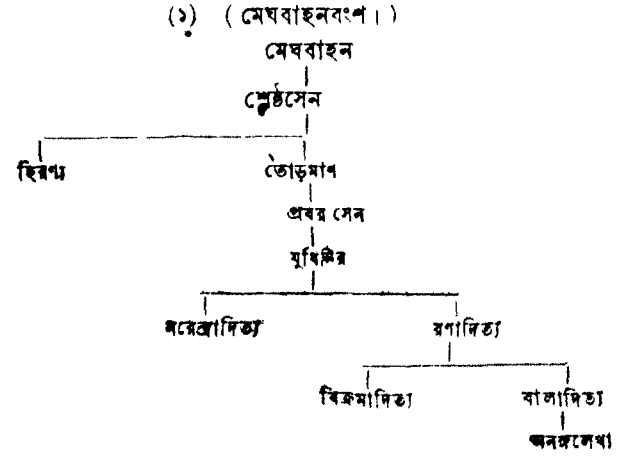

গোনর্দ্দ বংশীয় মেঘবাহনের ষষ্ঠ বংশধর বালাদিত্য। তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের। মৃত্যুর পর কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বালাদিত্যের কোন পুত্র সন্তান না হওয়াতে, তিনি আপনার তনয়া অনঙ্গ লেখাকে পুত্রবৎ পালন করেন। অশ্বঘোষ বংশীয় কায়স্থ দুর্লভ বর্দ্ধনের সহিত অনঙ্গলেখার পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই দুর্লভবর্দ্ধন কর্কোট নাগের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন *। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ 'কর্কোটক' বংশ নামে কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। শ্বশুরের মৃত্যুর পর দুর্লভবর্দ্ধন কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বীয় বুদ্ধিমত্তার জন্য দুর্লভবর্দ্ধন প্রজ্ঞাদিত্য নামে পরিচিত হন।

মহারাজ দুর্লভবর্দ্ধনের প্রতিষ্ঠিত কর্কোটক বংশে ১৭ জন নরপতি আবির্ভূত হন। * এই ক্ষত্রিয় কায়স্থবংশ ২৬০ বৎসর কাল কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন। রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যাইতেছে যে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় জাতির এক শাখা মাত্র। নতুবা গোনর্দ্দবংশীয় মহারাজা বালাদিত্য নীচ বর্ণোৎপন্ন অন্য জাতিতে আপনার প্রিয়তমা তনয়াকে কখনও পরিণীত করিতেন না। নিম্নে কর্কোটকবংশের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

(২) (কর্কোটক বংশ।)

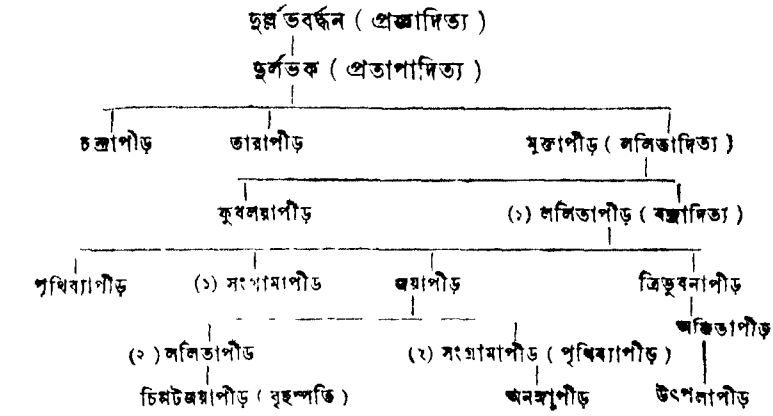

* বিষ্ণুপুরাণের মতে (১।২১।২১) কর্কোট নাগ কশ্যপের পত্নী কদ্রুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কহ্লণ পণ্ডিতের মতে এই কর্কোটনাগ কায়স্থ জাতীয় দুর্লভ বর্দ্ধনের পিতা। প্রাচীন জনপ্রবাদ অবলম্বনে কহ্লণ এই কথা লিখিয়াছেন। গৌড়েশ্বর রাজা বল্লাল সেন দেবের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজবংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এইরূপ অদ্ভুত জনশ্রুতি বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

রাজ্ঞো হমন্তরজ স্তস্য রাজাভূত্তদনন্তরম্।
তাপিতারাতিভূপালো বালাদিত্যো বলোর্জ্জিত ॥ ৪৭৭ ॥
বভূব তস্য ভূভর্ত্তু র্ভবনাদ্ভুতবিভ্রমা।
তনয়ানঙ্গলেখাখ্যা শৃঙ্গারোদধি-কৌমুদী ॥ ৪৭৪ ॥
তাং বীক্ষ্য লক্ষণোপেতাং মৃগাক্ষীং পিতুরন্তিকে।
অমোঘপ্রত্যয়োহবক্তং ব্যাজহারেতি দৈববিৎ ॥ ৪৮৫ ॥
ভবিতা তব জামাতা জগতীভোগ-ভাজনম্।
ত্বদন্তমেব সাম্রাজ্যং গোনন্দান্বয় জন্মনাম্ ॥ ৪৮৬ ॥
সুতা-সন্তানসাম্রাজ্যমনিচ্ছন্নথ পার্থিবঃ।
দৈবং পুরুষাকারেণ জেতুমাসীৎ কৃতোদ্যমঃ ॥ ৪৮৭ ॥
অরাজাধয়িনে দত্তা নেথং সাম্রাজ্যহারিণী।
মত্বেতি প্রদদৌ কন্যাং ন কস্মৈচনভূভুজে ॥ ৪৮৮ ॥
হেতুং স্বল্পভামাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ।
অথাশ্বঘোষকায়স্থং চক্রে দুর্লভবর্দ্ধনং ॥ ৪৮৯ ॥
মাতুঃ কর্কোটনাগেন স্নাতায়াঃ সমীযুষা।
রাজ্যাত্যৈব হি সংজাতো রাজা রাজ্যাদি তেন সঃ॥৪৯০"॥
(তৃতীয় তরঙ্গ)

কর্কোটক বংশের পর 'উৎপল বংশ' কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অবন্তীবর্ম্মা উৎপলবংশের প্রথম নরপতি। মেঘবাহনের ন্যায় অবন্তী বর্ম্মা দশ বৎসর পর্য্যন্ত স্বীয় সাম্রাজ্যে পশুবধ নিবারিত করেন। তিনি বদান্য ও প্রজারঞ্জক ছিলেন।

"শ্রীমেঘবাহনস্যেব সাম্রাজ্যে হরস্তিকর্ম্মণঃ।
অশেষ প্রাণিনামাসীদমায়ো দশ বৎসরান্ ॥"৬৪॥
(পঞ্চম তরঙ্গ)

(৩) (উৎপলবংশ।)

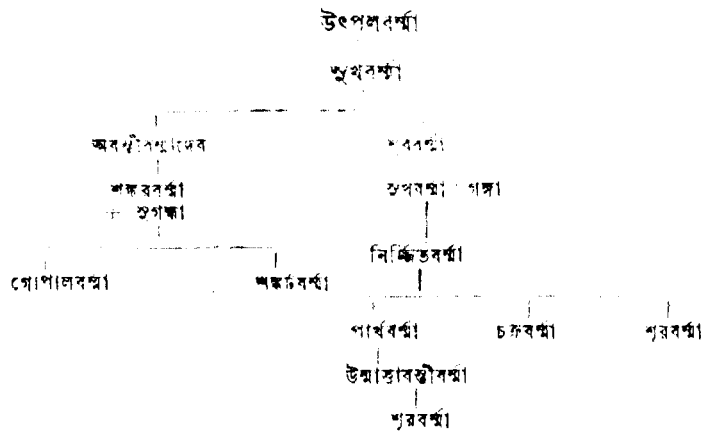

উৎপলবংশের শেষ রাজা উন্মত্তাবন্তি বর্ম্মা যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়া, স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। এই নরপিশাচের অত্যাচারের সীমা ছিল না! পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী কেহই এই নরপিশাচের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। এই নর রাক্ষসের মৃত্যুর পর রাজান্তঃপুরের রমণীগণ শূরবর্ম্মা নামক অজ্ঞাতজন্মা শিশুকে রাজ-পুত্র বলিয়া বিঘোষিত করে। রমণীগণের চক্রান্তে এই অজ্ঞাত কুলশীল শিশু রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। কম্পন রাজ্যের অধীশ্বর কমলবর্দ্ধন রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। রাজধানীর প্রধান প্রধান অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া, কমল বর্দ্ধন তাহাদিগকে নরপতি নির্ব্বাচনের জন্য আদেশ প্রদান করেন। অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণ বিজয়ী কমল বর্দ্ধনকেই রাজপদে মনোনীত করিবে বলিয়া, তিনি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে মনোনয়নের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু যশস্করদেবের মনোনয়নে মূঢ় কমল-বর্দ্ধনের আশা ভরসা সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত হয়। যশস্কর দেবের পিতা প্রভাকর দেব উৎপলবংশীয় রাজা শঙ্কর বর্ম্মার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এই বংশীয় তিনজন রাজা দশ বৎ বৎসর মাত্র কাশ্মীরে রাজত্ব করেন।

(৪) বীরদেব

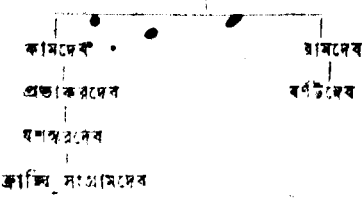

সংগ্রামদেবকে নিহত করিয়া পর্ব্বগুপ্ত কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই কণ্টক বংশীয় ছয় জন রাজা ৬৪ বর্ষ কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। পর্ব্বগুপ্তের পুত্রবধূ দিদ্দার অনুগ্রহে তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র সংগ্রামরাজ যে রাজবংশের

প্রতিষ্ঠা করেন, কহ্লণ পণ্ডিতের আশ্রয়দাতা জয়সিংহদেব সেই সাতবাহন বংশে উদ্ভূত হন।

(৫) কণ্টকবংশগুপ্ত।

দিদ্দা রাণী কৌশলক্রমে আপনার তিন শিশু পৌত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়া, স্বয়ং কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিদ্দার উপপতি তুঙ্গ সিংহ প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হয়। দিদ্দার ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রাম রাজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। দিদ্দার মৃত্যুর পর সংগ্রামরাজ কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দিদ্দার পিতার নাম সিংহ রাজ। তিনি অভিসারের সন্নিহিত লোহর প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। সিংহরাজের বংশধরেরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ক্ষেম গুপ্তের রাজত্ব কালে তাঁহার শ্বশুর সিংহরাজ লোহর প্রদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

"দিদ্দাপ্যুদয়রাজস্য ভ্রাতুঃ পুত্রং পরীক্ষিতুং।
চক্রে সংগ্রামরাজাখ্যং যুবরাজমশঙ্কিতা।
তস্যামেকান্নশীত্যব্দ-শুক্লভাদ্রাষ্টমী দিনে।
দেব্যাং দিবং প্রযাতায়াং সমরাজোঽভবন্নৃপঃ॥ ৩৫৫॥
শ্রীসংবর্দ্ধন ভূপালবংশ্যানং ভুবনাদ্ভুতঃ।
তৃতীয়ঃ পরিবর্ত্তোঽভূদয়ং বংশে মুখং মণ্ডলে॥ ৩৫৬॥

দিদ্দা 'কণ্টক'বংশীয়া শেষ রাজ্ঞী। দিদ্দার ভ্রাতা উদয়রাজ ও কান্তিরাজ। উদয়রাজ হইতে উৎকর্ষ ও হর্ষ দেব উদ্ভূত হন। হর্ষদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী উচ্চল উদয় রাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কান্তিরাজ হইতে উদ্ভূত হন। সংগ্রামরাজের প্রতিষ্ঠিত বংশ 'সাতবাহ' নামে কহ্লণ পণ্ডিত দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। যাদব বংশীয় শাতবাহন এই বংশ পঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কানিংহামের মতে ১০০৫-১৩৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই যাদববংশ কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

"নির্দ্দগ্ধ-কণ্টককুলে নয়সম্পদাঢ্যো,
শ্রীসাতবাহকুলমাপ মহীতলেঽস্মিন্।
দাবাগ্নিদগ্ধ কুতরৌ জলদাম্বুসিক্তে,
চূত-প্ররোহ ইব কেলিবনে প্রবৃদ্ধিঃ॥" ৩৬৭॥(ষষ্ঠতরঙ্গ)

(৬) (সাতবাহনবংশ।)

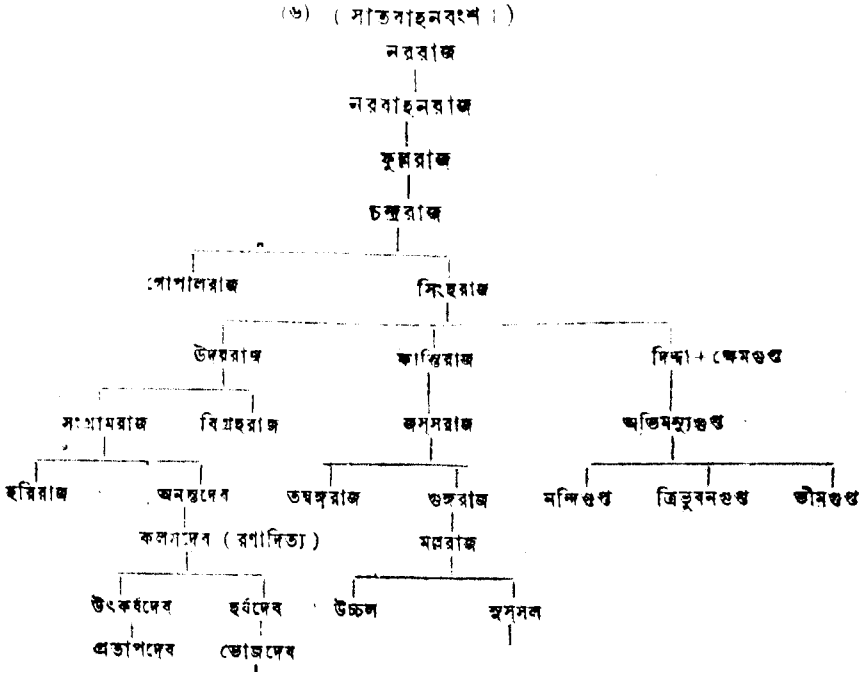

ভরদ্বাজ গোত্রে সংগ্রামরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। নররাজ এই সাতবাহন বংশের আধিপত্য দার্ব্বাভিসার নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কাশ্মীরের সামন্ত রাজগণের মধ্যে পরিগণিত হন। সংগ্রাম রাজদেব এই নররাজের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। পিতৃস্বসা দিদ্দার অনুগ্রহে তিনি কাশ্মীরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সংগ্রামরাজ পরীক্ষিত নামে পরিচিত ছিলেন। বীরবর উচ্চল স্বীয় ভুজবীর্য্যে কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। কহ্লণ পণ্ডিতের আশ্রয়দাতা জয়সিংহ দেব এই উচ্চলের ভ্রাতষ্পুত্র। খসরাজ সংগ্রাম পালের নিকট উচ্চল এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, রণাদিত্য কলস দেবের বিরুদ্ধে রাজপুরীর সামন্তরাজ সংগ্রামপালকে উত্তেজিত করিতে বৃথা চেষ্টা করেন।

"স বিবিক্তীকৃতে ধাম্নি খশাধীশং সমন্বিতং।
সান্ত্বয়ন্তং মহাতেজাঃ কোপকম্পাকরোঽব্রবীৎ ॥১২৮১॥
পুরা দার্ব্বাভিসারেঽভূদ্ ভারদ্বাজো নরো নৃপঃ।
নরবাহন-নামাস্য সূনুঃ, ফল্গুনজীবনং ॥১২৮২॥
স স্বার্থবাহনং, তস্মাজ্জজ্ঞেঽভূৎ, তৎসূনুঃ, সুতৌ।
গোপাল-সিংহরাজাখ্যৌ চন্দ্রাজোঽহ পান্যপুরান ॥
॥১২৮৩॥
বহ্লাম্বুজঃ সিংহরাজো দিদ্দাখ্যাং কন্যাং দদৌ।
ক্ষ্মাভৃত্ক্ষেমগুপ্তায়, সা নীয়া ভ্রাতৃনন্দনম্ ॥
রাজ্যে সংগ্রামরাজাখ্যং ন্যধাদুদয়রাজজম্ ॥ ১২৮৪ ॥
ভ্রাতাপি কান্তিরাজোঽস্য, জনসরাজমজীজনৎ ॥১২৮৫
পিতানন্তস্য সংগ্রামো, জনন সুস্বয়ুজ্জলয়োঃ।
অনন্তঃ কলসম্প্রাভূদ্, তুঙ্গাৎ মল্লোঽপাত্রাত্ ॥ ১২৮৬ ॥
কলসাৎ হর্ষদেবাদ্যা জাতা, মল্লাৎ তথা বয়ং।
কোঽয়মিত্যাদি তস্মৈন্যৈঃ ক্রমেঽস্মিন্ কথ্যতে কথং ॥
॥১২৮৭॥
পৃথিব্যাং বীরভোগ্যায়াং ক্রমো বা কোপযুজ্যতে।
বীরস্য চ সহায়োঽস্তু কঃ খবাহুবলাৎ পরঃ ॥ ১২৮৮ ॥
(রাজতরঙ্গিণী, সপ্তম তরঙ্গ)

জয়সিংহ দেবের সভায় অবস্থিতিকালে, অমাত্য চম্পক পণ্ডিতের পুত্র কহ্লণ পণ্ডিত "রাজতরঙ্গিণী" ১০৭০ শকাব্দে (১১৪৮ খৃষ্টাব্দে) রচনা করেন। জয়সিংহ দেব দ্বাবিংশতি বৎসর কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন। জয়সিংহের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে 'রাজতরঙ্গিণী' সমাপ্ত হইয়াছে। ১১৪৮ হইতে ২১ বৎসর বাদ দিয়া ১১২৭ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহের রাজ্য আরম্ভের কাল পাওয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে কাশ্মীরের পুরাতত্ত্ব বর্ণন ও রাজতরঙ্গিণীর সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।

এই প্রবন্ধে কাশ্মীরের নরপতিগণের নামমালার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিদের নিরূপিত যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে কাশ্মীরের ইতিহাসের কাল নির্ণয় কিরূপ দুরূহ ব্যাপার—ইহা স্পষ্টাক্ষরে অনুভূত হইবে। কর্কোটক বংশের রাজত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে কহ্লণ পণ্ডিত ৫২ হইতে ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন কোন নরপতির শাসনকাল নির্দ্দেশ করাতে, তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে বালাদিত্যের জনক রণাদিত্য ৩০০ বৎসর কাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। রণাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রাদিত্য ত্রয়োদশ বৎসর এবং রণাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রমাদিত্য ৪২ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। বালাদিত্য ৩৭ বর্ষকাল কাশ্মীর শাসন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু রণাদিত্যের রাজত্ব ৩০০ বর্ষ স্থায়ী থাকে। ইহা একান্ত অবিশ্বাস্য ও অমূলক। তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

"পদ্মাবত্যাং সুত তস্য নরেন্দ্রাদিত্য ইত্যভূৎ।
যঃ ত্রয়োদশাব্দি বর্ষাণ্যকরোত মহীভুজঃ ॥ ৩৮৫ ॥
তস্যানুজো ধরণীভুক্ রণাদিত্য স্ততোঽভবৎ।
তুঙ্গীনাপরনামানং যং জনাঃ প্রাহুঃ কল্পনা ॥ ৩৮৬ ॥

স এবং ভূপতিভূক্ত্বা ভুবং বর্ষশতত্রয়ং।
নির্ব্বাণমাপ্য নির্ব্যূঢ়ি পাতালৈশ্বর্য্যমাসদৎ ॥ ৪৭০ ॥
রণাদিত্যস্য গোনন্দবংশে রামস্য রাঘবে।
লোকান্তরসুখস্যাপিবয়োরংশভুজঃ প্রজাঃ ॥ ৪৭৩ ॥
বিক্রমাক্রান্তবিশ্বস্য বিক্রমেশ্বরকৃৎ সুতঃ।
তস্যাসীদ্ বিক্রমাদিত্য স্ত্রিবিক্রমপরাক্রমঃ ॥ ৪৭৪ ॥
রাজা ব্রহ্মগলূরাভ্যাং সচিবাভ্যাং সমং মহী।
সোপাসীদ্ বাসবসমো দ্বাচত্বারিংশতিং সমাঃ ॥ ৪৭৫ ॥
(তৃতীয় তরঙ্গ)

কর্কোটক বংশের পূর্ব্বতন নরপতিবর্গের সময় নির্দ্দেশে কহ্লণের ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। উল্লিখিত কারণে ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম গোনর্দ্দ হইতে গোনর্দ্দবংশীয় শেষ নরপতি বালাদিত্য পর্য্যন্ত ৯০ জন নরপতি কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। যুধিষ্ঠির ও প্রথম গোনর্দ্দ সমসাময়িক নরপতি। এই গোনর্দ্দের পৌত্র দ্বিতীয় গোনর্দ্দ শিশু বলিয়া, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধে আহুত হন নাই। 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গতে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। শকাব্দের পূর্ব্বতন ৩১৭৯ অব্দে কলিযুগের আরম্ভ হয়। অতএব শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৫২৬অব্দে এবং খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ২৪৪৮ অব্দে যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ২৪৪৮ অব্দে কাশ্মীররাজ প্রথম গোনর্দ্দ বর্ত্তমান ছিলেন। প্রতি রাজার রাজত্বকাল গড়ে ৩৪ বৎসর ধরিয়া লইলে, ৬১২ খৃষ্টাব্দে দুর্লভবর্দ্ধনের দ্বারা কর্কোটকবংশের কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা কাল পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিৎগণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে কর্কোটকবংশের প্রতিষ্ঠাতা দুর্লভবর্দ্ধনের রাজ্যারম্ভ নির্ণয় করিয়াছেন। সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ৫৯৮, উইলসনের মতে ৬১৯, কানিংহামের মতে ৬২৫ এবং ডাক্তর হারনলির মতে* ৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে—দুর্লভবর্দ্ধন (প্রজ্ঞাদিত্য) কাশ্মীরে কর্কোটকবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের অনুমিত ৬১২ খ্রীষ্টাব্দের সহিত পুরাতত্ত্ববিদগণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে। 'বিশ্বকোষে' রমেশ বাবুরই পদ অনুসৃত হইয়া, ৫২০ শকাব্দে কায়স্থ জাতীয় বর্দ্ধনের রাজ্যারম্ভ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহারাজা দুর্লভবর্দ্ধনের সময়ে ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরমাসে সুপ্রসিদ্ধচৈনিক পর্য্যটক হিয়াংসাং কাশ্মীরে আগমন পূর্ব্বক দুই বৎসর কাল 'জয়েন্দ্রবিহারে' অবস্থিতি করেন। এই বৌদ্ধবিহার মহারাজ প্রবরসেনের মাতুল জয়েন্দ্র দ্বারা প্রবরসেনপুর রাজধানীতে নির্ম্মিত হয়। কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজধানী শ্রীনগর এই প্রবরসেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান হরিপর্ব্বতের (তখতি সুলেমান) পাদমূলে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এই নবীন রাজধানী নির্ম্মিত হয়। বিতস্তার দক্ষিণতীরেও প্রাচীন রাজধানীর পশ্চিমে 'প্রবরসেনপুর' নির্ম্মিত হয়। বিতস্তা ও হর নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই নগরী বর্ত্তমান সময়ে 'শ্রীনগর' নামে বিখ্যাত। অদ্যাপি এই প্রাচীন নগরে কাশ্মীরের রাজধানী অবস্থিত রহিয়াছে।

"কস্যতাঃহস্ত দিশো জিত্বা নপ্তুঃ পৈতামহেপুরে।
কর্ত্তুং পুরং স্বনামাঙ্কং প্রথতে স্ম মনোরথঃ ॥৩৩৬॥

* "ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালার" প্রথম ভাগের ২৩ পৃষ্ঠায় আমরা ডাক্তর হারনলির অনুমিত সময় গ্রহণ করিয়া, ভ্রমে পতিত হই। তাহা ভ্রান্ত ও অমূলক বলিয়া এক্ষণে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। ডাক্তর হারনলি সুবিখ্যাত কানিংহাম সাহেবের মতই পরিবর্ত্তিতভাবে গ্রহণ করেন।

রাত্রৌ ক্ষেত্রঞ্চ লগ্নঞ্চ দিব্যং জ্ঞাতুমথৈকদা।
স বীরো বীরচর্য্যায়াং নির্যযৌ পার্থিবাগ্রণী॥৩৪৭॥
জয়স্য প্রতিষ্ঠাং প্রাক্ তস্মিন মনীষী প্রবরেশ্বরং।
স্বামী স্বয়ং পীঠে স্থিত্বা যত্নমুপাবিশৎ॥৩৫০॥
বেতালাবেদিতং লগ্নং জানতো জগতীভুজা।
স্থপতেঃ স জয়স্বামী নাম্না প্রখ্যাপিতোঽভবৎ॥৩৫১॥

বেতালের নির্দ্দিষ্ট লগ্ন অনুসারে জয় নামে স্থপতি॰ নূতন নগরীতে 'প্রবরেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। শিল্পনিপুণ জয়ের নামানুসারে মহাদেব 'জয়স্বামী' নামে পরিচিত হন। এই স্থানে 'ভীমস্বামী' নামে গণেশ দেবের মন্দির বহুকাল পূর্ব্বে সংস্থাপিত ছিল। প্রাচীন রাজধানী বিতস্তার পূর্ব্বতটে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন নগরীর এক ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজ অশোক এই প্রাচীন রাজধানী সংস্থাপিত করেন। প্রাচীন নগরী প্রবর সেন-পুরের প্রতিষ্ঠা কাল হইতে "পুরাণাধিষ্ঠান" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আবুরিহাণ আলবিরুণী 'আদি স্থান' (অধিষ্ঠান) নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে এই প্রাচীন রাজধানী 'পান্দ্রেথান' নামে পরিচিত এবং তখতি সুলেমান পর্ব্বতের এক ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

প্রাচীন নগরী হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে যাতায়াতের জন্য বিতস্তার উপরে এক নৌসেতু মহারাজ প্রবরসেনের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই নৌসেতুর নির্ম্মাণ উপলক্ষে, সুকবি মহারাজ প্রবরসেন প্রাকৃত ভাষায় "সেতুবন্ধ" বা "রাবণবধ" নামে কাব্য রচনা করেন। "সেতুবন্ধ" কাব্যের বিস্তারিত বিবরণ 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালায়' ৭০-৮৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে, তাহার পুনরায় উল্লেখ অনাবশ্যক।

"বিতস্তায়াং স ভূপালো বৃহৎসেতুমকারয়ৎ।
খ্যাতা ততঃ প্রভৃত্যেব তাদৃঙ্নৌসেতুকল্পনা॥২৫৫॥
শ্রীজয়েন্দ্রবিহারস্য বৃহদ্বুদ্ধস্য চ বাধাৎ।
মাতুলঃ স নরেন্দ্রস্য জয়েন্দ্রো নিনিবেশনং॥৩৫৫॥
দক্ষিণস্মিন্নেব পারে বিতস্তায়াঃ পুরা কিল।
নির্ম্মিতং তেন নগরং নিস্তৈক্য শঙ্কুমাপনৈঃ॥৩৫৮॥
দৃষ্টঃ ক্রীড়ানগোঽস্মাত্র ন মধ্যানগরং কচিৎ।
সুভগাঃ সিন্ধুসংভেদাঃ ক্রীড়ানসখবীথিব॥৩৬০॥

(তৃতীয় তরঙ্গ)

কাশ্মীরের ইতিহাসে কালনির্ণয়ের নিমিত্ত দুইটী সময় নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইল। ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে দুর্লভবর্দ্ধনের দ্বারা কর্কোটকবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বাবিংশতি বৎসর রাজত্বের পর মহারাজ জয়সিংহ দেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। কর্কোটকবংশের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে জয়সিংহের রাজত্ব পর্য্যন্ত 'রাজতরঙ্গিণী'র নির্দ্দিষ্ট সময় অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ৬১২-১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫৩৬ বর্ষ কাল ৫১ জন বিভিন্ন নরপতির শাসনকাল জানা যাইতেছে। ইহা হইতে গড়ে প্রত্যেক ভূপতির রাজত্বকাল সাড়ে দশ বৎসর বলিয়া জানা যাইতেছে। কর্কোটকবংশের পূর্ব্বতন ৯০ জন ভূপালের রাজত্বকাল ৩০৫০ বৎসর অনুমান পূর্ব্বক গড়ে প্রতি নরপতিকে ৩৪ বৎসর কাল রাজ্যশাসনে নিযুক্ত পাওয়া যাইতেছে। অতি প্রাচীনকালের ভূপতিরা পরবর্ত্তী নরপতিদিগের অপেক্ষা তিন গুণেরও অধিক সময় রাজ্যশাসন করেন বলিয়া, ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে। শেষভাগের ন্যায় প্রাচীনকালের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব ও অন্তর্বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নাই। এই সত্য ইহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে।

কেহ কেহ কনিষ্ককে শকাব্দের প্রবর্ত্তক

অনুমান করিয়া, তাঁহার রাজ্যারম্ভের কাল ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধারণ করিয়াছেন। রমেশ বাবু এই কনিষ্কের সময় ৭৮ খ্রীঃ অনুমান করিয়া, কাশ্মীরের ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু কনিষ্কের রাজ্যারম্ভকাল সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিৎগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ ঘটিয়াছে। কনিষ্ক শকাব্দের প্রবর্ত্তক নহেন বলিয়া, কোন কোন প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। লাসেন ও ওয়েবারের মতে ৪০ খ্রীষ্টাব্দে, বিশ্বকোশের মতে ৩৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে এবং কানিংহামের মতে ৫৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দে—কনিষ্ক প্রাদুর্ভূত হন। প্রথম গোনন্দ হইতে বৌদ্ধ নরপতি কনিষ্ক ৫১ পুরুষ অন্তর। গড়ে ৩৪ বৎসর প্রত্যেকের রাজত্ব কাল ধরিয়া, ৫১ পুরুষে ১৭৩৪ বৎসর পাওয়া যায়। ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দে প্রথম গোনর্দ্দ কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২৪৪৮ হইতে ১৭৩৪ অন্তর করিয়া, এই হিসাব অনুসারে ৭১৪ খ্রীঃপূঃ অব্দে কনিষ্কের রাজ্যারম্ভকাল পাওয়া যায়। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মতে বৌদ্ধনরপতি কনিষ্ক বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ১৫০ বৎসর পরে আবির্ভূত হন। স্থলান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৪৭৮ অব্দে বুদ্ধদেব কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজতরঙ্গিণীর মতে কনিষ্ক ৩২৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পূর্ব্বোক্ত ৭১৪ খ্রীঃ পূঃ অব্দের ন্যায় কহ্লণ পণ্ডিতের এই উক্তি একান্ত ভ্রান্ত ও অমূলক।

রাজতরঙ্গিণীর মতে হুষ্ক, জুষ্ক ও কনিষ্ক বৈদেশিক তুরুস্কবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই তুরুস্ক জাতীয় তিন জন নরপতির সময়ে ৬০ বর্ষকাল কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। এই নরপতিত্রয়ের দ্বারা বহুতর বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার নির্ম্মিত হয়। কনিষ্কের রাজত্ব কালে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুন কাশ্মীরে আগমন করেন। ভগবান শাক্যসিংহের নির্ব্বাণ লাভের ১৫০ বৎসর পরে এই তিন নরপতি কাশ্মীরে শাসন দণ্ড পরিচালন করেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামে তিনটী বিভিন্ন নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। আইন আকবরী ও কানিংহাম সাহেবের মতে তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা ছিলেন।

"অথাভবন্ স্বনামাঙ্কপুরত্রয়বিধায়িনঃ।
হুষ্ক জুষ্ক কনিষ্কাখ্যা স্ত্রয় স্তত্রৈব পার্থিবাঃ ॥১৬৮॥
সবিহারস্য নির্ম্মাতা, জুষ্কো জুষ্কপুরস্য যঃ।
জয়স্বামিপুরস্যাপি শুদ্ধধীঃ সংবিধায়কঃ ॥১৬৯॥
তে তুরুষ্কান্বয়োদ্ভূতা অপি পুণ্যাশ্রয়া নৃপাঃ।
শুষ্কলেত্রাদিদেশেষু মঠচৈত্যাদি চক্রিরে ॥১৭০॥
প্রাপ্তে রাজ্যক্ষণে তেষাং প্রায়ঃ কাশ্মীরমণ্ডলং।
ভোজ্যমাস্তে স্ম বৌদ্ধানাং প্রব্রজ্যোর্জ্জিত তেজসাং॥১৭১
তদা ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পরিনির্বৃতেঃ।
অস্মিন মহীলোকধাতৌ সার্দ্ধং বর্ষশতং হ্যগাৎ ॥১৭২॥
বোধিসত্ত্বস্য দেশেঽস্মিন্নেকো ভূমীশ্বরোঽভবৎ।
স চ নাগার্জ্জুনঃ শ্রীমান্ ষড়র্হদ্বনসংশ্রয়ী ॥১৭৩॥

(প্রথম তরঙ্গ)

চৈনিক পরিব্রাজক হুংযুনের মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ৩০০ বৎসর এবং হিয়াংসাঙের মতে ৪০০ বৎসর পরে কনিষ্ক গান্ধারে রাজত্ব করেন। তিব্বত ও চীন দেশীয় জনপ্রবাদ মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ৪০০ বর্ষ পরে কনিষ্ক ও নাগার্জ্জুন বিদ্যমান ছিলেন। সিংহল দ্বীপের প্রামাণিক ইতিহাসের মতে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুন বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ৫০০ বর্ষ পরে আবির্ভূত হন। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্বোপকূলে তৈলঙ্গদেশে নল্লমল্ল (কৃষ্ণ) পর্ব্বতের অন্তর্গত শ্রীশৈলের মন্দির অবস্থিত। এই

মন্দিরের সন্নিহিত স্থানে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুন দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। দক্ষিণ কোশলের কোন বৌদ্ধ নরপতির দ্বারা এখানে এক বৌদ্ধ বিহার (সঙ্ঘারাম) নির্ম্মিত হয়। নাগার্জ্জুন তন্মধ্যে বহুকাল যাপন করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়াংসাঙ্ এই সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়া, 'পোলোমে লোকিলি' নামে এই স্থানের উল্লেখ করেন। হিয়াঙ্-সাঙের মতে খ্রীঃ পূঃ ৭৮ অব্দে কনিষ্ক ও নাগার্জ্জুন বিদ্যমান ছিলেন। এই নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক নামে বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। মহারাজ কনিষ্ক 'পুরুষপুর' নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।' এই পুরুষপুর এক্ষণে 'পেশোয়ার' নামে পরিচিত।

শক বংশীয় কনিষ্কের দ্বারা ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শকাব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। ম্যাক্সমূলার, ফারগাসন, ওলডেনবার্গ, বুলর ও হার্ণলি প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদের এই অভিমত। ডাক্তর রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও রমেশ চন্দ্র দত্ত এই ভ্রান্ত মত গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে পশ্চিম ভারতীয় বোম্বের বিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকরের মতে শকরাজ কনিষ্কের দ্বারা শকাব্দ প্রচলিত হয় নাই। কনিষ্ক সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

দার্শনিক মতভেদ। (৮)

বিগত প্রস্তাবে আমরা সৃষ্টিবাদের কতিপয় কারণতত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিয়াছি। তাহাতে প্রতীত হইয়াছে, এই কারণাবলি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত। এরূপ হইবার হেতু এই যে, সৃষ্টিতত্ত্ব সমুদায় বেদ্য (Knowable); যাহা বেদ্য তাহা সামান্যজ্ঞানে প্রামাণ্য। সামান্য জ্ঞানে প্রামাণ্য বলিয়া তাহা সামান্য প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ জ্ঞান। যে প্রমাণে ইউরোপীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সেই কারণাবলির রহস্য-নির্ণয় করিয়াছেন, আর্য্যঋষিগণও সেই প্রণালীতে গিয়া তাহা অবধারণ করিয়াছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ বাহ্য ও অন্তর্জগতের নিগূঢ় রহস্যোদ্ভাবন করিয়া কিরূপে এই কারণাবলির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থাবলি পাঠে পরিদৃষ্ট হয়। সেইরূপ প্রণালীক্রমে সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতির বিশেষ পরিণাম সমূহের পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার অবিশেষ পরিণামপুঞ্জে আরোহণ করিয়াছেন। তাই ভগবান্ পতঞ্জলিদেব সাহঙ্কার পঞ্চ তন্মাত্রকে ষড়্‌বিধ অবিশেষ প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনেও ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" এবং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—এই দুই সূত্রে নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ মুনীশ্বর স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"সদদ্বৈতং শ্রুতং যৎ তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততোভূতপঞ্চকং প্রবিচার্য্যতে।
পঞ্চদশী।

"বেদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সেই ব্রহ্ম পরিজ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই, কেবল আকাশাদি পঞ্চভূতের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাদি বিচার দ্বারা তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। অতএব সেই পঞ্চভূতের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে।

সুতরাং কি আর্য্য ঋষিগণ, কি অনার্য্য পণ্ডিতগণ, এজগতের আদিকারণ নির্ণয়ের জন্য সকলেরই নিকট একই পন্থা। একই পন্থায় একই সিদ্ধান্ত। বৈদিক আর্য্য-ধর্ম্ম দর্শন এবং বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান-সম্মত রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) পূর্ব্বে যে পঞ্চষষ্টি (৬৫) মৌলিক পদার্থের সিদ্ধান্তে আসিয়াছিল, এক্ষণে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট তাহার আর অণুমাত্র আদর নাই। সে মত ভাসিয়া গিয়াছে এবং ইউরোপীয় দার্শনিক এখন স্থির করিয়াছেন, সকলই এক মূলতত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন, বেদান্তের "একমেবাদ্বিতীয়ং"ই এক্ষণে প্রসিদ্ধ মত। সেই অদ্বয় ব্রহ্মের যাহা তটস্থ লক্ষণ, তাহাই বেদান্তীর সগুণ ঈশ্বর এবং সাংখ্য-প্রকৃতির লিঙ্গমাত্র পরিণাম মহত্তত্ত্ব—বা বুদ্ধি। মূল প্রকৃতিতে আত্মা এবং মহত্তত্ত্বে বিশ্ব প্রতিবিম্বিত। ইউরোপীয় দার্শনিক কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"When our learned men are forced to admit that all motion is thought, that all nature is the language of one in whom we live, and are moved, and have our being, the attempts to evolve life out of chemical elements will cease."

True Science or Keely's Latest Discoveries—page 11.

পণ্ডিত গ্রোভ বলিতেছেন :—

"In all phenomena, the more closely they are investigated the more are we convinced that, humanly speaking, neither matter nor force can be created or annihilated, and that an essential Cause is unattainable—Causation is the will, Creation the Act of God"

Grove's "Correlation of Physical forces page—218

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের কথা বলিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মের উপাধি শক্তি এবং রূপ—ব্রহ্ম সেই সেই রূপে বিদ্যমান। পাছে কেহ ভাবেন, বেদ এক ভিন্ন দ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, তাই বেদ নিজেই বলিয়াছেন :—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমাগ্নিমাহুঃ। "

ঋগ্বেদ—১ম, ১৬৪ সূ ৪৬ মন্ত্র।

এবং

"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি।"

ঋ—৩। ৫৩। ৮।

বেদান্ত বলিয়াছেন :—

"একোদেবঃ সর্ব্ব ভূতেষু গূঢ়ঃ।"

এবং

তদেবাগ্নি স্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তং প্রজাপতিঃ॥

শ্বেতাশ্বতর।

সেই একমাত্র সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম চিন্ময় কারণ রূপে বিদ্যমান। কিরূপে তিনি কারণরূপে ব্যক্ত হইলেন, পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সে প্রস্তাবে সৃষ্টিকারণের একাংশ মাত্র বলা হইয়াছে। অপরাংশ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ ও শরীর। একই কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশ; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি—বেদান্তের এ সমস্ত কথায় আপাততঃ বোধ হয় যেন, সেই কারণ-শক্তি বা দেবতা সমুদায় স্বতন্ত্র; যেন এক একটি বিভিন্ন শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বলেন তাহা নহে, তাহারা কেহই স্বতন্ত্র নহে:—

"রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশঃ॥"

ঋগ্বেদ সংহিতা। ৪।৭।৩৩। বৃহদারণ্যক ৫ম ব্রাহ্মণ।

"সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যময় ইন্দ্র বা পরমাত্মাই অন্তঃকরণাদি উপাধিদ্বারা প্রতিশরীরে অবচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মা নামে ব্যপদিষ্ট, স্বীয় অনাদি মায়াশক্তি দ্বারা আকাশাদি রূপে বিবর্ত্তিত হন,—এক পরমাত্মাই ভোক্তৃ ভোগ্যরূপে অবস্থান করেন।"

আকাশাদি তবে এক পরমাত্মারই বিবর্ত্ত। বিবর্ত্তশব্দের লক্ষণ এই :—

"অবস্থান্তর জ্ঞানন্তু বিবর্ত্তোরজ্জুসর্পবৎ। পঞ্চদশী।

যে বস্তুতে অবস্থান্তরের জ্ঞান হয় বা অবস্থান্তরের ন্যায় প্রতীতি হয়, তাহাকেই বিবর্ত্ত কহে।"

তিনি অবচ্ছিন্ন ভাবে জগতের সমস্ত রূপে বর্ত্তমান। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেবতা সকল যে একাত্ম--একথা আমরা প্রথমে প্রতিপন্ন করিয়া তবে ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রের অপর কথার আলোচনা করিয়া দেখাইব, সেই কারণ সমুদায়ের সমবায় হইতে কিরূপে সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়গুণ ও শরীরের বিকাশ হইয়াছে। এ প্রস্তাবে কেবল প্রথম কথাই গৃহীত হইবে।

বেদ বলেন, পরমাত্মা মায়াদ্বারা আকাশাদি রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। ভগবান্ যাস্ক বলেন, পদার্থ সকল যদ্দ্বারা মিত হয়, পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকেই মায়া বলে। পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেব বলেন,—মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা, প্রকৃতি অণু প্রভৃতি সমস্ত কথাই একার্থে ব্যবহৃত হয়।

"নামরূপ বিনির্ম্মুক্তং যস্মিনাসন্তিষ্ঠতে জগৎ।
তমাহঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকে পরেত্বণুম্ ॥"

"নামরূপ বিনির্ম্মুক্ত জগৎ যাহাতে অবস্থান করে—প্রলয়কালে যে অবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে—তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ বা অণু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"

সুতরাং কি বেদান্ত, কি ন্যায়, কি সাংখ্য, সকলই এই একই মূল উপাদান হইতেই জগতোৎপত্তি বলিয়াছেন। এই অব্যক্ত প্রকৃতিই হার্বার্ট স্পেন্সারের—The Imperceptible এবং Diffused State. সেই অব্যক্ত হইতেই চিন্ময় ব্রহ্ম মহান্ বুদ্ধি তত্ত্বরূপে অহঙ্কৃত হইয়া স্বকামিভাবে আকাশাদি কারণ পঞ্চকে ব্যাকৃত হইলেন। ব্যাকৃত হইয়াও তিনি একই ঈশ্বর ও কর্ত্তৃত্বশক্তি। এ প্রস্তাবে আমরা দেখাইব, তিনি যে আকাশাদি-ব্যাপ্ত একই কর্ত্তৃশক্তি, এ কথাও বিজ্ঞান-সম্মত।

বেদান্ত বলিয়াছেন, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ ছিলেন। সেই সৎই জগৎ রূপে ব্যক্ত রহিয়াছেন। এই সৎ নির্গুণ (Non-Relative), নির্গুণ হেতু নিষ্ক্রিয়। ভগবান্ যাস্ক বলেন, সেই নিষ্ক্রিয় কেবল-সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ হেতু ক্রিয়াশীল হইয়াছেন:—

"মহানাত্মা ত্রিবিধোভবতি সত্ত্বং তু মধ্যে তিষ্ঠ-ত্যভিতো রজস্তমসী, রজঃ ইতি কাম দ্বেষস্তম ইতি।"

সত্ত্ব-লক্ষণ পরমাত্মা যখন জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন, মায়াদ্বারা যখন বিশ্বরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময় হয়েন। বিশুদ্ধ সত্ত্ব মধ্যে এবং উভয় পার্শ্বে রজঃ ও তমঃ। জগদাকারে বিবর্ত্তিত পরমাত্মার স্বরূপ এই। রজঃ কাম এবং তমঃ দ্বেষরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদ সংহিতার ২।৩।২৩ ঋকের ব্যাখ্যা স্থলে ভগবান্ যাস্ক এই কথার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সত্ত্বরূপী পরমাত্মার দুই পার্শ্বে এই দুই শক্তি—রজঃ ও তমঃ। এই রজঃ ও তমঃই সৃষ্টি ও লয়শক্তি, ভাব ও অভাব, রাগ ও বিরাগ, কাম ও দ্বেষ—(Attraction এবং Repulsion) সেই রাগ ও বিরাগের প্রাকৃতিক সংঘর্ষ ও ভেদবৃত্তি প্রভাবে সৃষ্টির উৎপত্তি। এই দুই শক্তি সত্ত্বের দুই পার্শ্বে বিদ্যমান। কেবল সত্ত্ব নিষ্ক্রিয়, সুতরাং ইনি কর্ম্মকর্ত্তা নহেন; রজঃ ও তমঃ দ্বারা তিনি ক্রিয়াশীল হইয়া সৃষ্টির বিকাশ করিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন:—

Nevertheless, the forms of our experience oblige us to distinguish between two modes of force : the one not a worker of change and the other a worker of change,—actual or potential. The first of these—the space-occupying kind of force has no specific name."

"For the second kind of force, distin-

guishable as that by which change is either being caused or will be caused if counter-balancing forces are overcome, the specific name now accepted is —Energy."

First Principles—page 191.

তবেই দেখা যাইতেছে, কেবল সত্ত্বদ্বারা কোন ক্রিয়া হয়না। সেই সত্ত্বের বিক্ষেপ-শক্তিদ্বারা সৃষ্টি সম্ভুত। বেদান্তসারেও আছে :—

অস্যাজ্ঞানস্যাবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মস্তি।

"অজ্ঞান বা মায়া, বা অব্যক্তের দ্বিবিধ শক্তি—এক আবরণ শক্তি, আর এক বিক্ষেপ শক্তি। যে শক্তি আত্মার যথার্থ স্বরূপ ঢাকিয়া রাখে, সেই শক্তির নাম আবরণ শক্তি। আমরা অজ্ঞান বশতঃই আত্মায় কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি নানা সংসার-ধর্ম্ম আরোপ করিয়া থাকি। কিন্তু আত্মা নিজে নিষ্ক্রিয়। যাহা আবৃত হয়, তাহাতেই নানা কল্পনার সমুদ্ভব হয়। সেই কল্পনা বশতঃই আমরা আত্মাতে বিক্ষেপ শক্তি আরোপিত করি। এই বিক্ষেপ-শক্তি আর সৃষ্টি করিবার শক্তি-সামর্থ্য একই কথা। তাই বেদান্তসার বলিতেছেন ;—

এবমজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ত্যা।
আকাশাদি প্রপঞ্চমুদ্ভাবয়তি তাদৃশং সামর্থ্যং।
তদুক্তং বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং
জগৎ সৃজেদিতি।"

"বিক্ষেপশক্তি কিরূপ? রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান যেমন সর্পাদির সৃষ্টি করে, সেইরূপ আত্মবিষয়ক অজ্ঞান স্বাবৃত আত্মাতে ভ্রমময় আকাশাদির সৃষ্টি করিয়াছে। অজ্ঞানের যে শক্তিদ্বারা তাদৃশ সৃষ্টি হয়, তাহাকেই বিক্ষেপ শক্তি বলে। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ এই যে, অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সর্বত্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকে।"

এই বিক্ষেপ শক্তিই সমস্ত পরিবর্তনের কারণ। হার্বার্ট স্পেন্সার যাহাকে Energy বলিয়াছেন এবং বেদান্তসারে যাহা বিক্ষেপ-শক্তি, ভগবান্ পাতঞ্জলি তাহাকে প্রবৃত্তি শব্দে মহাভাষ্যে উক্ত করিয়াছেন:—

প্রবৃত্তিঃ খল্বপি নিত্যা। নহীহ কশ্চিদপি স্বস্মিন্নাত্মনি মুহূর্ত্তমপ্যবতিষ্ঠতে।"

প্রবৃত্তি নিশ্চয় নিত্য। অণুৎ ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রবৃত্তি-শূন্য নহে। প্রবৃত্তি কি? পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি বলিতেছেন :—

"প্রবৃত্তিরিতি সামান্যং লক্ষণং তস্য কথ্যতে।
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ স্থিতি শ্চেত্যথ ভিদ্যতে॥"

আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণামের সামান্য নাম—সাধারণ সংজ্ঞা—প্রবৃত্তি। মুহূর্ত্ত মধ্যে সৃষ্টি হইতেছে, লয় হইতেছে আবার তন্মধ্যেই স্থিতি ঘটিতেছে। এই স্থিতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানে তাই Moving Equilibrium বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর্য্য শাস্ত্রেও এই "স্থিতি" কিরূপ দেখুন ;—

"আবির্ভাবতিরোভাবান্তরালাবস্থা স্থিতিরুচ্যতে।"
কৈয়ট।

"আবির্ভাব তিরোভাবের অন্তরালাবস্থাকেই স্থিতি কহে।" ভগবান্ পাণিনি এই আবির্ভাব, তিরোভাব এবং স্থিতিকে, পুংশক্তি, স্ত্রীশক্তি এবং নপুংসক শক্তিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন *।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি, এই স্থিতিই পৃথিবী-শক্তিরূপে বেদান্তের পঞ্চম কারণ তত্ত্ব ও মহাভূত। এই স্থিতি-শক্তিই সমস্ত কারণের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া "ঈশান" রূপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাই তাহার নাম ধরিত্রী বা পৃথিবী। প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম বা বিক্ষেপ শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিয়া পৃথ্বীশক্তি কিরূপে বহুত্বের

* এ বিষয় "আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপে" বিস্তৃতরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। পাণিনির "লিঙ্গানু" সূত্রের "মহাভাষ্য" দ্রষ্টব্য।

কারণ, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। আমরা একণে দেখিলাম, এই স্থিতিশক্তি (বিষ্ণু) পুং ও স্ত্রীশক্তি বা আবির্ভাব ও তিরোভাবের অন্তরালবর্ত্তী। তবে জিজ্ঞাস্য এই, আবির্ভাব ও তিরোভাব বা সৃষ্টি ও লয় কি পর পর সমুদিত, তাই তাহাদের অন্তরালে স্থিতি রহিয়াছে? পূর্ব্বেই দেখিয়াছি সৃষ্টি, লয় ও স্থিতি সমুদায়ই এক অগ্নি শক্তিরই বিভিন্ন অবস্থা। পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেবের প্রসাদে জানিতে পারিয়াছি, এক তেজেরই বিভিন্ন অবস্থা অগ্নি ও সোম। তবে কি সেই কারণদ্বয়—অগ্নি ও সোম—পর পর অবস্থিত? তাহারা ব্রহ্মাণ্ডে বা অব্যক্ত জগতে একের পর অন্য নহে। তাহারা একাধারে যুগপৎ বর্ত্তমান।

ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, রজঃ ও তমঃ দুই পার্শ্বে, মধ্যে সত্ত্ব—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এই রূপ। এই রজঃ ও তমঃই রাগ ও বিরাগ, ভাব ও অভাব, সৃষ্টি ও লয়।* এই রজঃ ও তমঃই সমস্ত আবির্ভাব-তিরোভাব বা পরিবর্ত্তনের কারণ। এই রজঃ ও তমঃ দ্বারা জগতে নিয়তই সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম ঘটিতেছে। তাহাই অব্যক্ত অবিভাগ প্রকৃতিতে সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ ঘটাইয়া তাহাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছে। তাহা সোম ও অগ্নি নামে একই তেজঃশক্তি। এই অগ্নি ও সোম এক মুহূর্ত্তও বিভিন্ন নহে। যে স্থানে শৈত্য, সেই স্থানেই তাপ। অগ্নি, শৈত্য ব্যতীত থাকিতে পারে না, শৈত্য ও অগ্নি ব্যতীত থাকিতে পারে না। তাহারা এক মিথুন। কোন কোন স্থানে তাহারা সবিতা ও সাবিত্রী নামেও অভিহিত হইয়াছে:—

উষ্ণমেব সবিতা, শীতং সাবিত্রী, যত্র হ্যেবোষ্ণং তচ্ছীতং, যত্র বৈ শীতং তদুষ্ণমিত্যেতে দ্বে যোনী একং মিথুনম্।"——গোপথ ব্রাহ্মণ।

তবেই আর্য্য দর্শন-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নি ও শৈত্য এক মিথুন। তাহাদের কুত্রাপি বিচ্ছেদ নাই। তাহারা universally co-existent. হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন:—

"To say that the primary re-distribution is accompanied by secondary re-distribution, is to say that along with the change from a diffused to a concentrated state, there goes on a change from a homogeneous state to a heterogeneous state. The components of the mass while they become integrated also become differentiated."

First Principles—page 330

ভগবান বশিষ্ঠদেবও বলিয়াছেন, সত্ত্ব কেন্দ্র বা সন্ধিস্থানীয় হইয়া রজঃ ও তম এই গুণ দ্বয়ের ধারক স্বরূপ হইয়াছে। সত্ত্ব অবিলোপী; সেই অবিলোপী সত্ত্বের আশ্রয়ে ভাব ও অভাবময় রজঃ ও তমঃ নিয়তই ক্রীড়া করিতেছে।

"সত্ত্বিরপ্যবিলোপঃ স্যাদেতয়োরেব তদ্বপুঃ।
ভাবাভাবৈর্য্যথৈকাত্মা নিষ্ঠাঁ চেত্তৌ তথৈবহি॥"

যোগবাশিষ্ঠ।

অগ্নি ও সোম যে এক মিথুন (Universally co-existent) তাহা প্রদর্শিত হইল। একণে বায়ুর কথা। বায়ু কি অগ্নি ও সোম ছাড়া এক দণ্ড থাকে? তাপ ও শৈত্যের সহিত বায়ু নিত্য-সংযুক্ত। শ্রুতি বলিয়াছেন:—

"স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং।"

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

"এক অগ্নি; অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যভেদে বিভিন্ন হইয়া যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত আছেন।"

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সৃষ্টিতত্ত্বে যাহা বায়ু নামে মহাভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই বেদান্ত দর্শনের "কম্পন"। বায়ু কেন "কম্পন" বলিয়া অভিহিত হইল, গতি

* সৃষ্টিতত্ত্বে তমঃ শব্দ দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তাহার এক অর্থ—বিনাশ বা লীনাবস্থা; অন্য অর্থ ঘনাবস্থা বা জাড্য।

বলিলেই ত যথেষ্ট হইত? তাহার কারণ এই, সৃষ্টিতত্ত্বে যে গতির উৎপত্তি,তাহা সরল গতি নহে, তাহা কম্পনাত্মক গতি। *

প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই কালে কালে ও তালে তালে হয়। ভগবান্ ভর্তৃহরি এই কথাই বলিয়াছেন:—

"ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত।"

বাক্যপদীয়।

"এই বিশ্ব প্রথমে ছন্দঃ হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

যে গতি তালে তালে নৃত্য করে তাহাই ছন্দঃ; সেই ছন্দঃই বিশ্ব-বিবর্ত্তনের কারণ। ভাগবতে এই শক্তিকে কালশক্তি বলা হই-য়াছে † ভগবান্ স্বয়ং কালরূপী:—

এতদ্ভগবতোরূপং।

এই প্রাকৃতিক তালে-তালে কম্পনই হার্বার্ট স্পেন্সারের Rhythm of motion শ্রুতি বলিয়াছেন, এই বায়ু অগ্নির সহিত নিয়তই সংযুক্ত।

"বায়োর্ব্বা অগ্নেস্তেজঃ তস্মাদগ্নিমন্বেতি।"

"বায়ু অগ্নিরই তেজঃ এই নিমিত্ত নিয়-তই অগ্নির সহিত তাহা সংযুক্ত।"

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নি ও সোম, ইহারা এক মিথুন। এক্ষণে দেখা যাই-তেছে, বায়ু সেই অগ্নি ও সোম ব্যতীত তিষ্ঠিতে পারে না। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, একই অগ্নি, অগ্নি ও বায়ুরূপে বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানেও স্থির হই-য়াছে:—

"To produce continuous motion, there must be an alternate action of heat and cold."

অন্যত্র:—

"It has been observed with reference to heat thus viewed, that it would be as correct to say that heat is absorbed, or cold produced by motion, as that heat is produced by it. This difficulty ceases when the mind has been accustomed to regard heat and cold as themselves, motion; *i e* as correlative expansions and contractions, each being evidenced by relation, and being inconceivable as an abstraction."

Grove's Correlation of Physical forces.

আর একজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন:—

"It seems possible to account for all the phenomena of heat if it be supposed that in solids the particles are in a constant state of vibratory motion."

Davy - Chemical Philosophy.

অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বায়ু ও তেজ এই দুই কারণশক্তি সর্ব্বদাই একত্র সংযুক্ত। এই বায়ু ও অগ্নি আকাশেই প্রতিষ্ঠিত। ছান্দোগ্যে আছে:—

সর্ব্বাণিহ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশোহ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম।

বায়ু, তেজ, রস ও পৃথিবী এই চতুর্ব্বিধ কারণশক্তি আকাশেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আকাশব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আকাশ বা স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রই বায়ুপতি। বায়ুই বল, বীর্য্য ও প্রাণ। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে ইন্দ্রই প্রাণ রূপে উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সমস্তই ভূতপঞ্চক পরস্পর সংযুক্ত ও সকলই সর্ব্বমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। যখন যাহার প্রাদুর্ভাব তখন তাহার উদয়। কিন্তু প্রত্যেকের উদয়ে অন্য ভূতে-রও সঞ্চার আছে। এইজন্য ঋষি এই ভূত-গণকে যে যেরূপে ভাবিয়াছেন, তাঁহার নিকট সেই সেইরূপেই তাহা চিন্তনীয় হইয়াছে।

* শ্রুতি দেখুন:—

"সতপোহতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা শরীরমধুনত।"

তৈঃ আঃ ১।২৩।

তিনি সৃষ্টি করিব বলিয়া স্থির করিয়া শরীর কম্পিত করিলেন।

† শ্রীমদ্ভাগবৎ ২।৫।২২ এবং ৩।২৯।৩৬ ইংরাজীতে Periodicity বলে। এই কালশক্তি প্রভাবেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ঘটে। তাই ভূতভাবন ভবানীপতি মহাকাল নামে উক্ত হইয়াছেন।

কোন ঋষি এই পঞ্চভূতকে পঞ্চাগ্নি * বলিয়াছেন, কেহ বা আপপঞ্চক বলিয়া ধ্যান করিয়াছেন, কেহ বা পঞ্চবায়ু (প্রাণ) রূপেই চিন্তা করিয়াছেন। যিনি যেরূপেই দেখুন না কেন, এই পঞ্চভূত সমস্তই একাধারে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। যাহাতে তাহারা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ড, মায়া, অব্যক্ত ও প্রকৃতি। তাই ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে আছে :—

"তস্মাদ্বিরাট্ অজায়ত।"

ঋ—১০।৯০।৫।

"আদি পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড হইল।"

এই ব্রহ্মাণ্ডই কারণসলিল। এই একার্ণব কারণপঞ্চকের সৃষ্টি একবার ব্যতীত দ্বিতীয় বার হয় নাই। তবে যে আমরা শাস্ত্রে বার বার সৃষ্টি প্রলয়ের কথা শুনিতে পাই, তাহা কি ? বেদ কি বলিতেছেন শুন :—

"সকৃদ্ধ দ্যৌ রজায়ত সকৃদ ভূমি রজায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়স্তদন্যো নানু জায়তে।"

ঋগ্বেদ—৬।৪৮।২২।

"একবার মাত্র দ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছে, একবার মাত্র ভূলোক উৎপন্ন হইয়াছে। মরুৎগণের মাতা হইতে একবার মাত্র দুগ্ধ হইয়াছে। এ সকল বার বার হয় না। পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিকালীন এই সকলই বার বার উৎপন্ন হয়।"

এ মন্ত্রে দুগ্ধ শব্দে এই একার্ণব কারণ সলিল বুঝাইতেছে। মরুৎগণের মাতা অদিতি; অদিতির পুত্র আদিত্যগণ। আদিত্যগণ—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ। সেই দেবগণের সমষ্টি দ্যুলোক হইতে এই ভূলোকের উৎপত্তি। যাহা একবার মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্মকৃত সৃষ্টি। যাহা বার বার হয়, তাহা ব্রহ্মার সৃষ্টি। * এই ব্রহ্মাই দ্বিতীয় পুরুষ। তিনিই হিরণ্যগর্ভ ও সমুদায় জগতের সমষ্টান। হার্বার্ট স্পেন্সারও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন :—

"Apparently, the universally coexistent, forces of attraction and repulsion, whiche as we have seen, necessitate rhythm in all, minor changes throughout the Universee also necessitate rhythm in the totality fo its changes—produce now an immeasure able period during which the attractivt forces predominating cause Universas Concentration, and then an immeasurabl. period during which the repulsive force predominating, cause Universal Diffusion alternate eras of Evolution and Diffusion And thus there is suggested the concep tion of a *past* during which there hav been successive evolutions analogous to that which is now going on, and a future during which successive other such Evolutions may go on—ever the same in principle but never the same in concrete result."

First Principles.

অতএব, শাস্ত্রে যে কারণার্ণবের কথা আছে, যে কারণার্ণবে আপপঞ্চক ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছে যে কারণার্ণবে জগৎ খণ্ডপ্রলয়ে লীন হইতেছে, আবার সৃষ্টিকালীন যাহা হইতে পুনরাবির্ভূত হইতেছে,—যে মহা কারণশরীর ব্রহ্মা বলিয়া পুরাণে এবং হিরণ্যগর্ভ বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রোক্তি কিরূপ বিজ্ঞান-সম্মত, তাহা হার্বার্ট স্পেন্সারের উদ্ধৃত সিদ্ধান্ত বাক্যেই প্রতীত হইতেছে। এ কথার যৌক্তিকতা যাহারা ভাল করিয়া বুঝিতে চান, তাঁহারা হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থাধ্যয়নেই জানিতে পারিবেন, তিনি কিরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা দ্বারা সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা সেই সিদ্ধান্তমাত্র উদ্ধৃত করিয়া বেদবাক্যের সারত্ব প্রতিপাদন করিলাম। তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সৃষ্টি-

* দিব্ (আকাশ), পর্জন্য (বায়ু), পুরুষ (পুংশক্তি), যোষিৎ (স্ত্রীশক্তি) এবং পৃথিবী—এই পঞ্চাগ্নি।

* শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি সরস্বতীকৃত "ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত"—২১।২২ পৃ।

শ্রুতি সকল বিজ্ঞান-সম্মত। পুরাণে এই ব্রহ্মা কিরূপ বর্ণিত হইয়াছেন দেখুন :—

"একদা ভরদ্বাজ কৈলাসশিখরে প্রভাজালজড়িত মহর্ষি ভৃগুকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, অগ্নি ভূমি ও বায়ুসমাবৃত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন্ মহাত্মাতেই বা উহা প্রলয়-কালে লয় প্রাপ্ত হইবে? * * *

ব্রহ্মসঙ্কাশ ভগবান্ ভৃগু কহিলেন, তপোধন! মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, মানস নামে এক সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, অভেদ্য, অজর, অমর, অব্যক্ত, অব্যয় পরমদেবতা আছেন। * সেই দেবতা সর্ব্বাগ্রে মহৎকে সৃষ্টি করিলেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। † অনন্তর সেই ভগবান স্বয়ম্ভু একটি তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের নিধান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। * *। তৎকালে আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। * * * *। আকাশ তাহার উদর, সমীরণ নিশ্বাস, তেজ অগ্নি, এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল। তাঁহার মস্তক আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে এবং হস্ত সমুদায় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল।" মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব। ভৃগু ও ভরদ্বাজ সম্বাদ। ১৮২ অধ্যায়।

উক্ত পদ্ম কি?

"ভৃগু কহিলেন, মহাত্মা মানসের যে মূর্ত্তি ব্রহ্মার দেহরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, উহার আসন বিধানার্থ পৃথিবীই (ব্রহ্মাণ্ড-কমল) পদ্মরূপে পরিকল্পিত হয়।" ঐ

এই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্থূলসৃষ্টির উৎপত্তি এবং ব্রহ্মাতেই সকলই লয়প্রাপ্ত হয়। এই ব্রহ্মা বা পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

"বিরাজো অধি পুরুষঃ।"

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে আদিপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইল। এক্ষণে সেই মন্ত্রই অপরার্দ্ধভাগে বলিতেছেন :—

সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকেই অধিকরণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডশরীরাভিমানী কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। সেই পুরুষ কি প্রকার, তাহা শ্রুতি বলিতেছেন :—

"দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি
খং বৈ নাভিং চন্দ্র সূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিঞ্চ
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা॥"

ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকে যাঁহার মস্তক, আকাশকে নাভি, চন্দ্রসূর্য্যকে চক্ষু, দিক্‌কে শ্রোত্র এবং পৃথিবীকে চরণ বলেন, তিনি অচিন্ত্য ও সর্ব্বভূতের স্রষ্টা। এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত পুরুষের সূক্ষ্মদেহ কিরূপ এবং সেই সূক্ষ্মদেহ কিরূপ কোষাত্মক হইয়া স্থূল জীবশরীরের উৎপত্তি করিয়াছে, তাহা পর প্রস্তাবে গৃহীত হইবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

* সৃষ্টিসংকল্পাত্মক ব্রহ্মই এস্থলে মানস নামে অভিহিত হইয়াছেন।

† এস্থলে কারণতত্ত্বের ক্রমপরম্পরায় বিভিন্নতা দেখিয়া প্রতীত হয় যে, ঋষিরা বিলক্ষণ জানিতেন যে, বায়ু, তেজ ও সলিল এই ত্রিবিধ একই কারণ। এ কথা আমরাও প্রতিপন্ন করিয়াছি।

শেষ বা সংস্করণ—ভয়ে ভয়ে, না অগ্নি-মন্ত্রে ?

"মা অভয়ে, আমি তোমার নাম স্মরণ পূর্ব্বক কেবল তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এই তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, আমি যদি ভীত, আতঙ্কিত বা আশঙ্কিত হইয়া ডুবি, তোমার নামের কলঙ্ক হইবে। মা, তুমি সকল অবস্থায় আমাকে অভয় চরণে রেখ। দোহাই তোমার, আমি তোমারই পদাশ্রিত দাসানুদাস। তুমি ক্রুশ-বিদ্ধ খ্রীষ্টের জলন্ত বিশ্বাস-মন্ত্রের, সংসার-জয়ী শাক্যের নির্ব্বাণ মন্ত্রের, নির্ব্বাসিত ম্যাটসিনীর অদম্য দেশানুরাগ মন্ত্রের, উপেক্ষিত পার্কারের ও লুথারের বিশ্ববিজয়ী সাহস মন্ত্রের, এবং মোহম্মদের অগ্নিমন্ত্রের জলন্ত দৃষ্টান্ত সম্মুখে ধরিয়া আমাকে মাতাও।"

সে দিন বিলাত-প্রবাসী কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম, "বোধ হইতেছে, সিডিসন আইন বিধিবদ্ধ হইবে। কিন্তু আমি তাহাতে ভীত নহি। কেন না, আমি রাজদ্রোহী নই। সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখিলেও আমি গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী।" এই আইনের বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না; নিশ্চয় আইন পাশ হইবে।* হইলে আমাদের ভয়ের কারণ নাই কি? থাকিতে পারে, কিন্তু আমি তাহাতে ভীত নহি। কাগজ চালাই, রাজার রাজ্যে বাস করি, আইনের ভয় করি না? ভয় করিব কেন? ভয় করিতে হইলে, এই জীবন ধারণ করা অসম্ভব নয় কি? কত আইন কানুন, কত নিয়মতন্ত্র, অপরাধী না হইলে সে সকলের ভয়ের কারণ কোথায়? অপরাধ না করিয়াও ভয় করিতে হইলে জীবন ধারণ অসম্ভব। প্রতি মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকের ঘটনারাজি বিভীষিকা দেখাইতেছে, দস্যু সকল ক্রীড়া করিতেছে—অসুরকুল হইতে আরম্ভ করিয়া, সংসারের কত শত্রুকুল চতুর্দ্দিকে ভয় দেখাইতেছে—আত্ম-রক্ষার উপায় কিছু নাই কি? আত্ম-রক্ষার কোন অস্ত্র নাই কি? লোকে বলে, পিপীলিকার পালক উঠে, মৃত্যুর জন্য, পতঙ্গ অগ্নি-প্রলুব্ধ হয়, মৃত্যুর জন্য। আমি যে নির্ভয়ের কথা বলিতেছি, ইহাও কি মৃত্যুর জন্য নয়? মৃত্যু, মৃত্যু—কি মনোমুগ্ধকর কথা, কি মধুর বাণী! শুনিলে আমার প্রাণ সুশীতল হয়; অমরধামের অমর-মন্ত্রে দীক্ষিত আমি কি জানি কেন, যেন কেমন এক স্বর্গীয় মাদকতায় পূর্ণ হই! পৃথিবীর মধ্যে সকল ভয়ের সার ভয়, শুনি, মৃত্যু। যদি মৃত্যুকে জয় করিতে পারি, তবে আর ভয় করিব কাহাকে? মৃত্যু জয়ের ঔষধ কি, ভাই, তুমি বলিতে পার কি? লৌহবস্ত্র, লৌহ অস্ত্র, বিবিধ বৈদ্যুতিক পোষাক এবং আগ্নেয় অস্ত্রে মৃত্যুকে জয় যায় কি? যায় কি রিপুকুলকে জয় করা, যাহার তাড়নায় বাল্য কাল হইতে আমি অস্থির এবং সন্ত্রাসিত? আমি সংসার-জয়ে হতাশ্বাস জীব, না রিপু জয়ে হতাশ্বাস প্রাণী? অধিক ভয় কোথায়? অন্তরে বা বাহিরে? অন্তরে যে চিরজীবিত, চিরবিজয়ী, বাহিরে তাহার ভয় কোথায়? আর ভিতরে যে মৃত, বাহিরেই বা তাহার জীবন কোথায়? আমি কি অন্তরে মৃত?

আমি ব্রাহ্মসমাজের লোক হইয়া, সমাজের বুকে বসিয়া বিরুদ্ধে লিখি বলিয়া আমার বন্ধুরা আমার প্রতি আজকাল বড়ই চটিয়াছেন। সেদিন কোন লেখক-বন্ধু বলিতে-

---

* এই প্রবন্ধ ছাপা হইবার পূর্ব্বেই, বিগত ৭ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৮, শুক্রবার, এই আইন পাশ হইয়াছে।

ছিলেন, "নব্যভারতে যাহাতে আর আমি না লিখি, তজ্জন্য অনুরোধ করিতে আমার নিকট কোন বন্ধু আসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, এক সময়ে আমার পরম বন্ধু রজনীনাথ এ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা শুনি নাই। এখন শুনিতে পারিব না। নব্যভারতের লেখা অন্যায় হইয়া থাকে, তাহার প্রতিবাদ করুন। নব্যভারতেই প্রতিবাদ দিন।" তিনি পরম বন্ধুর কার্য্যই করিয়াছেন। ঐ বন্ধু নাকি অন্য কাগজে কি লিখিবেন বা লেখাইবেন, সেই ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাকি অনেক যোগ্য লেখক এবং যোগ্য কাগজ আছে। আমি ঐ বন্ধুর নাম জানিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন, "তিনি আপনার দ্বারা উপকৃত কোন ব্যক্তি, নাম শুনিলে কষ্ট পাইবেন।" আমি আর পীড়াপীড়ি করিলাম না। উপকৃত ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে লিখিবেন, সে আর একটা বেশী কথা কি? আমি একজন নগণ্য অধম ব্যক্তি, পাপে তাপে জর্জ্জরিত, ধর্ম্মের ভাণ করি, কিন্তু ধর্ম্ম পাই না—বিশ্বাস ভক্তি দূরে—দূরে—কত দূরে, তাহাও জানি না। অন্তরে সদা আমার পাপ-রাশি কিলবিল করিতেছে, আমি কি করিতে কি করি, কি বলিতে কি বলি, সদা ম্রিয়মান। আমার বিরুদ্ধে বলাতে বা লেখাতে অধিক বাহাদুরি কি? তাহাতে যদি সকলের পবিত্রতা প্রমাণিত হয়, তাহাতে যদি সকলের অন্তর পরিশুদ্ধ হয় এবং সকল দোষ ক্ষালিত হয়, তাহা করুন। করুনই বা বলি কেন? দিবানিশি চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ২ কত কথা ঘোষণা করিতেছেন! এ নিন্দাতে আমার মঙ্গল ভিন্ন, অমঙ্গল নাই। ইহাতে আমার অন্তর্বৃত্তি বাড়ে বই কমে না। কিন্তু একটা কথা সদা ভাবি, গোপনে গোপনে কেন? বেনামী লেখাই বা কেন? আমি ত গোপনে কিছু লিখি না—বলিতে হয়, সম্মুখে বল; লিখিতে হয়, নাম দিয়া লেখ। সাম্রাজ্য আমি, আমাকে করিয়া এত ভয় কিসের? তোমাদের লেখকগণ কি কম শক্তিধারী? আমি সদা তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। তোমাদের সহায়গণের কত পাণ্ডিত্য, কত জ্ঞান, আমি সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। বিফ ব্রাণ্ডী-মন্ত্র-পূত সাধক-দল, হোটেল-বেশ্যা-কীর্ত্তি-পূত সাহিত্যিক দল, হ্যাট-কোট-পরিহিত, বিলাসিতা-গৌরব পূত কাঙ্গ্রেসিক দল, সকলই তোমাদের আছে, তা জানি। জানি, অসীম সাহসী হিতবাদীর সহিত তোমাদের বিবাদ মিটিয়াছে। জানি না কি? তোমাদের কাহার অন্তরে কতটুক ধর্ম্ম এবং কতটুক চরিত্র আছে, তা জানি। তোমরা ঋণ করিয়া ঘি খাওয়া ও নবাবী করার দলের লোক, তাহা জানি; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া লাইবেল করিতে জান, তাহাও জানি। তোমাদের মধ্যের কেহ কেহ কত কৌশল জাল বিস্তার করিয়া বেঙ্গল-ব্যাঙ্কিং করপোরেশন দ্বারা কত লোকের অর্থ নষ্ট করিয়া আইনের হাত এড়াইয়া প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জানি। সাধারণের অর্থে তোমরা যে ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহার দরজায় প্রহরী রাখিয়া লোক প্রবেশে বাধা দিতে তোমরা পার এবং প্রয়োজন হইলে মারামারী লাঠালাঠী করিতে পার, তাহা জানি। কথায় ২, যে তোমরা, মহারাণীর জাতি-নির্ব্বিশেষে অধিকার প্রদানের ঘোষণানুসারে কাজ হয় না বলিয়া দুঃখ কর, সেই তোমরাই, মন্দিরের ট্রষ্টডিডে যাহা লেখা আছে, অন্যের প্রবেশাধিকারে বাধা দিবার সময়, তাহা ভুলিয়া

যাও, জানি। তোমরা প্রথম হইতে মন্দির-নির্ম্মাণের পরীক্ষিত (audited) হিসাব সাধারণকে না দিয়া বাহাদুরী করিয়াছ, তাহা জানি। তোমাদের কত ক্ষমতা, কত জ্ঞান, কত বিদ্যা, কত কি আছে, তা কিছুই আমি অবিদিত নই, সব জানি। ইচ্ছা করিলেই তোমরা অনেক অস্থায়ী কাগজ বাহির করিতে সক্ষম, তাহা জানি। বিস্মৃতিতে নিমগ্ন, অহঙ্কার স্ফীত সাহিত্য বিজ্ঞান তোমাদেরই কাগজ ছিল, তাহা জানি। তোমাদের সঞ্জীবনী নব্যভারতকে ছুটাইয়া, এক সময়ে, সেই স্থানে দাসী কে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা জানি। তত্ত্বকৌমুদী, নামে সমাজের কাগজ, কাজে তোমাদেরই ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল চরিতার্থ করিবার অস্ত্র, নচেৎ অনেক পূর্ব্বে, ব্যক্তি বিশেষের কাগজ নব্যভারতের সমালোচনা উহাতে বাহির হইত না।* জানি, যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্ম-সমাজ যখন লিখিয়াছিলাম, তখন তোমাদের কত মহারথী, বন্ধু ভাঙ্গিতে, গ্রাহক ভাঙ্গিতে দ্বারে দ্বারে নির্লজ্জতার অভিনয় করিয়াছিলেন। তোমাদের কাহারও হয় ত ধারণা ছিল, কোন ২ জমীদার বন্ধু আমাকে মাসে ২ প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন, এই ভুল বিশ্বাসে তোমরা তাঁহাদের মন ভাঙ্গিতে কত পায়ে তৈলমর্দ্দন করিয়াছিলে। কত গ্রাহক তোমরা নিয়াছ, কত বন্ধুর মন ভাঙ্গিয়াছ, কে না জানে? জানি, কোন সময়ে পাড়া [illegible] আমাকে উচ্ছেদ করিবার ষড়যন্ত্রও হইয়াছিল! ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া এখনও কেহ কেহ আমাকে উড়াইবার জন্য গোপনে কত আয়োজন করিতেছেন, তোমাদের বাক্‌পটু সিংহচন্দ্র, অমিত তেজধারী ক্রোধ নাথ, এবং সর্ব্বত্যাগী মার্টার-কুমারগণ কত শক্তি ধারণ করেন, তাহা জানি। তোমরা কার্য্যোদ্ধার করিবার সময় অসতের সাহায্য নিতে, ব্যভিচারীর পদস্পর্শ করিতে, শত্রুকুলেরও পায়ে তৈল দিতে বড়ই সমর্থ, তাহা জানি। জানি অনেক, কিন্তু তাহাতে ভয় পাইব কেন? তোমাদের কত কত ভাষাবিৎ লেখক গজাইতেছেন, কতজন হাতে খড়ি দিতেছেন, দিগ্বিজয়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিতেছেন, তাহা কিছুই আমি অজ্ঞাত নই। জানি অনেক, কিন্তু সে সকলে কাজ কি? শক্তির বড়াই কেন? সে সকলই জানি। সত্য অপরাধ করিয়া আমি যদি অন্তরে মরিয়া থাকি, তবে বাহিরে মরিতে ভয় কিসের? মারিবার জন্য, প্রহারের জন্য, উচ্ছেদ করিবার জন্য অস্ত্র শাণিত করিতেছ, দল বাঁধিতেছ, পূর্ব্বের আন্দোলনের পুনরভিনয় করিতেছ, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া লেখক এবং গ্রাহক, সহায় এবং অনুগ্রাহকের মন ভাঙ্গিতে ধাইতেছ, বেশ, কর, সুখী হও। নব্যভারত উঠিয়া যাইবার হয়, যাউক। একজনও যদি আমার দুঃখের কাহিনী শুনিবার লোক, এই ধরায়, শস্যশ্যামলা এই ভারতবর্ষে না থাকে, মূর্খের লেখনীর মৃত্যু হইবে। একজনও যদি আমার বন্ধু না থাকে, সহায়হীন আমার কি গতি হইবে, ভাবিতেছ? আহা, বড় তোমার দয়া। আমি দিবারাত্রি মহাক্লেশে মাতিতেছি, ভাবিয়া তুমি কাতর হইতেছ, আহা, তোমার অপার করুণা! কিন্তু ভাই আমি কে, আমি কোথায়! আমার আত্মরক্ষার যদি উপায় না থাকে, তবে কত শত বন্ধুর সহিত আমিও গিয়াছি। আমি ভিতরে যদি মরিয়া থাকি, তবে আর চিন্তা কিসের? বাহিরের জীবন; কি বাহিরের অস্তিত্ব দেখিয়া ভয় পাও কেন? অন্তরে আমি মরিয়া থাকিলে, বাহিরেও আমি মুক্ত; আমার জন্য কোন ভয়ের কারণ কোথায়?

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই চৈত্র, ১৮০৮ শক, (১২৯৩ সাল) দেখ।

বাহিরে আমার কি আছে? আমি ধরা কাঁপাই য়া ঘোড়ায় বা চেরিয়টে চড়ি না; চক্ষু ঝলসাইয়া শাল বনাত বা হ্যাটকোট গায় দেই না; পোলাউ কালিয়া, রোষ্ট কাটলেট খাই না। আমি নগণ্য, আমি ঘৃণিত, আমি সামান্য, আমি নির্ধন। আমার বন্ধু বলেন, "তাঁহার বন্ধু, আমার দ্বারা কোন উপকৃত ব্যক্তি।" উপকৃত ব্যক্তির কথা বলার উদ্দেশ্য কি, জানি না। উপকার পাইয়া এখন তাহা গ্রাহ্য করে কে? পিতা মাতাকে যাহারা উপেক্ষা করে, তাহারা উপকারীকে গ্রাহ্য করিবে, খাতির করিবে? অসম্ভব কথা। সামান্য পিতা মাতার কথা স্মরণেও সন্তানের এখন কত লজ্জা হয়। উপকার পাইয়া কেহ সহস্রপতি বা লক্ষপতি হইলে পূর্ব্বের কথা মনে থাকিবে কেন? যদি কোন সামান্য ব্যক্তির নিকট উপকার পাইয়া থাকেন, তবে সে কথা স্মরণেও কত দুঃখ পান! কৃতজ্ঞতা নামক কথাটা একালে বাতুলের প্রলাপ!! বিধাতা কেন যে বড় লোকদিগকে কোন না কোন সময়ে সামান্য লোকদের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য করেন, এ রহস্য ভেদ করিবে কে? বড় লোকদের এ লজ্জা রাখিবার ঠাঁই নাই!! কিন্তু উপকারের কথা এখানে কেন? উপকার কি আমি কাহারও কখনও করিয়াছি? করিতে পারি কি? নিজের উদরান্ন সংস্থান করিতে যাহার প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রাম খাটিতে হয়, সে আবার অন্যের কি উপকার করিতে পারে? আমি স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় কাহারও উপকার করিতে পারি নাই; তবে জ্ঞানহারা ইচ্ছা-বর্জ্জিত অবস্থায়, কাহারও প্রেরণায় যদি কিছু কাজ হইয়া থাকে, সে জন্য আমার প্রতিদান-প্রত্যাশার অধিকার নাই, কৃতজ্ঞতা চাহিবার একটুও অধিকার নাই। অধিকার থাকেত, বিধাতার আছেন ইচ্ছা-বর্জ্জিত অবস্থায় এই অধম কোন্ লোকের কি উপকার করিয়াছে, তাহার কথা কে জানে? ইচ্ছা-বর্জ্জিত অবস্থায় এই অধম কত জনের নিকট কত পাইয়াছে, তাহারও গণনা হয় না। পদধূলি মাথায় লইতে জন্মিয়াছি, পদধূলি মাথায় লইয়াই আছি,—পাইতে জন্মেছি, বাল্যকাল হইতে পাইতেছি। ঋণ পরিশোধ করিতে জন্মেছি, বাল্যকাল হইতে কেবল ঋণ পরিশোধ করিতেছি। কি এক অচেনা, অজানাভাবে আমি আকৃষ্ট, দেওয়া এবং পাওয়ার কোন ইতিহাস কালীর আঁচড়ে কোন খাতার কোথাও লেখা নাই। পৃথিবীর নিয়মও বুঝি এইরূপ, জন্মিলেই দিতে এবং পাইতে হইবে। সে সকল কথা যে তুলে, সে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝে না, সৃষ্টির গভীর রহস্য বুঝে না।

উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা কি হয়? তাহা অসংখ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, যে উপকার করে, তাহার নিন্দা ঘোষণা করা এবং বিরুদ্ধে চলাই উপকৃতের প্রধান কাজ। ইহাতে আপাত-দৃষ্টিতে মানব-ঘৃণা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, ইহাতে দোষের কথা নাই। যে যাহার পরিচিত, সে-ই তাহা দ্বারা উপকৃত। যে সম্মুখে আসিবে, সে-ই কিছু অজ্ঞাতসারে দিবে, এবং সে-ই কিছু অজ্ঞাতসারে নিবে। এমারসন বলিতেন, যে ব্যক্তিকেই দেখি, সে-ই কোন না কোন বিষয়ে আমার শিক্ষা-দাতা। এ হিসাবে, যে উপকার পাইয়াছে, সে-ই উপকারী ব্যক্তির কতক পরিচয় পাইয়াছে, সুতরাং তাহার চরিত্র সমালোচনার অধিকার জন্মিয়াছে। অবাধ সমালোচনা এ জগতের উপকারী কি অপকারী, সে

বিচারের অগ্রে মীমাংসা হইলে বুঝা যাইবে, উপকারীর কোন রূপ সমালোচনা করার অধিকার উপকৃতের আছে কি না। আমার মনে হয়, অবাধ সমালোচনা সব সময়েই উপকারী। স্বাধীন মন্তব্যের, সংযত লেখার, স্পষ্ট কথার, উচিত বক্তৃতার স্বাধীনতা না থাকিলে, দেশ বা সমাজ উন্নত হইতে পারে না। তবে এক কথা এই—সমালোচনা গোপনে হইলেই তাহা নিন্দনীয়, সর্ব্বদাই প্রকাশ্যে তাহা হওয়া উচিত। যাহার কথা, তাহার নিকট বলা উচিত। ইহা সমাজে হয় না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। ইহা কাপুরুষতা, জঘন্যতা, নীচতা। এ দোষ সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।

এমারসনের হিসাবে সকলেই সকলের দ্বারা উপকৃত। মহা বিনিময়ের বিদ্যালয়ে, আমি কাহারও নিকট প্রত্যুপকারের দাওয়া রাখি না। যদি তুমি কোন উপকার পাইয়া থাক, সে জন্য লজ্জা বা সঙ্কোচ কি ? সত্য বড় বা ভালবাসা বড় ? সে জন্য গোপনে বাণ নিক্ষেপের প্রয়োজন কি ? ভয় কাহার ? সাহস থাকে, আমার সম্বন্ধে যাহা জান, প্রকাশ্যে বল। তাহাতে আমার পরম উপকার হইবে। সত্য ঘোষণায় আবার লজ্জার আবরণ কেন ? সত্য যাহা, তাহা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকুক। স্বর্গও যদি চূর্ণ হয়, সত্যকে রাজত্ব করিতে দেও। আমি বড় নির্ধন, তাহা বলিতে চাও, তাহাতে লজ্জা কি ? আমি নীচ জাতিতে জন্মিয়াছি, বলিতে চাও, তাহাতে লজ্জা কি ? আমি লেথব্রিজ সাহেবের সিলেকসন পর্য্যন্ত পড়িয়া বিদ্যার বাহাদুরী করি, আমার জীবন-ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া ইহা যদি সত্য বলিয়া জানিয়া থাক, বলিয়াছ, বলিতে পার কিন্তু তাহাতে নাম ঢাকা, নাম চাপা কেন ? তুমি জান না, কত দিন লেথব্রিজ-সিলেকসন এদেশে প্রচলিত হইয়াছে, মিথ্যা-কথা লিখিয়াছ বলিয়া কি লজ্জিত ? সত্য যাহা, তাহাই বলিও, মিথ্যা যদি বল, তাহা জগতে থাকিবে না, টিকিবে না—কখনই না, কখনই না। সত্যমেবজয়তে। আমার জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, লিপিচাতুর্য্য বা ভাষাজ্ঞান নাই—কিছুই নাই। আমি নিজেই স্বীকার করি, আমার কিছুই নাই। বাহিরের সৌন্দর্য্য নাই, বেশভূষার পারিপাট্য নাই, পোষাক পরিচ্ছদের ঘটা নাই—বাহ্য চটকের কাহারও প্রদত্ত কোন উপাধি নাই, —আমি নিজেই ত তাহা স্বীকার করি। অশেষ গুণালঙ্কৃত পূর্ণিমার লেখক অক্ষয় চন্দ্র বলেন—"আমার লেখার এখন আর তেমন লিপি-বৈচিত্র্য নাই।" সামান্যের লেখায় অসামান্য থাকিবে কিরূপে ? লিপি চতুর অক্ষয় চন্দ্রের সহিত মিলিয়া তোমরা বল, বল, ভাল করিয়া বল—আমি দরিদ্র, অজ্ঞান, মূর্খ, তাহাতে আমার লজ্জার কিছুই নাই। তোমাদেরও নাম অপ্রকাশিত রাখিবার কোন ভয়ের কারণ নাই। আমি বাল্যকাল হইতে আমি যাহা, তাহাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমার মধ্যে কপটতা থাকে, আমার শরীর-শব ছেদন করিয়া বাহিরে তাহা প্রকাশ কর। তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইবে। আমি অজানিত এবং নগণ্য হইয়াই থাকিতে চাই। এই জন্য প্রথমে পুস্তকে নাম দিতাম না; শেষে যে দিয়াছি, সে কেবল অন্যের প্রতারণা-নিবারণের জন্য। বাল্যকাল হইতে প্রায় ত্রিংশ বৎসর কলিকাতায় আছি—কিন্তু অতি অল্প সময়ই প্রকাশ্যে বাহির হইয়া কোন কথা বলিয়াছি। মহাবিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষায় দীক্ষায়

করিয়া আছি। আমার যদি কোন গুণও থাকে, তাহা যত ব্যক্ত না হয়, ততই ভাল। আমার দোষ যত প্রকাশ হয়, ততই ভাল নিন্দা হইলেই আমাকে লোকেরা ঘৃণা করিবে, সুতরাং নগণ্য এবং অজ্ঞানিত থাকায় সুবিধা হইবে। নিশ্চয় জানিও, অজ্ঞানিতের উপাসকের অন্য কামনা বা বাসনা নাই।

এ ত গেল—আমার বাহির সম্বন্ধে; এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে, ভিতরে আমি মৃত না জীবিত? এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে, আত্মজয়ের আমার কোন অস্ত্র আছে কি না? সে কথা পরে লিখিতেছি। আমি কখনও মদ্যপান করিয়াছি,জান যদি, ঘোষণা কর। আমি যদি কখনও প্রতারণা করিয়া থাকি এবং তাহা জান যদি, ঘোষণা কর। আমি যদি কখনও ব্যভিচার করিয়া থাকি, এবং তাহা জান যদি, অসঙ্কোচে ঘোষণা কর। আমি যদি কখনও কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপকার করিবার ছলনায় তাহাকে বা তাহা দিগকে মজাইয়া বা ডুবাইয়া থাকি, এবং তাহা যদি জান, অবাধে ঘোষণা কর। পাওয়ানাদারের টাকা এড়াইবার জন্য আমি যদি কখনও মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার খেলা খেলিয়া থাকি, এবং তাহা জান যদি, ঘোষণা কর। কিম্বা আমি যদি কখন কাহারও কোন অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিয়া থাকি এবং তাহা জান যদি, ঘোষণা কর। আমার মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পাপ, কলুষ রাশির কথা,যাহা জান, তাহা অবাধে, অসঙ্কোচে প্রকাশ্যে ঘোষণা কর। ঢাকাঢাকি, চাপাচাপি কিসের? কেন না, আমার দোষ আমি অনেকই জানি না—আমার দোষ সম্বন্ধে সদা আমি উদাসীন, আমি সদা আত্মভোলা। সত্য যাহা জান, তাহা ঘোষণা কর, আমার এবং এ জগতের বিশেষ উপকার হইবে। ভণ্ডামি ধরা পড়িবে—পৃথিবী নিষ্কৃতি পাইবে। তাহাতে ভয় ও সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। কিন্তু হায়, তুমি আমার অন্তরের কি জান? আমি অন্তরে যে হলাহল পান করিয়া নিত্য অহেতুকী ভক্তি এবং নিষ্কাম প্রেম হইতে বঞ্চিত হইতেছি, তাহার কথা তুমি বা সে কি জানিবে? আমি দেখিয়াছি,তুমি আমার গুণও জান না, দোষও জান না; আমার পাপও জান না, আমার পুণ্যও জান না। জান কি? জান, যাহা তোমার স্বরূপে আছে, কেবল তাহাই। প্রকৃত পরিচয় কি দুরবগাহ্য মানবজগতে কাহারও সহিত কাহারও কোন দিন হইয়াছে? যাহার সহিত নিত্য যোগ ছিল,খ্রীষ্টের এমন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুই তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল, নিত্যানন্দের ধর্ম্মহীনতার সংবাদ শুনিয়াই বুঝিবা শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান হইয়াছিলেন; পরীক্ষার দিনে বুদ্ধের পঞ্চশিষ্যই অগ্রে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, ম্যাটসিনির অকৃত্রিম বন্ধু গ্যারিবল্ডীই প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠায় তাঁহার ঘোর প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, পরম বন্ধু ব্রুটসই সিজরকে নিহত করিয়াছিলেন। কত দৃষ্টান্ত দিব? জানা শুনা,এ জগতে বড়ই কম হয়। এ যুগে দৈনিক শত শত ঘটনায় দেখিতেছি, আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। ইহার কারণ এই, কেহ কাহাকে প্রকৃতরূপ জানে না। না জানার এক কারণ, কপটতা, * আর এক কারণ, অহং লইয়াই মানুষ মত্ত। আপনার স্বরূপ ছবিই সে সর্ব্বঘটে, সকল বস্তুতে দেখিতে ভালবাসে। তোমার নিকট যাহা দোষ, আমার মাধ্য তাহা দেখিলেই তুমি আমাকে দোষী মনে কর, কিন্তু জানিও,

* জ্যোতিকণা—মহামিলন প্রবন্ধ দেখ।

আমি তাহাতে নিষ্পাপও হইতে পারি। হই বা না হই, তুমি জানিতে পারিয়াছ, আমার অতি অল্প। আমার দশবৎসরের জীবন আলোচনা করিয়া তোমাদের একজন বড় লোক আমার দোষের কথা এক সময়ে বলিতে আসিয়াছিলেন, সে সকল শুনিয়া আমি একজন বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, আমার অতি সামান্য দোষই তিনি জানিয়াছেন। যাহা জানিয়াছেন, তাহা যেন দোষই নয়। ইহা-পেক্ষা নিজ সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা অনেক বেশী মারাত্মক। জান বা কি, বলিবে বা কি? আমাকে তোমরা ভয় দেখাও কেন? সত্য বলিতে পারিলে আমার বিশেষ উপকার হইত, কিন্তু মিথ্যা কথা বই সত্য ঘোষণা করিবার তোমাদের অধিকার নাই, উপকরণ নাই, সাহস নাই। তাহা থাকিলে এত দিন ব্রাহ্মসমাজ খোসামুদীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইত—ভেদ-বোধ তিরোহিত হইত, ধনীর আদর খর্ব্ব হইত, নীতির জয়জয়কার হইত, সমালোচনায় তেজে পাপরাশি ভস্মী-ভূত হইয়া যাইত।

আমার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ইচ্ছা থাকিলে আমার নিকট আসিয়া আমার দোষগুলি জানিয়া যাইও। ঘৃণা করিয়া আসিতে চাও না? আমার সহিত কথা বলিলে তুমি নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে? তুমি বা তোমরা কথা বন্ধ করিলেই যেন আমার সর্ব্বনাশ হইবে! হায়রে বুদ্ধি!! না কথা বল, শুনিয়া রাখ, আমার ভিতরেও কিছু নাই, বাহিরেও কিছু নাই। আমি অন্তরে এবং বাহিরে—দুই স্থানেই মরা মানুষ। এই মরা মানুষকে মারিবার জন্য এত আয়োজন কেন ভাই?

আমি মরিয়াও একটা কাজের জন্য এই সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিতেছি। বুঝিবা বিধাতা সেই জন্যই আমাকে রাখিয়াছেন। সে কাজটুক শেষ হইলে বুঝিবা বিধাতা আর আমাকে রাখিবেন না। সে কাজটা কি—"শেষ কিম্বা সংস্করণ।" আমি যাহা কিছু ভাল-বাসি, তাহারই শেষ বা সংস্করণ চাই। আমার নিজকে ভালবাসি, ইহারও শেষ বা সংস্করণ চাই। পতঙ্গ মরিবার জন্যই অগ্নির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। হয় ভাল হইব, নয় মরিব। আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার দেশ, সব সম্বন্ধেই এই একথা—শেষ বা সংস্করণ। হয় পরিবার, দেশ ও সমাজ ভাল হইবে, নয় ডুবিবে। আমি এই মন্ত্র সাধনের জন্য আছি। বিধাতার আর কি বিধান, তাহা তিনিই জানেন। আমি রাজাকে ভয় করিনা, সমাজকে ভয় করি না, পরিবারের পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাদিগকেও কখনও ভয় করি নাই। আমার জীবন-কাহিনী যখন জানিবে, তখন ইহা বুঝিবে, আমি বাল্য হইতে কাহাকেও ভয় করিয়া চলি নাই। শিক্ষককে নয়—বাবাকে নয়, মাকে নয়, দাদাকে নয়—স্ত্রীকে নয়, বন্ধুকে নয়—গুরুকে নয়—কোন দল-পতিকে নয়। যাহা কখনও করিতে পারি নাই, তাহা আজ কিরূপে করিব? হয় শেষ বা সংস্করণ—বাল্য হইতে ইহাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। আমি একজনকে ভয় করিতে শিখিয়া আমূল-সংস্কার-মন্ত্রে বাল্য হইতে দীক্ষিত হইয়াছি। সে এক ভীষণ অগ্নি মন্ত্র। শুনিয়া রাখ—সে মন্ত্র "শেষ বা সংস্করণ।" বাল্য হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, হয় ভাল হইব, নয় মরিব। ঘোর প্রতিজ্ঞা, হয় ভাল হইব, নয় মরিব? ভাল হওয়ার পথে যত বাধা বিঘ্ন, বাল্য হইতে তাহা বিতাড়িত করিয়া ২ এই জীবন-সন্ধ্যায় উপ-স্থিত হইয়াছি। কাঁদিয়াছি ঢের, কষ্ট পাই-

য়াছি যথেষ্ট, অনাহার-ক্লেশ, নির্য্যাতন, তাড়না অনেক ভুগিয়াছি, কিন্তু মন্ত্র পরিত্যাগ করি নাই। বঙ্গজ সমাজের কত মহারথী এক সময়ে এই দাসের বিরুদ্ধে ছিলেন, ডরাই নাই। ব্রাহ্ম সমাজের কত শক্তিশালী ব্যক্তি এক সময়ে বিপক্ষে হইয়াছিলেন—ডরাই নাই। বিবাহ-সংস্কার প্রকাশিত হইলে আমার শিরশ্ছেদন হইবে, শুনিয়াছিলাম। যে বন্ধু এ সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি আজ স্বর্গে। কিন্তু আমি ডরাই নাই। ডরাইব কেন, ডরাইব কাহাকে? আমার গুরু একজন, নেতা একজন, চালক একজন, আশ্রয় একজন। তিনি বিমুখ না হইলে আমি ডরাইব কেন? তিনি যতদিন ইচ্ছা করিবেন, আমাকে বধ করিতে পারে কে? মারিয়াই বা অমর ব্রহ্ম-সন্তানকে কে কবে শেষ করিতে পারিয়াছে? আমি ঘৃণিত, মলিন, পাপী, যাহা হই না কেন, আমি যদি ব্রহ্মসন্তান হই, আমাকে কেহ মারিলেও আমি বিশ্বাস ভক্তিতে অমর হইয়া এ জগতে থাকিব। বিধাতার প্রেরণায় আমি যে যে কথা বলিয়াছি, বা যে কাজ করিয়াছি,তাহার প্রাণ হইয়া আমি চিরদিন জীবিত থাকিব। আর অমর নিত্যানন্দ ধামে? পদাশ্রিত দাসকে কৃপাময় পরিত্যাগ করিবেন কি? আমি ভিতরে এবং বাহিরে মৃত—কিন্তু এক সঞ্জীবনী শক্তির, এক অমোঘ ঔষধের,—এক দুর্লঙ্ঘ্য শাণিত অস্ত্রের পরিচয় পাইয়াছি, যে শক্তি, যে ঔষধে,যে অস্ত্রে জীবন পাইব, আশা আছে। আমার কোন শক্তিই নাই, যাহাতে মৃত, দুর্ব্বল, অসহায়, নির্ধন আমি আত্মরক্ষা করিতে পারি। তবে ব্রহ্ম-শক্তি, ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্ম-কৃপা, শ্রাবণের বর্ষার ন্যায়, আমার মাথায় দিন রাত্রি বর্ষিত হইতেছে। ঐ স্রোত নিবারণ করিবার তোমাদের সাধ্য থাকে যদি, তবেই আমার শেষ করিতে পারিবে। ব্রহ্ম-কৃপা প্রতিনিয়ত আমাকে প্রাতঃ সন্ধ্যায় স্নাত ও পূত করিয়া আশ্বাস দেয়, ভয় কি, তোর সংস্করণ হইবেই! আশ্বাস দেয়, আমি মরিয়া থাকিলেও পুনঃ বাঁচিব। আশ্বাস দেয়, আমি ডুবিয়া থাকিলেও উদ্ধার পাইব! আমার শক্তি নয়,তাঁর শক্তিতে আমি মাতোয়ারা,—তাঁর শক্তিতে আমি সঞ্জীবিত—তাঁর শক্তিতে অনুপ্রাণিত। প্রতিদিন ক্ষুধার সময় তিনি অন্ন দেন, পিপাসার সময় জল দেন, শীতের সময় উত্তাপ দেন,রোগের সময় ঔষধ দেন। তুমি সে শক্তি মান না, তুমি অবিশ্বাসী। কি খাইব, কি করিব, কি পরিব, প্রতিদিন তিনিই তাহা এ দাসের কাণে কাণে বলেন। ব্রহ্মবাণী অবিরত আমাকে আত্মজয়ের মন্ত্রে—অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছে। মিথ্যাবাদী কাপুরুষ, তোমাকে আমি ভয় করিব? সূর্য্যের রশ্মি, চন্দ্রের জ্যোতি এবং বিশ্ব-বিস্তৃত বায়ুর সহিত ব্রহ্মকৃপা আমাকে সর্ব্বদা আলিঙ্গন করিতেছে। নির্ব্বাসনে বা দ্বীপান্তরে, কারাগারে বা বধ-কাষ্ঠে—সর্ব্বত্রই ঐ কৃপা। আমার কে কি করিবে? আমি ব্রহ্মদাস। বাড়ীর ইষ্টকে ইষ্টকে,শরীরের রক্ত বিন্দুতে বিন্দুতে তাঁহার কৃপা। আমি যদি আমার শক্তিতে উঠিতে পারিতাম বা উঠিতে চেষ্টা করিতাম, আমার আত্মরক্ষার উপায় ছিল না। আমি নগণ্য, ঘৃণিত, মলিন, পতিত, দুর্ব্বল, অসহায়। এক শক্তি, এক ধ্যান, এক জ্ঞানে আমি আশ্বাসিত। ভণ্ড কাপুরুষ, তোমাকে ভয় করিব?

হয় থাকিব, নয় যাইব। থাকিত ভাল হইয়া থাকিব। এজন্য কঠোর সাধন নিত্যই করিতেছি। এজন্য নিত্যই বিপুল পরিশ্রম

করিতেছি। যে দেশে জন্মিয়াছি, যে পরিবারে আছি, যে সমাজের দ্বারা উপকৃত এবং যে রাজার সুশাসনে উন্নীত, এ সকলের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করিতেছি, খাটিতেছি, দেহপাত করিতেছি। অন্য কামনা নাই, অন্য বাসনা নাই। শেষ বা সংস্করণ-মন্ত্রে আমাকে বিশ্বপতি দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহারই উত্তেজনাতে, কৃপাতে, দয়াতে নিত্য অনুপ্রাণিত হইয়া, নৈরাশ্যে আশা, অন্ধকারে জ্যোতির স্বপ্ন দেখিতেছি। সেই অজানিত মহানই জানেন, কিসে কি হইবে। আমি কেবল তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার প্রেরণায় খাটিয়া২ দেহপাত করিব। অ মার অন্য বাসনা, অন্য কামনা, অন্য ইচ্ছা নির্ব্বাণ হউক, আমি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্মবর্জ্জিত, অনাসক্ত, নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত, নির্ভয় হই। মা এই অগ্নি-মন্ত্র সাধনায় মহা শ্মশানে আমার সহায় হউন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

মঙ্গলোপহার। *

১

বধূ-বরণ।

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্‌াং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবষু॥

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে হও, সমরাজ্ঞী শাশুরীর।
দেবরে সম্রাজ্ঞী হও, সমরাজ্ঞী ননদীর॥

মনে তো থাকিবে, রাণী,
ঋষির ও মধু বাণী—
এ গার্হস্থ্য সাম্রাজ্য তোমার;
দেখো মা, না যেন শোষে
দুরভিক্ষ অসন্তোষে,
হোয়ো লক্ষ্মী, হোয়ো রাজ্ঞী তার!
দুনিয়ায় বাদশাহী
এমন তো আর নাহি,
হোক্ রূম্ হোক্ হিন্দুস্থান;
দেখেনি মৃদঙ্গ-ঘায়,
কল্যাণে কানাড়ায়,
এ মুলুক মিঞা তানসান।
রেখো মা হৃদয়ে লিখা
এ হিরণ্য হোম-শিখা,
এ অমর মনন্ত তোমার;
তোমাতে মূরতিমতী
হোক্ পুরাতন শ্রুতি,
এ জীবনে দেখি একবার!

* পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত জগদাচরণ সেনগুপ্ত এম্-এ, মহাশয়ের শুভবিবাহে রচিত।

১

গীত।

বিবাহে

রাগ বসন্ত—তাল তেতালা।

কে তুমি এলে, বধূ, ল'য়ে বসন্তে,
এ বিজন যৌবন যমুনারি বক্ষে।
চল চুড়ী মঞ্জীর জলতরঙ্গের মীড়,
কাটে হিয়া গুমরিয়া কাফি বসন্তে।
কনক কলসী তায় ছুঁও ছুঁও কলিজায়,
আর তো না সামালে সে অঙ্গে অঙ্গে॥

বাসি বিবাহে

রাগ সিন্ধুভৈরবী—তাল তেতালা।

বাসি বিয়ে কও, নারী, শুনে' হাসি পায়।
বিবাহ যে ভালবাসা সে কি বাসি হয়।
চাঁপা, চামেলী গুলে বসন্তেরে বেঁধে চুলে,
দলিয়া মলিয়া হেলে কর তারে ক্ষয়,;
সে তো কাণের খাসে শুষিতে শুষিতে হাসে,
সে আতর-স্নেহ হারে সে কি কভু যায়॥

ফুলশয্যায়

রাগ ছায়ানট—ঠুমরী।

হের জাগে কার হরিণ নয়নী
ফুলশয়নে সুখ রয়নী রে।
ফুলে ফুলে ভুল, আঁখি না পাএ কূল,
ফুল সায়রে ফুল নাগরী রে।
চকোর চাঁদিনায় ক্বরিছে হায় হায়,
হাসে বিধু বিধু-বয়নী রে॥

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

কি দিব মা ভারতী তোমায়!

(শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে)

১

আজি ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে উদয়-অচলে
কি মধুর প্রীতি আবাহন,
কি মহিমা-বিমণ্ডিত চারুনীলাম্বর
জ্যোতির্ম্ময় প্রভাত পবন ;
শিহরি উঠিছে প্রাণ আনন্দে অধীর
বসুন্ধরা আনন্দে সুধায়,
কি দিব মা ভারতী তোমায়!

২

ওই উর্ম্মিমালী উন্নামিত কিরণ-আয়ুধে
ফেনময় অনন্ত অঙ্গন,
অট্ট অট্ট মহাহাস্যে উদ্দাম তাণ্ডবে
উন্মাদিত করে প্রীতি রণ ;
আজি দীন বঙ্গাসরে বসন্ত পঞ্চমী
সুরভিত লবঙ্গ লতায় ;—
কি দিব মা ভারতি তোমায়!

৩

ওই ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘমালা রবি ভাঙ্গা ভাঙ্গা
ঢল ঢল তরল শিশির,
নাচিছে কাঁপিছে ধীরে প্রসূনে প্রসূনে
শূন্য প্রাণে আনন্দ অধীর ;
তরঙ্গিত চরাচর ভাবের তরঙ্গে
উন্মাদিত নব মলয়ায়,
কি দিব মা ভারতি তোমায়।

৪

আজি আয় সবে আয় কেতকী মালায়
রসাল-মঞ্জরী থরে থরে,
মাধবী লতায়, যুঁই, মল্লিকা, গোলাপে
তোরণ সাজাই ধীরে ধীরে,
আজি নব ফুল্ল আন চারু সরোজিনী
ভকতি-অঞ্জলি নিয়া আয়,
আজি প্রাণ ভরি আন মরম-কবিতা,
কি দিব মা ভারতি তোমায়!

৫

আজি কানন-কিন্নর— বিহগের বীণা,—
নিয়ে আয় ছত্রিশ রাগিণী,
আজি বিদ্যাধরী কণ্ঠ— নটিনী-কিন্নরী
নিয়ে আয় গীতি নির্ঝরিণী ;
আজি অবসাদ, ব্যথা ভাবনা ভুলিয়া
একপ্রাণ সবে মিলি আয়!
গলায় গলায় আজি আনন্দে আনন্দে
কি দিতে মা ভারতি তোমায়!

৬

ওমা দিব কি তোমায় দীন দুঃখী মোরা,
কোথা পাব কাব্য-পদ্মাসন!
স্বর্গীয়া জননী বাণী দরিদ্রের গৃহে
উর মা এ দরিদ্র আসন ;
হৃদয়-অঞ্জলি মাগো, নয়নের জল
কবিতার উৎস রাঙ্গা পায় ;
নিগম জননী মাগো স্নেহে নেও আজ
কি আছে মা কি দিব তোমায়!

৭

রবি-শশী কুলে দেখ জোনাকি সংহতি
একি ওমা সেই আর্য্যদেশ?
সেই অযোধ্যা উজ্জীন নর্ম্মদা, যমুনা
একি মাগো সেই ভস্মশেষ?
সেই নিগম-তরঙ্গে উদ্বেল উছল
একি সেই সরস্বতী নীর?
সেই অমর বীণার মোহন ঝঙ্কার
কণ্ব মুনি আশ্রম গভীর!
একি ব্রজ কুঞ্জবন, মধুর মুরলী
গুঞ্জিত নিকুঞ্জ মলয়ায়!
কোথা জয়দেব, হর্ষ মুকুন্দ, ভারত
কি দেখাব ভারতি তোমায়?

৮

নাই সে নৈমিষারণ্য বিন্ধ্য, নীলাচল,
গোদাবরী তরঙ্গ-কল্লোল,
দ্বৈপায়ন্ বাল্মীকি, মাঘ, ভবভূতি
সঞ্জীবনী মাধুরী তরল,
মৃত ভক্ত তরে তোর পুলিন-শালিনী
কাঁদিছে মা কাবেরী, যমুনা,
ধূ ধূ ধূ অনন্ত লক্ষ্যে ধূ ধূ ধূ অনন্ত কাল
কাঁদিছে মা বিষাদ মলিনা ;
কাঁদিবে মা আজীবন গীতস্রোতে ডাকি
উতরোলে বসুধা ভাসায়,
উত্তপ্ত সুদাম শ্বাসে অতীত কাহিনী গাহি
ভারতি মা পূজিবে তোমায়!

৯

অমর কাব্য-কীর্ত্তন শত মৃত কত
মৃত রাজ্য ভগ্ন রাজ্য গান,
ভগ্ন দুর্গ গাথা গাহি সৈকত-শালিনী
জুড়াইবে শত ভগ্ন প্রাণ ;
আজীবন—আমরণ ভারত-সুন্দরী
সেই ভস্ম কুড়ায়ে রাখিয়া,
ভবিষ্য পথিক তনু মোহ অঙ্গরাগে
বিলেপিত করিবে বসিয়া ;
সেই স্বপ্ন-স্মৃতি-গীত জলদ-গম্ভীরে
ভবিষ্যের কর্ণে যাবে গাহি,
সে গীত শুনিয়া কত ধীরে চক্ষু মুছি
নব-যাত্রী উঠিবেক চাহি ;
অনন্তের উচ্চ লক্ষ্যে আত্ম বলি দিয়া
কত ভক্ত ভজিবে তোমায়,
নির্ম্মাল্য-কুসুম-ভার স্নেহ কর ভরি
ভারতি মা আজ নিয়া আয় !

১০

কত ছিন্ন মৃত প্রায়, রুগ্ন, ধরাশায়ী
কত লতা উঠিবে ফুটিয়া,
কত ক্ষীণ আশাহীন, ঝঞ্ঝানিলে আহা,
মৃত দীপ উঠিবে স্ফুরিয়া;
কত ক্ষুদ্র প্রাণকুঞ্জ বীণার ঝঙ্কারে
বিপ্লাবিবে ভারত-পৃথিবী,
'ভূত হবে ভবিষ্যৎ' হবে কি সে দিন ?
কাব্যাকাশে উঠিবে কি রবি ?
বিশ্ব হবে প্রেমময় সে অমর গীতে
বসুন্ধরা ভাসিবে সুধায়,
সে দিন ফিরিবে কবে বল মা ভারতি
দীন মোরা কি দিব তোমায় ?

১১

সাহিত্য-আকাশে মাগো রবি চন্দ্র কবে
উদিবে রোহিণী চিত্রা আর ?
কুহেলি তাড়িত-নীল নীরেন্দ্র-প্রতিম
উজ্জ্বলিবে ভারত আবার ,
আনন্দে বহিবে মৃদু জাহ্নবী, যমুনা
বেদ মন্ত্রে জাগি ধীরে ধীরে,
নির্ম্মল গগনে ইন্দু গাহিবে প্রণয় গীত
ডুবি শুভ্র লহরে লহরে ;
বিমণ্ডিতা নীলাম্বর কবিতা-প্রসূন
ত্রিবেণীর স্নেহ-স্বর্গে ভাসি,
কভু ডুবি কভু উঠি জ্যোৎস্না ছড়াই
পুনঃ মাগো উঠিবে কি হাসি ?

১২

আজি বসন্ত পঞ্চমী দীন বঙ্গাসরে—
আনন্দ উৎসব দীনের কুটীরে,
আনন্দিত যত সব সোহাগিনী,
আনন্দিত যত কুসুমের রাণী,
আনন্দ সঙ্গীত গায় ধীরে ধীরে,
উর মা আজি মা দীন বঙ্গাসরে
বাণী, বাগ্বাদিনী, দেবী বীণাপাণি !
শুভ্র-বরণা শ্বেত পদ্মাসনা
উর মা আজি মা ত্রিলোক-জননি !
এ দীর্ঘ বরষ কত আশা গানে—
কত ভর পূর স্নেহ-সুধা দানে,
কত মা ব্যথিত মার অদর্শনে,
উর মা আজি মা বসন্ত পঞ্চমী
মনোপদ্মে শ্বেত পদ্মাসন !
নয়নের তপ্ত বারি ভক্তি গঙ্গাস্রোত
কর ওমা অঞ্জলি গ্রহণ ! !

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

প্রার্থনা।

শুধু ক্ষণেকের তরে আজ্ঞা করপ্রভো,
অভিনয় হোক্ ;—
জ্বলুক এ বঙ্গে রক্তরশ্মিঝলসিত
প্রলয়-আলোক।
রুদ্ররোলে বঙ্গসিন্ধু আসুক গ্রাসিতে
লক্ষ ফণা তুলি ;
মহাধৈর্য্য ভাঙ্গি' আক্রোশে জাগুক পৃথ্বী
ডগমগে দুলি'।
নভশ্চর নীরেচর অস্থিম-আতঙ্কে
উঠিবে বিলাপি,'
অনুতপ্ত ভীত নর দৈব-অভিশাপে
মুহুর্মুহুঃ কাঁপি !

শেষে সংহারিয়া, আদেশিয়ো, সাগরেরে
হইতে সুধীর,
কালাগ্নিরে শোভিতে সুন্দর, সুশীতলে
বহিতে সমীর।
সেই সিন্ধু অভয় উচ্চারি দেখাইবে
অগাধ সম্পদ

পুণ্যালোকে খুলে যাবে অনন্তের পানে
মহত্ত্বের পথ।
ছাই হবে শতগ্রন্থি সংহিতা সংস্কার
অক্ষম শাসন;
তুচ্ছ সুখ ক্ষুদ্র শান্তি হবে প্রক্ষালিত
অদৃষ্ট-বয়ন।
অসীম স্ফূর্তিভরে সে শুভ বিপ্লবে
জাগ্রত সবাই;
নাই অভিমান স্বার্থ দ্বিধা দ্বন্দ্ব দ্বেষ,
ছুরন্ত বালাই!

মৃত্যু মন্ত্রে সংহারিল যুগব্যাপি'
কঠিন জনতা।
মুক্ত ধরণীর ক্রোড়ে তূর্ণ বেড়ে উঠে
চৈতন্য জড়তা।
মহাবেগে সিংহদ্বার কর্ম্মক্ষেত্রমুখে
গেল উন্মোচিয়া,
বাহিরিল বঙ্গের সন্তান ঐক্যবলে
দুরন্ত হইয়া।
নবোৎসাহে সমর্দ্ধিত গঠিয়া তুলিল
আশার তরণী,
বায়োত্থিত ভগ্ন-পালে ভাসাইল তরী
ভ্রমিতে ধরণী।
একেবারে শত শত কবি ঝঙ্কারিল
সঙ্গীত মহান্—
নমোনমঃ কাঙ্গালিনী মাতঃ জন্মভূমি!—
সঞ্জীবিল প্রাণ!
ওঠে গীত—আগে চল্ দলি' ভীতি বাধা,
বয়ে যায় বেলা;
আছে উচ্চতর লক্ষ্য; মানব-জীবন
নহে ছেলেখেলা।
ছুটে সবে কোথা কাব্য দর্শন বিজ্ঞান
—বলে আরো চাই;
ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য শিল্পে নবোজ্জ্বল বেশে
মায়েরে সাজাই।
মরু অদ্রি, সিন্ধু পার হয়ে ভাগ করে আনি
যথা সাধ্য যার;
যদি চিরে রক্তটুকু দিয়া পূজাঞ্জলি
শোধি স্তন্যধার।
উচ্চ নীচ অন্ধ খঞ্জ, বলিষ্ঠ, সুন্দর—
গেছে তর্ক ছেদ;
মরণের কাছে লভিয়াছে মহাশিক্ষা—
মিছে বর্ণ ভেদ।

ধনীর সন্তান হের, রুগ্ন ভিক্ষুগৃহে
লিপ্ত শুশ্রূষায়;
ধর্ম্মভীরু দিতেছে সান্ত্বনা বক্ষে টানি'
পতিত ভ্রাতায়।
ফিরে আসে বঙ্গের সন্তান মাতৃমুখ
উজ্জ্বল করিয়া;
ফিরে আসে মহিমামণ্ডিত, যশোরশ্মি
ললাটে ধরিয়া।
কত কীর্ত্তি কত বৃত্তি দেশ দেশান্তরে
করিল অর্জ্জন;
কত পুণ্য কত শক্ত শৌর্য্য সাধ্য সাধ্যে
করিল পূরণ।
গৌরব-পতাকা সারি আনন্দকম্পিত
উধাও গগনে;
নমোনমঃ বঙ্গভূমি—কোটি কোটি কণ্ঠে
ধ্বনিত সঘনে।
ফুলাসার বর্ষে নারীগণ, অর্দ্ধস্ফুটে
শিশু গায় জয়;
মঙ্গল কলস পূর্ণ গৃহে গৃহে আজ
নির্ভয় হৃদয়।
একদিনে অন্তর্হিত অতীতসঞ্চিত
সলজ্জ দীনতা;
গর্ব্ব-স্ফীত মাতৃ-আশীর্ব্বাদ প্রচারিল
আরেক বারতা।
—একি হায়, স্বপ্ন শুধু? মায়াবিসর্পিত
ব্যাকুল জল্পনা?
রবে জাগি' পরিচিত ব্যথা, ভেঙ্গে দিবে
সোণার কল্পনা!
তবে অন্তর্যামি, সত্য সত্য নাশ বঙ্গ,—
বীর্য্যের কাঙ্গালী;
হের স্নেহ-রোষে দেব, হাসে মূঢ় যত
নির্লজ্জ বাঙ্গালী!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

ভালবাসা।

১

কেন হিয়া মেহে তরা জানিনা উত্তর,
ভালবেসে সুখ পাই
এত ভালবাসি তাই,
চাহিনাক প্রতিদান চাহি না আদর

চাহি না পরশ তার,
শুধু চাই অনিবার
অবাক্ হইয়া হেরি মুখ-শশধর।
নলিনী বিভল প্রাণে
চেয়ে থাকে নভোপানে,
কতদূর দূরান্তরে রহে দিনকর।

২

পুরশ চাহে না কভু প্রেমিক অন্তর,
রবি পানে চেয়ে চেয়ে,
সরলা সুশীলা মেয়ে—
সূর্য্যমুখী, ভব-খেলা ভাঙে অতঃপর।
শুধু দরশন আশে,
কুমুদ সলিলে ভাসে,
কোথা কুমু' কোথা নভো কোথা শশধর।
পরশে কি আসে যায়,
দরশে দেবত্ব তায়,
শুধু দরশন আসে দেবে পূজে নর।

৩

জানি না স্নেহেতে ভরা কেন যে অন্তর,
কেন তারা নৈশাকাশে,
যমুনা উজানে ভাসে,
নীল সিন্ধু-বুকে কেন খেলে শশধর!
কেন গাছে ফুটে ফুল,
কেনবা বিহগ কুল,
উষায় মানবে ডাকে তুলি'মৃদু স্বর।
পার কি উত্তর তার,
দিতে কেহ একবার,
আমি ত খুঁজিয়া তার পাইনি উত্তর।

৪

কেন ভালবাসি তবে কি দিব উত্তর,
নীরবে হৃদয় চাই
কেবল উত্তর পাই
ভালবাসা ডোরে বাঁধা বিশ্ব চরাচর।
ভালবাসা সুবিমল
নাহি তাহে হলাহল,
দেবতা তাহাকে পূজে করিয়া আদর।
ভবে যে দেবতা-প্রায়,
চিত ঢালা ব্রহ্ম পায়,
ভালবাসা সুধামাখা তাহারো অন্তর।

৫

জানিনাক কেন ভালবাসি নিরন্তর,
শুধু জানি ভালবাসি
নিতি ঢালি প্রীতি রাশি
সেই আমি আমি সেই নহে স্বতন্তর।
ভেবে দেখ একবার,
ভালবাসা রাধিকার
ভাব সেই আত্ম-ত্যাগ কত মনোহর।
ভালবাসা মাঝে হায়,
দেব ছটা ব'য়ে যায়,
কেন ভালবাসি তার নাহিক উত্তর।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

অসাধারণ দাস দুর্গামোহন।

(জন্ম—৩রা অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ সাল, বিক্রমপুরের অধীন তেলিরবাগ; মৃত্যু—৪ঠা পৌষ, শনিবার, ১৩০৪—বেলতলা।)

মানুষ, সব সময়ে মানুষ থাকে না,—কখন দেবত্বে উন্নীত এবং কখনও বা পশুত্বে নমিত হয়। মানুষ যখন স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত, তখন তাহাকে দেখিবে, মদ খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া ধূলায় ধূসরিত হইতেছে, স্বৈরিণীর পদতলে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ অন্বেষণ করিতেছে, কি জঘন্য কাজ যে না করিতেছে, হিসাব নাই। এই মানুষই আবার পরার্থপরতা, বা পরমার্থের শক্তি সংঘর্ষণে আসিলে, নিমগ্ন লোকের উদ্ধারার্থ জীবন-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে। কাহাকে বলিবে, খারাপ এবং কাহাকে বলিবে ভাল? চাঁদেও কলঙ্ক আছে, ফুলেও কণ্টক আছে; তিক্ত নিমেও জগতের কত উপকার, কুৎসিৎ কোকিলেরও কেমন মধুর স্বর। বিধাতার লীলা রহস্য ভেদ করা বড়ই কঠিন নয় কি?

সব মানব আবার সমান নয়; কতক সাধারণ, কতক অসাধারণ। শক্তি বিশেষে প্রতি মানুষই অন্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, কিন্তু সময়ে সময়ে শক্তি সমষ্টি আত্মসাৎ করিয়া কেহ কেহ অসাধারণত্ব লাভ করিয়া জগৎকে চমকিত করেন। যার যেমন ধারণ করিবার শক্তি, সে সেই পরিমাণে শক্তি আত্মসাৎ করিতে সক্ষম। নদীর জল সকলের জন্যই, কিন্তু যাহার পাত্র বড়, সে অধিক জল গৃহে তুলিতে সমর্থ। চেষ্টার তারতম্যে পাত্র বড় ছোট হয়;—শক্তি-ক্রীড়ায় মানুষের শক্তি বাড়ে। অনুশীলনের তারতম্যে মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস হয়। চর্চ্চা, মার্জ্জনা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, অনুশীলনের সহায়। অনুশীলনের লক্ষ্য—স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরমার্থে আত্ম নিমজ্জিত করা। পরমার্থে আত্ম যখন নিমজ্জিত হয়, তখনই মানুষ দেবত্বে উন্নীত,—অন্য সময়ে মানুষ পশুর ন্যায় বা জড়ের ন্যায়।

তুমি, আমি, সে, আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের স্বার্থ বিসর্জ্জিত এবং পরমার্থ সঞ্জীবিত হইলে আমরাও অসাধারণ হইতে পারি, সে কথা এখন থাকুক। আমরাও সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে কোন শক্তিবিশেষের অধিকারী হইয়া হয় ত শ্রেষ্ঠ হইতে পারি, কিন্তু সে কথাও থাকুক। ঘটনা—প্রত্যক্ষ ঘটনা একালে ঘোষণা করিয়াছে, এদেশে কেশবচন্দ্র অসাধারণ, বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ, বিদ্যাসাগর অসাধারণ, মহারাণী স্বর্ণময়ী অসাধারণ ছিলেন। এ কথার প্রতিবাদ যদি কর, সত্যের অপলাপ হইবে, হিংসার পরিপোষণ হইবে। স্বার্থ ভুলিয়া পরমার্থের চস্‌মা চক্ষে লাগাইয়া চাহিয়া দেখ, বুঝিবে, ইঁহারা অসাধারণ কি না।

মানুষের কতকগুলি সাধারণ জিনিস আছে, কতকগুলি অসাধারণ জিনিস আছে। সাধারণের উৎকর্ষ সাধিত হইলে স্বার্থের উদয় হয়, অসাধারণের উৎকর্ষ সাধিত হইলে পরমার্থের উদয় হয়। প্রেয় এবং শ্রেয়, অসৎ এবং সৎ, দুইই মানুষে আছে। দেবাসুরের সংগ্রাম প্রতিনিয়তই মানব-জীবনে চলিতেছে। আসুর শক্তিকে যিনি পরাজয় করিয়াছেন, তিনিই অসাধারণ। অসাধারণের আদর্শ ধরিয়া যিনি চলেন, তিনিই কালে অসাধারণ হন।

আমরা সাধারণ সমাজের মধ্যে থাকিয়া, সাধারণ সাধারণ করিয়া দিবারাত্রি ছুটিতেছি, খাটিতেছি, মরিতেছি। সাধারণ সাধারণ করিতে করিতে আমাদের লক্ষ্যও যেন খাটো হইয়া যাইতেছে, মন্ত্র ছোট হইয়া উঠিতেছে, উদ্দেশ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে—আমরা যেন দিন ২ সর্ব্ব বিষয়ে মহান অনন্ত হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইতেছি। আমরা মানুষের সন্তান, মানুষই থাকিয়া যাইতেছি। আমরা দিন ২ স্বার্থ-সাধনে ডুবিয়া যাইতেছি। হইলামই বা সাধারণ মানুষ, আমরা যে অসাধারণের সন্তান, তাহা কি মনে রাখিতে নাই? হইলামই বা সাধারণ, আমরা যে ঈশা-মুশা, মনু যাজ্ঞবল্ক্য, নানক গৌরাঙ্গের বংশের লোক, মনে রাখিতে নাই কি? লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গতি সবই যে আমাদের অসাধারণের দিকে, অনন্তের, দিকে, মনে রাখিতে নাই কি? কেবল সাধারণ, সাধারণ, সাধারণ!—এমন ভুল ভ্রান্তি ত আর মানুষের দেখি নাই! যাহা আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট—যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট—যাহা মিলিয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট। নূতনের কথা বলিও না,—যাহা পাইয়াছ, তাহাতেই তৃপ্ত থাক! সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষা, সাধারণ ভাব ও জ্ঞানচর্চ্চা, সাধারণ প্রেম ও প্রণয়-সাধন, সাধারণ ভজন সাধন, সাধারণ

বিশ্বাস ভক্তি অর্জ্জন ;—পূজা অর্চ্চনা, যোগ তপস্যা, আচার ব্যবহার, সকলই সাধারণ রকমের। ব্রাহ্মসমাজ একটুও প্রচলিত সমাজের বা মতবাদের উপরে উঠিবে না। চতুর্দ্দিকে যে চিত্র, এখানে যেন তাহারই পুনরাভিনয় হইতেছে—পৌনঃপুনিক লীলাভিনয় হইতেছে। অসাধারণের সন্তান আমরা অসাধারণ হইব না—হইতে চেষ্টাও করিব না!—এ কি মহাভ্রান্তি!!

সাধারণ সমাজকে এক অসাধারণ বীর জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম অমর দুর্গামোহন দাস। তিনি সাধারণকে জয় করিলেন কিরূপে? তিনি জানিতেন, সাধারণ যাহা, তাহা চিরকাল সাধারণ। তিনি জানিতেন, সাধারণের উপর টাকার ক্ষমতা এ জগতে অসীম। এক সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন কোন এক বন্ধু ব্রাহ্মসমাজের মত-বিরুদ্ধ গর্হিত কার্য্য করিয়া অপদস্থ হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দুর্গামোহন বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, দুই হাজার টাকা খরচ করিলেই তোমরা ব্রাহ্মসমাজে উঠিতে পারিবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ টাকার দাস, উপরোক্ত কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি এ কথা বিশ্বাস করিতেন। তিনি নিজে অজস্রধারে সমাজের কল্যাণের জন্য টাকা ব্যয় করিতেন বটে, কিন্তু কখন কখন গোপনেও করিতেন। এজন্য মনে হয় না যে, টাকা দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে জয় করার কলুষিত ইচ্ছা তাঁহার ছিল। অলক্ষিতভাবে যদি টাকা কোন রূপে ব্রাহ্মসমাজ-জয়ের সহায়তা করিয়া থাকে, সে কথা আমরা বলিতে চাহি না। তবে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে কিরূপে জয় করিলেন? সকলেই জানেন, তিনি শেষ বয়সে পুনঃ বিবাহ করিয়া কলঙ্কের বোঝা মস্তকে বহিয়াছিলেন। তিনিও জানিতেন, কাজটা ভাল করেন নাই। শুনিয়াছি, বিবাহের পর লোকে গালাগালি দিলে হাসিয়া বলিতেন, "আরে ভাই, কাজটা করেছি কিরূপ, গালাগালি দিবে না?" * তাঁহার বিবাহের পর এদেশে, ব্রাহ্মসমাজে—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও, তুমুল আন্দোলন উঠে। বীর দুর্গামোহন সে দিকে দৃক্‌পাতও করেন নাই। লেখালেখি, বলাবলি অনেক চলে—অনেক মনোমালিন্য ঘটে—যত নীচতা সম্ভব, তাহার অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই—দুর্গামোহন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি বরিত হইলেন। ইতিহাসের এক মহাব্যাপার। আন্দোলনকারীদিগের মুখ চুণ হইয়া গেল। অসাধারণের ইচ্ছাশক্তি, সাধারণ ইচ্ছাশক্তিকে এইরূপে জয় করিল। সাধারণের সাধারণত্ব এবং অসাধারণের অজেয়ত্ব এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

এই অসাধারণের সহিত আর এক অসাধারণের সংঘর্ষণ হইয়াছিল, মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি আপনার অজেয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি পুণ্যশ্লোক কালী নারায়ণের পত্নী, তিনি ঋষিতুল্য গিরীশচন্দ্রের ভগ্নী, তিনি অসাধারণ দুর্গামোহনের শেষ পক্ষের শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী। তাঁহার সাত্ত্বিক জীবনে আর এই কন্যা বা এই জামাতার সহিত মিলন হয় নাই। মহীয়সী অজেয়া শক্তিধারিণী মাতৃমূর্ত্তি।

সাধারণকে জয় করিবার শক্তি দুর্গামোহনের বাল্যকাল হইতেই ছিল। বাল্য-ইতিহাস, যৌবন-ইতিহাস, প্রৌঢ় বা বার্দ্ধক্যের ইতিহাস—সব অনুসন্ধান কর, এই

* তত্ত্ববোধিনী—১৬ পৌষ, ১৮১৯ শক, ২১৩ পৃষ্ঠা।

অসাধারণত্বের পরিচয় পাইবে। অসাধারণ বুদ্ধি, অসাধারণ প্রতিভা, অসাধারণ সাহস, অসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতা। বাল্যে শিক্ষা এবং বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, দুর্গামোহনের অসাধারণ। যৌবনে বিমাতার প্রতি কর্ত্তব্য-পালন, দুর্গামোহনের অসাধারণ। এজন্য দুর্গামোহনকে বরিশালে কত লাঞ্ছনা, কত উপহাস বা বিদ্রূপ-বাণ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তদানীন্তনকালের বরিশালবাসী মাত্রেই তাহা জানেন। বিমাতার বিবাহ দিয়া দুর্গামোহন যে অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। তারপর, তারপর?—প্রৌঢ়ে পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। তারপর—তারপর? বার্দ্ধক্যে অপযশের মুকুট মস্তকে পরিয়া আপনার শেষ বিবাহে যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাও অসাধারণ। কিন্তু এ সকলের জন্য তিনি সকলের নিকট তত পূজ্য নাও হইতে পারেন, তাঁহার অসাধারণ কীর্ত্তি, দরিদ্রে দয়া, কাতরে করুণা, ব্যথিতে সান্ত্বনা প্রদান। অসাধারণ প্রতিভা এবং বুদ্ধিবলে তিনি যে প্রভূত ধনরাশি সঞ্চয় করিতেন, অম্লানচিত্তে তাহা দীন দরিদ্রদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। শব জীবনে, পরিণয়ের পর, তাঁহার এই অসাধারণত্ব, স্বার্থময় সাংসারিকতার প্রতিঘাতে কিছু খর্ব্ব হইয়াছিল, সন্দেহ নাই,—কিন্তু বাল্য হইতে প্রৌঢ় পর্য্যন্ত পরদুঃখকাতরতাশক্তিতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। আমরা একটী পয়সা খরচ করিতে যত ভাবি, সাক্ষ্য দিতেছি, দুর্গামোহন ১০৲ কি ২০৲ টাকার নোট ব্যয় করিতেও ততটুকু চিন্তা করেন নাই। আমাদিগের মধ্যের একজনের কথা অধিক বলা ভাল নয়, কিন্তু কি করি, সত্যের খাতিরে অম্লানচিত্তে আজ বলিতে হইতেছে, দয়া এবং সংস্কার-ব্রতে দুর্গামোহন ব্রাহ্মসমাজের বিদ্যাসাগর।

আমি দুর্গামোহনের একজন প্রকৃত ভক্ত। একথা বলিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, আমি তাঁহার বিবাহ অনুমোদন করিয়াছি। তাঁহার শেষ বিবাহে আমি মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। বিশ্বাস করি, এ বিবাহ না করিলে তিনি আরো দীর্ঘজীবী হইতেন। তিনি আপনিও এ বিবাহকে আদর্শ মনে করিতেন না। শুনিয়াছি, কোন বন্ধুকে এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি রিপু সংযম করিতে পারি না বলিয়া আমার বিবাহের প্রয়োজন, কিন্তু তাহাতে বন্ধু বান্ধবের আনন্দ করিবার কি আছে?"—ইহা প্রকৃত মহৎ লোকের উক্তি। এই বিবাহ দুর্গামোহনের জীবন চন্দ্রমার একমাত্র কলঙ্ক। কিন্তু এ সম্বন্ধেও তিনি অধিক দোষী, কি কোন কোন বন্ধু, কিম্বা তাঁহার কোন কোন আত্মীয় অধিক দোষী, আমি জানি না। পূর্ব্বে তিনি যে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই বিবাহ হইলে, বুঝিবা এ কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। কিন্তু সে সকল ইতিহাসের আলোচনার আর সময় নাই। দুর্গামোহন সমাজ-সংস্কারের অদ্বিতীয় নেতা—যাহা যখন ভাল বুঝিয়াছেন, তাহা করিবার সময় কাহারও ভালবাসা বা সমালোচনার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্যে পরিবার লইয়া বসিবার জন্য তিনি যে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন, আমাদের চক্ষের সম্মুখে যে সকল চিত্র ভাসিতেছে। তিনি, কেবল তিনিই এ সকল পারিতেন। নিন্দা, তিরস্কার নির্য্যাতন—বাল্যকাল হইতে এ সকল যেন তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল।

অসাধারণত্বের প্রকৃত পরিচয় কোথায়

পাওয়া যায় ?—জীবন-মাহাত্ম্যে। সরল, অমায়িক, আড়ম্বর-শূন্য দুর্গামোহন চিরকাল যেন সমালোচনারূপ ভীষণ তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিলেন—বিমাতার বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ তরঙ্গে তিনি আন্দোলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন দিকে তিনি দৃক্‌পাত করেন নাই। বিরক্ত হইয়া লোকেরা তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিতেও ছাড়ে নাই, কিন্তু তিনি কিছুতেই দৃক্‌পাত করেন নাই। মহাত্মা হারকোর্ট গ্লাডোষ্টোনের অশীতি জন্মোৎসব উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—

"If I leave this vile garbage, in which the accusations against Mr Gladstone are clothed, to perish as they deserve—I mention them only to remind you of equanimity and magnanimity with which Mr. Gladstone has always encountered attacks of this description, and scarcely even have I seen him stirred or disturbed for a moment by the shameful insults that are sometimes hurled at his head. He seems to [illegible] over them like a great ship making [illegible] voyage with a precious freight in [illegible] troubled sea, which dashes against it and breaks upon it, but the vessel goes on its way, on its steady course, without swerving or shrinking for a moment until the port is gained and the freight is safely landed."

Sir W. Harcourt, in celebration, of the 80th anniversary of Mr. Gladstone's birth day.

আমরাও দুর্গামোহন সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি। যেখানে মানুষের লক্ষ্য-চ্যুতি, মত-পরিবর্ত্তন সম্ভব, সেখানে অসাধারণত্ব নাই। খাতিরে, বা ভালবাসায়, প্রশংসায় বা নিন্দায়—যে বিচলিত হয়, সে কাপুরুষ, সে সাধারণ লোক। আর ম্যাটসিনি বা পার্কার, গ্লাডোষ্টোন বা লুথার—কাহারও দিকে চাহিয়া আপন ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই, এই জন্য তাঁহারা অসাধারণ পুরুষ, মহৎ হইতেও মহৎ,—আমাদের পূজ্য। দুর্গামোহন চিরকাল অবিচলিত, অপরিবর্ত্তিত, চিরকাল অসাধারণ। যদি স্বার্থ ভুলিয়া পরমার্থকে সার করিতে পারিতেন, ঐ সকল মহাপুরুষদিগের সম আসনে আজ তিনি বসিতে সক্ষম হইতেন।

সাধারণের সহিত এই অসাধারণের যোগ এ জগতে ঘোষণা করিতে রহিল, স্বার্থ এবং পরমার্থ, প্রেয় এবং শ্রেয়, অসুর এবং দেব—দুইই মানুষকে চালিত করিতেছে। এক পশুত্বে নমিত করিতেছে, আর এক দেবত্বে উন্নীত করিতেছে।—দুর্গামোহন দেবতা ছিলেন, একথা বলি না; তিনি সংসারজয়ী সংযমী বীর ছিলেন, একথা বলি না; তিনি বিলাসিতাহীন নির্ব্বিকার যোগী ছিলেন, একথা বলি না; তিনি ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তায় এ জগতে নেপোলিয়নের তুল্য ছিলেন, তাহাও বলি না; বলি কেবল এই কথা—তিনি দয়ায় এবং সেবায় অসাধারণ ছিলেন। তিনি কর্ত্তব্যপালন, মানব-সেবা এবং ধর্ম্মমত-ধারণে অসাধারণ ছিলেন। এই গুণেই তিনি আমাদিগের পূজ্য। আর পৃথিবীর চক্ষে?—যে যেমন, সে সেইরূপ তাঁহাকে বুঝিয়াছে, এবং সেইরূপেই বুঝিবে। কেহ তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, পূজা করিয়াছে, কেহ ঘৃণা করিয়াছে, অগ্রাহ্য করিয়াছে, উপেক্ষা করিয়াছে। তিনি কিন্তু যাহা, তাহাই ছিলেন। যে অসাধারণত্ব লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে বহুদিন লাগিবে। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি অমর আত্মাকে অমরধামের অসাধারণত্বে দিন দিন আরো উন্নীত এবং শোকদগ্ধ পরিবারে সান্ত্বনা বর্ষণ করুন।

প্রতিভা। * (১)

সমালোচনা।

কাব্য ও উপন্যাস নামে রাশি রাশি গ্রন্থে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজ কাল যিনি পদ্য লিখিতে জানেন, তিনিই কাব্য প্রণয়ন করিতেছেন—যিনি গদ্য লিখিতে জানেন, তিনিই উপন্যাস রচনা করিতেছেন। কাব্য ও উপন্যাস সমাজের উন্নতির চিহ্ন, একথা স্বীকার করিলেও, এমনভাবে তাহার আমদানি হইতে দেখিলে, স্বতঃই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। ফলতঃ এখন যেরূপ এই কাব্য ও উপন্যাস আমাদিগের দেশে মুদ্রিত, প্রচারিত ও পঠিত হইতেছে, তাহাতে কাহারও এরূপ ধারণা হওয়া অসঙ্গত নহে যে, কিছুকাল পরে বাঙ্গালীর জ্ঞানানুশীলন প্রবৃত্তি একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

কাব্য ও উপন্যাসের দিকে বাঙ্গালী লেখকের মন কেন এত ধাবিত, কেন বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দ কাব্য ও উপন্যাস পড়িতে এত আনন্দিত, তাহার অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক। এই যে সংক্রামক ব্যাধি সমগ্র বঙ্গভূমিতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, ইহার নিদানতত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করা উচিত। কারণ যদি এই রোগের চিকিৎসা আবশ্যক হয়, নিদান না জানিলে, তাহা চলিবেনা। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী ও পণ্ডিত, যাঁহারা সমাজের হিতসাধনে যত্নপর, তাঁহাদিগকে এ বিষয়টী ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি—নিদান উদ্‌ঘাটন বা ব্যাধিপ্রশমন করিতে পারি আমাদের এমন শক্তি নাই। তবু এই গ্রন্থ সমালোচনার ব্যপদেশে এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে চাহি।

প্রথমতঃ সমগ্র সাহিত্যের কথাই বলিতেছি। ইংরাজ জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বশতঃ আমাদিগের জাতীয় সাহিত্য এইক্ষণে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বকালের সাহিত্যে ও বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য আমরা একথা বলিতেছিনা যে, পূর্ব্বকালের সাহিত্য যেরূপ ছিল, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও গুণগরিমায় অনতিক্রমণীয় ছিল; আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে, সেই সাহিত্যেও এখনকার সাহিত্যে মজ্জাগত বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু আমরা ইহাই বলিতেছি যে, ইংরাজ জাতির সহিত অপরূপ সম্বন্ধই এই বিভিন্নতার মুখ্য কারণ। ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতায় যেমন আমাদিগের সামাজিক রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তেমনই এই সাহিত্যও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ফলতঃ ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতায় আমাদিগের হৃদয়ই যেন রূপান্তরিত হইয়াছে। যখন সাহিত্য লেখকের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব, তখন হৃদয়ের রূপান্তরে তাহারই বা রূপান্তর ঘটিবেনা কেন?

হৃদয়ের পরিবর্ত্তনে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন ত ঘটিয়াছেই, এতদ্ ভিন্ন আরও কয়েকটী কারণ, এই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে অল্প সহায়তা করে নাই। নিম্নে তাহার দুই একটীর কথা বিবৃত হইতেছে।

---

* শ্রীরঙ্গীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে সাহিত্যের চর্চ্চা বা প্রচার বড়ই বিভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিলনা, লোকে হাতে লিখিয়া পুস্তক পাঠ করিত এবং যেমন বিনাব্যয়ে শিষ্য গুরুর নিকট সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিত,—তেমনই বিনাব্যয়ে গ্রন্থ পাঠার্থিগণ অন্যকৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া উপদেশ ও আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন। কেহ কোন নূতন গ্রন্থ লিখিলে তিনি তাহা বিনা ব্যয়েই অন্যকে নকল করিয়া লইতে দিতেন। তিনি এজন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না—গ্রহণ করা অবৈধ মনে করিতেন।

এখন প্রথা অন্যরূপ। এখন দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হইয়াছে। এখন কেহ হাতে লিখিয়া পুস্তক পড়েন না—গ্রন্থকারও এখন গ্রন্থ লেখার পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঠার্থিসমীপে গ্রন্থের মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। গ্রন্থ বিক্রয়ে এখন যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন হয়—সুতরাং বিনামূল্যে অথবা ব্যয়মাত্র লইয়া কেহ গ্রন্থ বিতরণ করেন না। সাহিত্য এখন বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য।

এই যে প্রথা পরিবর্ত্তন—ইহাই সাহিত্য ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাইয়াছে। ইহাতে যেমন শত প্রকার সুফল প্রসব করিয়াছে, তেমন কয়েক প্রকার কুফলও উৎপাদন করিয়াছে। সেই কুফলের কথাই আমার বক্তব্য—কেন না তাহাই বিদূরিত করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে গ্রন্থ বিক্রয়ের প্রথা ছিল না। সুতরাং গ্রন্থাদি লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জনের স্পৃহাও কোন গ্রন্থকারের তখন ছিল না। সত্য বটে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণকে রাজা পুরস্কার স্বরূপ জায়গির বৃত্তি ইত্যাদি প্রদান করিতেন, কিন্তু তাহা এত অল্পসংখ্যক লোককে দেওয়া হইত যে, নূতন গ্রন্থকার তাহা পাইবার আশা অতি অল্পই করিতেন। বিশেষতঃ এই যে পুরস্কার তাহাও বিশেষ বিচার বিতর্কের পরে দেওয়া হইত। রাজা তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে গ্রন্থের দোষগুণ বিচার করিয়া উপযুক্ত বোধ করিলে সেইরূপ পুরস্কার প্রদান করিতেন। আর সেই পুরস্কারই বা কি? অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহের বিধান মাত্র। তাহাতে কোন গ্রন্থকারের ভোগবিলাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারিত না। ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হইলে কোন কোন স্থলে প্রদত্ত জায়গিরাদি পুনর্গৃহীত হইত। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, তখনকার গ্রন্থকারগণ মুখ্যতঃ ধন লাভের আকাঙ্ক্ষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন না। যশের আকাঙ্ক্ষা কিছু থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাও যে প্রবল প্রবর্ত্তক ছিল, এমন বোধ হয় না। এখন যেরূপ লোকে গ্রন্থাদি লিখিয়া যশোলাভ করে, তখন যশোলাভ এমন সহজ ছিল না। বড় কষ্টে এই যশ অর্জ্জিত হইত। রাজার সভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ আলোচনার পর যদি গ্রন্থখানি ভাল বলিয়া বিবেচিত হইত, তবেই তাহাতে কিছু যশ হইত। এখন যেমন গ্রন্থ লেখার যশ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, দেখিতে দেখিতে সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্রের সাহায্যে দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন এরূপ যশোবিস্তার ঘটিতে পারিত না। তাই আমরা মনে করিতেছি, এই সামান্য অতিশয় দুষ্প্রাপ্য যশের জন্য লোকে গ্রন্থ লিখিতে সচরাচর প্রবৃত্ত হইত না। আমাদিগের বোধ হয়, তখন যাঁহারা গ্রন্থাদি লিখিতেন, তাঁহারা গ্রন্থ লিখিতেন—গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে একান্ত অনুরক্তি বশতঃ—কোথাও বা লোকশিক্ষার্থ কোথাও

বা নির্ম্মল আনন্দ উপভোগার্থ। যাঁহারা কাব্যাদি লিখিতেন, তাঁহারা লোকশিক্ষার্থ তাহা লিখিতেন। একথা বলিতে না পারিলেও সেই কাব্যাদির আলোচনায় একান্ত অনুরক্তি ও তাহাতে অত্যন্ত আনন্দ সম্ভাবনা দেখিয়াই তাঁহারা গ্রন্থাদি লিখিতেন, ইহা বলা যায়। অন্যান্য গ্রন্থকারগণ কেহ বা লোকশিক্ষার্থ, কেহ বা সত্যসেবার্থ গ্রন্থ লিখিতেন। অর্থ প্রাপ্তির আশা বা যশের আশা থাকিলেও, তাহা নগণ্য বলিতে পারা যায়।

এখন হইতেছে কি? এখন গ্রন্থকারগণ প্রধানতঃ ধনের বা যশের আকাঙ্ক্ষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। নাই বা থাকিল তাহাতে তাহার অনুরক্তি, নাই বা থাকিল তাহাতে তাহার অধিকার, গোল্ড্‌স্মিতের বিবিধ বিষয়ক পুস্তক প্রণয়নের ন্যায়, তিনিও অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। কেহ দেখিলেন, বাজারে ইতিহাসের বড়ই আদর—ইতিহাসের বড়ই কাট্‌তি, অমনি তিনি ঐতিহাসিক সাজিয়া ইতিহাস লিখিতে বসিলেন। ইতিহাসে তাঁহার অনুরক্তি না থাকিলেও অর্থেত অনুরক্তি আছে। একজন দেখিলেন কাব্যের বড়ই আদর—কাব্য লেখকের সমাজবিশেষে বিশেষ প্রতিপত্তি—তিনি আর না ভাবিয়া না চিন্তিয়া কাব্য লিখিতে বসিলেন। এইরূপ কত আর দেখাইব?

ইহার ফলে সাহিত্যের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ঘটিতে পারে, তাহা কি আবার কাগজে কালির চিহ্ন দিয়া দেখাইতে হইবে? এই স্বাভাবিক অনুরক্তি, লোকশিক্ষার ইচ্ছা প্রভৃতি হইতে যে ফল ফলিয়াছে, তাহার সহিত, অর্থে অনুরক্তি—অবৈধ যশে অনুরক্তি হইতে যে ফল ফলিতেছে, তাহার তুলনা করিয়া নাই বা দেখাইলাম।

আরও দেখুন।

পূর্ব্বে কোন নূতন গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইলে, রাজসভায় তাহা উপস্থিত করা হইত। রাজসভায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সেই অভিনব গ্রন্থের দোষ গুণ বিচার করিতেন। বিচারান্তে গ্রন্থকার প্রশংসিত বা নিন্দিত হইতেন। এইরূপ একটী প্রসিদ্ধ সমালোচক সমিতি প্রকাশ্য ভাবে একত্র হইয়া দোষ গুণ বিচার করাতে, অনেক স্থলেই পুস্তক সম্বন্ধে ন্যায্য বিচার ঘটিত। অন্যায্য বিচার হইবেই বা কেন? গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দার সহিত যখন অর্থের বিশেষ সংশ্রব ছিল না, তখন গ্রন্থকারের আত্মীয় বর্গও গ্রন্থকারের প্রতি অনুচিত পক্ষপাত করিতে ইচ্ছা করিতেন না। আর দুই এক জন তেমন লোক থাকিলেও, যখন প্রকাশ্যভাবে বহু লোক একত্র হইয়া নিরপেক্ষ বিচারকের সম্মুখে বিচারকার্য্য করিতেন, তখন কাহারও পক্ষপাতিত্বে বেশী কিছু অপকার হইত না। এইরূপ সমিতির বিচার অপর সাধারণে বিনা তর্কে গ্রহণ করিত এবং তদনুযায়ী তাহাদিগের মধ্যে গ্রন্থকারের আসন প্রতিষ্ঠিত হইত।

আর এখন হইতেছে কি? এখন তুমি, আমি, শ্যাম, রাম, যদু, মধু, গোবিন্দ, গোপাল সকলেই সমালোচক। মাসিক পত্র, দৈনিক পত্রের সম্পাদকগণ—তাঁহারা ইংরাজই হউন; আর বাঙ্গালীই হউন, বাঙ্গালা জানুন আর নাই জানুন—সকলেই বাঙ্গালা গ্রন্থের স্বকীয় কার্য্য-প্রভাবে, সমালোচক। এখন আমি করিব, আমার বন্ধুর গ্রন্থের সমালোচনা বা প্রশংসা, বন্ধুতার বা বন্ধুর অনুরোধে—তুমি করিবে তোমার অনুগত লোকটীর গ্রন্থের সমালো-

চনা বা প্রশংসা, তাহার আনুগত্যে বাধ্য হইয়া বা স্নেহবশতঃ। রাম করিবেন মাধবের গ্রন্থের প্রশংসা, টাকা পাইয়া বা অনুগ্রহ প্রত্যাশায়, শ্যাম করিবেন যাদবের গ্রন্থের প্রশংসা, তাহাকে অন্ন করিয়া দিতে। যদু করিবেন মধুর গ্রন্থের প্রশংসা, মধু তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা করিবেন বলিয়া, মধু করিবেন যদুর গ্রন্থের প্রশংসা, আপনার অঙ্গীকার প্রতিপালনার্থ বা কৃতজ্ঞতা-দেখাইতে। গোবিন্দ করিবেন গোপালের গ্রন্থের নিন্দা, মনের ঈর্ষা বা অন্য কোন ভাবপ্রযুক্ত। গোপাল করিবেন গোবিন্দের গ্রন্থের নিন্দা তাঁহার প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার জন্য। এই হইয়াছে এখনকার সমালোচনার ভাব।

ইহার ফলে কি হইয়াছে, হইতেছে দেখুন। ঐ দেখুন, সম্মুখে ঐ উদ্যানে কেমন সুন্দর সুন্দর সুজাত পুষ্পবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু মালী তাহাকে যত্ন করিতেছে না; যে বৃক্ষটীতে জল সেচন করিলে, তাহার শোভা বাড়িবে, সে সেইটীকে আতপ তাপে বিশুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে। যে বৃক্ষটীকে আতপতাপে রাখিলে তাহার সুষমা বৃদ্ধি পাইবে, তাহাকে সে অবিরল জলধারায় সিক্ত করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। যেটীকে কিঞ্চিৎ ছাটিয়া দিলে ভাল ফুল ফুটিবে, তাহাকে সে যদৃচ্ছারূপে বাড়িতে দিতেছে। আর কিছুমাত্র ছাটিলে যেটী ভবিষ্যতে বাড়িবেনা, ভাল ফল হইবেনা, তাহাকে অনবরত ছাটিয়া দিতেছে। আবার ঐ দেখুন কতকগুলি বন্যবৃক্ষ (আগাছা) জন্মিয়া সুজাত বৃক্ষগুলিকে ছাইয়া ফেলিতেছে। তাহার আবরণের জন্য মালী সে গুলিকে যত্নে পরিবর্দ্ধন করিতেছে। ঐ দেখুন দেখিতে দেখিতে বন্য বৃক্ষের অবাধ বিস্তারে সমস্ত সুজাত বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল। ঐ দেখুন দেখিতে দেখিতে সেই নয়নাভিরাম উদ্যানের স্থলে কিরূপ ভীতিপ্রদ কানন বিরাজ করিতে লাগিল।

বৃক্ষের গুণাগুণ প্রকৃতি পদ্ধতি না জানিয়া বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্যানপাল উদ্যানের যে অবস্থা ঘটাইল, দোষ গুণের বিচারে অক্ষম স্বার্থপর সমালোচকগণও বঙ্গীয় সাহিত্যোদ্যানের সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইতেছেন।

স্থূলভাবে সাহিত্যের কথা বলিয়া, এখন আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য কাব্য উপন্যাসের কথা বলিতেছি।—কাব্য উপন্যাসে লেখক ও পাঠকের এত অনুরক্তি কেন তাহারই আলোচনা করিতেছি।

ইংরাজজাতি যেমন সুখপ্রিয় ও বিলাসী, তেমন কর্ম্মঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। এই দুই প্রকার গুণ অতি সুন্দরভাবে বিজড়িত হইয়া ইংরাজের চরিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমরা বাঙ্গালা—ইংরাজের অধীনে বাস করি; ইংরাজের সুখসমৃদ্ধি দেখিয়া তাহাদিগকে বুঝি স্বর্গের দেবতা বলিয়াই আমাদিগের অনেকের মনে হয়, সুতরাং সেই ইংরাজের অনুকরণ করিতে যাওয়া আমাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ। তাই আমরা আমাদের জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া অনেক সময়ে ইংরাজের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। ভিন্ন জাতির সর্ব্বতোভাবে অনুকরণ সহজ ব্যাপার নহে। বাঙ্গালী যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিত, তাহা হইলে বাঙ্গালী আজ ইংরাজের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যাইত, বাঙ্গালী বলিয়া পৃথক্ কোন জাতি আজি দেখিতে পাইতাম না। আমরা ইংরাজের অনুকরণ করিতে গিয়া তাহাদিগের যে অংশ সহজে অনুকরণ করা যাইতে পারে, তাহারই অনুকরণ করিতেছি।

আমরা অলস ও দুর্ব্বল বাঙ্গালী—ইংরাজের ভোগবিলাসের পদ্ধতি দেখিয়া তাহারই অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলা বাহুল্য ভোগ বিলাসের উপকরণমধ্যে কামিনী একটী প্রধান উপকরণ। ইংরাজেরা এই উপকরণ-সম্ভূত সুখকে সভ্যতার সম্মোহন আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া "প্রেম" নামক একটী বৃত্তির বিকাশ সাধন করিয়াছেন। আমরা স্বামী ও স্ত্রী একত্র হইয়া গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন করিতেই উপদেশ পাইতাম। স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ হইতে এমন যে একটী আপাত-পবিত্র সুখ উদ্ভূত হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। আমাদিগের কবিগণ স্বামিস্ত্রীর ঐ রূপ অনুরাগকে (পূর্ব্ব রাগকে) প্রায় সর্ব্বত্রই মন্মথের শরসম্ভূত বলিয়া প্রকাশ্য ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইংরাজ তাহার আবর্জ্জনা ও মলিনতা বাহিরের শোভাময় আবরণে অতিশয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ইহাকে একটী পরম পবিত্র উচ্চ প্রবৃত্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে প্রবৃত্তির অনুশীলন হইতে আমরা সমধিক পরিমাণে সুখ সম্ভোগে সমর্থ হই, সেই প্রবৃত্তিকে যদি কেহ পবিত্র ও উচ্চ স্থানস্থিত বলিয়া, আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন, তবে তাহার পথ অনুসরণ করিতে আমাদিগের কেনই বা ইচ্ছা না জন্মিবে? তাই আমরা ইংরাজের প্রেম, আমাদিগের পরিবারমধ্যে ও সাহিত্য কাব্য উপন্যাস মধ্যে আনিয়াছি, আনিতেছি ও আনিয়া ইহা লইয়া বড়ই বাড়াবাড়ি করিতেছি। ইংরাজের কাব্য উপন্যাস এই প্রেম লইয়া। সুতরাং এই কাব্য ও উপন্যাসের প্রতি আমাদিগের মন এখন অত্যন্ত অনুরক্ত।

তারপরে দেখুন—গ্রন্থবিক্রয়ের কথা। গ্রন্থবিক্রয় যখন ব্যবসায়রূপে গণ্য হইল, তখন বাঙ্গালী দেখিল যে, কাব্য উপন্যাস লেখা বড়ই সুন্দর ব্যবসায়। অন্য ব্যবসায়ে মূলধন আবশ্যক, এ ব্যবসায়ে তাহার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। ইতিহাস বল, দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, জ্যোতিষ বল, এ সকল বিষয়েই গ্রন্থ লিখিতে কিছু পড়া শুনা ও জ্ঞান গবেষণা চাই। কিন্তু কাব্য উপন্যাস লিখিতে এক মাত্র কল্পনা হইলেই নাকি চলিতে পারে। তাই যাহারা অন্য ব্যবসায়ে অপারগ, যাহাদিগের বিশেষ কোন মূল ধন নাই, তাহারা সংগ্রহে, এই লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকসংখ্যাই অধিক। তাই বাঙ্গালাসাহিত্যে কাব্য উপন্যাসের সংখ্যাও আজ কাল অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

এই শ্রেণীর লেখকগণ মনে করেন, অন্যান্য গুণে তাঁহারা যে পরিমাণে বঞ্চিত, প্রতিভা ধনে সেই পরিমাণে, ভগবান্, তাহাদিগকে সম্পন্ন করিয়াছেন। তাই যিনি যে পরিমাণে মূর্খ, তিনি সেই পরিমাণে আজ কাল এই "প্রতিভার" দাবী করিতেছেন। ইঁহারা মনে করেন, কালিদাস সেক্‌স্‌পিয়র, ভবভূতি, মিলটন, বঙ্কিম চন্দ্র, নবীন চন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ইঁহারা কেবল কল্পনা বলেই যশস্বী। কি প্রকারে বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা যে ইঁহাদিগের কল্পনা মার্জ্জিত, তাহা এই শ্রেণীর লেখকগণ বুঝিতে পারেন না। তাই ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পার্শী প্রভৃতি সর্ব্ব ভাষায় অনভিজ্ঞ, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ইতিহাস প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিই আজ কাল, উন্মত্তসুলভ কল্পনাবলে ইঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্পর্দ্ধা হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এখন আমরা বঙ্গদর্শনের ন্যায়, ইহাদিগকে কেহ আর

জনী প্রহারে, প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেছেন না। বরং নানা প্রকারে উপকার, কোথাও বা সেবা, কোথাও বা ধন পাইবার জন্য, আধুনিক সমালোচকগণ প্রশংসা করিয়া, ইহাদিগকে আরও বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন। ইহার দৃষ্টান্ত চাহিলে.. নাম উল্লেখ করিয়া আমরা তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ।

ইংরাজজাতির সহিত ঘনিষ্ঠতাবশতঃ এবং গ্রন্থ-বিক্রয়-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার জন্য যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বর্জ্জনীয়। কিন্তু প্রকৃত সমালোচনার অভাবে যাহা হইতেছে, তাহা বোধ হয় চেষ্টা করিলে পরিবর্জ্জন করা যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে, সমালোচকগণ কি প্রকারে গ্রন্থকারদিগের উপরে শাসন বিস্তার করিবেন? ইহার উত্তরে আমরা নিম্নে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

যাঁহারা বাঙ্গলাসাহিত্যের গতি প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, "বঙ্গদর্শন" "বান্ধব" প্রভৃতি কয়েকখানি মাসিকপত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে এক দিন যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। "শাস্ত্রদর্শী" বিদ্যাসাগর এবং "তত্ত্বদর্শী" অক্ষয়কুমার দত্ত যাহা করিতে পারেন নাই, এই মাসিকপত্রিকাগুলি তাহাও করিয়াছে। বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় কুমার দত্ত পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে উৎসাহাদি প্রদান করিয়া, তাঁহারা কাহাকেও লেখক বা গ্রন্থকার করিয়াছেন, এমন আমরা জানি না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মাসিকপত্রগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই করিয়াছে। বাঙ্গলার আধুনিক বরেণ্য লেখক ও গ্রন্থকার প্রায় সকলেই এই মাসিকপত্রগুলির নিকট প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। এবং আমাদিগের বোধ হয়, এই মাসিকপত্রগুলি গ্রন্থকারদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য যত গুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সমালোচনা একটী প্রধান উপায়। বঙ্গদর্শনে প্রশংসাসূচক সমালোচনায় কাহার না হৃদয় আহ্লাদে প্রপূরিত হইয়াছে? বান্ধবের প্রশংসাসূচক সমালোচনায় কেইবা আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে না করিয়াছেন? মাসিক পত্রে যে নিয়মে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহাও এক প্রকার সমালোচনার কার্য্য করিত। নিয়ম ছিল, কোন প্রবন্ধ সম্পাদকের মনোনীত না হইলে পত্রস্থ হইত না, সুতরাং যাহা প্রকাশিত হইত, পত্রিকাসম্পাদক তাহা উৎকৃষ্ট মনে করিয়াছেন, লেখক এই রূপই বুঝিতে পারিতেন। ইহা ভিন্ন প্রকাশ্য ভাবে গ্রন্থাদির যে সমালোচনা হইত, তাহাতে প্রশংসার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। আর যাহারা অনুপযুক্ত তাহারা বাধ্য হইয়া আপনাদিগের দাম্ভিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উপযুক্ত পথ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইত। আমার বোধ হয়, এই দুইখানি পত্রিকা বিশেষতঃ বঙ্গদর্শন, যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল ও যে শক্তি প্রয়োগ করিত, তাহা পূর্ব্ব কালের রাজশক্তিরই বুঝি অনুরূপ ছিল। সকলেই বঙ্গদর্শন সম্পাদককে রাজার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত, ভয় করিত, সম্মান করিত। তিনি যে গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিতেন, রাশি রাশি পাঠক তাহা অবিলম্বে ক্রয় করিয়া আগ্রহের সহিত পাঠ করিত এবং গ্রন্থকারকে পরোক্ষভাবে প্রোৎসাহিত করিত। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক যে গ্রন্থের নিন্দা করিতেন, সে গ্রন্থ বড় কেহ কিনিত না। পুস্তক

পাইলে, আমাদের অন্তরও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বেই গ্রন্থে মহত্তর হইয়া উঠে। এই কারণে এই ভাবাবেগ স্থায়ী করিবার জন্যই সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করিবার আদেশ শাস্ত্রে আছে। সুতরাং যিনি যে ভাবেই আলোচনা করুন না কেন, মহাপুরুষগণের কথা লইয়া যিনিই আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন, আমরা সাদরে তাঁহাকেই প্রণিপাত করিব।

এই বলিলাম—গ্রন্থের বিষয় নির্ব্বাচনের কথা।

যেমন এই গ্রন্থের বিষয় নির্ব্বাচন অতি উচ্চ শ্রেণীর, তেমনই ইহার বিষয় বিবরণ বা প্রকটনও অতি উচ্চশ্রেণীর। ইংরাজীতে যেমন মেকলের প্রবন্ধ, বাঙ্গালাতে ঠিক তেমনই এই গ্রন্থখানি। ইহা কাব্য নহে—অথচ তেমনই বুঝি চিত্তহারী, ইহা জীবন চরিত নহে, অথচ তেমনই বুঝি শিক্ষাপ্রদ। এক দিকে ইহার সুললিত শব্দবিন্যাস সুরতালসম্মিলিত সাত্বিক সঙ্গীতের ন্যায়, কর্ণ কুহরে অমৃত ধারা বর্ষণ করিয়া, হৃদয়ের সুপ্তস্মৃতি যেন জাগাইয়া দিতেছে; অন্য দিকে ইহার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও চিন্তাশীলতা অন্তরের প্রচ্ছন্ন জ্ঞানানন্দ যেন উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে। এমন ভাষাস্রোত বাঙ্গালার অতি অল্প গ্রন্থেই দেখিতে পাইয়াছি। কোন প্রকার বাধায় প্রতিহত হইতেছে না, কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতায় বিপথগামী হইতেছে না, ইহার ভাষা যেন স্রোতস্বিনীর স্রোতের ন্যায় আপন মনে গন্তব্যাভিমুখে ছুটিতেছে। গ্রন্থকার এই ভাষা সম্বন্ধে একস্থলে কিরূপ লিখিয়াছেন, পাঠকবর্গ পাঠ করুন।

"অক্ষয়কুমার যথানিয়মে সংস্কৃত শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। একজন অধ্যাপকের নিকটে তিনি কিয়ৎকাল মাত্র সংস্কৃতের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইলেও তাঁহার ভাষায় এরূপ সুপ্রণালীক্রমে সংস্কৃত শব্দ সমূহের বিন্যাস আছে যে, একজন মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত পণ্ডিত তৎসমুদয়ের যোজনা করিতে সমর্থ হইলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। ফলতঃ অক্ষয়কুমার সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাকে শ্রুতিকঠোর করেন নাই, দীর্ঘ সমাস প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাকে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নীরস করিয়া তুলেন নাই। সংস্কৃতের পার্শ্বে প্রচলিত কথার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য্য হানি করেন নাই। তাঁহার ১ম ও ২য় ভাগ "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার," তাঁহার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, "চারুপাঠ", তাঁহার 'ধর্ম্মনীতি', তাঁহার 'পদার্থ বিদ্যা', তাঁহার ১ম ও ২য় ভাগ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', যাহাই পাঠ করা যায় তাহাতেই তদীয় ভাষায় পরিশুদ্ধ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মাতাপিতার সহিত যে ভাষায় কথা কহা যায়; প্রণয়ী জনের সহিত যে ভাষায় আলাপ করা যায়; স্নেহময়ী ধাত্রী বা বিশ্বস্ত পরিজনের সহিত কথোপকথন কালে যে ভাষার ব্যবহার করা যায়; অক্ষয়কুমার সাধারণতঃ সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ভাষা গম্ভীর, তাঁহার ভাষা সংস্কৃতবহুল, তাঁহার ভাষা সংস্কৃতের নিয়মানুসারে সমাস-সমন্বিত; কিন্তু এই গাম্ভীর্য্যে, এই সংস্কৃত শব্দবাহুল্যে, এবং এই সমাসমালায় এরূপ মাধুর্য্য ও কমনীয়তা আছে যে, পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় মোহিত হয়। যে সজীব ও নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির বেদনা বোধ নাই; যে ব্যক্তি মহা

পাইলে, আমাদের অন্তরও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সেই সুষমায় মধুময় হইয়া উঠে। এই কারণে এই ভাবাবেগ স্থায়ী করিবার জন্যই সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করিবার আদেশ শাস্ত্রে আছে। সুতরাং যিনি যে ভাবেই আলোচনা করুন না কেন, মহাপুরুষগণের কথা লইয়া যিনিই আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন, আমরা সাদরে তাঁহাকেই প্রণিপাত করিব।

এই বলিলাম—গ্রন্থের বিষয় নির্ব্বাচনের কথা।

যেমন এই গ্রন্থের বিষয় নির্ব্বাচন অতি উচ্চ শ্রেণীর, তেমনই ইহার বিষয় বিবরণ বা প্রকটনও অতি উচ্চশ্রেণীর। ইংরাজীতে যেমন মেকলের প্রবন্ধ, বাঙ্গালাতে ঠিক তেমনই এই গ্রন্থখানি। ইহা কাব্য নহে—অথচ তেমনই বুঝি চিত্তহারী, ইহা জীবন চরিত নহে, অথচ তেমনই বুঝি শিক্ষাপ্রদ। এক দিকে ইহার সুললিত শব্দবিন্যাস সুরতালসম্মিলিত সাত্বিক সঙ্গীতের ন্যায়, কর্ণ কুহরে অমৃত ধারা বর্ষণ করিয়া, হৃদয়ের সুপ্তস্মৃতি যেন জাগাইয়া দিতেছে; অন্য দিকে ইহার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও চিন্তাশীলতা অন্তরের প্রচ্ছন্ন জ্ঞানানন্দ যেন উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে। এমন ভাষাস্রোত বাঙ্গালার অতি অল্প গ্রন্থেই দেখিতে পাইয়াছি। কোন প্রকার বাধায় প্রতিহত হইতেছে না, কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতায় বিপথগামী হইতেছে না, ইহার ভাষা যেন স্রোতস্বিনীর স্রোতের ন্যায় আপন মনে গন্তব্যাভিমুখে ছুটিতেছে। গ্রন্থকার এই ভাষা সম্বন্ধে এক-স্থলে কিরূপ লিখিয়াছেন, পাঠকবর্গ পাঠ করুন।

"অক্ষয়কুমার যথানিয়মে সংস্কৃত শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। একজন অধ্যাপকের নিকটে তিনি কিয়ৎকাল মাত্র সংস্কৃতের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইলেও তাঁহার ভাষায় এরূপ সুপ্রণালীক্রমে সংস্কৃত শব্দ সমূহের বিন্যাস আছে যে, একজন মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত পণ্ডিত তৎসমুদয়ের যোজনা করিতে সমর্থ হইলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। ফলতঃ অক্ষয়কুমার সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাকে শ্রুতিকঠোর করেন নাই, দীর্ঘ সমাস প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাকে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নীরস করিয়া তুলেন নাই। সংস্কৃতের পার্শ্বে প্রচলিত কথার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য্য হানি করেন নাই। তাঁহার ১ম ও ২য় ভাগ "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার," তাঁহার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, "চারুপাঠ", তাঁহার 'ধর্ম্মনীতি', তাঁহার 'পদার্থ বিদ্যা', তাঁহার ১ম ও ২য় ভাগ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', যাহাই পাঠ করা যায় তাহাতেই তদীয় ভাষায় পরিশুদ্ধ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মাতাপিতার সহিত যে ভাষায় কথা কহা যায়; প্রণয়ী জনের সহিত যে ভাষায় আলাপ করা যায়; স্নেহময়ী ধাত্রী বা বিশ্বস্ত পরিজনের সহিত কথোপকথন কালে যে ভাষার ব্যবহার করা যায়; অক্ষয়কুমার সাধারণতঃ সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ভাষা গম্ভীর, তাঁহার ভাষা সংস্কৃতবহুল, তাঁহার ভাষা সংস্কৃতের নিয়মানুসারে সমাস-সমন্বিত; কিন্তু এই গাম্ভীর্য্যে, এই সংস্কৃত শব্দবাহুল্যে, এবং এই সমাসমালায় এরূপ মাধুর্য্য ও কমনীয়তা আছে যে, পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় মোহিত হয়। যে সজীব ও নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির বেদনা বোধ নাই; যে ব্যক্তি মহা

প্রাণতার অধিকারী হয় নাই ; জাতীয় জীবনে সজীব হইয়া উঠে নাই ; উদ্দীপনার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে নাই ; বিরহী জনের কাতরতা-প্রকাশক রোদন বা প্রণয়ী জনের অস্ফুট প্রণয়-সম্ভাষণ যে জাতির ভাষার প্রতিস্তরে পরিস্ফুট হয় ; অথবা তান্ত্রিকমতে অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের কর্কশ কথার ন্যায় কতকগুলি অসম্বদ্ধ শ্রুতিকঠোর শব্দাবলী যে জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্তূপে স্তূপে সজ্জিত থাকে ; অক্ষয়কুমার সেই জাতির ভাষায় প্রচণ্ড তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করেন এবং সেই জাতির ভাষাকে সুসম্বদ্ধ, সুশ্রাব্য শব্দমালায় শোভিত করিয়া তুলেন। মিল্টন একটি নিত্য স্বাধীন মহাজাতিকে কোন মহান্ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, উদ্দীপনাময়ী ভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। চিরপরাধীন, চিরনিপীড়িত ও চিরনিগৃহীত জাতির মধ্যে অক্ষয় কুমারের ভাষা মিল্টনের ভাষারও গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছে। মিল্টন যদি ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নিস্তেজ বঙ্গীয় সঙ্কীর্ণ কর্ম্মভূমিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও জাড্যদোষে সমাচ্ছন্ন লোকের মধ্যে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, দরিদ্র অক্ষয়কুমারের লেখনীর প্রভাব দর্শনে তাঁহারও হিংসার আবির্ভাব হইত। নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট বিষয়ের সজীবতা সম্পাদন অসামান্য ক্ষমতার কার্য্য। অক্ষয় কুমার এই অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতায় নিস্তেজ ভাষার মধ্যে এরূপ তেজস্বিতা ও সজীবতার আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাহার প্রদীপ্ত ভীমপ্রভায় বঙ্গীয় সাহিত্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুজ্জ্বলভাব দেশান্তরের সভাসমাজেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।" ক্রমশঃ

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

বিলাতে বড়দিন। (১)

প্রিয় দেবীপ্রসন্ন বাবু !

আমার 'ইংলিশ হোম' আপনাকে ভাল লেগেছে শুনে সুখী হ'লাম। যদিও এ সুখটুকু যে সম্পূর্ণ অনাবিল, তা মনে করতে পারিব না। কেননা, আপনাকে ভাল লাগাটা কেমন শুনেন ? যেমন সেই কথায় বলে—"আপনার রান্না আপনাকে ভাল, আর ঠাকুরকে ভাল।" আমার তাই মনে হচ্চে, আপনি সম্পাদক ভাবেই পড়ুন অথবা বন্ধুভাবেই পড়ুন, আপনাকে আমার পত্র—তা ভালই হোক আর মন্দই হোক—ঠাকুরকে রান্না ভাল লাগার মত ভাল লাগবেই লাগবে। যাই হোক, তবুও আপনার মুখে প্রশংসা শুনে আমার সুখের অবধি রৈল না। আপনার পাঠক পাঠিকারা ইংলিশ হোম পড়ে কি মনে করেছেন, তা শোনবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার থাকলেও, নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সুবিধা নাই। সুতরাং সে বিষয়ে অনর্থক মাথা খারাপ না করে, তাঁদের সহৃদয়তার উপর অসংকোচ আস্থা স্থাপন করে, আজ আবার বিলাতে বড়দিন সম্বন্ধে একটা প্রস্তাবের সূচনা করচি।

ক্রিশমাস পর্ব্বকে আমাদের দেশের সাধারণ লোকে 'বড়দিন' বলে। কেন বলে জানেন ? আমার ত অনুমান হয়, ঐ সময়ের কাছাকাছি (২১শে ডিসেম্বর) সূর্য্য উত্তরায়ণ অতিক্রম করেন এবং তারপর থেকেই দিবার মাত্রা অর্থাৎ সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত-কাল-ব্যবধান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় থেকে দিন বাড়ে বলেই হয়ত ক্রিশমাস

পর্ব্ব 'বড়দিন' বলে সাধারণে পরিচিত হয়ে থাকবে। আমি তা বলে অবশ্য ইহা মনে করতে পারি না যে, অস্মদ্দেশের অশিক্ষিত প্রবরেরা জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন প্রভৃতি সৌর গণনায় সুপণ্ডিত। তবে, এটা আমি সহজে মনে করতে পারি যে আমাদের খ্যাতনামা পঞ্জিকাকারদিগের নির্বিশেষ কৃপার গুণে কোন্ মাসের কোন তারিখে দিবার মাত্রা হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় তা অনেকের নিকট অবিদিত না থাকলেও থাকতে পারে। সুতরাং জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য না জন্মালেও বৎসরের মধ্যে কোন্‌টা বড়দিন বা কখন বড়দিনের আরম্ভ হয়, তা জানবার পথে কোন একটা বিশেষ বাধা বর্ত্তমান থাকার সম্ভাবনা অতি বিরল। অতএব আমি এখন বেশ মনে করতে পারি যে, বৎসরের মধ্যে পৌষ মাসের অমুক দিন থেকে দিবাভাগ বর্দ্ধিত হয়—এ কথাটা আপামর সাধারণে অবগত আছে। তারপর ধরুন, খ্রীষ্টবিশ্বাসী শাসনকর্ত্তাদের কল্যাণে আমরা অনেক কাল হতেই খ্রীষ্ট পর্ব্বকে এক রকম আমাদের জাতীয় পর্ব্বের ন্যায় মনে করে আসছি। সাহেবদের মত বাঙ্গালী ও মুসলমানেরাও 'বড়দিন' করে। কিন্তু ক্রিশ্‌মাস শব্দটা বড়ই খটমট। বালাম চাল আর মুগের ডাল ভুক্ত বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে যেন মিশ খায় না। তাই, নিশ্চয়ই, শব্দ দেখে, কোন না কোন উদ্ভাবন-শীলমস্তিষ্ক, দিবার বৃদ্ধির আরম্ভ আর ক্রিশ্‌মাস পর্ব্বের সমসূত্রতা পরিলক্ষ্য করে, ক্রিশ্‌মাসকে বাঙ্গালী করবার মানসে উহার হ্যাটকোট কেড়ে নিয়ে, ধুতি চাদর পরিয়ে, কোন এক সুপ্রভাতে ঐ পর্ব্বকে বড়দিন নামে প্রচার করে থাকবে। বড়দিন বলতেও কষ্ট হয় না, মনে রাখতেও কষ্ট হয় না, আর ক্রিশ্‌মাসের মত সাহেবী ও খটমটও নয়; দিব্যি বাঙ্গালীর ছাঁচে গঠিত; ষোল আনা বাঙ্গালী। কেমন, আপনারও কি মনে হয় না, ক্রিশ্‌মাসের চলিত নাম বড়দিনের—ইহাই অতি প্রাঞ্জল ও দার্শনিক ও (বলতে যাচ্ছিলাম রাসায়নিক,) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা?

আপনাকে বলতে হবে না যে, পঁচিশে ডিসেম্বরের মহা পর্ব্ব মহাত্মা যিশুর জন্মদিন উপলক্ষে। ঐ শুনুন ক্যারল সশব্দে ঘোষণা করচে।

"Rejoice our Saviour he was born
On Christmas day in the morning

আর অবিশ্বাস করিবার বা সন্দিগ্ধ হবার কোন কারণ নাই। পঁচিশে ডিসেম্বরের পুণ্য বাসরে জগতের মুক্তিকল্পে স্বয়ং ভগবান শিশুরূপে কায়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই দেখুন, আজ সমস্ত খ্রীষ্টসাম্রাজ্য বিশ্বাসে জাগ্রত-প্রাণ হ'য়ে মহোল্লাসের মহাধ্বনি তুলিয়াছে। ঘরে বাহিরে লোকের মুখে দুঃখ বিষাদের লেশ নাই, পথে মাঠে একটা উত্তাল আনন্দোচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছে, হিমানীপরিজড়িত প্রকৃতির মুখেও যেন একটা বৈজয়ন্তী ছটা উদ্ভাসিত হয়েছে। ক্রিশ্‌মাস খ্রীষ্টান-সাধারণের এক মহা পর্ব্ব, ইংরাজের একমাত্র ও সর্ব্ব প্রধান জাতীয় মহোৎসব।

ধর্ম্মের সঙ্গে বাঁধাবাঁধি থাকলেও ইউলপর্ব্বের (আপনি জানেন, ক্রিশ্‌মাসের অন্য আর একটী নাম Yule) দশমিক নয় সহস্র নয় শত নিরেনব্বই অংশ সাধিক আনন্দোপভোগ লইয়া। অবশ্য, আমার এই উক্তি শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, বড়দিনে গির্জ্জার ঘণ্টা রবিবারের চেয়ে সংখ্যায় ও বারে অধিকবার বাজে না; অথবা রবিবারের চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের সমাগমও

গির্জ্জায় হয় না ; অথবা ধর্ম্মালয়ের ভিত্তি, বেদী, চ্যাপেল, বক্তৃতামঞ্চ প্রভৃতি অন্য উপাসনার সময়ের ন্যায় নগ্ন, অসজ্জিত বা অশোভিত থাকে। না, আমি এ রকম কোন একটা ঈর্ষামূলক অসাধু ভাব পরিজ্ঞাপন করছি না। তবে আমি বলতে যাচ্চিলাম যে, বাহ্যিক আঁটা আঁটি বাঁধাবাঁধি, আদব কায়দা পরায়ণ ইংরাজ জাতির অনেক কাজ নাকি ডব্‌ ক্লকের মতন যথাসময়ে নিয়ম পালনের ন্যায় করা হয়—হৃদয়ের সহিত যোগ থাকুক্‌ আর না থাকুক—তা এই মহা উৎসব উপলক্ষেও ধর্ম্মের অংশটা তেম্নি নিয়ম রাখার ন্যায় পালন করা হয়। ক্রিশমাস পর্ব্ব সর্ব্বসমেত বার দিন ব্যাপিয়া হয়। সমুদয় প্রটেষ্টাণ্ট পর্ব্বে এ প্রথা পালন করা না হলেও, আমাকে সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হচ্চে যে, রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসবের দ্বাদশ দিবসই গির্জ্জায় উপাসনা ও আরাধনার ত্রুটি হয় না। যিশুর শুভাগমন প্রতীক্ষায় রোমীয় সম্প্রদায় ক্রিশমাসের পূর্ব্ব রাত্রি জাগরণে (Vigil) যাপন করে। প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের দ্বার (হাই চার্চ্চ ছাড়া) সে দিন একবারও খোলা হয় না। ক্রিশমাসের দিনে অবশ্য গির্জ্জার 'ভার্জার' বেচারার কষ্টের সীমা থাকে না। কেননা, ভোর ছটা থেকে রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে উপাসনার সময় বাদ দিয়ে, বেচারাকে অবিশ্রান্ত ঘণ্টা বাজাতে হয়। ভোর ছটা শুধু বল্লে, আপনি হয়ত ঠিক বুঝবেন না, ভার্জারের পোয়ের কষ্টটা এত কিসের? আজকাল শীতকালে এদেশে সূর্য্যদেব ওঠেন বেলা আটটার সময়। সাতটা, সওয়া সাতটার সময়ও, যদি বেশ পরিষ্কার সকাল হয়, কোয়াশা বা মেঘ না থাকে, জানলা দিয়ে দেখলে রাত দুপরের অমানিশার ন্যায় প্রতীত হবে। তা ভাবুন, সেই আঁধার নিশিতে আর এই ডিসেম্বরের নিদারুণ শীতের প্রকোপ উপেক্ষা করেও, ভার্জার মহাশয়কে একাকী গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিয়ে প্যারিশের ধার্ম্মিকপ্রবরদের প্রাতঃ নিদ্রার নিঘোর ভাঙ্গাতে হবে। আমি ত বলি যে, তাঁহার এ নিষ্ঠুর শীতে নিজের গরম শয্যা ও গরম কম্বলের আরাম পরিত্যাগ করে, আপনার ও আমার জন্য চার্চ্চের ঘণ্টা বাজাতে আসে, তার এই ত্যাগস্বীকার এক মহা ত্যাগস্বীকার। আর সে যদি আর কোন পুণ্য কার্য্যও জীবনে না করে থাকে, এই মহা ত্যাগ-স্বীকারের সঞ্চিত পুণ্যরাশি নিশ্চয়ই তার জন্য স্বর্গের দ্বার অর্গলমুক্ত করে দেবে। হাঁ, আমি মনে করেছিলাম, বড় বড় পাদরি সাহেবরা ও ধর্ম্মোপদেষ্টারা নিজেদের জন্য যদি ধর্ম্মালয়ের এই নিকৃষ্টতম কর্ম্মচারীর ত্যাগস্বীকার ন্যায় এম্নি একটু কোন সামান্যতম পুণ্যেরও যোগাড় করতে পারতেন, স্ব স্ব সুদীর্ঘ জীবনে, তাহলে, অন্য সব কৃত বা অকৃত পাপের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, ধর্ম্মবেদী হতে ধর্ম্মের নামে কপটতায় যে সকল পাপ জাল আপনাদের চতুষ্পার্শ্বে রচনা করেন, শেষের হিসাবের দিনে সে পাপ জাল্‌ হতে মুক্তি লাভের একটা আশা থাকত! কিন্তু, কৈ, এই সব মোটা মোটা বেতন-ভোগী, বিলাস-বাসনপ্রিয়, ঘোর সংসারী,—উপদেশপ্রিয়, উপদেশ-পালন-বিমুখ, 'ওষ্ঠ'-ধর্ম্ম-যাজকদিগের এমন একটু আশাও ত দেখছি না।

যাক্‌ ধর্ম্মের কথা। আপনি দেশের খ্রীষ্টসম্প্রদায়দিগের অবস্থা হতে সবই জানেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম আপনার দেশেও যেমন

জীবনশূন্য, কেবল কতকগুলি পুঁথিগত কথায় আবদ্ধ, এখানেও সেইরূপ। গির্জ্জায় যান, উপাসনার সময় দেখবেন, উপাসকমণ্ডলী কেবল দাঁড়াচ্চেন বা হাঁটুপেতে বসচেন, অথবা কতকগুলো ন্যাষ্টেম গানের সুরে আওড়াচ্চেন, অথবা বাঁধা প্রার্থনার বুলি মন্ত্রের মত সমস্বরে উচ্চারণ করচেন। এ দেখলে ধর্ম্মের যে একটা জীবন আছে, কে ভাবতে পারে? উপদেশ শুনুন, যাজক মহাশয় লিখিত উপদেশ পাঠ করচেন। সেরূপ পঠিত বক্তৃতায় উপাসকমণ্ডলীর নিদ্রার বেগটা যে অতি প্রবল হবে, তা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। আমি ভাবতে পারি না, থ্যারিশ্‌ড্ চার্চ্চের যাজকেরা বেশ শিক্ষিত, (অন্ততঃ যে রকম মোটা বেতনের হার আছে, তাতে বেশ শিক্ষিত লোকের চার্চ্চে প্রবেশ করবার বেশী সম্ভাবনা মনে করতে পারা যায়) তবুও অনেকেই কেন মৌখিক উপদেশ প্রদানে অপারগ। ধর্ম্মোপদেশ হৃদয় থেকে সতেজ ভাষায় উদ্গারিত না হলে কি কখন প্রাণস্পর্শী হতে পারে? আমার বিবেচনায়, ইংরেজ উপাসকমণ্ডলীর ধর্ম্মালসভাব অনেকটা ধর্ম্ম যাজকদিগের জন্য। যাজকেরা যদি আপনাদের জীবনে ও কার্য্যে, কথায় ও দৃষ্টান্তে ধর্ম্মের জলন্ত আগুন শিখা প্রদর্শন করিতে না পারেন, উপাসকমণ্ডলীর প্রাণ কখনই তাঁদের মৃত ও নির্জ্জীব উপ দেশে প্রণোদিত হবে না। আমি ভেবেছিলাম, অন্ততঃ সম্বৎসরের মধ্যে একদিন, শুধু একদিন নয়, এক বিশেষ মহোৎসবের দিন, নিশ্চয়ই কেবল যাজক নয়, সমগ্র খ্রীষ্টান জাতি তরুণ ধর্ম্ম কিরণে সমুজ্জ্বল হবে। ভেবেছিলাম, ক্রিশমাসের সময় গির্জ্জায় ভক্তির ও প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখব, জলন্ত বক্তৃতায় সারগর্ভ ও উৎসাহপূর্ণ ভাবের বিকাশ দেখব। ভেবেছিলাম, খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের উপলক্ষে, অন্ততঃ ভজনালয়ের মধ্যে ধর্ম্মোপাসনায় একটা মাখামাখি ও গদগদভাব দেখব। তা—আপনি নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছেন, আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম। যেমন ইংরাজিতে বলে "I spare you the repetition"

ধর্ম্মভাবের স্ফূরণ না দেখলেও, দর্শক ধর্ম্মালয়ের সুসাজ দেখিয়া মনে করতে পারেন যে, একটা উৎসব হচ্চে। ইংরাজ জাতি আদব কায়দা ও বাহ্যিকতা প্রিয়, এটা বোধ হয় আপনি জানেন। সুতরাং উৎসব উপলক্ষে চার্চ্চ সাজানের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখান হয় না। যে কোন চার্চ্চে প্রবেশ করুন, দেখবেন, চিরহরিৎ পল্লব, নানাবিধ পুষ্পস্তবক দ্বারা উহার বিশেষ বিশেষ অংশ অতি সুন্দর মনোজ্ঞ ভাবে সাজান হয়েছে। লণ্ডনের পশ্চিমাংশটা pulse proud ধনী ভদ্রলোকদিগের দ্বারায় অধিবাসিত। এই অংশের গির্জ্জাগুলি, সেই জন্য, অন্যান্যাংশের গির্জ্জাপেক্ষা খুব ভাল করে সাজান হয়ে থাকে। তা না হলে ধনীর ধর্ম্ম চিন্তা ভাল হবে কেন? শুনুন, সংবাদ পত্রের ভবঘুরে সংবাদদাতারা—(এরা নিশ্চয়ই জনসাধারণের অতীব কৃপাপাত্র, কেন না, এমন ধর্ম্মোৎসবে কোথায় নিঃশব্দে সংগোপনে হৃদয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করে মানুষ উচ্চ ধর্ম্ম চিন্তায় সময়াতিপাত করবে না, এ বেচারিরা বিপুল লণ্ডন সহরের বিবিধ নগরীর ও উপনগরীর ধর্ম্মালয়ে পরিভ্রমণ করে গির্জ্জা ঘরগুলি কেমন সাজান হয়েছে, কত লোকের সমাগম হয়েছে এবং কে কি বক্তৃতা পাঠ করলেন, আর কোন কোন সাময়িক সংগীত অর্থাৎ ক্যারল গাওয়া হ'ল তারি সংবাদ গ্রহণে ব্যস্ত।)

কি সংবাদ দিয়াছেন,—

"Notwithstanding the fog and frost vast congregations were present at the morning services in St. Paul's Cathedral and Westminster Abbey (এ দুটিই লণ্ডনের অতি সুবিখ্যাত ও প্রাচীন ধর্ম্মালয়) and there were crowded attendances at other of the more popular places of worship .... The decorations this year have been on a most extensive scale. Those at St. Paul's Cathedral and the Abbey—the latter especially were marked by extreme simplicity, but in the chapels Royal and the Fashionable West-end churches the floral adornment of the alter, chancel, chancel-screen and pulpit was very beautiful and the general effect most striking. Arum lilies, white chrysunthemums, and eucharist roses were chiefly used for alter decorations, but in many instances the nurcissus, hyacinths, stephanotes, and red and white tulips were also requisitioned ....."

অন্য গির্জ্জার সাজান বর্ণনা করতে করতে আরো ঢের দাঁত-ভাঙ্গা ফুলের নাম উল্লেখকরা হয়েছে, কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্চি, বড় বড় ল্যাটিন শব্দ বাচক ফুলের নাম শুনে আপনি হাই তুলবেন। তাই আর বেশী উদ্ধার করিলাম না। কিন্তু কেবল ফুল নয়, নানা 'evergreen' চিরহরিৎ পল্লব দ্বারাও গির্জ্জার অন্তরঙ্গ পরিশোভিত হয়। আমি এক চার্চ্চে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখলাম, বক্তৃতা মঞ্চের অর্থাৎ pulpit পেছনের এক স্তম্ভে সবুজ পাতার উপর লাল ছোট ছোট ফল Berries দিয়ে দিব্যি একটি ক্রশ প্রস্তুত করেছে। তা ছাড়া, পুলপিটের গায়ে দিব্যি পাতা ও লতা দিয়ে খুবরি খুবরি ঘর তৈরি করেছে। Evergreenর মধ্যে হলি (holy আর আইভি (Ivy) গির্জা সাজানে বিশেষ ব্যবহৃত হয়। পশ্চাতে ইহাদের সম্বন্ধে আরো বলিব।

আমি যদি বিলাতে বড়দিনের কথা বলতে বলতে উহার ধর্ম্মাংশের কথা ঐ পর্য্যন্ত বলে ফুলষ্টপ দিই, তাহাতে বোধ হয়, আপনার পাঠকেরা আমার উপর রাগ করবেন না। কেননা, গোড়াতেই বলেছি, ক্রিশমাসের সঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্মের বা ধর্ম্ম-ভাবের সম্বন্ধটা নিতান্তই "মাইক্রসকোপিক" পরিমাণের। বিশেষতঃ আমার উদ্দেশ্যও নয় যে ক্রিশমাস উপলক্ষে আপনার অপক্ষপাত ও সমদর্শী পত্রিকার স্তম্ভে একটা প্রকাণ্ড সার্মণ আওড়াই। এই মহোৎসব সম্পন্ন করবার সময় এদেশে অনেক গুলি সামাজিক ও গার্হস্থ্য রীতি-নীতির অনুসরণ করা হয়। আমাদের দেশে থেকে, সাধারণতঃ এই পদ্ধতি ও রীতি গুলি দেখতে পাই নাই। পদ্ধতি গুলির বিশেষত্ব আছে বলেই আমাদের চখে লাগে। আর সেই জন্যই, সহিষ্ণু পাঠক, এই প্রবন্ধের অবতারণা। এইখানে আমার Prologue শেষ হল ; এবার Play আরম্ভ হবে।

পাঠকের মনে থাকচে, আমি পেছনে কোন এক যায়গায় বলে এসেছি, ক্রিশমাস পর্ব্ব ইংরাজের একমাত্র ও সর্ব্বপ্রধান জাতীয় মহোৎসব। যদি আমরা আশে পাশে চেয়ে দেখি, দেখব, সকল প্রধান জাতিরই এমনি একটা না একটা মহা পর্ব্ব বা জাতীয় মহোৎসব আছে। হিন্দুর দুর্গা পূজা, মার্কিনের ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-ডে, মুসলমানের মহরম, প্রভৃতি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। বৎসরান্তে অন্ততঃ একদিন বা এক সময়ে পরিবারের সকলে সমবেত হয়ে পরস্পরের প্রীতি ও শ্রদ্ধার আদান প্রদান ; আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবে সুজনতার বিনিময় করে পরস্পরের মিলন ; প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীর পরিচয়-মূলক আলাপ ও সম্বর্দ্ধনা দ্বারা পারস্পরিক সদ্ভাব পরিবর্দ্ধন—কোন এক জাতির উন্নতি ও বর্দ্ধনের সঙ্গে—জাতিগত একটা বিশেষ অভাব হইয়া দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই আমরা সেই অভা-

বের বশবর্ত্তী হয়ে যদিও অনেক সময়ে ভেবে চিন্তে বা বিচার করে এইরূপ কোন একটা উপায় অবলম্বন করতে যাই না—আমাদের জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটী এমন কাল নির্দ্দিষ্ট করি (তার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ থাকতেও পারে নাও আসতে পারে, যেমন মার্কিনদের থ্যাংক্স-গিভিংডে) যে সময়ে বা দিনে আমরা সকলে সমগ্রজাতি একটী মানুষের মত উঠি ও আনন্দোৎসব করি। যে সময়ে আমরা হৃদয়ের অসাম্য ও অনৈক্য মুছিয়া ফেলে, হৃদয়ের মিলন ও একতা সাধন করি। যে সময়ে পিতা পুত্র, স্ত্রী কন্যা, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসী ও পল্লীবাসী, ধনী নির্ধন, প্রভু ভৃত্য, বালক বৃদ্ধ, ক্ষুদ্র মহৎ প্রভৃতি, নানাবিধ পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া, একতায় ও সমতায়, সহৃদয়তায় ও সুজনতায় উদার প্রীতির ও সাম্যনীতির বিশ্বপ্লাবী গভীর ভাবসমুদ্রে নিমজ্জিত হই। সেই সর্ব্বজনীন আনন্দের দিন ইংরাজের ক্রিশমাস পর্ব্ব। ধর্ম্মের সহিত উহা বিজড়িত হইলেও, উহার সামাজিক ও পারিবারিক প্রাধান্য যত, এত আর কিছুই নয়। সম্বৎসরের তিন শত পঁয়ষট্টি দিবসের মধ্যে তিন শত চৌষট্টি দিন লক্ষ লক্ষ প্রাণ এই একদিনের জন্য আশাপূর্ণ প্রাণে ভবিষ্যতের আঁধারময় পথের পানে চাহিয়া থাকে, কবে সেদিন আসিবে!! ক্রিশমাস আসিতেছে, এই আনন্দে প্রাণ উৎফুল্ল, এই ভেবে নয় যে, সেই দিনে মনের আশা মিটাইয়া, প্রাণের আবেগ পুরাইয়া ভক্তপ্রাণ ভগবৎ চরণে প্রেমের অঞ্জলি দিবে, কিন্তু এই ভেবে যে, দূরস্থ আত্মীয় স্বজন ঘরে আসিবে; প্রবাসী সন্তান বা স্বজন, পিতা বা পিতৃব্য, বন্ধু বা অন্য কোন বিশেষ পরিচিত হৃদয়ের লোক একত্রে হার্থের চতুষ্পার্শ্বে বসে বৎসরের কথা কহিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিবে। এ যে একটা কি আশা, হৃদয়ের এ যে কি একটা অদম্য অথচ অতি স্বাভাবিক টানভরা আবেগ, তা ভাষায় বলবার নয়। ব্যক্তিনির্বিশেষে, বয়ঃ নির্বিশেষে, শিক্ষা-নির্বিশেষে, পদ গৌরব নির্বিশেষে, সকলের প্রাণ আহ্লাদে আট খানা, উৎসাহে উচ্ছ্বাসময়, প্রীতির বিকাশে ভরপূর। পাঠক! আমি কি আবার বলিব, এ আনন্দের ছড়াছড়ি, উৎসাহের হুড়াহুড়ি, আশার ছটপটানি ধর্ম্মোৎসবের জন্য নয়, ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, জাতিগত এক অনুপম মহা জাতীয় উৎসবের জন্য।

তাই দেখুন, ক্রিশমাসের কতদিন আগে থেকে (আমি ঠিক করে বলতে পারলাম না, কতদিন আগে থেকে; কেননা বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জানিয়াছি, ব্যবসাদারেরা, অন্ততঃ এক ক্রিশমাস ফুরাইলেই তারপর থেকেই পরবর্ত্তী ক্রিশমাসের জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়; আমি যথাসময়ে ইহার একটা উদাহরণ দেব) ব্যবসায়ীরা আপনাদের পণ্য দ্রব্য কেমন সুন্দর ও মনোরম ভাবে সাজাইয়াছে। বিলাতের দোকান পশার যেমন অশেষবিধ সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত হয়, ফরাসী ও মার্কিন ছাড়া অন্য কোন দেশে তেমন অথবা তার শতাংশের একাংশও দেখতে পাই নাই। আমার লেখনী নিতান্ত ক্ষীণ, আর লিখিবার শক্তিও নিতান্ত পরিমিত। সুতরাং আমি ইহার বিন্দুমাত্রও আভাস দিতে পারলাম না। আমি যদি বলি, মনে মনে কল্পনাকে, যতদূর সাধ্য, প্রসারিত করে বিলাতীয় দোকান পশারির অতুল তৈজস পত্রের দ্রব্য সম্ভারের চিত্র এঁকে নিন, তাহলেই কি আপনি প্রকৃত সাজ সজ্জা ও বিভব বিচিত্রতার সহস্রাংশের একাংশও মনে

করিতে পারবেন? আমার ত মনে হয়, তাও অসম্ভব। আজ এই মহাপর্ব্ব বলে নয়। ইংরাজের দোকান,দোকান সাজান, দোকানের অপরিমেয় দ্রব্য সামগ্রী, সকল সময়েই অতাব বিস্ময়পূর্ণ ব্যাপার। আপনি জানেন, লণ্ডন সহর, উপনগরগুলি লইয়া এক দিকে পনর যোল মাইল, অপর দিকে বার চৌদ্দ মাইল ব্যাস সম্পন্ন সহর। তা ইহার যে অংশেই যান, পথের দুই পাশে কেবল দোকান—সুরা, মিষ্টান্ন, চুরট, তামাক, কাপড়, জুতা, ছাতা, ছবি, টুপি, খবরের কাগজ, চা ও কফি, রুটি, মাংস, বই, ফল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, বাজনা, খেলনা, বেণে-মসলা, ফুল, বাইসিকল, দুধ, ব্যাঙ্ক,ইঞ্জিন ও কলকারখানা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—যত রকমের দোকান মনে করতে পারেন, তত রকমের দোকান শ্রেণী সারবন্দী ও promiscuously অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ভাবে বিস্তারিত রয়েছে। তারপর দোকানের সামগ্রী—ইহার সুমার হবার নয়, একেবারেই নয়। মনে হয় যেন জগতের সমুদয় ধন ঐশ্বর্য্য, স্বর্গের কুবেরের অশেষ ধনভাণ্ডার লণ্ডন সহরের সর্ব্বত্রে ঢালা রয়েছে। এত অর্থ, এত বিভব, দোকানের এত পারিপাটা, এত মূলধনের কারবার, বোধ হয়, জগতের আর কোথাও কেহ কখনও দেখবে না। আপনারা কলকাতায় হোয়াইটওয়ে লেডলর ব্যবসা দেখে তাক হয়ে থাকেন। মনে করেন, না জানি কত টাকারি ব্যবসা চালাচ্চে। তবুও ভাবুন, হোয়াইটওয়ে একটি কোম্পানী। এ দেশে কোম্পানি দোকানদার বেশী দেখা যায় না। এক এক জন একলাই কারবার করে। মূলধন নিজেরি সর্ব্বস্ব। তা, কারবার কত জানেন? এক এক জনেরি কারবার পঞ্চাশটা হোয়াইটওয়ের কারবারের চেয়েও বেশী হবে। ওয়েষ্টএণ্ডে হয়াইটালি বলে এক দোকানদার আছে, তার নামই Universal Provider. সে দোকানে দাঁত খোঁটাটি থেকে, রাজার মাথার ক্রাউন, ... সরঞ্জাম থেকে বিবাহের সরঞ্জাম একটি ফার্দিং ডিপ (farthing dip) থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত। খাবার শোবার শোবার,পরবার,মরবার ঘর কন্নার জগতের যার যা আবশ্যক, সব পাওয়া যায়। ভাবুন কি কারবার, কত কত টাকার কারবার! তা লণ্ডন সহরে একটি আধটি নয়, এমন শত শত হয়াইটালি কোটি কোটি টাকার কারবার করছে। আমি এ সব কেবল অন্তর্বাণিজ্য (inland) ব্যবসার কথাই বলছি। বহির্বাণিজ্য আমার আলোচ্য নয়। তা বলছিলাম, সব সময়েই লণ্ডণের সর্ব্বত্রেই দোকানের বাহার ও অতুল বিভবের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। এদেশে না এলে ইংরাজের দোকান ও দোকান সাজানের প্রকৃত ধারণ কোন মতেই হবার নয়। পূজার সময় দেশে বড়বাজারের দোকান ও দোকান সাজান দেখিছি। বিলাতের দোকান দেখে মনে হয়, সে সব নিতান্তই ছেলে খেলা; নিতান্তই অসার ও তুচ্ছ, প্রকৃতত্বের নিকট ছায়া যেমন, মহা মরুভূমির মধ্যে একটি বালুকা যেমন,পূর্ণ চন্দ্রের বিমল আলোকে আলোকিত আকাশে একটি ক্ষুদ্র জোনাকীর বিকাশ যেমন,বিপুল বিভব সম্পন্ন রাজ পরিবারের মধ্যে ক্ষুৎ-পিপাসার্ত্ত, শীর্ণকঙ্কালসার, ছিন্ন জীর্ণ মলিন-বাস, রুক্ষবেশ ধূসরিত-তনু পথের ভিখারী যেমন। হা পাঠক! এ রূপক-চিত্র আর আঁকিতে ইচ্ছা হয় না।

এখন কি বুঝবেন, এই ক্রিসমাসের

লণ্ডনের দোকান বিপণি অশেষবিধ পণ্য সম্ভারে কেমন সাজান হয়েছিল। ব্যবসায়ী যেমন আপনাদের ব্যবসা স্থল পরিষ্কার করে সাজায়, বাগলাণ্ডি। সেইরূপ স্ব স্ব বাসস্থল পরিষ্কার করে ও সাজায়। আমাদের দেশে পূজার সময় যেমন প্রত্যেক হিন্দুর ঘর এক পোঁচ হোয়াইট ওয়াস করে, এ দেশেও তেমি রীতি আছে। ঘরের বাহিরে হোয়াইটওয়াস না দিলেও, আমাদের দেশের প্রথার মত গৃহের অভ্যন্তর্দ্দেশ খুব ঝাড়া পোঁচা হয়। মেজের কার্পেট তুলে কার্পেট ঝাড়া, মেজের তক্তায় তার্পিন ও মোম মাখান, জানালার গ্লাস ছাফ করা, জানালার পর্দ্দা ধোলাই করা, ভিত্তি পরিষ্কার করা — এ সবই আমাদের দেশের মত। তা ছাড়া মেয়েরা আমাদের দেশের মত, গৃহের আসবাব পত্র পরিষ্কার করে ও নূতন ভাবে সাজায়, থালা বাসন ও অন্যান্য জিনিস পত্র, যা এত দিন দেরাজে বন্ধ ছিল, ঠিক আমাদের দেশের পাঠিকা ভগিনীদের ন্যায়, বাহির করে সাফ শুদ্ধ করে। বাগানের গাছ পালা ও ঘাস কেটে ছেঁটে পথ ঘাট পরিষ্কার ও মেরামত করে, মহোৎসবের জন্য ঘরে ও বাহিরে একটা পরিচ্ছন্নতার ও নয়নতৃপ্তির ভাব স্ফুটতর করে তুলে। গৃহী ও ব্যবসায়ী সকলেই ব্যস্ত। এত ব্যস্ততা, এত আয়োজন স্পৃহা, এত কথা বা সত্য কার্য্য-তৎপরতা, অন্য কোন সময়েই লক্ষিত হয় না। *

* ব্যবসায়ীরা লাভের প্রত্যাশায় ক্রিসমাস আসিবার অনেক দিন পূর্ব্ব হতে ত নানা সরঞ্জাম করিবেই। কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তিরাও অনেক দিন আগে থেকে নানা আয়োজন করিতে থাকে। তন্মধ্যে উপহার প্রস্তুত করা প্রধান। ক্রমে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিব। এখানে কেবল এই বলি যে, এ উপহার প্রস্তুত জন্য ইংরাজ মহিলারা, তা বালিকা হ'তে আরম্ভ করে সপ্ততিতম প্রবীণা পর্য্যন্ত দুমাস কিম্বা তাহাপেক্ষাও অধিকতর সময় পূর্ব্ব হতে নানাবিধ উপহার দিবার সামগ্রী প্রস্তুত করণে ব্যাপৃতা হয়। সুতরাং গৃহী বা ব্যবসায়ী ক্রিসমাসের অনেক পূর্ব্ব হতেই মহোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত থাকে। সে ব্যস্ততা ক্রমেই গভীর হতে গভীরতর, প্রবল হতে প্রবলতর ভাব ধারণ করে, যতই আনন্দের দিন, উৎসবের দিন নিকট হতে নিকটতর হয়। ঘরের বাহিরে, পথে ঘাটে যেখানে যান, যার সঙ্গে কথা কউন, কেবল ক্রিসমাসের কথা, ক্রিসমাস ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গ নাই যেন।' মহিলারা উপহারের সামগ্রী তৈরি করতে করতে ক্রিসমাস আসিবার অনেক পূর্ব্ব হতেই নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য, ছাতা, ও পেয় উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত আরম্ভ করেন। বাস্তবিক, যতই সময় নিকটবর্ত্তী হয়ে আসে, মহিলাদের মুহূর্ত্তও বিশ্রামের সময় অনেকদিন থাকে না। উপহার তৈরি, মিষ্টান্ন তৈরি, ঘর দ্বার ঝাড় পোঁচ, জিনিসপত্র মোছা ও সাজান, বস্ত্রাদি ধোয়া ও কাচা, নিমন্ত্রণের পত্র লেখা, নিজেদের নূতন পোষাক প্রস্তুত করণ, ক্রিসমাসের সময় কি কি আমোদ ও ক্রীড়া হবে, তার অনুষ্ঠান পত্র প্রস্তুত করণ (অন্ততঃ মুখে মুখে একটা ঠিক করে রাখা অথবা একটা মতলব আঁটা) ইত্যাদি অশেষবিধ ব্যস্ততায়, সর্ব্বাপেক্ষা ক্রিসমাসের অব্যবহিত পূর্ব্ব সপ্তাহটা, এমি হুলস্থূলে কাটায় যে, ডিনারের সময় ডিনার হয় না, সপারের সময় সপার হয় না, অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার ঠিক থাকে না। বাজার হাট করিতে, ঘর দোর সাজাতে, দেরাজবন্ধ

মূল্যবান জিনিস পত্র বাহির করতে ও পরিষ্কার করতে এবং অন্য সহস্রাধিক খুঁটি নাটিতে এত সময় যায় যে, আহার পানের নিয়মিত সময়েরও ব্যতিক্রম ঘটে।

আজ ক্রিশমাস ইভ্ অর্থাৎ উহার পূর্ব্ব দিন। ক্রিশমাসের জন্য যত কিছু করবার, আজ সব শেষ করাত হবে। সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া ত নিমন্ত্রণ পত্র ও কার্ড পাঠান হয়েছে, উপহারের প্যাকেজ বাঁধা ও পাঠান হয়েছে, হাট বাজার, কেনা বেচা শেষ হয়েছে, মিষ্টান্ন ও নানা খাদ্য সামগ্রী প্রায় প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু এখনও ঘরের ভিতর সাজান বাকী। অন্য দিন রাত্রি আটটার সময় সপার খাওয়া হয়। আজ দশটা বেজে গেছে, এখনও টেবিলে সপারের চাদর পাতা হয়নি। চাকরাণী অন্য কাজে ব্যস্ত। গৃহকর্ত্রীর মনে পড়ল, এখনও সপার খাওয়া হয়নি। তাড়াতাড়ি চাকরাণী টেবিলে সপার আন্লে। তাড়াতাড়ি সকলে সপার খেয়ে নিলে। খাবার জন্য বেশী সময় দিতে আজ কে পাবে? তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েই হলি, আইভি ও মিশলটো নিয়ে সকলে ডাইনিংরুম, কিচেন (পাকশালা) সাজাতে আরম্ভ করেছে। আজ হয়ত আর রাত্রিতে নিদ্রা হবে না। সমস্ত রাত্রি এই ঘর সাজাইতেই অতিবাহিত হবে। ছেলে মেয়ে, প্রৌঢ়া যুবতী আজ আনন্দে ও উৎসাহে সহস্র মত্ত হস্তীর বল পেয়েছে। দৌড় ধাপড়, ওঠানামা সহস্রবার করছে; করে, মনের মত রুচিসঙ্গত নানা প্রকারে দেয়ালের গায়ে, ছবির গায়ে, ম্যাণ্টল পিসে, দ্বারের মস্তকে, গবাক্ষের উপরে হলি, আইভি, লরেল ও মিশ্‌লটো দিয়ে সাজাচ্ছে। এ ব্যস্ততার তরঙ্গে পড়লে, অতি নির্জ্জীব ও অসাড় প্রাণেও যেন এক বৈদ্যুতিক তেজের সঞ্চার হয়। রাত্রি শেষই হোক, আর যাই হোক, কল্যকার জন্য কিছুই অসম্পূর্ণ রাখা হবে না। তাই এত ব্যস্ততা।

ক্রিশমাস ইভে কতকগুলি প্রাচীন প্রথার অনুসরণ আজও করা হয়। মানুষ শিক্ষা ও উন্নতিতে যতই অগ্রসর হ'ক, প্রাচীন ও চিরাগত প্রথার শিকল সহজে ছেদ করতে পারে না। হয়ত সে সব প্রথা এখন নিতান্তই নিরর্থব্যঞ্জক, হয়ত পূর্ণ কুসংস্কার; তথাপি প্রাচীন প্রথার অনুষ্ঠানেই যেন জয়োল্লাসের সারবত্তা, আনন্দোচ্ছ্বাসের ঘনত্ব, উৎসবের মহানন্দ। একটি হচ্ছে, হার্থে বা উনুনের মধ্যে ইয়ুল বুক্ স্থাপন। ইয়ুল বুক্, বা ইয়ুল-লগ বা ইয়ুল-ক্লগ আর কিছুই নয়, কেবল একখণ্ড মোটা গুঁড়ি কাঠ। পুরাকালে, নানা অনুষ্ঠানের সহিত ও মহা সমারোহে ক্রিশমাস ইভে উনুনের মধ্যে এই কাষ্ঠখণ্ড স্থাপন করে জ্বালান হ'ত। এ দেশে নাকি, পঞ্জিকাকারদের হিসাব মতে ২১ ডিসেম্বর থেকে ২০ মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রকৃত শীতকাল। আর শীতকালে অগ্নিসেকটা নিতান্ত অপরিহার্য্য ও আবশ্যক, সেইজন্য, যদিও উক্ত সময়ের অনেক পূর্ব্ব হতেই হার্থের মধ্যে আগুন জ্বলে থাকে, শীতের নিদারুণভাব উপশম জন্য, এই 'ইভের' দিন ঘটা করে প্রকৃত পক্ষে যেন শীত তাড়াইবার উদ্দেশে ইংরাজের উনুনের মধ্যে অগ্নি স্থাপন করা হয়। এই সময়ে হার্থের গ্রেট সরাইয়া, হার্থের উপর প্রকাণ্ড কাষ্ঠের গুঁড়ি জ্বালান হয়। এরূপ কাষ্ঠের আগুন ক্রিশমাস পর্য্যন্ত থাকবে। বর্ত্তমানে ইয়ুল-লগ স্থাপনের কোন ঘটা নাই, আর স্থাপনের সময় কোন বিশেষ অনুষ্ঠান অবলম্বিত হয় না। কিন্তু প্রথা আজও প্রত্যেক গৃহীর ঘরে পালিত হয়। ক্রিশমাসের সময় দ্বারে দ্বারে ফায়ার প্লেসে গুঁড়ি কাঠ, কোক কয়লার সঙ্গে জ্বালান হবে। ক্রমশঃ

শ্রী[illegible] রায়।

স্বর্গীয় মহাত্মা গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ। (২)

আমরা দেখিয়াছি, বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমাজের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির প্রতি ফিরিয়া দেখেন নাই, অথবা হিন্দু শাস্ত্রের চির-অনুরাগী তিনি হিন্দু-শাস্ত্রের গৌরবরাশির সহিত তাহার দোষ দুর্ব্বলতাও সরল হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। এ জন্য অনেকে অনেক সময় তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ-বাক্য-বিষ বর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুখের বিষয়, হিন্দু-সমাজের প্রধান আচার্য্যেরাই আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত বুদ্ধিতে তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-কুলচূড়ামণি ভুবনমোহন ন্যায়রত্ন ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন-প্রমুখ মহামহোপাধ্যায়গণ মহাত্মা গোবিন্দমোহনের অগাধ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র মীমাংসায় মুগ্ধ হইয়া আশীর্ব্বাদের সঙ্গে তাঁহাকে বিদ্যাবারিধি উপাধি উপহার দ্বারা প্রকৃত গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন এবং সুপণ্ডিত সমাজ উদার ভাবে তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে যাইয়া "অভিনন্দন পত্রে" বলিলেনঃ—

"অথানন্দয়তি নঃ কায়স্থকুল মলয়চন্দনো বারেন্দ্রঃ শ্রীযুক্তোগোবিন্দমোহন নামধেয়ো রায়ঃ। যস্য চ পুরা বাল্যাদারভ্যৈব একদেশ জন্মনৈব গৌড়বঙ্গ-প্রণয় বশীভূতেব সম্যগেব অপ্রীয়ত বঙ্গদেশভাষায়া ভগিনী। ততোঽপি প্রায়শঃ পঞ্চদশবর্ষ দেশীয়স্য তস্য নৈসর্গিক বিদ্যাঙ্গনাং উর্দ্ধমুখ দর্শন সুখমপি প্রত্যভিজ্ঞা নাসীৎ। তত্রৈব দুতিকৃতচাতুর্য্যেন সাকৃষ্টা হৃদয় মস্যাবগাহতে চ পারমস্যা রাজ্ঞী বিশেষস্য যবনমুখ নৃত্যকারিণী ভাষা।

"বর্ত্তমানেতু পরমবিদ্যাতত্ত্ব বুভুৎসোরমুষ্যাচ সংস্কৃত শাস্ত্রেষ্বপি দৃশ্যতেহি ভূয়সী চর্চ্চা। তথাপি স্মৃতিষু ভাগবতেন বর্ত্তমানো হরিবাসরতত্ত্ব সারোহনেনৈব প্রকাশিতঃ। জ্যোতিশ্চ কৃত সংস্কৃত প্রমাণং "ভূগর্ভী ভূগোল তত্ত্বঞ্চ। সামান্যেষ্বপি আচরণবিদ্যাবিকৃতির-পাদেনৈব বিকসিতা। যস্তাবহাসুচ "কৈলাস-চরিতঞ্চ।" যদন্যমপাস্য দর্শন দর্শমমানন্দয়তি চ হৃদয়পঙ্কজং গুরূণাম্। কানাকোটিরেবাপি পতিতমস্য চক্ষুঃ। যেন চ পুনর্ভাষাবান্ধবে ক্যো গতোহস্যানেকস্য ক্বাত্তোহস্য কশ্চিৎ সংস্কার বিশেষঃ। তদেবাস্য গ্রন্থা-নিচ তানি তানি পঞ্চলক্ষণাদিনি ইতিহাস বিমিশ্রানিচ কল্পস্থস্যোপ কতকিং হৃদয়ং জ্যায়ানাং। তস্যৈব উপ-বৃংহিতবিদ্যানদীমাতৃকেঽস্মিন্ ক্ষেত্রে হৃচরিতশস্যাবা-মেনাশা নবসঞ্চারজাগামিতি কি বাক্য বিচিকিৎসা। তথাহিমূল মনিরাময়ন্ত পুরা বিনিশ্চয়স্য পরমেষ চর্ম্ম-চিরং কাঠিকষ্ট কুৎসামশকঞ্চ নির্ম্মাসয়াঞ্চক্রে। অয়-মেকঃ পরিপুষ্পান্তিচ জ্ঞানপঞ্চাস্যং। তস্য স্বপ্নাবপি সিংহাসনস্থস্যায়েন ভয়েনচ বাতিব্যস্তা নৈব সংপ্রবি-শন্তি ব্যসননাম মত্তমাতঙ্গাঃ।

" কিং বহুভিঃ কৌমারে বয়সি বর্ত্তমানে চ বর্ত্তমানস্য কাকিনীয়াধিপতে ভূমিভাষাস্য অপকম্পা পরামর্শবিহঙ্গিকং নিয়মশৈক্য নিগড়ঞ্চ গুরুতরং অতএব সুদুর্দ্দহঞ্চ অপরিণতবিয়নোঽসমাসস্যোমপি বিদিতা ধৃতধনুরিব মনসাপি দুরাক্রমণীয়ং রাজ্য-ভাগুসমুদ্দীপিত প্রকৃতিরঞ্জকযশঃ সমুদ্রহৃদপি কাকি-নীয়া রাজ্য মহাভারং পতধাতোরর্থ স্যানভিজ্ঞঃ; স এবাস্য সচ্চারিত্রস্যং পরীক্ষায়া নিকষঃ। বয়মপি দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বাস্যচ বিদ্যাবিজৃম্ভিত সচ্চারিত্র্যং ছাত্রস্নেহ বিনয়েন সমাদরেণ মন্ত্রেণৈব বচসৈব সম্প্রীতাঃ এনমদ্য ভাস্বদায়ুপযুক্তং সন্ধ্যাচ বিচার্য্যচ উৎসাহার্থং অপূর্ব্ব-তয়া বিদ্যাবিনোদ নাম্নৈব নৈবোপাধিরত্নেন চ বিভূ-ষিতং করবামঃ। অদ্যাবধি তমেনং বিদ্যাবিনোদমিতি জানীমশ্চ। ভগবানপি পূরয়তু তাবদস্য মনোরথং চিরয়তু চ শুভায় জীবিতঞ্চ। পশ্যতু জনতাং তাবৎ-অমুষ্যাদ্য কীদৃশী শোভা। ইদমপি বক্তব্যং উপমায়-লালিত্যবিক্ষোয়নঙ্গশোভালঙ্কারোঽদ্ভূতপূর্ব্বশ্চ কায়স্থঃ সন্ ভূষয়তু কায়স্থনামসন্নীতি মল্লিনাথাদাভিচ্ছা। অলমতিবিস্তরেণ। স্বস্ত্যস্তু।"

"বারেন্দ্রকুল-প্রসূত কায়স্থকুলের মলয়-চন্দন স্বরূপ শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় মহাশয় আমাদিগকে যারপরনাই আপ্যায়িত করিয়াছেন। একদেশে উভয়ের জন্ম হইয়াছে, এই কারণ বশতঃ বঙ্গভাষারূপ ভগিনী সোদরপ্রণয়ে বশীভূতা হইয়া বাল্যকালাবধিই ইহঁার প্রতি অত্যন্ত প্রীতা রহিয়াছেন। পরে সেই মহাত্মা প্রায় পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে বিদ্যারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বুদ্ধিবৃত্তীয় চাতুর্য্যে যবন মুখরূপ রঙ্গভূমির নর্ত্তকীস্বরূপ পারস্যাদি যাবনিক ভাষাকেও বিলক্ষণ আয়ত্তীভূতা করিয়াছেন। ইদানীং পরমার্থ বিদ্যাতত্ব জ্ঞান ইচ্ছাবশতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রেও ইহঁার ভুরি পরিমাণে চর্চ্চা দেখা যায়। ইনি স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে দুইভাগে বিভক্ত "হরিবাসর তত্ত্বসার" নামক পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ইহঁার কি পরিমাণ অধিকার আছে, "মৃণ্ময়ী" নামক ভূগোলতত্বই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। বঙ্গভাষায় "কৈলাসচরিত" নামক একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। সম্প্রতি "অষ্টাদশবিদ্যা" নামে আর একখানি পুস্তকও লিখিয়াছেন। ইহঁার দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান ও গুরুদিগের হৃদয়কমলকে আনন্দিত করিতেছে। কাব্যশাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ বিষয়েও ইহঁার বিশেষ দৃষ্টি আছে, বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান সঙ্কলন ও রচনা সাধন সম্বন্ধে ইহঁার একটি বিশেষ সংস্কার জন্মিয়াছে। ইনি দুশ্চরিত্রদিগের কুতর্কাক্রান্ত অপবিত্র হৃদয়কে ইতিহাস বিমিশ্র পুরাণাদি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা কম্পিত করিয়া থাকেন। এই সকল কারণবশতঃ বিদ্যা নদী-মাতৃক-ক্ষেত্রে সচ্চরিত্রতারূপ শস্যেরই আশা করা যাইতে পারে,—সচ্চরিত্রতা শস্য থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ইনি বাল্যকালেই দেহরূপ মন্দির হইতে পরদ্বেষচর্য্যচর্চ্চিকা ও ভ্রান্তি-সন্তাপকর গরকুহকরূপ মশককে ঘৃণার সহিত নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এই মহাত্মা একটি জ্ঞানসিংহকে নিয়ত প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সেই সিংহ-ভয়ে বাতিবাস্ত হইয়া ব্যসনরূপ মত্ত মাতঙ্গগণ স্বপ্নেও ইহঁার নিকট গমন করিতে সাহসী হয় না। বলা বাহুল্য যে, ইনি ইতঃপূর্ব্বে এবং সম্প্রতিও প্রজাপুঞ্জরূপ-রত্নরাশি পরিপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ সুহৃর্দ্দহ কাকিনীয়া রাজ্য মহাভার, যাহা অন্যান্য অল্পবুদ্ধি দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের মিথিলা নগরীয় হরধনুর ন্যায় দুরাক্রমণীয়, তাহা অথও পরামর্শরূপ ভার-যষ্টী ও নিয়মরূপ শিক্য দ্বারা অক্লেশে বহন করিয়াও পদস্খলন কি, তাহা জানেন না, ইহাও ইহঁার সচ্চরিত্রতা রূপ স্বর্ণ সম্বন্ধে পরীক্ষার নিকষস্বরূপ হইয়াছে।

"আমরা ইহঁার বিদ্যাবিজৃম্ভিত সচ্চরিত্র্য বিলোকন করিয়া, ছাত্রত্ব, বিনয়, সমাদর ও মধুর বাক্যাদি দ্বারা অতীব প্রীত হইয়া, অন্যান্য পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার দ্বারা ইহঁাকে জ্ঞান চিহ্নের উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া অদ্য 'বিদ্যাবিনোদ' নামক সার্থ উপাধিরত্ন দ্বারা বিভূষিত করিলাম। অদ্যাবধি আমরা ইহঁাকে বিদ্যাবিনোদ বলিয়াই জানিব।" জগদীশ্বর সর্ব্বথা ইহঁার মনোরথ পূর্ণ ও জগতের হিতের জন্য জীবনকে দীর্ঘতর করুন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এই উপনায়ন্থলাভিষিক্ত অভূতপূর্ব্ব উপাধিরূপ অঙ্গ-শোভাকর অলঙ্কার কায়স্থ জাতীয়দিগের সমস্ত অঙ্গকে বিভূষিত করুক। আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের আশীর্ব্বাদে নিয়ত ইহঁার মঙ্গল বৰ্দ্ধন হউক।" *

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ভট্টাচার্য্যের অনুবাদ।

যাহা হউক, আরও সুখের বিষয়, মহাত্মা গোবিন্দমোহন স্বদেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাহা করিয়াছেন, সেই শুভ উদ্দেশ্যের সফলতা পক্ষেও তিনি সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া যান নাই। প্রাচীন গৌরবান্বিত স্বদেশের মহত্ত্ব ভুলিয়া আমাদের যে সব শিক্ষার্থী যুবক বিদেশের প্রসাদভুক্ হইতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকে বিদ্যাবিনোদের অভিনব গ্রন্থালোচনায় জাতীয় মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার "মৃন্ময়ী" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে মাতৃভূমির গৌরবগর্ব্বিত ও গুণগ্রাহী কতিপয় সুশিক্ষিত যুবক প্রকাশ্য পত্রিকায় বলিলেন,—

"পৃথিবীর সম্বন্ধে একরূপ পাশ্চাত্যশিক্ষা যে যে জ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করিয়া আমাদের প্রাচীন ভূগোল ও খগোল বিদ্যার প্রতি অভক্তি জন্মাইয়াছে, এদেশীয় গ্রন্থের ও বিদ্যার লোপই তাহার কারণ। সমস্ত বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ ও তাহার ব্যবহার এবং অনুশীলন এদেশে বিদ্যমান থাকিলে কোন বিদেশই কোন জাতি আমাদিগকে চমক লাগাইতে পারিতেন না। আমরা দীর্ঘকাল ঘোর অন্ধকারে পতিত থাকিয়া আপনার বিদ্যা, জ্ঞান, শাস্ত্র প্রভৃতি হারাইয়া এখন আপনাকে আপনি অপদার্থ দেখিতেছি। বিজ্ঞ যাহা অভিনব বলিয়া দেখাইতেছেন, তাহাতেই আমরা বিস্মিত হইতেছি। সার আইজাক্ নিউটন, গ্যালিলিও, কোপারনিকাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহা শিক্ষা দিতেছেন, তাহা তাঁহাদের জন্মগ্রহণের বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অনুশীলন হইয়াছিল, সুতরাং জ্ঞান আমাদের নূতন নহে। তত্ত্বাবতে আমাদের যে অধিকার ছিল, এই 'মৃন্ময়ী' তাহা আমাদিগকে বলিতে সমর্থ করিতেছে। সুতরাং এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট বঙ্গদেশ কৃতজ্ঞ হইলেন, সন্দেহ নাই। আমরা এই পুস্তক আমাদের কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রকেই এক একবার পাঠ করিতে বলি। * * বাল্যকালে বিদ্যালয়ে "ভাস্করাল কিল সকোর" গুরুগ্রন্থের নিকানিয়ু অংশ পাঠকালে আট্রাক্শন অব গ্রাভিটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করণার্থ আমাদের শিক্ষক সার আইজাক নিউটনের আখ্যান বর্ণন করিতেন; অদ্য প্রায় পাঁচ বৎসর পরে আমাদের অভিনব জ্ঞানকে এই "মৃন্ময়ী" সমুজ্জ্বলিত করিয়া বলিয়া দিলেন, "সার আইজাক্ নিউটনের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ভাস্করাচার্য্যের নিকট এই মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান ছিল।" "

পরন্তু, আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি যে, একদিকে মহাত্মা বিদ্যাবিনোদ যেমন অকপট হৃদয়ে জাতীয়গৌরব প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন, স্বদেশের গৌরব প্রকাশে তাঁহার যেমন অসাধারণ অনুরাগ প্রকাশ পাইত, তেমনই কখনই তিনি প্রকৃত সত্য প্রকাশের সময় জাতীয় পক্ষপাতের প্রশ্রয় দেন নাই। আমরা দেখাইয়াছি, তিনি একজন দৃঢ় হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাসী হইয়াও, শাস্ত্রোক্ত পক্ষপাত বিশেষের প্রতি সুতীব্র দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার 'সমালোচক' শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে 'স্বদেশহিতৈষণায় অন্ধ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মহাত্মা বিদ্যাবিনোদের জ্ঞানানুশীলনপ্রসূত কৃতকার্য্যরাশি সম্যক্ আলোচনা করিলে তাঁহার প্রতি এমন ভ্রান্ত সংস্কার কখনই থাকিতে পারে না। তিনি আপন জীবনেই 'সর্ব্বসত্যস্বগৃহিতম্' নীতি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। একদিকে স্বদেশের সমুদায় ভুলিয়া বিজিত দাসোচিত অনুকরণ, আর একদিকে অন্যজাতির কোনও প্রকার গুণ গ্রহণ না করিয়া কেবল যুক্তিহীন জাতীয় অভিমান এই উভয় দুরবস্থার প্রতিই তাঁহার আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। নিজের সাংসারিক জীবন এবং শাস্ত্রানুশীলন, এই দুই দিকেরই তিনি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। সংস্কৃতশাস্ত্রের

পণ্ডিত হইয়াও হিন্দুসমাজের চিহ্নিত ব্যক্তি হইয়া তিনি স্বদেশীয় সমাজ ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কেমন উদার অসাম্প্রদায়িক মত পোষণ করিতেন, তাহা আলোচনা করিলে ইহা মনে না হইয়া যায় না যে, বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে এদেশে এত সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিড়ম্বনা থাকিত না। 'অষ্টাদশবিদ্যা' নামক গ্রন্থে স্মৃতিশাস্ত্রালোচনা প্রসঙ্গে তিনি একস্থানে বলিতেছেন,—

"সমাজের বিশৃঙ্খলতা নিবারণই যে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য তৎবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; তবে আনুসঙ্গিক মোক্ষধর্ম্মও কথিত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের লৌকিকত্বের আরও প্রমাণ এই যে, ইহা চিরকাল একভাবে চলিয়া আসে নাই, এবং সকল স্মৃতি সংহিতাকারের একমতও নহে। ইহার বিধান যে সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহানুভব ঋষিগণ দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া যে সময়ে সময়ে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতেন, তদ্বারা তাঁহাদিগের মহত্ত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সামাজিক সুনিয়ম ও শান্তি সংস্থাপনই যে শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, দেশকাল পাত্র ভেদে তাহার পরিবর্ত্তনাদি যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায়। কলির প্রথমে পূর্ব্বপ্রচলিত সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতি কতকগুলি ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি সমাজের হিতকর বিধান রহিত হওয়াটি নিতান্ত অনুচিত ও ক্ষতিজনক বোধ হইতে পারে, কিন্তু যে সময়ে উহা রহিত হয়, সে সময়ে রহিত করিবার অবশ্যই উপযুক্ত কারণ ছিল। তৎকালে সমুদ্র পথ সকল অত্যন্ত বিপদজনক হওয়াতে সামুদ্রিক বাণিজ্যাদি রহিত হইয়া গিয়াছিল। যে তীর্থযাত্রা আর্য্যদিগের পরম ধর্ম্ম, তাহাও বিনাকারণে রহিত হইতে পারে না। শূদ্রজাতির মধ্যে দাস, গোরক্ষক কুলের হিতৈষী এবং অর্দ্ধসীরী (যাহার লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্রকর্ষণ ও শস্যোৎপাদন করাইয়া শস্যের অর্দ্ধেক দেওয়া যায়) ইহাদের সঙ্গে গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদির আহারাদি প্রচলিত ছিল ও শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণাদির পাককার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এ সকল নিয়ম রহিত হইয়াছে। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রাচীন কালে কেবল অন্নবিচারই জাতিভেদের কারণ ছিল না। তৎকালে ব্যবসায়ই জাতিভেদের প্রধান কারণ ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে এখন আর বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন নিবর্ত্তন হয় না। প্রাচীন সুসংস্কারের পরিবর্ত্তে এখন কুসংস্কার এদেশে একাধিপত্য করিতেছে, অথবা এখন সকলে আপনাকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। দেশের বা সমাজের মঙ্গলের দিকে কে অবলোকন করিবে? এখন সমাজ সংস্কারের আশা ভরসা কেবল স্বভাবের উপরেই নির্ভর করিতেছে। পরন্তু, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি দুই চারিটি বিধান রহিত হওয়া বর্ত্তমান কালে যেরূপ অহিতকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইরূপ নরমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, অতিথির নিমিত্ত পশুবধ এবং পাপে সংসর্গদোষ প্রভৃতি অধিকাংশ বিধান রহিত হওয়াতে যে বিশেষ উপকার হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।"

পরিশেষে তাঁহার যথার্থ ধর্ম্মমতের আভাষ মাত্র দিয়া আজ অগত্যা উপসংহার করিতে হইতেছে। মহাত্মা বিদ্যাবিনোদের জীবনে একাধারে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি মিশ্রণে যে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহা আমরা স্থানান্তরে ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা পাইব, কিন্তু আজ শুধু তাঁহার শাস্ত্রানুগত ধর্ম্মবিশ্বাস ও তাঁহার সর্ব্বজনীন উদার ভাবটি বুঝিয়া অধিক সুখী ও সন্দেহদোলায়মান হৃদয়ে আশা করি, প্রকৃত সত্যের আভাষ লাভ করিতে পারিব। ধর্ম্মপ্রসঙ্গে একস্থলে তিনি বলিতেছেন,—

"কুণ্ডল হইতে স্বর্ণকে পৃথক্ করিলে যেমন কুণ্ডল বলিয়া আর কিছুই থাকে না, অর্থাৎ কুণ্ডল এই উপাধি বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎকে পৃথক্ করিলে জগৎ বলিয়া কিছুই থাকে না। স্বর্ণ যেরূপ কুণ্ডলের কারণ, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের

বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত

রাজমালা

বা ত্রিপুরার ইতিহাস। মূল্য ২৲ টাকা। পোঃ ৶০আনা।

এই সুবৃহৎ উপাদেয় গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, প্রথম ভাগ—সূচনা, ত্রিপুরানামোৎপত্তি, পরিমাণ ও বিস্তৃতি, প্রাকৃত বিবরণ, পর্ব্বত, নদী, মৎস্য, বন্যদ্রব্য, পশু, হস্তীশিকারপ্রণালী, অধিবাসী, লৌহিত্যবংশ, তিপ্রা, স্বভাব, বাসস্থান, জুম, রাজকর, বিবাহ, দেবতা, ভাষা, রাজবংশ, বিবাহ, ধর্ম্ম, উত্তরাধিকারীত্বের নিয়ম, মুদ্রা, উপাধি, সাহিত্য, রাজমালা, গদ্যের উন্নতি, বংশাবলী। দ্বিতীয় ভাগ—ত্রিপুর-রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাস। তৃতীয় ভাগ—কাছাড় রাজবংশের বংশাবলী, মণিপুরের বংশাবলী ও ইতিহাস, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ এবং কুকিজাতির বিবরণ। চতুর্থ ভাগ—প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্য বা নওয়াখালী জেলার বিবরণ। ত্রিপুরা জেলার প্রত্যেক পরগণার ইতিহাস অনার্য্য ও আর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অধিবাসীর বিবরণ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আচার, ব্যবহার ও রাজস্বের ইতিহাস—ইত্যাদি। (৶+৬১+৫৯৬=) ৬৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

It contains a mass of interesting information and is a valuable contribution to the historical literature of Bengal. *Calcutta Gazette. 30 June 97.*

মোহমুদ্গর (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য /০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারণ; কিন্তু ঐশীশক্তির আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, ব্রহ্ম জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থাৎ নির্লিপ্ত; "ইদংহি বিশ্বং ভগবা নিবেতরো যতো জগৎস্থান নিরোধসম্ভবা" ইত্যাদি (ভাগবত প্রঃ ৫ অধ্যায়)

অত্র স্বামী যথা,—

"ইদং বিশ্বং ভগবান এব স তু অস্মাৎ বিশ্বস্মাৎ ইতরঃ ঈশ্বরাৎ প্রপঞ্চোন পৃথক ঈশ্বরস্তু প্রপঞ্চাৎ পৃথক্ ইত্যর্থঃ।"

তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম হইতে প্রপঞ্চ পৃথক নহে; কিন্তু প্রপঞ্চ হইতে ব্রহ্ম পৃথক্, এই মতটি অদ্বৈতবাদমূলক। অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নহে, ইহা পরমেশ্বরের মায়াশক্তি দ্বারা তাঁহাতেই কল্পিত মাত্র। বস্ত্র যেরূপ সূত্র হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু তন্তুবায় দ্বারা সূত্রেতেই কল্পিত হইয়া থাকে, জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মেতে কল্পিত। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অদ্বৈতবাদের প্রমাণ। এই অদ্বৈতবাদ হইতেই পুরাণাদিশাস্ত্রে প্রতিমাদি জড় পদার্থেও পরব্রহ্মের পূজাবিধি উক্ত হইয়াছে। জড় পদার্থে পরমেশ্বরের সত্তা আছে বলিয়া উহাতে পরমেশ্বরের পূজার বিধান উক্ত হইয়াছে, কিন্তু জড়পদার্থেই যে পরমেশ্বর শাস্ত্রে ইহা লিখিত নাই, বরং গীতাদিশাস্ত্রে জড়পদার্থে উক্ত প্রকার জ্ঞানের বিশেষ নিন্দাই লিখিত আছে যথা,—

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যেশক্ত মহৈতুকং।
অতত্ত্বার্থ বদল্পক তত্তামসমুদাহৃতং॥ (ভগবদ্গীতা)

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সমুদায় টীকাকারই এই শ্লোকের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কোন একটী মাত্র কার্য্যে যে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্থাৎ দেহে বা পাষাণময় প্রতিমাদি জড়পদার্থে এই পরমেশ্বর এতদতিরিক্ত পরমেশ্বর নাই এই প্রকার যে অযৌক্তিক ও অপ্রামাণিক জ্ঞান তাহা তামস, অতএব অতি হেয়। অজ্ঞানী মানবদিগেরই এইরূপ জ্ঞান দেখা যায়। এতদ্বিষয়ক সংস্কৃত টীকা ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের অন্যান্য প্রমাণ বাহুল্য রূপে বর্ত্তমান আছে। এস্থলে বিশেষ বিবেচ্য এই যে, শাস্ত্রানুরূপ প্রতিমাতে পরব্রহ্মের অর্চ্চনাকে 'পৌত্তলিকতা' বলা যাইতে পারে কি না? যাঁহারা যথাযথরূপে শাস্ত্রালোচনা করিবেন তাঁহারা নিশ্চিত ইহাই জানিতে পাইবেন যে, আর্য্যঋষিগণ প্রতিমাদিতেও পরব্রহ্মের সত্তা জানিয়া কনিষ্ঠ অধিকারীদিগের নিমিত্ত প্রতিমাদিতে তাঁহার অর্চ্চনার বিধান করিয়াছেন; কিন্তু প্রতিমাকেই পরমেশ্বর বলেন নাই। অতএব প্রাচীন ঋষিগণ যে পৌত্তলিক নহেন, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে। যাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ প্রতিমাদি জড়পদার্থেই ঈশ্বরবুদ্ধি করে, তাহারা যে পৌত্তলিক অথচ তামসজ্ঞানসম্পন্ন, ইহা শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। যাঁহারা নিন্দিতকর্ম্মবিমুখ প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, সৌভাগ্য বশতঃ যাঁহারা দুর্লভ ভক্তিরসে ভাবিতাত্মা, তাঁহারা রুচি অনুসারে যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, আমাদের একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র। অসৎকার্য্যপরায়ণ ভক্তিহীন ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব হউন, শাক্ত হউন, বা ব্রাহ্মই হউন, কেবল ধার্ম্মিকাভিমানী হইলেই আদরের পাত্র হইতে পারেন না। সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই পবিত্র ও ধার্ম্মিক হইল, এমত বোধ করাকেই সাম্প্রদায়িক ভাব বলা যায়। আস্তিক মাত্রই রুচি অনুসারে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধভাবে একমাত্র জগদীশ্বরেরই আরাধনা করিয়া থাকেন, প্রকারান্তরে সকলেই 'আমার প্রভুর অর্চ্চনা করেন', ইহাই মনে

করা উচিত। জ্ঞানীগণ কৃপা করিয়া অজ্ঞান জনগণের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার অপনোদনের অবশ্যই চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু কাহাকেই ঘৃণা করেন না। প্রসিদ্ধ মহিম্নস্তোত্রে প্রকাশ আছে, ঋজু কুটিলগামিনী নদীসকল যেরূপ কালসহকারে একমাত্র সাগরকেই প্রাপ্ত হয়, রুচির বিচিত্রতা হেতু ঋজু কুটিল নানা ধর্ম্মপথগামী মানবগণও সেইরূপ এক মাত্র জগদীশ্বরকেই লাভ করে; ধর্ম্ম বাস্তবিক একই পদার্থ, কেবল সাম্প্রদায়িকভাবই তাহাকে বহুবিধরূপে প্রতীত করে, যথা,—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় যেটুকু উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না যে, তাঁহার হৃদয় প্রচলিত সাম্প্রদায়িক মতবাদের গণ্ডী অতিক্রম পূর্ব্বক কত ব্যাপক ভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছে,—সাম্প্রদায়িক হইয়াও তিনি বিস্তীর্ণ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মপথাবলম্বীদিগের একমাত্র মূল উদ্দেশ্যের সহিত কেমন সহানুভূতির সহিত মিশিয়াছেন, কেবল মাত্র ভক্তি বিশ্বাস ও চরিত্রের পরিচয়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম নির্ব্বিশেষে জাতিগত সমুদায় পার্থক্য ভুলিয়া কেমন এক সার্ব্বজনীন একতার মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন! লোক শিক্ষার এই উচ্চ আদর্শকে শুধু আপন গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াই তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন নাই, হৃদয়ের এই স্বাভাবিক পবিত্র অভিলাষ তিনি জীবনে যথাসাধ্য পূর্ণ করিবার জন্য অন্তঃকরণে কোন প্রকার জাতি-বৈষম্য ভাবের ছায়া স্পর্শ করিতে না দিয়া নিরন্তর সাধুসাহচর্য্যের জন্য লালায়িত হইয়াছেন। হৃদয়ের এই মনোহর ভাবের জন্য তিনি তাঁহার সহিত পরিচিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত "উচ্চনীচ জাতীয়" সমুদায় নিষ্ঠাবান সজ্জনেরই প্রাণের অতি অন্তরঙ্গ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা গোবিন্দমোহন হিন্দু সমাজের কোন এক অতি নীচ বংশীয় ব্যক্তির ভগবৎসাধন-সুলভ ভক্তিময় জীবনের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সংসার ও সমাজ ভুলিয়া তাঁহার সহিত তিনি যেরূপ অভিন্ন হৃদয়ে অভিন্ন ব্যবহার করিতেন, সে দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইত। আপন পুত্র-কলত্র, কন্যা, পুত্রবধূকে ডাকিয়া লইয়া তিনি সেই প্রবীন মহাত্মার চরণধূলি মস্তকে লইতে বলিতেন, তাঁহারাও অবনত মস্তকে ভক্তির সহিত সে আদেশ পালন করিতেন। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া একবার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যাবিনোদের সম্মুখেই তাহার এই ব্যবহারকে অসঙ্গত প্রকাশ করায়, মহাত্মা গোবিন্দ মোহন প্রত্যুত্তরে ব্যথিত হৃদয়ে, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সেই আর্য্যঋষিদিগের অমূল্য অত্যুদার বাণীর পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপোঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রেতু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
নৈব শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্পং বৃত্তং স ব্রাহ্মণ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র মিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

এইরূপে, উপস্থিত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে আমরা এই মহাত্মার জীবনের কয়েকটী বিশেষ অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। সেই সমুদায় বিশেষ ভাবের প্রকৃতি যুগপৎ একই সময়ে বুঝিতে চেষ্টা করিলে উপলব্ধি হয় যে, সে সকলের প্রত্যেকের মূলেই সত্যের

প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ পূর্ণ। এই অনুরাগের পরিচয় আমরা তাঁহার জীবনের বৈচিত্রময় ঘটনারাশির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই স্বভাবের জন্যই তিনি দীর্ঘকাল সংসারের সহস্র অনুকূল প্রলোভনে বেষ্টিত থাকিয়াও, আপন ন্যায়ানুগত উপার্জ্জনের একটীমাত্র মুদ্রা শঙ্কিত রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, এই স্বভাবের জন্যই তিনি অবস্থাতিরিক্ত অর্থব্যয়ে ও সম্ভবাতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে বিদ্যানুশীলন, করিয়াছেন; কিন্তু সে বিদ্যার বিনিময়ে সংসারের নিকট অর্থানুকূল্যে লাভবান হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও আকাঙ্ক্ষা করেন নাই. এই স্বভাবের জন্যই তিনি সম্পূর্ণ কায়মনোবাক্যে স্বদেশের গৌরবকাহিনী প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন এবং সে জন্য আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন ও সেই স্বদেশীয় গৌরবরাশির সঙ্গে যে সকল অগৌরবের কারণ বর্ত্তমান আছে, তাহাও একবার নয়, শতবার প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই স্বভাবের জন্যই তিনি যথোচিতরূপে স্বকীয় সমাজ ও ধর্ম্মের সেবা করিয়াছেন এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বাসীদিগের প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু যখনই সেই সমাজ ও ধর্ম্মের সহিত আপন বিবেক ও বিচারের অনৈক্য হইয়াছে, অথবা সামাজিক গৌকিকতার মুখাপেক্ষায় জাতিগত বিদ্বেষ প্রশ্রয় পাইয়াছে, তখনি তিনি নিজের জ্ঞান বিশ্বাস ও বিচার লইয়া একদিকে একাকী পৃথক সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পরন্তু কোন সমাজবিশেষে আশৈশব লালিত পালিত হইলে সাধারণতঃ মানুষের তাহার প্রতি যেমন একটা পক্ষপাত প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি সাহিত্যশিক্ষাও মানুষের প্রতি তদপেক্ষা অল্প প্রভাব বিস্তার করে না। এই জন্যই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সংস্কৃত শাস্ত্রে যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা অনেকে তাহার অন্ধ অনুরাগী হইয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অন্যান্য বিষয়ের গুণবিচার করিতে ইচ্ছা করেন না এবং কেবল তাঁহারাই নহে, বিদেশীয় সাহিত্য যাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচয়, তাহারাও অনেকে ব্যক্তিগত শিক্ষার অন্ধ আত্মরক্তিফলে স্বদেশের কিছুই ভাল দেখিতে পান না। এইরূপ বহুল দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা যখন দেখিতে পাই, কদাচিৎ কোন একজন ব্যক্তি অপক্ষপাতে যাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহার প্রতি তেমনি ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতি আমাদের স্বভাবতঃই একটা অসাধারণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঞ্চার হয়। মহাত্মা গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি সেই সব কদাচিতের মধ্যে একজন,—তাঁহারও আদ্যন্ত জীবনের কোন অবস্থাতেই কোন একদিকে সঙ্গত আবশ্যকের অতিরিক্ত পক্ষপাতের প্রমাণ দেখান যায় না, বরং তাহার বিপরীতে চিরদিন জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত সত্যনিষ্ঠার দৃঢ়ব্রত হৃদয়ে ধরিয়া তিনি খ্যাতির অথবা "ক্ষতিলাভের বেষ্টিত জাল অম্লান বদনে ছিন্ন করিয়া আপন গন্তব্য পথে একাকী অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

বঙ্গদেশে সঙ্গীত-চর্চ্চা। (১)

ভারতবর্ষে, অতি প্রাচীন কাল হইতে সঙ্গীতের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গীত-শিক্ষার সহজ নিয়ম ও প্রণালী না থাকাতে, উহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীনকাল হইতে লোকে কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া—মৌখিকভাবে গীতবাদ্য শিক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কেবল যাহারা ব্যবসায়ী,—যাহারা সঙ্গীতকে জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিত, কেবল তাহাদেরই মধ্যে সঙ্গীত-চর্চ্চা আবদ্ধ ছিল। পিতা গায়ক বা বাদক; তাঁহার পুত্রগণ বাল্যকাল হইতে সেই গীতবাদ্য শুনিয়া ও পিতার যথাসম্ভব উপদেশ পাইয়া, বয়োবৃদ্ধির সহিত, তাঁহারাও এক একজন গায়ক ও বাদক হইয়া, সঙ্গীতের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন। এই সম্প্রদায়ের লোকই সাধারণের নিকটে সঙ্গীত বিদ্যার প্রকৃষ্ট শিক্ষা-গুরু বলিয়া সম্মানিত ও আদৃত হইতেন। কিন্তু ইহাঁদের অধিকাংশই অক্ষর-জ্ঞান-শূন্য, এবং তজ্জন্য সঙ্গীত-বিজ্ঞান বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞতা নিবন্ধন বিশুদ্ধ প্রণালীতে ও বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে, অনুসন্ধিৎসু সাধারণ জনগণের মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যার প্রচার সহজভাবে করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের "ওস্তাদ" বা গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা পাইয়াছেন, সেই প্রণালীই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন; সুতরাং সেই প্রণালী অনুসারেই তাঁহারা শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা নিজে নিরক্ষর বলিয়া, সঙ্গীত পুস্তকের কোন খবর রাখিবার প্রয়োজন হইত না বা অধিকার ছিল না। সঙ্গীত বিজ্ঞান বলিয়া যে আবার গীতবাদ্যের পুস্তক হইতে পারে, এরূপ কোন ধারণাই তাঁহাদের মধ্যে ছিল না।

এইরূপ ব্যবসায়ী সঙ্গীত-গুরুদিগের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া, কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি গীতবাদ্যে কৃতী হইয়া থাকিলেও, অনেকে সঙ্গীত-গুরুর উপদিষ্ট সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, শিক্ষা ও সাধনোপযোগী সঙ্গীত-পুস্তকের সম্ভাবনার প্রতি, তত আস্থাবান হন নাই। এই সকল কারণে, সঙ্গীত-শিক্ষার উপযুক্ত তাদৃশ পুস্তকের প্রচলন না থাকাতে, লোকে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য কষ্ট ও দুঃখভোগ করিয়া আসিতেছিল। সকলের পক্ষে সঙ্গীত বিদ্যা সহজ-সাধ্য নহে বলিয়া, সাধারণের মধ্যে একটী বলবৎ সংস্কার দাঁড়াইতেছিল। আধুনিককালে, বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যবিদ্যার অনুশীলনের প্রারম্ভেই, সঙ্গীত শিক্ষার সহায়কর কতিপয় সঙ্গীত পুস্তকেরও আবির্ভাব হয়। আমরা যতদূর জানি, সঙ্গীতবিদ্যার জটিল ও বন্ধুর পথের সহজ গতির প্রথম-প্রবর্ত্তক বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তৎকৃত এইরূপ পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে তাদৃশ সহজ প্রণালীতে অন্য কোন ভাষায় এই প্রকারের সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা বিশেষ অবগত নহি। শুনিয়াছি, বোম্বাই প্রদেশস্থ পুনানগরবাসী শ্রীযুক্ত অন্নামার পুরী নামক জনৈক সঙ্গীতবিৎ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এইরূপ বিবিধ সঙ্গীত পুস্তক প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি যে, তাহা কৃষ্ণধন বাবুর প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক প্রচারের পরে।

ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে, সংস্কৃত ভাষায় নানাবিধ সঙ্গীত পুস্তক থাকিলেও, তাহা পাণ্ডুলিপি অবস্থায় থাকাতে, কেহ সে সকল পুস্তকের বড় একটা খোঁজ খবর লইতেন না। সংস্কৃত সঙ্গীত পুস্তকের এইরূপ হতাদরের দুই প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ,—সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্য। দ্বিতীয় কারণ, ব্যবসায়ী সঙ্গীত গুরুদিগের নিরক্ষরতা জন্য অজ্ঞতা। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, তাদৃশ সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের প্রচার থাকিলেও তদ্দ্বারা সঙ্গীত শিক্ষার সহজ ও সার্ব্বজনিক উপায় উদ্‌ভাবনের সাহায্য হইত না। সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে, সঙ্গীতের বৃত্তান্ত সকল যে ভাবে বিবৃত ও প্রকটিত রহিয়াছে, তাহা অধ্যয়ন করিয়া গীতবাদ্য শিক্ষার সাহায্য পাওয়া যায় না। কি কি উপকরণে সঙ্গীত-শাস্ত্র গঠিত, প্রধানতঃ তাহাই ঐ সকল গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সুতরাং সঙ্গীতের উপকরণিক বৃত্তান্ত মাত্র অধ্যয়নে গীতবাদ্য শিক্ষার ও সাধনার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। গীতবাদ্যের উপকরণের মধ্যে ধাতু ও মাত্রা * সর্ব্ব প্রধান। ধাতুর অর্থ সুর (স্বর) এবং মাত্রার অর্থ—সুরের স্থায়িত্ব; তদ্দ্বারা তাল বা ছন্দ গঠিত হয়।

কোন একটী ভাষার বর্ণমালা না থাকিলে, সেই ভাষা শিক্ষা করা বড়ই দুরূহ হইয়া উঠে। সেইরূপ, গীতবাদ্যরূপ ভাষার বর্ণমালা প্রচলিত না থাকাতে, উহার শিক্ষাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থসমূহে, ৭টী মাত্র বিভিন্ন সুর লিখিবার বর্ণ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু গীত বাদ্যে, ঐ স্বরের তিন বা চতুর্গুণ বিভিন্ন সুরের ব্যবহার হইয়া থাকে। তৎসমুদায় লিখিবার কোনও বর্ণ বা সংগত ঐ সকল গ্রন্থে দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত, সঙ্গীতে সুরের যে বিভিন্ন প্রকার মাত্রা বা স্থায়িত্ব ব্যবহৃত হয়, তাহা লিখিবারও কোন বর্ণমালা সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই এ দেশের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, সংগীতের সমুদয় সুর ও সমুদয় মাত্রা কোন প্রকার সংকেত দ্বারা ভাষার ন্যায় লিখিয়া প্রকাশিত করা যাইতে পারে না। অধুনা, ইউরোপীয় সঙ্গীত বা বাদ্য লিখিবার রীতি ও প্রণালী অনেকে দেখিয়া থাকিলেও, হিন্দু-সঙ্গীতও যে ঐরূপ প্রণালীতে লিখা যাইতে পারে, তাহা কেহ মনেও করেন নাই। কৃষ্ণধন বাবু ইউরোপীয় সঙ্গীত শিক্ষা করাতে, তাঁহার মানসপটে এই নূতন প্রতিভার উদয় হয় এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সংকেতাবলী দ্বারা হিন্দু সঙ্গীতের সুর তালাদি লিখিয়া প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হন। এই প্রতিভার প্রভাবেই তিনি ইউরোপীয় সংকেতাবলী দ্বারা দেশীয় গীতবাদ্য লিখিয়া, সঙ্গীত-পুস্তক প্রকাশ করেন। তৎপর, অন্যান্য অনেক মহাত্মা, বিভিন্ন সংকেতাবলী প্রয়োগে সঙ্গীত পুস্তক প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন।

সঙ্গীতের সুরতালাদি লিখিবার সেই সংকেতাবলীর নাম "স্বর-লিপি।" ভারতের সঙ্গীত বিদ্যার ইতিহাসে এরূপ স্বরলিপির উল্লেখ নাই; কেননা ইউরোপের ন্যায় সংকেতাবলী দ্বারা গীতবাদ্য এদেশে লিখা হইত না। এই স্বরলিপি ব্যবহারের ফলে, আজ ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক ধনী ও দরিদ্রের প্রাসাদে ও কুটীরে সঙ্গীতালোচনা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যিনি ইউ-

* "ধাতু মাত্রা সমাযুক্তং গীতমিত্যভিধীয়তে"—সঙ্গীত শাস্ত্র।

রোপীয় স্বরলিপির উপযোগিতা দেখাইয়া, সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রথম যত্ন পাইয়াছেন, তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র ও কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই হতভাগ্যদেশে এ বিষয়েও এখন একটু বাড়াবাড়ি দেখা দিয়াছে। যেখানে আদৌ কোন স্বরলিপির ব্যবহার ছিল না, সেখানে আজ তিন চারি প্রকার স্বরলিপির প্রচার হইয়াছে। এরূপ ঘটনা সঙ্গীত শিক্ষা কার্য্যকে সুগম ও সহজ করা দূরে থাকুক্, আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এখন এক ব্যক্তিকে সঙ্গীত শিক্ষায় প্রথম প্রবৃত্ত হইতে হইলে, তিন চারি প্রকারের স্বরলিপি অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। যেস্থলে একরূপ মাত্র স্বরলিপি দ্বারাই সমুদয় প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, যে স্থলে একাধিক যত স্বরলিপি উদ্ভাবিত হইবে, তাহা ততই অনিষ্টকর হইবে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। যাঁহারা নূতন ২ স্বরলিপি উদ্ভাবন করিতেছেন, তাঁহারা হয় ত ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝেন না; নতুবা তাঁহারা নূতন ২ স্বরলিপির উদ্ভাবনে এত প্রয়াসী হইবেন কেন? তাঁহারা হয় ত মনে করেন যে, কোন প্রণালী বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে, প্রকাশিত স্বরলিপি অপেক্ষা লিখিতে, বুঝিতে ও ছাপাইতে যে প্রণালী সহজতর, সেইরূপ প্রণালী উদ্ভাবন করাই সঙ্গত এবং তাহাই হিতকর। এ যুক্তি উত্তম, স্বীকার করি; কিন্তু সকলেই এই সাধু প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন কি না—তাহাই জিজ্ঞাস্য। যে স্থলে, কোন এক বিদ্যার সকলে তাদৃশ পণ্ডিত হয়েন নাই, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা দ্বেষ হওয়া একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। পরস্পর, পরস্পরকে "খাটো" করিতে উদ্‌যোগী হইয়া পড়া, এ ক্ষেত্রে বিরল নহে। বিশেষতঃ, সঙ্গীত বিদ্যার উপাসকদিগের মধ্যে এরূপ ভাব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এক-জনের উদ্ভাবিত প্রণালী উত্তম হইলেও তাহা গ্রহণ না করার দৃষ্টান্ত অনেক সময়ে আমাদের মধ্যে পাওয়া যায়। হিংসাই এরূপ দৃষ্টান্তের মূল নিদান।

কোন অভিনব বিষয়ের প্রাথমিক উদ্যমের সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার মত ও প্রণালী প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা স্বাভাবিক। ইউরোপেও স্বরলিপির প্রথম প্রবর্ত্তন সময়ে, ভূরি ভূরি স্বরলিপির সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতালী, জার্ম্মণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্বরলিপির উদ্ভাবন হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কি উপায়ে স্বরলিপি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ হয়, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ, ঐ সমস্ত দেশে কৃতবিদ্য বিজ্ঞগণ নানাবিধ স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এইরূপে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই স্থিরীকৃত হইয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইরূপ এতদ্দেশেও নানাবিধ স্বরলিপির উদ্ভাবন হইতেছে, হউক। পরিশেষে যাহা সর্ব্বোত্তম প্রণালী বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাই ব্যবহৃত হইবে। আপাত দৃষ্টিতে, এই তর্কের মধ্যে কেহ কোন দোষ দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এ যুক্তির মধ্যে দোষ দেখিতে পাইবেন। কোন দেশে কোন এক বিদ্যার বিস্তার ও উন্নতি সংসাধিত হইলে, যদি অপর দেশ তাহা গ্রহণ না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, তবে তাহা মহা অনিষ্টকর বলিতে হইবে। কেবল কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা নিবন্ধনই এ দোষের

উন্নতিকর কার্য্য অন্যদেশে অবলম্বিত হয় না। এদেশে, সঙ্গীত বিষয়ে, সাধারণের মধ্যে ঘোর অজ্ঞানতা ও বিপুল কুসংস্কারের অভাব নাই; —এরূপ অবস্থায় ইহা বাস্তবিকই বড় আহ্লাদের বিষয় যে, কৃষ্ণধন বাবু নিজে কোন নূতন স্বরলিপি উদ্ভাবনের পথে ধাবিত না হইয়া, দৃঢ় নৈতিক সাহসের উপরে নির্ভর করিয়া, বঙ্গভাষায় ইউরোপীয় স্বরলিপি প্রচার করিলেন। তিনি জানিতেন যে, ঐ প্রণালীই সমস্ত অন্যান্য সংকেত সকলকে পরাজিত, চূর্ণ করিয়া—ইউরোপের সমুদায় সঙ্গীতরাজ্য অধিকার করিয়াছে। বঙ্গভাষায় এই ইউরোপীয় স্বরলিপি প্রচারিত হওয়াতেই আমাদের দেশে সুকঠিন সঙ্গীত-বিদ্যালোচনার কণ্টকময় পথ পরিষ্কৃত হইয়া, সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। যদি এতদ্দেশীয় অন্যান্য সংগীতবেত্তাগণ ঐ প্রণালী অনুসারে সঙ্গীত পুস্তক প্রণয়ন পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে আজ সঙ্গীতের কত অভাব দূরীভূত হইত! কিন্তু আমাদের মনে হয়, ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা কুসংস্কারই তাহা হইতে দেয় নাই।

অন্যান্য সংগীতবিদ্‌গণ, ইউরোপীয় স্বরলিপির অনুগমন না করিয়া, নিজে বাঙ্গালা অক্ষরে নূতন নূতন স্বরলিপি উদ্ভাবন করিয়া প্রচার করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। ইউরোপে মধ্য (medeval) যুগে, তদনুরূপ বহুস্বরলিপি ব্যবহৃত হইয়াছিল; সুতরাং সেইরূপ করিতে হইলে আমাদিগকে আজ প্রায় সহস্রবর্ষ পশ্চাৎগমন করিতে হইবে! কৃষ্ণধন বাবু তৎপ্রণীত সঙ্গীত পুস্তকে এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তর্ক করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ভাসিয়া গিয়া কত শত স্বরলিপি নিত্য উদ্ভাবিত হইতেছে!!

এই সমস্ত বহুবিধ স্বরলিপির প্রথম দৃষ্টান্ত—সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামীকৃত বাঙ্গালা স্বরলিপি। ইহা ১৮৬৮ সালে প্রচারিত হয়। তখন ইউরোপীয় স্বরলিপি গ্রহণের বিরুদ্ধে এই এক তর্ক উঠিয়াছিল যে, হিন্দুসঙ্গীত হইতে ইউরোপীয় সঙ্গীত খুব ভিন্ন, সুতরাং বিজাতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপির দ্বারা হিন্দুসঙ্গীত উত্তমরূপে লিখা যাইতে পারে না। এইজন্য হিন্দুসঙ্গীতের উপযোগী করিয়া, উক্ত গোস্বামী মহাশয় সেই স্বরলিপি প্রস্তুত করেন। কিন্তু ঐরূপ তর্কের উত্তরে কৃষ্ণধন বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইউরোপীয় স্বরলিপি দ্বারা বঙ্গ-সঙ্গীত উত্তমরূপে লিখিত হইতে পারে। বরং যাহা গোস্বামী-প্রবর্ত্তিত স্বরলিপিতে নাই, এরূপ অনেক সংকেত ইউরোপীয় স্বরলিপিতে আছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? গোস্বামী মহাশয়ের স্বরলিপির পশ্চাতে অর্থবল পড়াতে এবং উহা ভারতীয় রাজধানী কলিকাতা নগরীর এক মাত্র সঙ্গীতবিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হওয়াতে, উহা ইউরোপীয় স্বরলিপিকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজ বিক্রমে চলিতে লাগিল। অনেকেই সেই গোস্বামী প্রবর্ত্তিত স্বরলিপি লিখিতে লাগিল। পরে অনেক ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণও অর্থোপার্জ্জন লালসায় ঐ স্বরলিপিতে পুস্তকাদি ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে অগ্রসর হইল। এদিকে কিন্তু কৃষ্ণধন বাবুও অদম্য উৎসাহে ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে বিবিধ সঙ্গীত পুস্তক প্রচার করতঃ সাধারণকে ইউরোপীয় স্বরলিপি শিখাইতে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। তাহাতেই দেশ বিদেশে বহু কৃতবিদ্য লোক ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ক্রমশঃ সেই ইউরোপীয় স্বরলিপিযোগে দেশীয় সঙ্গীত অভ্যাস করিতেছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

প্রতিভা। (২)

এই উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ-ধারণাও কতক জানিতে পারা যায়। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন কি উদ্দেশ্যে আমরা এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম? ইহা গ্রন্থকারের ভাষার বিকাশ প্রকাশ জন্য নহে—কারণ ইহা তাঁহার আটপ'রে ভাষা মাত্র। ইহা বিশেষ কোন ঘটনার ভাষা নহে—বিশেষ কোন উচ্ছ্বাসের ভাষা নহে, তবু ইহার বেগ ইহার গতি, অবলোকন করুন। কোটালের জোয়ার বহে নাই—বর্ষারও বারিধারাতে স্রোতস্বিনী স্ফীতা হয় নাই, তবু ইহার অবয়ব দেখুন। শুধু কি তাহাই দেখিবেন? শুধু ইহাই দেখিয়া তুলনা করিলে অনেক স্রোতস্বতীই ভাগীরথীর সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। শুধু ইহার বাহিরের অবয়ব দেখিলে চলিবে না—ইহার অভ্যন্তরও দেখিতে হইবে। কি বৈজ্ঞানিক মতে, কি (হিন্দুর) শাস্ত্র মতে যে ভাবেই দেখুন জাহ্নবীর সলিল অন্য সাধারণ স্রোতস্বিনীর সলিলের সহিত অতুলনীয়। এমন চিরশান্তিদায়িনী, জড়তাদি সর্ব্বপ্রকার দুষ্টতা-বর্জ্জিত সলিল কি অন্যত্র পাওয়া যায়?

রজনী বাবুর ভাষার গুণ একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন ওজস্বিনী, এমন গম্ভীরা, এমন প্রাণস্পর্শিনী, এমন সুললিতা, এমন পবিত্রা, এমন উন্নতা ভাষা বাঙ্গালা গ্রন্থে নিতান্তই অপ্রাপ্য। তবে আমাদিগের এ সম্বন্ধে বড় একটা দুঃখ আছে। জাহ্নবীর বারির সহিত ইহার তুলনা করিলাম সত্য, কিন্তু ইহাতে ভাগীরথীর সে বৈচিত্র্য দেখিতে পাই না। ভাগীরথীর যেমন কখনও স্ফীতি দেখিতে পাই, কখনও ক্ষীণতা অবলোকন করি; যেমন কখনও তাহার তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিতে পাই, কখনও বা তাহার শান্তমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি; যেমন কখনও বা সুদূর আকাশস্থিত অমিয়-মূর্ত্তি চন্দ্রমা তাহার বক্ষে প্রতিফলিত হয়,—কখনও বা দুর্দ্দান্ত মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তাহার অন্তরে প্রতিবিম্বিত হয়; যেমন কখনও বা ধীর সমীরে তাহার প্রশান্ত সলিল রাশি ঈষৎ কম্পিত হইয়া বীণানিন্দিত মধুর কল কল ধ্বনিতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, কখনও বা প্রবল ঝটিকাঘাতে তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘোর গর্জ্জনে প্রাণ আতঙ্কিত করে—রজনী বাবুর ভাষায় তেমন বৈচিত্র্য বড় একটা দেখিতে পাই না। অবশ্যই বৈচিত্র্য আছে, এ কথা স্বীকার করি—কিন্তু যেমন ভাষার অন্যান্য গুণ, এ গুণ যেন তেমন বিকাশ পায় নাই। তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলিই প্রায় এক শ্রেণীর; সেই জন্যও হয় ত এ বিকাশপ্রদর্শনে গ্রন্থকার তাদৃশ সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই—তবু আমাদিগের মনে হয়, এ সম্বন্ধে তাঁহার যেন একটু ত্রুটিও আছে।

ভাষার কথা আর অধিক বলিব না। এখন গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইঁহারা বাঙ্গালার প্রতিভাক্ষেত্রে পাঁচটি মহাসাগর। ইঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয়—এই পাঁচটি মহাসাগরে কি কি মনোহর রত্ন আছে, কি কি ভীষণ হিংস্র প্রাণী আছে, তাহার সম্যক্ পরিচয় দিতে

একজন অগস্ত্যের প্রয়োজন। এই প্রতিভা-সাগরের সমস্ত বারি উদরস্থ করিতে না পারিলে, ইহার গর্ভস্থ মনোহর রত্নরাজী ও ভীষণ নক্রচক্রাদি কেহই সম্যক্ প্রদর্শন করিতে পারেন না। আর এক প্রকারে মহা সাগরের পরিচয় পাইতে পারি। যেমন পুরাকালে দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া তন্মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ সামগ্রীগুলি উত্তোলন করিয়াছিলেন—তেমন করিয়া এই সমুদ্রগুলি মন্থন করিতে পারিলে, আমরা সাগরের সৌন্দর্য্যের একভাগ সম্পূর্ণ দেখিতে পারি। সেইরূপ মন্থন করিতেও লেখকারকে অপরগ দেখিতে পাইতেছি। তিনি অন্যবিধ উপায়ে এই রত্নোদ্ধার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি পুনঃ পুনঃ এই প্রতিভামহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। সেই সাগরের উত্তালতরঙ্গমালা ভেদ করিয়া গভীর হইতে গভীরতর, গভীরতম প্রদেশে গমন করিয়া দুই একটি করিয়া রত্ন আহরণ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছেন—সেই রত্নের কি প্রকৃতি, কি সৌন্দর্য্য, কি রূপ, কি গুণ। তাহা প্রদর্শন করিতে যেমন বিরহীর অন্যান্য প্রতিভাসাগরের [illegible] তুলনা করিয়া তিনি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। একভাবে তাঁহার এই পরিচয়ে—পল্লব-সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করা যায়—এরূপ সাহিত্য গ্রন্থে সেই মহাসাগরের প্রতিভাবারি শুষ্ক করিয়া সমস্ত রত্ন প্রদর্শন সম্ভবপর নহে। তাই আমরা ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য।

রজনী বাবু এই প্রতিভাসাগরে সামান্য ডুবুরির ন্যায় রত্ন অন্বেষণে নিমজ্জিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি যে সকল রত্ন উত্তোলন করিয়াছেন, বুঝি তাহাই সাগর ও নির শ্রেষ্ঠ রত্ন। তিনি এই পঞ্চ মহাপুরুষের জীবনচরিতে যাহা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, বুঝি তাহাই তাঁহাদিগের জীবনের শ্রেষ্ঠ আলোচ্য বিষয়।

এই প্রতিভার পরিচয়ে রজনী বাবুর চিন্তাশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি। যে জাতীয় চিন্তা স্থূলতার দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া জড়ের অন্তর, অন্তরতর, অন্তরতম প্রদেশে উপনীত হয়, বলা বাহুল্য রজনীবাবুর 'প্রতিভা' সেরূপ চিন্তার পূর্ণ নহে। যে শ্রেণীর চিন্তাশীলতা "হিন্দুত্ব" "ত্রিধারা" "শকুন্তলা তত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থে পরিস্ফুট দেখিতে পাই, সেই সূচীর ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র কুতর্কব্যূহ-ভেদী চিন্তাশীলতা 'প্রতিভা'য় পরিব্যক্ত হয় নাই। ফলতঃ তাহা প্রতিভার ন্যায় সাহিত্য গ্রন্থে ব্যক্ত হইলে, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য অল্প লোকেরই ভোগ্য হইয়া পড়ে। সেই জাতীয় চিন্তাশীলতা ধর্ম্মতত্বের কঠিন সমস্যাভেদে, কাব্যান্তরস্থিত দর্শনতত্বের উদ্ভাবনেই প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়। এমন তরল সাহিত্যে তাহার সমাবেশ প্রার্থনীয় নহে। বালকের কৃমির ঔষধ মিশ্রী, বন বন,—তিক্ত পাচন তাহারা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহে। এই কাব্য উপন্যাস পাঠে আসক্ত পাঠকগণকে, উপকারী হইলেও, তেমন দর্শনমূলক সাহিত্য পড়িতে দিলে তাঁহারা তাহা পড়িতে চাহিবে না। এ কথা কতদূর সত্য—তাহা পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলির বিক্রেতা মহোদয়গণই জ্ঞাত আছেন। ঐ শ্রেণীর সাহিত্যই শ্রেষ্ঠতর তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা এখনও দেশের অধিকাংশের পক্ষে উপযোগী হয় নাই। উহা এত গুরুপাক যে, বলকারক হইলেও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে উহার ব্যবস্থা তত সমীচীন নহে।

রজনীবাবুর চিন্তাশীলতা যেমন সুদূরব্যাপিনী, তেমন অন্তর্দর্শিনী নহে। তাঁহার চিন্তার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সাধারণ পাঠকও অনায়াসে ভাসিয়া যাইতে পারেন—তাঁহার চিন্তাশীলতার সাহায্যে সাধারণ পাঠকবৃন্দ দুই এক মিনিটের জন্য সাগরজলে নিমজ্জিত হইয়া রজনীবাবুর রত্নরাজীর আহরণ দেখিতে পারেন। তাহাতে মানসিক অবসন্নতা উপস্থিত হইবে না—তাহাতে বিশেষ ক্লান্তিবোধও হইবে না। এক মুহূর্ত্ত ডুবিয়া আবার পরক্ষণেই উপরে উঠিতে কাহার কষ্ট হইয়া থাকে? রজনীবাবুর এই গ্রন্থ সুস্বাদু, লঘুপাক অথচ পুষ্টিবর্দ্ধক। সুস্থ ও সবলের পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় না হইলেও রুচিকর; আর অজীর্ণ রোগগ্রস্তের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ও সর্ব্বাংশে হিতজনক। ফলতঃ আধুনিক কাব্য উপন্যাসের ও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ না থাকিলে কেহই কাব্য ও উপন্যাসের স্তর হইতে দর্শনের স্তরে উঠিতে সাহস করিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সকল কথা সপ্রমাণ করা সমালোচকের কর্ত্তব্য—কিন্তু তাহা করিতে হইলে প্রবন্ধ বড়ই দীর্ঘ হইয়া যায় সুতরাং কষ্টের সহিত বিনা প্রমাণে কথাগুলি বলিয়াই আমাদিগের ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারাই ইহার সত্যাসত্য অবধারণ করিতে পারিবেন।

রজনীবাবুর বিষয়—বর্ণনে একটী অতি সুন্দর ভাব দেখিতে পাই। তিনি যে বিষয়ই লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে শুদ্ধ কল্পনা ও চিন্তামূলক কথা না লিখিয়া, ঐতিহাসিক অনেক তত্ত্বও সন্নিবেশিত করেন। এই যে তিনি বাঙ্গালার প্রতিভার পরিচয় দিতে বসিয়াছেন, এই উপলক্ষে তিনি ভিন্ন দেশস্থ প্রতিভারও পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ "দিক্‌দর্শন" বাঙ্গালার অতি কম গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে ইহাতে লেখকের পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ গ্রন্থকার কেবল কল্পনার খেলা লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন না; সঙ্গে সঙ্গে একটু স্মৃতি-শক্তি ও মস্তিষ্কের পরিচালনা করাও ইঁহাদের আবশ্যক হয়। রজনীবাবুর গ্রন্থে এইরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতে বর্ত্তমান; যে কোন পৃষ্ঠা খুলিয়া আমরা ইহা সপ্রমাণ করিতে পারি। ইচ্ছাক্রমে একস্থান উদ্ধৃত করিলাম।

"ইংরেজী গ্রন্থকারগণ দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু পরকীয় সাহায্য আশানুরূপ হইলেও তাঁহাদের দরিদ্র ভাব ঘুচিত না। তাঁহারা এক সময়ে বিচিত্র বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইতেন অন্য সময়ে ছিন্ন ও মলিন পরিচ্ছদে কষ্টদায়ক ঋতুর পরাক্রম হইতে দেহ রক্ষা করিতেন; * * * জনসন্ ও গোল্‌ডস্মিথ্ অর্থের জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। জনসনকে ঋণের দায়ে অবরুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। ইঁনি ঋণ-দায়ে আদালতের কর্ম্মচারীর [illegible] করিয়াছিলেন। * রাজমন্ত্রী [illegible] ও লোক লক্‌ষম্‌ আডিসনের ভরণপোষণোপযোগী বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।"

রজনীবাবুর গ্র[illegible] দোষ সময়ে সময়ে আমাদিগকে কিছু কাতর করিয়া থাকে। সেটি তাঁহার অসাবধানতার ফল বলিয়া আমরা উপেক্ষা করিলাম। তাঁহার দুই একটি সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক—দুই একটি তথ্য মিথ্যা—ভাবার আবেগে দুই এক স্থানে যুক্তির সঙ্গতি তেমন সুদৃঢ় হয় নাই। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,

"পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মহৎকার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদের অপেক্ষাও মহত্তর।"

এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ ঠিক যুক্তি-সঙ্গত কি ?

এই গ্রন্থে এইরূপ দোষ কিছু আছে। সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনৈক্য, মতভেদ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

সব বিচার করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কি সাহিত্যের কি ঐতিহাসিক তত্ত্বব্যাখ্যার হিসাবে, এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় অতি উচ্চশ্রেণীর ও আদরের উপযুক্ত গ্রন্থ হইয়াছে। সর্ব্বোপরি ইহার ভাষা—অক্ষয়কুমারের ওজস্বিতা, ও গাম্ভীর্য্য এবং বিদ্যাসাগরের সরলতা ও পবিত্রতার সহিত—বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্য ও কোমলতা মিশাইয়া রজনী বাবু যে ত্রিধারার স্রোত তাঁহার প্রতিভাক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যসেবিগণের পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। লোকের কথার স্বর শুনাইয়া যেমন তাহার সঙ্গীতের ক্ষমতা বুঝান যায় না, বাদ্যযন্ত্র দেখাইয়া বা তাহার গুণ বর্ণনা করিয়া যেমন তাহার স্বর প্রকাশ ক্ষমতা বর্ণনা করা যায় না—আমরা সমালোচনা করিয়াও তেমন তাঁহার ভাষার সেই অদ্ভুত মনোহারিত্ব প্রকাশ করিতে পারি না। যাঁহারা অর্থব্যয়ে কাতর বা অপারগ, তাঁহাদিগকে অন্ততঃ এক জনের নিকট চাহিয়াও এই গ্রন্থখানি একবার পড়িতে বলি। রামপ্রসাদের সঙ্গীতের ন্যায়, ইহাতে কর্ণ ও মন উভয়ই পরিতৃপ্ত হইবে—ইহাই আমাদিগের স্থির বিশ্বাস।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

অপরিচিত।

ছিল একজন আপনার ধন,
নাই আর সে এদেশে ;
না ব'লে, না ক'য়ে, বিদায় না ল'য়ে
চ'লে গেছে সে সেদেশে।
কোথা গেল ব'লে ভাসি অশ্রুজলে
স্নেহের এমনি টান ;
সে দিকে তাকাই কি অসার ছাই,
কি অসার বর্ত্তমান !
এই কি জীবন মানব জীবন ?
এই আছে—এই নাই !
এত অহঙ্কার এত চীৎকার
ইহারি তরে কি ছাই ?
সম্মুখে আমার কিবা আছে আর
শুধু ঘোর অন্ধকার ;
ভেদি সে আঁধার নিরখি অপার
মহাকাল পারাবার
অকূলের কূলে দেখি আঁখি খুলে
ধূ ধূ করে চারিধার !
তাহারি মাঝারে, গভীর আঁধারে
পাড়ি দিল তরী তার।
তরঙ্গে আকুল জলধি অকূল,
ক্ষীণ সে তরণী খানি ;
কত দিনে যাবে ? কবে কূল পাবে ?
কিছু না—কিছু না জানি।
যত দিন ছিল মুখ বুজে ছিল,
কহে নাই কিছু কারে ;
মুখ খানি বুজে, না জানি কি বুঝে,
পাড়ি দিল পারাবারে !
এত স্নেহ মা'র, এত সেবা তাঁর
এত নিশি জাগরণ ;
এত অতুলন আদর যতন,
তবু কি উঠেনি মন ?

এসেছিল ঘরে যাইবার তরে,
কেন সে থাকিবে আর ?
কেন এসেছিল ? কেন ফিরে গেল ?
কে দিবে উত্তর তার ?
পেতে তার মন, কত না যতন
কত জন করিয়াছে ;
বিফল যতন, বৃথা আয়োজন
কেবা মন পাইয়াছে ?
আপনার মন করিয়া গোপন,
আপনারি মনে তার,
আসিয়া নীরবে, গেল সে নীরবে
বুঝি না রহস্য তার !
নীরব জীবন, উষার স্বপন
না দেখিতে হল শেষ ;
কুহেলিকাময় প্রহেলিকাময়,
স্মৃতিমাত্র অবশেষ।
বুঝি কোথা হ'তে, কোথা যেতে যেতে,
এসেছিল ভুলে পথ,
মিটে নাই আশা, মিটেনি পিপাসা,
পূরে নাই মনোরথ।
কত যাত্রী আসে ভব-পান্থ-বাসে,
মুখ বুজে কেবা রয় ?
যতক্ষণ থাকে, মিলে মিশে থাকে,
মন খুলে কথা কয়।
এ যেন তা নয়, দেখে মনে হয়,
এসেছিল কারাবাসে ;
কেহ নয় তার সেও নয় কার ;
কার কাছে কাঁদে হাসে ?
বাধার উপর সাতটি বছর
নীরবে গিয়েছে ব'য়ে,
সাতটি বছর রোগ-জ্বালা-জ্বর,
নীরবে গিয়েছে স'য়ে।
পারিত না যবে সহিতে নীরবে
ফুটিত তখন মুখ ;
প্রকাশিত ব্যথা একমাত্র কথা,
কাটিত যখন বুক।
বেছে বেছে বেছে ভাষা-সিন্ধু ছেঁচে
পেয়েছিল রত্নসার ;
অমৃত বাহিত, অমৃত সিঞ্চিত
"মা" নাম কণ্ঠের হার।
অসহ্য না হ'লে, ডাকে নি মা ব'লে,
ধন্য সহিষ্ণুতা তার !
কভু বলে নাই, কেহ শুনে নাই
দ্বিতীয় কথাটি আর।
যত মনোভাব, আকাঙ্ক্ষা অভাব,
"মা" ব'লে বুঝাত সব ;
নীরবে "মা" রবে, কি ললিত রবে
কে করিত অনুভব ?
এক "মা" কথায় এত যে বুঝায়,
কার সাধ্য কেবা জানে ?
একের ভিতরে এত অর্থ ধরে,
আছে কোন্ অভিধানে ?
আপনি কহিত, আপনি বুঝিত,
আপনার নব ভাষা ;
সে ভাষা বুঝিতে, সে রসে মজিতে,
বৃথা চেষ্টা—বৃথা আশা !
কেহ স্নেহ-ভরে ডাকিলে আদরে,
যাহা ইচ্ছা নাম দিয়ে ;
কে বুঝে কে জানে, সেই মুখ পানে
থাকিত সে তাকাইয়ে।
কৌতুকে বিস্ময়ে লাজে ক্লেশে ভয়ে
সেই যে চাহনি তার ;
কি যে ব্যাকুলতা, কিবে কাতরতা,
প্রকাশিত বার বার !
কি যেন বলিতে, বলিতে বলিতে
পারেনি বলিতে আর !
দুআঁখি ফাটিয়া আসিত ছুটিয়া
মর্ম্মভেদী কথা তার।

তবু দুঃখ এই, বুঝি নাই সেই
নীরব গভীর ভাষা ;
বুঝি নাই আর, ছিল প্রাণে তার,
কি গভীর ভালবাসা !
কে জানে কি তার ছিল সমাচার
কারে তাহা দিতে এল ?
কি আদর্শ ল'য়ে কি আদর্শ হ'য়ে
এসে কেন ফিরে গেল ?
কত জ্ঞান-বল, অমূল্য রতন,
ছিল সে জীবন বেদে ;
কেবা জানে তার, কিবা ছিল সার
প্রতি ছেদে পরিচ্ছেদ ?
বলিব কেমনে, পেলে তার মনে
প্রবেশের অধিকার ?
নাহি হ'ত কার লঘু মনোভার ?
কারো পথ পরিষ্কার ?
বিশ্ব-কোলাহলে, নীরবে বিরলে
করি লীলা সমাপন,
গেল সে লুকায়ে, নীরবে শিখায়ে
নীরব আত্ম-গোপন।

কি জানি তাহার এই শিক্ষা সার
হবে কার কণ্ঠহার ?
ক্ষুদ্র এ জীবন, করিবে পূরণ
জীবন-সমস্যা কার ?
বুঝি নাই তারে, বুঝে নি সে কারে
কেন আর র'বে তবে ?
বিনা পরিচয়ে, বিনা বিনিময়ে,
কে পারে বাঁচিতে কবে ?
বিদেশীর বেশে আসিয়া এ দেশে
স্বদেশে গিয়েছে ফিরে ;
আসিবে না আর, করি হাহাকার
ভাসিয়া নয়ন-নীরে।
যথা থাকে থাক, যথা যায় যাক্,
ডাকিব না তারে আর,
শূন্য ঘরপানে চেয়ে শূন্য প্রাণে
ফেলি শুধু অশ্রুধার।
ছিল একজন আপনার ধন,
মনে রবে শুধু তাই ;
স্মৃতি ছিন্ন তার, চিতা-ভস্ম সার ;
আর কিছু নাই—নাই !

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

পঞ্চস্কন্ধ বা প্রপঞ্চ স্কন্ধ।

জগতে নিয়ত কালের প্রভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অভ্যুদয় স্থিতি ও অবনতি সাধিত হইয়া থাকে। এক এক সময়ে এক এক দেশ হইতে এক এক ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিলয় সাধিত হয় সত্য, কিন্তু ঐ ধর্ম্মমত মানব সমাজে যে এক একটী রেখা রাখিয়া যায়, উহা জাতীয় কাব্য নাটক ও ইতিহাসাদিতে নিবদ্ধ থাকিয়া চিরকাল সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত ধর্ম্মমতের প্রচার করিয়া থাকে।

সকলেই জানেন, বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ মানবের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, অদ্যাপি সমস্ত ভূমণ্ডলের এক তৃতীয়াংশ লোক এই মত অনুসারে চলিয়া থাকে। এই বৌদ্ধগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে "আত্মা" বলিয়া কোন পদার্থ অঙ্গীকার করিতেন না, তাঁহারা "পঞ্চস্কন্ধ" স্বীকার করিতেন। আমাদের প্রাচীন কবি মাঘভট্ট তদীয় শিশুপালবধ নামক মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে লিখিয়াছেন :—"যেমন বৌ...দিগের মতে সর্ব্বশরীরে পঞ্চস্কন্ধ ব্যতীত আত্মা নাই, সেইরূপ নৃপতিদিগেরও সর্ব্বকার্য্যে পঞ্চ অঙ্গ

ভিন্ন মন্ত্রণা নাই।" * মহাকবি মাঘভট্ট এই একটী সাধারণ উপমার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই উপমাটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধদর্শনের সারাংশ জানা প্রয়োজন। স্থূলতঃ বৌদ্ধমত ও পঞ্চস্কন্ধের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে লিখিত হইল।

মাধ্যমিক সূত্র নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থের বৃত্তিকার মহামতি চন্দ্রকীর্ত্তি লিখিয়াছেন :— "পঞ্চ" শব্দের অর্থ "প্রপঞ্চ"। বৌদ্ধগণের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ "প্রপঞ্চ" বা "মায়া" মাত্র। আমরা চতুর্দ্দিকে যে সকল পদার্থ অনুভব করিতেছি, উহারা সকলই অলীক, পরমার্থতঃ উহাদের কাহারও অস্তিত্ব নাই। কদলীফল সমূহ সুশৃঙ্খলার সহিত উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত থাকিয়া যেরূপে কদলীস্কন্ধের (কলার কাঁদি,) সৃষ্টি করে, আমাদিগের অনুভূয়মান পদার্থ সমূহও সেইরূপ বিভিন্ন সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া প্রপঞ্চস্কন্ধ † (প্রপঞ্চের কাঁদি,) বা বিশ্বসংসারের উদয় সাধন করিতেছে। এক দুই, পিতাপুত্র, দর্শন দ্রষ্টব্য, আত্মা অনাত্মা ইত্যাদি যে কোন পদার্থের বিচার করি, দেখিতে পাই, উহা সংবন্ধরহিত নহে। সম্বন্ধবিহীন স্বাধীন সত্তা কাহারও নাই। সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় একের সত্তায় অপরের সত্তা ও একের অভাবে অন্যের অভাব। পিতা না থাকিলে পুত্র থাকিত না এবং পুত্র না থাকিলে পিতা থাকিত না, চক্ষু না থাকিলে রূপ থাকিত না এবং রূপ না থাকিলে চক্ষু থাকিত না। আত্মা (আমি) না থাকিলে অনাত্মা (বাহ্যজগৎ) থাকিত না এবং অনাত্মা না থাকিলে আত্মা থাকিত না। সার্দ্ধদ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মহাযোগী শাক্যসিংহ এইরূপ চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, 'আত্মা' বলিয়া কোন স্বভাবসিদ্ধ পদার্থ নাই। অনাত্মার সম্বন্ধেই আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে। এই অনাত্মা আবার কদলীস্কন্ধের ন্যায় কতকগুলি পদার্থের সম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়াছে। এই পদার্থ সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ এবং প্রপঞ্চ ও আত্মার উৎপত্তির ক্রম নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

(১) অবিদ্যা (২) সংস্কার (৩) বিজ্ঞান (৪) নামরূপ (৫) ষড়ায়তন (৬) স্পর্শ (৭) বেদনা (৮) তৃষ্ণা (৯) উপাদান (১০) ভব (১১) জাতি (১২) দুঃখ।

মিথ্যা জ্ঞানের নাম অবিদ্যা। ঘট, পট, মানুষ, পশু, আমি, তুমি ইত্যাদি অলীক পদার্থ সকলকে যথার্থ বলিয়া অবধারণ করার নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি ঘট, পট ইত্যাদির জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে ঐ ঘটাদিজনিত সংস্কার উৎপন্ন হইত না। অতএব বাসনা সমূহের মূল কারণ অবিদ্যা। 'আমি আছি' এইরূপ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান, উহা সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে আমি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কোন পদার্থ দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমি এই মুহূর্ত্তে ঐ পদার্থ দর্শন করিতেছি, এইরূপ 'আমিত্বের' জ্ঞান পূর্ব্ব জ্ঞান সমূহের সংস্কার ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান সংস্কাররূপে পরিণত না হইত, তাহাহইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান ও পর পর জ্ঞান সমূহের একত্র সমাবেশ ও আমিত্বের উদ্ভব হইত না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান সমূহ সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়াই উহারা বর্ত্তমান

* পঞ্চক্যাঃ [illegible] স্কন্ধপঞ্চকম্।
[illegible] নাস্তিমন্ত্রো মহীভুজাম্॥
(শিশুপালবধ)

† প্রপঞ্চস্কন্ধ, পঞ্চস্কন্ধ, সমুদয় স্কন্ধ, দুঃখস্কন্ধ, প্রতীত্যসমুৎপাদ ইত্যাদি সকলেই তুল্যার্থক

জ্ঞান সমূহের সহিত একসূত্রে বদ্ধ হইতে পারে এবং এই সমগ্র জ্ঞানের সমষ্টিতে বিজ্ঞানের (আমিত্বের) উদ্ভব হয়। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ ইত্যাদির (বিষয়ের) উৎপত্তি হয়। আমি রূপ দেখিতেছি, শব্দ শুনিতেছি ইত্যাদি প্রকারে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পঞ্চ বিষয় দ্বারা আমিত্বের বিকাশ হইয়া থাকে। আমি আছি—এইরূপ বিজ্ঞান না জন্মিলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয়ের উদ্ভব হইত না। নামরূপ ইত্যাদি হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমার রূপ দর্শন করিবার শক্তি আছে, শব্দ শ্রবণ করিবার শক্তি আছে, ইত্যাদি প্রকারে দর্শন-শ্রবণাদি শক্তি সমূহের বিকাশে আমিত্বের বিকাশ ও বিষয়ের উপলব্ধি হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় বিদ্যমান না থাকিলে চক্ষু (দর্শন) কর্ণ নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ষড়ায়তনের উৎপত্তি বা বিকাশ হইত না। অতএব ষড়ায়তনের মূল কারণ বিষয় (নামরূপ)। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষের নাম স্পর্শ। ষড়ায়তন না থাকিলে স্পর্শ উৎপন্ন হইত না। এই স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি হয়। যদি ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ না হইত, তাহা হইলে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষের (বেদনার) উদ্ভব হইত না। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর স্পর্শই প্রত্যক্ষের (বেদনার) কারণ। প্রত্যক্ষ হইতে উৎকট ইচ্ছা বা তৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং তৃষ্ণা হইতে উপাদানের উদ্ভব হয়। ইচ্ছা না থাকিলে শারীরিক বাচিক ও মানসিক কর্ম্মের আরম্ভ হইত না, অতএব উপাদান বা এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মূল তৃষ্ণা। উপাদান হইতে ভব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত জাতি বা জন্মলাভ হয়। জন্মলাভ করিয়া জীব জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি বহুপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।*

বুদ্ধদেব যখন দেখিলেন—জরা, মরণ, শোক দুঃখ দৌর্ম্মনস্য ইত্যাদি দ্বারা জীব অহরহঃ সন্তপ্ত হইতেছে এবং অবিদ্যার ধ্বংস না হইলে এই শোক দুঃখাদির একান্ত ও অত্যন্ত উচ্ছেদ অসম্ভব, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস সাধন না করিয়া সমাধি ত্যাগ করিবেন না। বুদ্ধদেব বলিলেন, যদি মৃত্যুর হস্ত হইতে চিরকালের জন্য উদ্ধার লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে জন্মের উচ্ছেদ কর এবং যদি পুনরায় জন্মলাভ করিতে না চাও, তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ কর। কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন না হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের উচ্ছেদ হইতে পারে না। যদি কর্ম্মত্যাগ করিতে চাও তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ রুদ্ধ কর। অহংজ্ঞান রুদ্ধ না হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ রুদ্ধ হইতে পারে না। সংস্কারের ক্ষয় না হইলে অহংজ্ঞান নষ্ট হইতে পারে না এবং যতদিন অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকিবে, ততদিন সংস্কার সমূহের বিলোপ হইবে না। দুঃখ সমূহের একান্ত ধ্বংস করিতে হইলে অবিদ্যা নাশ করিতে হইবে। এই অবিদ্যার ধ্বংস

* অবিদ্যা প্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ, সংস্কার প্রত্যয়ং বিজ্ঞানম্ বিজ্ঞানপ্রত্যয়ং নামরূপম্ নামরূপপ্রত্যয়ঃ ষড়ায়তনম্, ষড়ায়তনপ্রত্যয়ঃ স্পর্শঃ, স্পর্শপ্রত্যয়া বেদনা, বেদনাপ্রত্যয়া তৃষ্ণা, তৃষ্ণা প্রত্যয়মুপাদানম্, উপাদান প্রত্যয়ো ভবঃ, ভবপ্রত্যয়া জাতিঃ, জাতিপ্রত্যয়া জরামরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াসাঃ সম্ভবন্তোব। (ললিতবিস্তরঃ)

হইলে সংসারের নাশ ও জীবের নির্ব্বাণলাভ হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা পদার্থ কি? এবং উহার ধ্বংস কিরূপে হইয়া থাকে তাহা প্রজ্ঞাপারমিতা নামক বৌদ্ধগ্রন্থে সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যদ্দ্বারা অবিদ্যমান পদার্থ সমূহ বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই অবিদ্যা।* যেমন কোন দক্ষ মায়াকর স্বীয় কৌশল প্রভাবে নানাবিধ বস্তু প্রদর্শন করে, কিন্তু ঐ প্রদর্শিত বস্তু সমূহের কাহারও যথার্থ সত্তা নাই, সেইরূপ অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনুভব করিতেছি, কিন্তু এই জগতের যথার্থ সত্তা নাই।†

কালের প্রভাবে ও যোগাচার সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে "প্রপঞ্চের" "প্র" বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন হইল এবং প্রপঞ্চ উপসর্গ হারাইয়া পঞ্চ এই সংখ্যার বাচক হইল। শালিস্তম্ভ সূত্র, রত্নাকর সূত্র, রত্নকূট সূত্র, ললিতবিস্তর সূত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, মাধ্যমিক সূত্র ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে যে প্রপঞ্চ স্কন্ধ বা দ্বাদশাঙ্গের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, ঐ দ্বাদশাঙ্গই কালক্রমে বিভক্ত হইয়া পঞ্চস্কন্ধে পরিণত হইল। রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, ও সংস্কার এই পাঁচটী অঙ্গ ব্যতীত কোন অঙ্গের প্রয়োজন হইল না। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর্য্যনাগার্জ্জুন নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক স্বীয় মাধ্যমিক সূত্র-নামক দর্শন গ্রন্থে অবিদ্যাদি দ্বাদশস্কন্ধ এবং রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ উভয়েরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ সূরি মাঘ কাব্যের টীকায় পঞ্চস্কন্ধের* নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন:—

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ষড়িন্দ্রিয় সমুদয়ে এই একাদশ পদার্থই রূপ স্কন্ধ নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে বেদনা স্কন্ধ (প্রত্যক্ষ) বলে। চাক্ষুষাদি ভেদে এই বেদনা ষড়্বিধ। তদনন্তর ধারাবাহিক বেদনা সমূহ (প্রত্যক্ষ সমূহ) হইতে "আমি" এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বিজ্ঞান স্কন্ধ বলে। তদনন্তর আমি ভিন্ন বাহ্যজগতের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে সংজ্ঞা স্কন্ধ বলে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের জ্ঞান সমূহ পরপর মুহূর্ত্তে সংক্রান্ত হইয়া যে বাসনা উৎপাদন করে, তাহাকে সংস্কার স্কন্ধ বলে। এই পঞ্চ প্রকারে বিবর্ত্তমান জ্ঞান সমূহই আত্মা।

আত্মা সংস্কার সমূহ হইতে পৃথক পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বৌদ্ধগণ কার্য্য ও কারণের অভেদ প্রমাণ করিয়াছেন; যেরূপ অসংখ্য জলকণার সমবায়ে নদীর উৎপত্তি হয়, ঐ জলকণা সমূহ ব্যতীত নদী নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, সেইরূপ সংস্কার সমূহের সমবায়ে আত্মার উদ্ভব হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ঐ সংস্কার সমূহ ব্যতীত আত্মা নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। লৌকিক ভাষায় এই সংস্কারসমূহের বর্ণনা করিতে

---

*যথা ন সংবিদ্যন্তে তথা সংবিদ্যন্তে এবং অবিদ্যমানাস্তেনোচ্যন্তে অবিদ্যেতি। (প্রজ্ঞাপারমিতা)

† যথা কশ্চিৎ দক্ষো মায়াকরো বা মায়াকরান্তেবাসী বা চতুর্ম্মহাপথে মহান্তং জনকায়মভিনির্ম্মিমীতে, অভিনির্ম্মায় তস্যৈব জনকায়স্য অন্তর্ধানং কুর্য্যাৎ তৎ কিং মন্যসে সুভূতে তত্র কেনচিৎ কশ্চিৎ হতো বা মারিতো বা অন্তর্হিতো বা। (প্রজ্ঞাপারমিতা)

* তত্র বিষয়প্রপঞ্চো রূপস্কন্ধঃ, তজ্জ্ঞানপ্রপঞ্চো বেদনা স্কন্ধঃ, আলয় বিজ্ঞান সন্তানঃ বিজ্ঞান স্কন্ধঃ। নাম প্রপঞ্চঃ সংজ্ঞা স্কন্ধঃ বাসনাপ্রপঞ্চঃ সংস্কারঃ। এবং পঞ্চধা বিবর্ত্তমানো জ্ঞানসন্তান এব আত্মা ইতি বৌদ্ধাঃ (মল্লিনাথঃ)

হইলে উহাদিগকে ক্ষণিক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। বোধিসত্বগণ অপক্ষপাত বুদ্ধিতে বিচারপূর্ব্বক কেবল "আত্মা"কেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন এরূপ নহে, তাঁহারা "কাল" নামক পদার্থকেও অস্বীকার করিয়াছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, নিত্য অনিত্য, ক্ষণিক ইত্যাদি শব্দ শ্রবণ করিয়া ঐ শব্দ সমূহের নিয়ামক কাল নামক কোন পারমার্থিক পদার্থ আছে, এরূপ মনে করা ভ্রান্তি মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানসমূহই কাল, দেশ ইত্যাদির ব্যবহার ও সম্বন্ধ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে "জ্ঞান" বলি, উহার সহিত অতীতকাল নামধেয় জ্ঞানের সমাবেশ হইলে উহা "স্মৃতি" এই নাম ধারণ করে এবং উহাই আবার ভবিষ্যৎ কাল নামধেয় জ্ঞানের সমাবেশে "প্রত্যাশা" এই নাম ধারণ করে। সাধারণ জ্ঞান পদার্থ দেশনামধেয় জ্ঞানের সম্বন্ধে রূপ, রস ইত্যাদি ভৌতিক বা জড় পদার্থ এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। একই জ্ঞানপদার্থ বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াপ্রবাহ সম্পন্ন করিতেছে। রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার ইহারা সকলেই মূলে এক পদার্থ। একই জ্ঞান পদার্থ এইরূপ বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হইতেছে। দেশ ও কাল এই দুই জ্ঞানের সহিত অন্যান্য জ্ঞান এত দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ যে ঐ দুই জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য জ্ঞান প্রায়ই প্রকাশ লাভ করিতে পারে না। আমরা যে কোন পদার্থের বর্ণনা করিতে যাই, উহাতে দেখিতে পাই, উহা কোন দেশ বা কোন কালের সহিত সংবদ্ধ। যদি জ্ঞান পদার্থকে দেশ ও কালের সহিত সম্পর্ক রহিত করিয়া বর্ণনা করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে অবশ্য নিত্যও বলিতে পারা যায় না, অনিত্যও বলা যায় না, তাহা হইলে উহা অণুও হইতে পারে না, মহৎও হইতে পারে না। যে পদার্থ নিত্যানিত্যের অতীত এবং যাহার অণুত্ব বা মহত্ত্ব নাই, তাহার উৎপত্তি বা ধ্বংস কিরূপে হইতে পারে? এই উৎপাদবিনাশরহিত, অণুত্ব মহত্ত্ব শূন্য ও নিত্যানিত্যত্ব বিগর্হিত পদার্থের নাম নাই। মহাজ্ঞানী বুদ্ধ অল্পজ্ঞ মানবের বোধসৌকর্য্যার্থে এই পদার্থের নাম রাখিয়াছেন "শূন্যতা বা মহাশূন্য।" গভীরধ্যানমগ্ন বোধিসত্বগণ জগৎপ্রবাহের অসারত্ব অনুভব করতঃ অবিদ্যার ধ্বংস ও এই মহাশূন্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই শূন্যতার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বুদ্ধদেব অবদানকল্পলতা ও অন্যান্য প্রাচীনগ্রন্থে "অদ্বয় বাদী ও অদ্বৈতবাদী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই মহাশূন্যে পর্য্যবসানই মহাযান সম্প্রদায়ের চরম উদ্দেশ্য এবং সেই মহাশূন্যে পর্য্যবসিত অবস্থাই নির্ব্বাণ। যোগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা এই শূন্যকে (দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধরহিত) জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই চিৎরূপী শূন্যমূর্ত্তিকে "ব্রহ্ম" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত রিজ্ ডেভিড্স্ (Rhys Davids) এই পঞ্চস্কন্ধের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, অষ্টাবিংশতি প্রকার ভৌতিক গুণ (জড়ের গুণ) সমূহের নাম রূপস্কন্ধ। চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, স্বাদন, স্পার্শন ও মানস এই ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষের নাম বেদনাস্কন্ধ। বাহ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ রহিত ষড়্‌বিধ আন্তর জ্ঞানের নাম সংজ্ঞাস্কন্ধ। দ্বিপঞ্চাশৎ প্রকার আভ্যন্তরীণ বাসনার নাম সংস্কারস্কন্ধ। সংস্কার সমূহের আলম্বন বা নিয়ামকের নাম বিজ্ঞানস্কন্ধ।

(বিবেক)। জীবের শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার শক্তি ও গুণ আছে সেই সমুদয়ই এই পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত। পদার্থমাত্রই ক্ষণিক, অতএব আত্মা নামক কোন নিত্য পদার্থ নাই। ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

উপাসনার ভাষাতত্ত্ব।

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা আজ কাল যেরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাতে ভগবদ্‌চিন্তাশীল মহানুভবগণের প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে না। কেন না, উচ্চ সাধকগণের মধ্যেও শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভাবের উচ্ছ্বাসে, ভাষার সৌন্দর্য্যে, রূপকের মাধুর্য্যে নিরাকারেও আকার গঠন হইতেছে। এ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে প্রশ্ন উঠিয়াও আকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রখরা ভক্তি-প্রসূত ভাবুকতার তীব্র শাসনে কেনই বা স্থান পাইবে? কিন্তু বুঝিবেন, ভাবুকতা-প্রমত্ত মতের আসক্তিতে যে আধ্যাত্মিক সাকার পূজার ভিতর দিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম পৃথিবীকে গ্রাস করে, এ কথা অবশ্যম্ভাবী। সংসারে অনেক স্থানেই কেবল যুক্তি তর্কের পুষ্ট সাধনেরই প্রবল শক্তি দেখা যায়। বরং অনেকেই প্রাচীন পদ্ধতি ও মতের আতিশয্য বশতঃ বলিয়া ফেলেন, উনি যে কথাটী বলিলেন, উটি তাঁহার ভুল, ইনি যাহা বলিতেছেন, ওটা কিছুই নয়। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ এ সকলত কিছু দেখেন না! মনের খেয়ালে একটা বলিয়া ফেলেন। এইরূপ মতগত আসক্তি প্রভাবে ব্রহ্মপূজার বিঘ্ন ঘটিতেছে এবং অনন্তকে "এস বস" সিংহাসনে ইত্যাদি বলিয়া টানাটানি করা হইতেছে। বাস্তবিক সরলভাবে একটুকু ভাবিয়া দেখিলে এরূপ লেখার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবার কথা নহে। বরঞ্চ না চটিয়া নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনায় বিশুদ্ধ ভাষা ভাব দ্বারা বিরুদ্ধ কথাগুলি পরিহার করিতে চেষ্টা পাইলে বড় সুখের হয়।

প্রেম ভক্তির কি অনিবার্য্য গতি! গভীর অনুরাগী জ্ঞান-যোগীও ধৈর্য্যচ্যুত হন। ভাবাবেশে প্রত্যঙ্গ-কল্পনা রোগে বিহ্বল হইয়া স্পষ্টই বলিয়া থাকেন, "হে প্রভো! আমি তোমার চরণাঙ্গুলির দাস।" এখানে তোমার চিরভৃত্য বলিলে কি চক্ষে জল আইসে না? বলিতে কি, প্রভুর কৃপায় ঐ কথাটীতে আমার উত্তপ্ত চক্ষেও কতবার জল পড়িয়াছে। হীনতা, দীনতা, অধীনতা প্রভৃতির ভাব হৃদয় হইতে যখন ফুটিয়া উঠে, তখন মানুষ চির অভ্যাসগত ভাষাকেই সহসা ধরিয়া ফেলে। তদ্দ্বারা যে প্রেম, প্রীতি, আনন্দ হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, উহাতেইত ভাবুকতার পুষ্টিসাধন করে, নিত্য পুরুষের মহান ভাবকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। আপনি একটুকু ভাবিয়া দেখুন ত? একটা উপল খণ্ডকে হিমালয় ভাবিয়া লইলে কি সত্যই তাহা হয়? তাহা যেমন কখনই সম্ভব হয় না, তেমনই চরণাদি শব্দেও অসীমত্ব ভাব ধারণ করিতে পারা যায় না! তর্কের স্থলে যিনি যতই কেন বলুন না, ঐরূপ উপাদান দ্বারা নিরাকারেও ঈশ্বরের মূর্ত্তি গঠিত হইয়া পার্থিব শরীর ভাবে প্রকাশিত হয়। কারণ, ভক্তির শক্তি এতই প্রবলা যে, বড় বড় সাধকগণকেও ঐ ভাবে টলিয়া পড়িতে দেখা যায়। গাঁহারা

নিরাকার একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের বক্তৃতাতে কাশি, বৃন্দাবন কাঁপাইয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ রোগেস্থিত গৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতেছেন। এই অন্তর্ভেদী ভীষণ রোগে পৃথিবী অনেক দিন হইতে কৃষ্ণজী, রঘুনাথজী, মহাবীর হনুমানজীর দারু-ধাতু প্রস্তরাদি নির্ম্মিত পুতুলের দুর্ব্বহ ভার বহন করিতেছে। হা! এমন সুসময়েও যদি আধ্যাত্মিক পৌত্তলিক পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে আর উপায় কি?

নিরাকার ঈশ্বরে কোনরূপ পার্থিব বস্তুর সাহায্য চলিতে পারে না, আবার সুবিশাল বিশ্বচরাচর এ সকলও তাঁহার ভিতরে অস্পর্শ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এমন অবস্থাতেও সাধকের পবিত্র দৃষ্টি যখন হৃদয়কে ভেদ করিয়া ছুটে, তখন কি অসীম সৌন্দর্য্য মধ্যে কোন প্রকার অবয়ব চিহ্ন সহ্য হয়? ব্যাকুল প্রাণে তিনি কেবল রুচি, ভক্তি, প্রীতি ও অনুরাগাদিকেই দেব প্রদত্ত বিশুদ্ধ ভূষণ ভাবিয়া কৃতার্থ হইতে থাকেন? বাস্তবিকই যতক্ষণ মানবের স্বাধীন ইচ্ছা ও আমিত্বের মলিন ভাব চলিয়া না যায়, ততক্ষণ শাশ্বত ধর্ম্মের উজ্জল জ্যোতিঃ বিকাশ পায় না, এবং নিষ্কলঙ্ক স্বর্গীয় তত্ত্ব সকলও পরিস্ফুট হয় না। এই কারণে অনেকে রূপক আধ্যাত্মিকের সাহায্যে ও পার্থিব কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভূষণে ঈশ্বরকে কোন প্রকার মূর্ত্তিতে আনিয়া তৃপ্তি বোধ করেন। কিন্তু তাহা যে ভয়ানক সাধন-বিভ্রাট, কিছুতেই মতগত আসক্তি প্রভাবে স্বীকার করেন না বরং আশু সুখের লালসার বক্তৃতার ঢেউয়ে ভাসাইয়া দেন।

এইরূপ রুচিগত অভ্যাসকে প্রশ্রয় দেওয়াতে কতদূর যে সাধনের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে, সরল বিশ্বাসী যোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। কারণ, তাঁহারা পরমানন্দ রসে নিয়ত নিমগ্ন থাকেন। ইহা যে যোগ-বিঘ্ন ভয়ঙ্কর বিকার ভোগের যাতনা, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াই কল্পনার রাজ্য হইতে দূরে অবস্থিতি করেন, নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মাত অবলম্বন করিয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হন। তাঁহাদের উজ্জল দৃষ্টিতে আর কোন প্রকার পরিমিত বস্তুর ভাবে বাধা দিতে পারে না। নির্ব্বিকল্প নিরাকার ঈশ্বরকে কোন সসীম পদার্থ সম্ভূত ভাষার দ্বারা চিন্তা বা রূপক আধ্যাত্মিকে হস্ত-পদাদির সংযোগে দর্শনেরও আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, এক মাত্র অসীমানন্দ রসে ডুবিয়া অনন্তেরই সত্তা ভোগ করেন। জড়ীয় বস্তুর ভাষা ভাব জড়িত যে তত্ত্বই হউক না কেন; কিছুতেই তাঁহাদের সুদৃঢ় হৃদয় বিচলিত হয় না বরং "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদি স্বরূপের একতায় অসীম শক্তিরই প্রকাশভাবে জগৎকে সুখী করেন এবং স্বর্গীয় তত্ত্বের উপহার দিয়া ভ্রাতৃত্বের গূঢ়মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন।

তাইত ভাবিতেছি, এখন যে সত্যপ্রিয় সাধকগণের বিশুদ্ধ ভাবগুলি বাতাসে ধূলির মত উড়িয়া যায়! উনি বড় লোক, উচ্চ উপাধিধারী, যাই কেন বলেন না, উঁহার সমস্ত কথা শুনিতেই হইবে। নীরস নিষ্প্রয়োজনীয় হইলেও তাহা আদরের বস্তু। আর ঐ সাধনশীল গরীবটী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সত্যের কথা বলিতেছেন, তাহা কে শুনিবে? চক্ষু রাঙাইয়া, "ও কি বলে? আঃ—বলে কি?" আবার বাবুটীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! ঐ বিষয়টীর শেষ কথাটী কি—বলুন ত?" সম্মান্থ মহোদয় মুখ খুলিতে না খুলিতেই করতালির শব্দে আলোচনার স্থানটী পূর্ণ হয়, আনন্দের পরি-

সীমা থাকে না। এই ভয়ঙ্কর রোগে কি কখন উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব তিষ্ঠিতে পারে? একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম যে শতগ্রন্থী মলিন বসন পরিধেয় বৃক্ষতলবাসী দীনের হৃদয় নিহিত বস্তু? যাঁহারা নানাবিধ ভাষায় পারদর্শী এবং বিপুল ঐশ্বর্য্যভোগী হইয়া ঐরূপ দীন ভ্রাতাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধর্ম্ম ও ভাষা-তত্ত্ব রক্ষা করিতে পারেন। মৌমাছি ত দুর্গন্ধময় স্থান হইতেও মধু সংগ্রহ করে? ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীগণের ঐরূপ স্বভাব গঠিত করা কি উচিত নহে? তাহা না হইলে দীনতার অভাব হইয়া যায়, হৃদয়ের ধর্ম্মভাব মলিনও শুষ্কতায় আচ্ছন্ন করে, সাধু প্রবৃত্তি সকল একবারে অন্তর্হিত হয়।

যাক্, এখন আধ্যাত্মিক রূপক ভাষার মধ্যে শুভাশুভ ভাবের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। ঐরূপ আধ্যাত্মিক ভাষায় যে উপাসকগণের প্রাণে তৃপ্তি হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু এ টুকু অবশ্যই বলিব, রূপক ভাব জড়িত ভাষা-ভাবে ঈশ্বরের একটী মূর্ত্তি কল্পনা করা হয়। "হে প্রভো! তোমার মঙ্গল হস্ত এই পাপদগ্ধ গাত্রে একবার বুলাইয়া দাও—তোমার প্রেম মুখের হাসিতে জগৎকে আকুল করিতেছ—তোমার পাদপদ্মের এক পার্শ্বে স্থান দাও"—অধিক কি বলিব, কোন স্থানে ইহাও শুনিয়াছি, "প্রভো! তোমার চরণ তলে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া যেন বাস করি" ইত্যাদি ভক্তি ভাবোদ্দীপক অনেক কথা বলিবার আছে। বলুন ত? মুখের হাসি, গাত্রে হাত বুলান, চরণকমলে স্থান, এ সকল কি নিরাকার ঈশ্বরের অঙ্গ সৌন্দর্য্যের কল্পনা নহে? আর যদি মতের দুর্জ্জয় বলে ও তর্কের তীক্ষ্ণধারে কাটিয়া ফেলেন, তবুও বুঝিবেন, অনন্ত যোগের ভিতরে ঐরূপ কল্পনাগুলি বিবিধরূপে ফুটিয়া চিত্তকে পরিমিত ভাবে মুগ্ধ করিবেই করিবে। বলিতে পারি না, কে এমন শক্তিশালী আছেন যে, নীল লোহিতাদি বিবিধ বর্ণের বৈচিত্র্যতাকে বিনষ্ট করিয়া একটী বর্ণে দেখিতে পান? বস্তুতঃই ঐ সকল রূপক ভাষায় যোগ বিভ্রাট হয়, একথা যোগী মাত্রই স্বীকার করিবেন।

অনন্তব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা, স্বাভাবিক দেবভাষা ব্যতীত মানবীয় ভাষায় প্রকৃত হয় না। তাহার কারণ এই যে, মানুষ আসক্তির প্রলোভন এড়াইতে না পারিয়া স্থূল বস্তুর ছায়াকে অবলম্বন করে এবং আশু চিত্তরঞ্জক ভাষার বশীভূত হইয়া যায়। এজন্য ঐশ্বরীক ভাষা-তত্ত্ব সহসা গ্রহণ করিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে আমিত্বের মলিন ভাব অপসৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐশ্বরীক ভাষা-তত্ত্ব অনুভূত হয় না। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই ঐ অব্যাহত ভাষা শক্তিতে দেব তত্ত্বের উজ্জ্বল পথ দেখাইয়া দেয়। যাহা হউক, ঐরূপ অমিশ্রিত ভাষা-তত্ত্ব সংসারে উল্টা হইলেও তাহার শক্তি অনতিক্রমণীয়। কি আশ্চর্য্য! এই মহত্তত্ত্বের আন্দোলন হইলে ভয়ানক তর্কের যাতনা সহ্য করিতে হয়। তজ্জন্য কতকগুলি দেব ভাষাকে যে পরিমিত ভাবে আনিয়া তর্কযুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা এবং কতকগুলি স্থূলতত্ত্বের ছায়াভাব যাহা ব্যবহার করিতে দেখা যায়, সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলা আবশ্যক।

তুমি—কাহাকে বলে? মুখ তুমি না হস্ত পদাদি তুমি? ইহাতে বুঝা যায়, সমস্ত শরীর সমষ্টি ধরিয়া একটী আকৃতি—তাহার ভিতর হইতে যে জীব জড়িত চিচ্ছক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তুমি। শব শরীরটীকে

কি কেহ বলিয়া থাকে, "কি হে! তুমি কি করিতেছ?" এখানে শরীর বেষ্টিত চিচ্ছক্তিকেই তুমি বলা প্রমাণ হইতেছে। সাধকগণ ঈশ্বরের অনন্তত্ব অর্থাৎ পূর্ণ-স্বভাবকেই তুমি শব্দে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। মানব শরীরেও সেই চৈতন্য-সত্তা বর্ত্তমান থাকিলে 'তুমি' বলা যায়। ইহাই ত তুমির অর্থ— তুমি তত্ত্ব ত পরিমিত নহে? অনেকেই ইহার গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ে গ্রহণ করেন না, মানবীয় সংকীর্ণ ভাবে দেখিয়া ভীষণ তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন।

চক্ষু ও দৃষ্টিশক্তি—চক্ষু বলিতে কি বুঝায়? শরীরস্থিত প্রধান দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু স্থূল বস্তু, তাহার মধ্যস্থলে অতি ক্ষুদ্র গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ (পরকলা) তারা আছে,যাহাকে সকলে মণি কহে। উহাতেই চিচ্ছক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া দৃষ্টি শক্তি প্রকাশ করে। দর্শন শক্তি ক্ষুদ্রাধারে অবস্থিতি করিয়াও তাহার অব্যাহত গতি বদ্ধ থাকে না বটে, কিন্তু স্থূল তত্ত্বের অবস্থাভেদে তারতম্যও বুঝিয়া থাকি। যেমন সূর্য্য পরিমিত হইয়াও তাহার প্রখর জ্যোতিতে কোটি কোটি জগৎকে আলোকিত করিতেছে অথচ ঐ সূর্য্যই আবার এই পৃথিবীর আচ্ছাদনে অদৃশ্য হয়। তেমনই চক্ষুর মণিবিম্বিত দৃষ্টিশক্তির গতি অনতিক্রমণীয়। চক্ষু দুইটী অঙ্গুলির আবরণেও আবৃত হয়। তবেই বুঝিয়া দেখুন, কাচপাত্রে দীপালোক বাহিরে ফুটিয়া আইসে, তাই বলিয়া কি কাচ তেজোময় পদার্থ? চক্ষুর ক্ষুদ্র মণিও সেইরূপ। পৃথিবী এবং জড় চক্ষের অবয়বের আবরণে দৃষ্টি শক্তির অনন্ত গতি সংকীর্ণ বোধ হয়। * এস্থলে বুঝিবেন, চক্ষু স্থূল ও পরিমিত ক্ষুদ্র, দৃষ্টিশক্তির গতি অপরিমিত। দৃষ্টিশক্তিকে ঈশ্বরের অখণ্ড দৃষ্টি বলিলে কোন ক্ষতি হয় না। বস্তুতঃই দৃষ্টিশক্তি খণ্ড নহে, ইহা চিচ্ছক্তির অনন্তব্যাপী মহা ব্যাপার, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মহাজ্ঞানের বিকাশ ভাব উহাই ব্রহ্মদৃষ্টি—শরীর ভাবের ভিতর দিয়া অস্পর্শরূপে অনাদিকাল প্রকাশ পাইতেছে। কোটি কোটি দেহী সকল স্থূলে বিলীন হইতেছে, আবার উঠিতেছে, কিন্তু ঐ দৃষ্টি শক্তির অনন্ত উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নিত্যকাল একই ভাবে রহিয়াছে। কারণ, দৃষ্টিশক্তিই ঈশ্বরের অনন্ত অস্তিত্ব। অনেকে আমিত্ব প্রলোভনে জীবন্ত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, দেহীর অবস্থাভেদে ঐ মহদ্দৃষ্টিকে খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত করতঃ, স্থূলভাবে গ্রহণ করেন। তন্নিমিত্ত ঐশী শক্তির গূঢ় মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তর্ক-যুক্তি দ্বারা হৃদয়,মন, প্রাণকে সংকীর্ণতায় বদ্ধ রাখেন। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইবেন, আশ্চর্য্য কি? আহা! এমন যে চৈতন্যময় শব্দ শক্তি, সকল প্রকার ভঙ্গুর শরীর ভেদ করিয়া প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, উহাতেই দেহী সমূহ চলিতেছে, পরস্পর পরস্পরকে দেখিতেছে, সমস্তই ত ঐ চিচ্ছক্তির লীলা! ইহা না ভাবিয়া অনেকেই স্থূলের বিচিত্র ক্রিয়া দর্শনে কৃতার্থ হইতেছেন। বাস্তবিকই আমরা আমিত্ব জ্ঞানে যে ক্ষুদ্রাধারে অনন্ত দৃষ্টি শক্তিকে বদ্ধ রাখি, তাহাতে সংকীর্ণতাই প্রদর্শিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মশক্তির অসীম ভাব প্রকাশ হইতে দেই না। এই কারণেই ত স্থূলের আভাস ভাব "সর্ব্বতোক্ষি" ইত্যাদি শাব্দিক ভাষাগুলিও নিরাকার নিত্য তত্ত্বে ব্যবহৃত হইলে উহা সঙ্গত বিবেচনা

* পৃথিবী গোলাকার সত্তে দিগমণ্ডল সংকীর্ণ ভাবে প্রত্যক্ষ হয়, এইজন্য দর্শন-শক্তি দূরতাকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে না।

হয় না। ঐ শূন্যটার বিকৃত বিস্ফারিত চক্ষু কি জগতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছে? অতঃপর স্পষ্টই জানা যাইতেছে, দৃষ্টি শক্তিই চৈতন্য ও নিরাকার নিত্য, অবয়ব বিশিষ্ট স্থূল চক্ষু বস্তুতঃই অচেতন পদার্থ অনিত্য। যেমন বাষ্পের শক্তিতে ফাহুসের চলিবার শক্তি, চক্ষুর অবস্থাও ঠিক তেমনই।

চরণ কি নিরাকার?—পঞ্চবিধ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে উহাও একটী ইন্দ্রিয়। ইহার দ্বারা পর্য্যটন কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহা স্থূলে গঠিত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি যেমন শরীরের এক একটী চিহ্ন, চরণও তেমনই একটী চিহ্নিত বস্তু। চরণ উচ্চারণ করিতে গেলেই ঐ দেহস্থিত ভ্রমণ-যন্ত্র বলিয়া মনে হয়। কেননা, কর্ম্মেন্দ্রিয় মাত্রেই পৃথকরূপে শরীরে সংযুক্ত রহিয়াছে। হস্ত বলিতে হইলে কি সমস্ত শরীরকে বুঝায়? না হস্তই বিবেচনা হয়? এজন্য স্থূলের গঠিত পদার্থ যাই কেন হউক না, উহা কিছুতেই সর্ব্বব্যাপী ভাবের সাহায্য করিতে পারে না। ভক্তগণ দাসত্বাদির পুষ্টিসাধন জন্য ব্যাকুলচিত্তে চরণ শব্দ ব্যবহার করেন বটে, বস্তুতঃ তাহাতে ঈশ্বরের অনন্ত ভাবকে ম্লান করে। তিনি যে নিরাময় "ব্রণরহিত" কোন আকৃতি বিশিষ্ট নহেন? এইরূপ চিহ্নগত ভাবা দ্বারা নিরাকার ঈশ্বরকেও যেন একটী মূর্ত্তি ভাবে দর্শনের প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে। স্থূল বস্তুর আভাস ভাবা নিরাকার ভাবে ভাবিয়া লইয়াও যে কোন ভাবে আরোপ করা যাক্ না; তাহাতে অনন্তব্যাপী পরমেশ্বরের দর্শন হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিকই ঐ ভাবে অখণ্ড দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিতে পারে না, অতঃপর পরিমিত স্থূল তত্ত্বের আকর্ষণ পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এ বিষয় ভক্ত, সাধক, যোগী সকলেরই প্রার্থনীয়। উপাসনার শেষে যে বলা যায়, "প্রভো! তোমার মুক্তিপ্রদ চরণে বারবার নমস্কার করি।" এস্থলে প্রভো! তোমাকে পাপসন্তাপিত হৃদয়ে নমস্কার করি, রক্ষা কর। ইহাতে কি সুখ, শান্তি, সন্তোষ লাভ করা যায় না?

ঈশ্বর আসেন আর ব'সেন—এই ভাবাটী চিরদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, সচরাচর সকল স্থানেই শুনা যায়। ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষে ঈশ্বরের আহ্বান বিসর্জ্জন উভয়ই আছে। যখন একটী ক্ষুদ্র পাত্রেও তাঁহারা ঈশ্বরকে বসাইতে পারেন, আবার ইহাগচ্ছ ছাড়িয়া গচ্ছ গচ্ছ মন্ত্রে অনায়াসে বিদায় দিয়াও থাকেন, তখন অবশ্য উহাঁদের বিশ্বাস মতে সম্ভব হয় হউক, তদসম্বন্ধে আমাদের বলিবার কোন কথা নাই। কিন্তু একেশ্বরবাদ ধর্ম্মে যে একমাত্র অনন্তেরই পূজা, এখানেও কি ঈশ্বর আসেন আর যান? আসিলেত কিছুকাল বসিতেও হয়? এই কথাই বা কেন বলি? শাস্ত্র যে বলিতেছেন, ঈশ্বরের মুখ নাই অথচ কথা বলেন, হাত নাই কার্য্য করেন, চরণ নাই সর্ব্বত্র চলিতে পারেন। আচ্ছা, অনাহত শব্দ ও অখণ্ড ইচ্ছার কার্য্যকারিতা শক্তি এ যেন বুঝিলাম। তিনি অসীম, ব্যাপ্তময়, নিরাকার, স্থির ও অবিচলিত, এমন কোথায় একটুকু স্থান আছে যে, সেখানে আবার তিনি আসিবেন, চলিয়া বেড়াইবেন? তবেই বলিতে হয়, প্রভু কোন একটী মূর্ত্তি ধরিয়া উপাসকগণের তৃপ্তির জন্য অনবরত ঘুরিতে থাকেন। * এইরূপ ভাবা

* ইহার গূঢ় তত্ত্ব এই যে আমাদের হৃদয় যখন ভ্রান্তির অন্ধকার হইতে পরিষ্কৃত হয়, তখন ঐশী শক্তির প্রকাশ ভাব বুঝিয়া তাহাকেই ঈশ্বরের আসা ও স্থিতি ভাবকে বসা মনে হয়, আবার ভ্রান্তিতে প্রচ্ছন্ন করিলে তাঁহার চলিয়া যাওয়া বিবেচনা হইয়া থাকে

ভাবে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা পদ্ধতি সম্ভবত কত দূর সঙ্গত, একটুকু চিন্তা করা উচিত। পার্থিব ইন্দ্রিয় সাহায্যে ও রূপক পূর্ণ মানবীয় ভাষায় অনন্ত ব্যাপী পরমেশ্বরের উপাসনা যে বিরুদ্ধ, ইহা যতক্ষণ হৃদয়ঙ্গম না হইবে, ততক্ষণ স্বাভাবিক দেবভাষায় অধিকার জন্মিবে না। বাহ্যিক লোকরঞ্জিত ভাষারই আকাজ্ঞা বলবতী হইতে থাকিবে বরং উহা চিরবর্দ্ধিত হইবার জন্য মনের আবেগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। দুঃখের কথা যে, সাধনশীল সাধকগণ মধ্যেও অনেককে এই মানবীয় অতিরঞ্জিত ভাষার পুষ্টিসাধনে পরাঙ্মুখ দেখিতেছি না। ভাবের উচ্ছ্বাসে "প্রভু যেন কচ্ছপ অবতার"—কথাটী কি একবারেই কৌতুকাবহ মনে করিবেন? স্নেহ-বক্ষঃ, প্রেম-মুখ, মঙ্গল-হস্ত, অধীনতার ভাবটাই যেন চরণ হইল, এই ভাবে কি ঐ রূপটীর দর্শন অসম্ভব বলিতে পারেন? হায়! নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে কত বিচার কত তর্ক কত সভা সমিতি চলিতেছে, তাহার উপরেও যদি এই ভীষণ রোগ প্রবল হইতে থাকে, তবে আর উপায় কি?

নামতত্ত্ব—নিরাকারের আবার নাম কেন? তিনি যে নিরুপাধি নিত্য। ইহাকেও যদি তর্ক ধরিয়া বলা যায়, এ সকল কথাই বা কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ বিশ্বাসের মূলে বুঝিবেন, চিৎ—জ্ঞান বা চৈতন্য, ইহা স্বাভাবিক। বেদ বলিতেছেন, "অহমস্মি" চৈতন্য শক্তিতে কি অনাহত শব্দে "আমি আছি" কথাটি প্রকাশ হইতে পারে না? সেই চৈতন্যইত জীব অথবা আত্মা শব্দে অবিহিত। ঐ শব্দ চৈতন্য হইতে ঈশিত্ব ঐশ্বর্য্যময় ঈশ্বর নাম, এটীও স্বাভাবিক যোগী হৃদয় নিঃসৃত। এখানে সম্যক রূপে বলিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য ইহার মূল কথাটীমাত্র ব্যক্ত হইল। তবেই দেখুন, স্বাভাবিক যোগে যখন ঈশ্বর নাম পাওয়া যায়, তখন ঐরূপ ধাতুগত অব্যর্থ অনেক প্রকার নাম, যোগীরা হৃদয়েই প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত মধুসূদন, রুক্মিণীনাথ, গোপীবল্লভ প্রভৃতি বংশগত ও কার্য্যাদির ভাবে যে সকল নাম তাহা ভক্ত প্রদত্ত। ইহাতেই জানিবেন, নামতত্ত্ব দুইভাগে প্রকাশ পাইতেছে। একটী স্বাভাবিক ভাবে, আর একটী মানবীয় ভাবে। এই উভয় ভাব মধ্যে প্রথমোক্তটী সিদ্ধ—শেষোক্তটী যৌক্তিক জীবন শূন্য নাম। যেমন হরি—অর্থাৎ পাপকে যিনি হরণ করেন—তিনি কে? ঈশ্বর। গৌরাঙ্গ—(গৌর-অঙ্গ) ইহাকে শ্বেতবর্ণ শরীরধারী বলিয়াই বুঝায়। বাস্তবিক নামতত্ত্ব বিষয়ে ভক্তগণ তত দৃষ্টি রাখেন না, কোন স্থানে ইহাও শুনিয়াছি, ঈশ্বরকে হুকো, কল্কি যাই কেন বলিয়া ডাকিনা, তিনিত প্রাণটা বুঝেন? অমনি তাঁহার করুণা বর্ষিত হইবে। এই কথাটী একটুকু ভাবুন ত? আপনি পিপাসায় ব্যাকুল, প্রাণে এক খণ্ড অগ্নিকে তুষার খণ্ড ভাবিয়া যদি ভক্ষণ করেন, তাহাতে কি আপনার মুখ পুড়িবে না? নামতত্ত্বেও সেইরূপ বুঝিবেন। হায়! নিরাকারবাদী উপাসকগণ মধ্যে নামতত্ত্বের ভাষা-বিভ্রাট, ঘুচিবে কি ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সম্প্রদায় ভেদই বিপদের ঐকমাত্র ভিত্তি। ইংরাজী ভাষায় গড্, আরব্য ভাষায় আল্লা, য়ীহুদি ভাষায় যীহবা, এ সকল ত স্বাভাবিক নিত্য নাম? উপাসনার মধ্যে হিন্দুগণ কি আল্লা, গড্, যীহবা বলেন? মুসলমানগণ কি হরি, গড্ ইত্যাদি ভাবে সর্ব্বশক্তি-

মানকে ডাকেন? পরস্পর মধ্যে যদি কেহ ঐ রূপে প্রভুর নাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেত সম্প্রদায় বিশেষের ভাষায় "দূর দূর বিধর্ম্মী, কাফের," ঈদৃশ তীব্র কথায় তিরস্কৃত ও তথনি তাড়িত হইতে হয়! এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ঈশ্বরকেও ভাষা-ভাবে উপাসনা দূরে থাকুক, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই আপন আপন জাতিতে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন, ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা! সকলে এক পিতার পুত্র হইয়া যে ভাষাগত ভাবে ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হইতেছেন, কেহই একবার ভাবিয়া দেখিতেছেন না। এ বিষয় সতর্ক হওয়া কি উচিত নহে?

অধিকার ভেদ।—সাধক শ্রেণীর মধ্যে উপাসনা তত্ত্বে অধিকার ভেদ এই ভাষাটী প্রায়ই শুনা যায়। প্রথমে ক, খ, না পড়িয়াই কি একবারে বেদ, বেদান্ত শিক্ষা করিবে, না ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইবে? এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে চাই না; তবে এটুকু অবশ্যই বলিতে পারি, মহর্ষি যীশু নিরক্ষর সত্ত্বেও তিনি কোন্ অধিকারে ও কোন্ ভাষায় পৃথিবীকে ঘোর নিদ্রা হইতে জাগ্রত করেন? তাঁহার স্বাভাবিক স্বর্গীয় ভাষা যে নিরক্ষর ধাতুতে সিদ্ধ; তাহা কি শনৈঃ শিক্ষার্থী পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছিলেন? ক, খ, এ, বি, আলেফ্, বে, এসকল ত স্থূলের ছায়া সাঙ্কেতিক পরিমিত বর্ণচিহ্ন—ইহা বাহির হইবার মূলস্থান কোথায়? ঐ যে অসীমাকাশ-ভেদী শব্দ শক্তি ও সমস্ত দেহীর হৃদয় অধিকার করিয়া ধ্বনিত হইতেছে, অজ্ঞানতার অন্ধকারে সহসা এ মহতত্ত্বের গূঢ় মর্ম্ম বুঝা যায় না। যতই ঈশ্বর কৃপা বর্ষিত হইয়া ঐ অন্ধকারকে দূর করে, ততই ঈশ্বরোপাসনার বিশুদ্ধ ভাষা ফুটিয়া উঠে এবং স্বভাবসিদ্ধ অধিকার আসিয়া অধিকার করে। তখন পৃথিবীর ভাষায় উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না। তবেই ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, ঐশীশক্তি অধিকার-ভেদে অথবা সময় সাপেক্ষে আকর্ষণ করিতে ক্ষান্ত থাকে না। অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমের বহুশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ "মহিষ মর্দ্দিনী দেবী" বলিয়া সময় কাটাইতেছেন। আবার একজন নীচ শ্রেণীর শাস্ত্রান্ধ দ্বাদশ বর্ষীয় যুবক, নিরাকার চিন্ময় অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনায় উন্মত্ত। চক্ষুর জল ফেলিয়া কাঁদিতেছে, "হে প্রভো! আমার হৃদয়ের কুটিল ভাব ও পাপ-তাপ সকল দূর কর" এই সকল ভাষাতেই প্রেমের আবেশে আকুল! দেখুন ত? এ স্থলে ঐ বৃদ্ধ ঠাকুর মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষার উপাসনাটাই ঠিক, না শূদ্র যুবকটীরই প্রেমপূর্ণ সরল ভাষার প্রার্থনাটাই প্রাণস্পর্শী? ইহাতেই জানিবেন, ঈশ্বরের উপাসনায় অধিকারভেদ নাই, জাতিভেদ নাই, বাল-বৃদ্ধ যুবার অবস্থাভেদ নাই। যিনি ব্রহ্মকে অন্তঃকরণে বুঝেন, তিনিই ধন্য! প্রক্রিয়া-প্রলুব্ধ অস্বাভাবিক ভাব-প্রমত্তগণ তাঁহারাই অভেদময় স্বাভাবিক দেবতত্ত্ব গ্রহণ করিতে চান না; যুক্তির কুটজালে উপাসনার ভাষা-তত্ত্বকে বদ্ধ রাখেন—কিছুতেই প্রকাশ হইতে দেন না।

সংসারে ঈদৃশ বহুবিধ ভাবের আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা পার্থিব ভাব-প্রসূত অতিরঞ্জিত ভাষাকে অবলম্বন করতঃ উপাসনায় অধীর হয়েন, বস্তুতঃ তাঁহারা যে অনন্ত আরাধনার অমিয় পানে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেন, বলিতে পারি না। নিরাকার অনন্তব্যাপী পরমেশ্বরের উপাসনার ভাষাতত্ত্বও অখণ্ড। কেন না, জড়ীয় শক্তির

যে, অখণ্ড শক্তির সহিত কখনই মিলন সম্ভবে না। রূপক-ব্যঞ্জক অতিরঞ্জিত ভাষা সকল হৃদয়গ্রাহী হইলেও কি হইবে? তাহার প্রকৃতি যে কল্পনায় গঠিত। ইহাতে সত্যকে অসত্যের আবরণে বুঝিতে দেয় না, জগত্তত্ত্বের বৈচিত্র্যতার আপাত মধুর ভাবে আকৃষ্ট করে, সসীম সৌন্দর্য্যের প্রলোভন সমূহ সম্মুখে আনিয়া দেয়; উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জড়ের অন্তরালে সংকীর্ণ করিয়া ফেলে। কি শোচনীয় ভাব! মৃগ যেমন জলভ্রমে মরীচিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ঘুরিয়া মরে, তেমনই রূপক কল্পনাপূর্ণ ভাষা যতই প্রাণস্পর্শী হউক না কেন, উহা দ্বারা অভীষ্ট লাভের আশা অসম্ভব।

তত্ত্বজ্ঞগণ! বিনীত ও কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি, আপনারা মনে করিবেন না যে, ঐ স্বর্গীয় ভাষা-তত্ত্ব আমি বুঝিয়াছি। গভীর যোগনিষ্ঠ যোগীগণের হৃদয়-নিঃসৃত যে সকল দেব-ভাষা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা স্মরণ হইলে প্রাণ বড় আকুল হয়। সেই জন্যই সকলের নিকট কয়টী কথা বলিলাম। মনে হয়, তত্ত্বদর্শী সাধকগণ মধ্যে ইহা উড়িয়া যাইবে না। নিরাকার ঈশ্বরের পূজা, একমাত্র বিশুদ্ধ ভাষার প্রতি নির্ভর। যদিও নানা আসক্তির প্রলোভনে আমরা উপাসনার ভাষাতত্ত্বকে স্থির রাখিতে পারি না, তথাপি সম্ভবত চেষ্টা করা উচিত যে, যতটুকু নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মলভাবে ঐ দেবপ্রদত্ত ভাষাকে ধরিতে পারি, তজ্জন্য কিছুতেই উদাসীন হইব না। কারণ, উপর্য্যুক্ত ভাবে অনন্ত চিন্তার প্রতি কোন প্রকার স্থূলের ছায়া সন্নিবেশিত হইলে হৃদয়ে বজ্রবৎ আঘাৎ পড়ে। এটী সাধকের হৃদয়ের কথা! একেশ্বরবাদী উপাসকগণ কখনই প্রক্রিয়া প্রলুব্ধ হইয়া স্থূলের কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। ভাল, একবার চক্ষু মুদিত করিয়া দেখা যাউক না কেন, অযাচিত ব্রহ্মশক্তিতে হৃদয়কে তোলপাড় করে কি না? অসীমালোকে গভীর অন্ধকার ডুবিয়া যায় কি না? "আর ভয় নাই" এই অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কি না? অবশ্যই বলিব, প্রেমের আকর্ষণে দেবভাষা ক্রমেই জাগিয়া উঠে। যিনি বুঝিতে পারেন, তিনি বুঝিয়াছেন। গগন-মণ্ডলে কোটি কোটি নক্ষত্রে শোভাসম্পন্ন করিতেছে বটে, ভাবিয়া দেখিলে ইহাও ত পরিমিত সৌন্দর্য্য? সেই মহাকাশভেদী নিরাকার মধ্যে অখণ্ড জীবভাবে মহাভাবের মহালীলা ব্যতীত আর কিছুই ত নাই, এক মাত্র নিরূপমেয় অনন্ত শোভা; যাহা ব্যক্ত করিতে ভাষা পরাভব। যোগীগণ আবাঙ্মুখ হইয়া অশ্রুধারায় নিমগ্ন—আর কি বলিবেন? মানবীয় ভাষা পরাস্ত। কাহার সাধ্য যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিতে পারে? এই জন্যই কি যীশু ক্রুশে রক্ত দিয়াছিলেন? রাজপুত্র শাক্যসিংহ ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন? হাফেজ হৃদয়াকাশে প্রিয়তমের অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন?

হায়! সংসার ত বিষে অমৃতে জড়িত। কেহবা প্রভুকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন, কেহবা বৃথা আমোদ প্রমোদে সময় কাটাইতেছেন। কেহবা ধর্ম্মকথা শুনিবা মাত্র জৃম্ভণ ছাড়িতেছেন। এই সংসারে যে দরিদ্রতার ভিতরে ঐশ্বর্য্য আছে, রোগের ভিতরে স্বাস্থ্য আছে, নিরাশার ভিতরে আশা আছে, ইহা যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি ধন্য! ঈদৃশ গূঢ়তত্ত্বভেদী সাধকগণই উপাসনার ভাষা-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম। আমিত কিছুই বুঝিনা। বহু

অপরাধে অপরাধী হইয়াও মহান তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি! শুষ্ক কাষ্ঠকে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উঠে; আমার কঠিন পাষাণ হৃদয় সম্বন্ধে ইহা সম্ভব কি? এক্ষণে সাধারণের নিকট দয়ার ভিক্ষার্থী—এই অল্প বুদ্ধি অযত্নের জন্য সকলে প্রভুর কাছে একটুকু প্রার্থনা করুন, এই শেষ প্রার্থনা।

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

পঞ্চরত্নম্।

নাগঃ পোতস্তথা বৈদ্যঃ কান্তিঃ শক্যো যথাক্রমম্।
পঞ্চরত্নমিদং প্রোক্তং বিদুষামপি দুর্লভম্॥

(১)

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্ম ন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
সৎপুত্রেণ কুলং নৃপেণ বসুধা লোকত্রয়ং বিষ্ণুনা॥

মদের ক্ষরণ হলে হস্তী শোভা পায়,
জল শোভা পায় যদি পদ্ম ফুটে তায়।
পূর্ণচন্দ্র উঠে যদি রাত্রি শোভা করে,
নারী শোভা পায় যদি গুণে মন হরে।
অশ্ব শোভা পায় যদি থাকে দ্রুতগতি,
উৎসব থাকিলে নিত্য গৃহে শোভে অতি।
ব্যাকরণ জানিলেই বাণী শোভা ধরে,
নদী শোভে যদি তায় হংসযুগ চরে।
পণ্ডিত থাকিলে তবে সভা শোভা পায়,
বংশ শোভে যদি তায় সুপুত্র জন্মায়।
রাজা থাকিলেই শোভা রাজ্যের তখন,
বিষ্ণুর স্থিতিতে শোভা পায় ত্রিভুবন।

(২)

পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোহন্ধকারাগমে
নির্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ সৃণিঃ।
ইত্থং তদ্ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা
মন্যে দুর্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাহপি ভগ্নোদ্যমঃ॥

তরীর হয়েছে সৃষ্টি সাগর তরিতে,
দীপের হয়েছে সৃষ্টি আঁধার হরিতে।
পাখার হয়েছে সৃষ্টি বায়ুর সেবনে,
অঙ্কুশের সৃষ্টি হস্তি-দর্পের চূরণে।
এ জগতে কোন কিছু কভু নাহি হেরি
বিধাতা না রাখে যার প্রতীকার করি;
কেবল দুষ্টের মন বশে আনিবার
বুঝিলাম বিধাতার সাধ্য নাহি আর।

(৩)

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজম্
যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকম্।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবম্
ভার্য্যাং যৌবনগর্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ॥

চিকিৎসক বটে কিন্তু মদ্যপানে রত,
নট বটে কিন্তু তার শিক্ষা নাহি তত।
ব্রাহ্মণ বটেন কিন্তু নাহি শাস্ত্রজ্ঞান,
কাপুরুষ বটে কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যান।
অশ্ব বটে কিন্তু তার নাহি দ্রুতগতি,
সন্ন্যাসী বটেন কিন্তু গণ্ডমূর্খ অতি।
রাজা বটে কিন্তু রয় কুমন্ত্রী লইয়া,
দেশ বটে কিন্তু রয় বিপদে ভরিয়া।
ভার্য্যা বটে কিন্তু দেখি নিজের যৌবন,
পতিরে করিয়া তুচ্ছ ভজে অন্য জন।
এ সংসারে এই গুলি বড় ভয়ঙ্কর,
বুদ্ধিমান্ ত্যজে যেন হইয়া সত্বর।

(৪)

কান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোহস্তি
চেদ্দেহিনাম্
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্ দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলম্

কিং সর্পৈর্যদি দুর্জ্জনঃ কিমু ধনৈর্বিদ্যানবদ্যা যদি
ব্রীড়াচেৎ কিমু ভূষণৈঃ সুকবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্।

ক্ষমাচে কি প্রয়োজন ক্ষমা যদি রয় ?
দেহে যদি ক্রোধ, অন্য শত্রুতে কি ভয় ?
জ্ঞাতিশত্রু যদি রয় কি করে অনল ?
জ্ঞাতিমিত্র যদি হয় ঔষধে কি ফল ?
দুর্জ্জন হইলে শত্রু, সর্পে কিবা ভয় ?
সুবিদ্যা রহিল যদি ধনে কিবা হয় ?
লজ্জাভয় থাকে যদি কি করে ভূষণ ?
সুকবি হইলে, রাজ্যে কিবা প্রয়োজন ?

(৫)

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ সূর্য্যাতপঃ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন চপলো দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ।
ব্যাধি র্ভৈষজ্যসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈ র্মন্ত্রপ্রয়োগৈ র্বিষম্
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্॥

জলের প্রভাবে হয় অগ্নির দমন,
ছত্রযোগে সূর্য্যতাপ হয় নিবারণ।
হস্তী শান্ত হয়ে যায় অঙ্কুশ মারিলে,
গো গর্দ্দভ শান্ত হয় দণ্ডাঘাত দিলে।
বৈদ্যের ঔষধ পেলে রোগ দূরে যায়,
মন্ত্রবলে বিষ ছুটে কোথায় পলায়।
শাস্ত্রমত প্রতীকার রয়েছে সবার,
কেবল মূর্খের নাহি কোন প্রতীকার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সপ্তম অধ্যায়।

হয় সর্ব্বভূত যোগি ইহারা নিশ্চয়,
জানিও ইহাই তুমি ; হই আমি আর
সমুদায় জগতের উৎপত্তি প্রলয়। ৬
ধনঞ্জয়, আমা হতে নাহি কিছু আর
শ্রেষ্ঠতর ; সূত্রে গাঁথা যথা মণিহার—
আমাতে এ সমুদায় সেরূপে গ্রথিত। ৭
আমিই জলেতে রস-শশী সূর্য্যে প্রভা,
সর্ব্ববেদে হে কৌন্তেয়, আমিই প্রণব,
আকাশেতে শব্দ আমি, নরেতে পৌরুষ। ৮
পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ আমিই আবার,
আমিই অগ্নিতে তেজ, আমিই জীবন
সর্ব্বভূতে, তপস্বীতে আমি হই তপ। ৯

টীকা।

(৭ ও ৮ শ্লোকের টীকা গত বারের নব্যভারতে দ্রষ্টব্য।

(৮) কিরূপে এই সমুদায় ব্রহ্মে গ্রথিত, তাহাই বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য নিম্নের কয় শ্লোক উক্ত হইয়াছে।

রস—সার (শঙ্কর)। তন্মাত্র রূপ (স্বামী, মধুসূদন) অর্থাৎ জলে আমি রস বা তাঁহার মূল রস তন্মাত্ররূপে ওতপ্রোত বা অবস্থিত (শঙ্কর)। স্থূলভূতের কারণ বা আশ্রয় তন্মাত্র। জল ভূতের কারণ বা আশ্রয় তন্মাত্র (স্বামী)।

প্রভা—প্রকাশরূপ বিভূতি (স্বামী), আলোক।

প্রণব—ওঁকার। প্রণবরূপ আমাতে সমুদায় বেদ ওতপ্রোত আছে (শঙ্কর)।

সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণানি (গ্রথিতানি) এব ওঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্।" (বেদঃ)—ইতি শঙ্কু।

শব্দ—শব্দ তন্মাত্ররূপে আমি আকাশে অনুস্যূত বা আকাশের আশ্রয় (স্বামী, মধু)।

পৌরুষ—পুংবুদ্ধি (শঙ্কর), উদ্যম (স্বামী)।

(৯) পুণ্যগন্ধ—সুরভি গন্ধ। গন্ধভূত আমাতে পৃথিবী প্রোত (শঙ্কর)। অবিকৃত গন্ধ—গন্ধতন্মাত্র (স্বামী)। পৃথিবী ভূতের কারণ বা আশ্রয়—গন্ধতন্মাত্র আমিই (মধুসূদন)। স্বামী বলেন, বিভূতিরূপে ভগবান আশ্রয় করেন বলিয়া কেবল উৎকৃষ্ট গন্ধেরই উল্লেখ হইয়াছে অথবা কেবল গন্ধতন্মাত্রইকেই বুঝাইতেছে।

সর্ব্বভূতে সনাতন বীজরূপে তুমি
জানিও আমারে পার্থ ; হই বুদ্ধি আমি
বুদ্ধিমানে, তেজ আমি হই তেজস্বীর। ১০
কাম রাগ বিরহিত বল—হই আমি
বলবানে, সর্ব্বভূতে আমি হে ভারত
হই কাম—হয় যাহা ধর্ম্ম অনুগত। ১১

যা কিছু সাত্ত্বিক ভাব, আর রাজসিক
তামসিক যাহা—সব জান আমা হতে ;
আমি কিন্তু নহি তাতে—তাহারা আমাতে।১২
এই তিন গুণময় ভাবে বিমোহিত
এ জগৎ সমুদায় ; তাই নাহি জানে,
ইহা হতে শ্রেষ্ঠ আর অব্যয় আমারে। ১৩

শঙ্করাচার্য্য বলেন, গন্ধাদি তন্মাত্র প্রকৃতির প্রথম বিকার বলিয়া তাহাদের সার বা উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। তবে গন্ধাদি যে অনেক সময় অপকৃষ্ট বোধ হয়, অবিদ্যা ধর্ম্মই তাহার কারণ। সংসারিদের ভূতবিশেষের সম্পর্ক জন্যই তাহা ঘটিয়া থাকে।

তেজ—দীপ্তি (শঙ্কর)। সর্ব্বদহন প্রকাশন সামর্থরূপ উষ্ণস্পর্শ সহিত দীপ্তি (মধু)।

জীবন—যদ্বারা ভূতগণ জীবিত থাকে—জীবনী শক্তি (শঙ্কর), আয়ু (স্বামী, মধু)।

তপ—বানপ্রস্থাদিতে, শীতোষ্ণ ক্ষুৎপিপাসাদি অন্যের সহন সামর্থ্য (স্বামী, মধু)। তপরূপ আমাতে তপস্বীগণ প্রোত বা আশ্রিত (শঙ্কর)।

(১০) বীজ—প্ররোহ কারণ (শঙ্কর)। স্বজাতীয় কার্য্যোৎপাদন সামর্থ্য (স্বামী), নিত্যবীজ-যেহেতু অন্য কারণের অপেক্ষা করে না—অব্যাকৃত বীজ (মধু)। এবং সাধারণ বীজের ন্যায় কার্য্য উৎপাদন করিয়াই নষ্ট বা রূপান্তরিত হয় না—উত্তরোত্তর সর্ব্বকার্য্যেই বীজরূপে অনুস্যূত থাকেন (স্বামী)। প্রধান্য বীজ (বলদেব)।

বুদ্ধি—বিবেক সত (শঙ্কর), প্রজ্ঞা (স্বামী)।

তেজ—প্রাগল্ভ্য (শঙ্কর, স্বামী)।

(১১) বল—সামর্থ্য ; কেবল দেহাদিধারণ জন্য সত্ত্ব (শঙ্কর), স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সামর্থ্য (স্বামী)।

কামরাগ বিরহিত—অপ্রাপ্ত বিষয়ে তৃষ্ণা—কাম ; প্রাপ্ত বিষয়ে অনুরাগ—রাগ। কামনা ও অনুরাগ বিহীন, বা রজস্তম বিহীন সাত্ত্বিক (স্বামী, শঙ্কর)।

যাহা ধর্ম্ম অনুগত—ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ অবিরুদ্ধ (শঙ্কর, স্বামী)।

কাম—কেবল দেহ ধারণ জন্য অশন পানাদি বিষয়ে যে অভিলাষ (শঙ্কর), শাস্ত্রানুমত জায়া পুত্র বিত্তাদি বিষয়ে যে অভিলাষ (মধু)।

নিজস্ত্রীতে ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন মাত্র উপযোগী যে কাম (স্বামী, বলদেব)। এস্থলে শঙ্করের অর্থ অধিক বিস্তৃত হইলেও স্বামীর অর্থ অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

(১২) ভাব—পদার্থ (শঙ্কর), চিত্তপরিণাম (মধু)।

সাত্ত্বিক ভাব—সত্ত্বনিবৃত পদার্থ (শঙ্কর), জগতের দেহরূপে, ইন্দ্রিয়রূপে, ভাগ্যরূপে তাহাদের কারণরূপে অবস্থিত যে অস্তিত্ব (রামানুজ), শমদম আদি (স্বামী, মধু)।

রাজসিক ভাব—হর্ষ, দর্পাদি (স্বামী, মধু)।

তামসিক ভাব—শোক মোহাদি (স্বামী, মধু)।

সত্ত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির এই তিন শক্তি বা পদার্থ, জীবকে রজ্জু বা গুণের ন্যায় বদ্ধ করে বলিয়া ইহাদের গুণ বলা হইয়াছে। ইহারা কোন বস্তুর গুণবাচক নহে। (মধু)।

আমা হতে—প্রাণিদের স্বকর্ম্ম বশে যে সকল ভাব জন্মে, তাহা আমা হইতেই জন্মে (শঙ্কর)। আমার প্রকৃতির গুণত্রয়ের কার্য্যহেতু জন্মে (স্বামী)। তাহারা রজ্জুরূপ আমাতে সর্পরূপে কল্পিত হয় (মধু)। তাহারা আমার শরীররূপে অবস্থিত (রামানুজ)।

তাহারা আমাতে—তাহারা আমার অধীন, আমি সে সকল ভাবের অধীন নহি (শঙ্কর)। জীব যেমন সেই সব ভাবের বশীভূত হয়, আমি সেইরূপ তাহাদের বশীভূত নহি (স্বামী)।

"স ঈশঃ যদ্বশে মায়া, স জীবঃ য স্তয়ার্দ্দিতঃ।"

তাহারা আমা হইতে উৎপন্ন ও আমাতে বিলীন হয় (রামানুজ)।

(১৩) গুণময় ভাব—গুণবিকার, রাগদ্বেষ মোহাদিরূপ পদার্থ (শঙ্কর)। কাম লোভাদি গুণ বিকারী স্বভাব (স্বামী)। উৎপত্তি ধর্ম্মযুক্ত পদার্থ (মধু)। মায়া গুণের কার্য্য যে সত্ত্বাদি উৎপত্তি ; পরিণামশীল পদার্থ ও তাহাদের কর্ম্ম অনুসারে উৎপন্ন শরীর ইন্দ্রিয় বিষয়াদি (বলদেব)।

এই যে আমার মায়া—দৈবী গুণময়ী
বড়ই দুস্তর ইহা—প্রপন্ন আমাতে
হয় যারা তারা হয় এই মায়া পার। ১৪

কিন্তু যারা পাপকারী, মূঢ় নরাধম
মায়াবশে জ্ঞান হত, আসুরিক ভাবে
বিমোহিত নহে তারা প্রপন্ন আমাতে। ১৫

এ জগৎ—প্রাণীজাত জগৎ (শঙ্কর, (মধু)।

মোহিত—অবিবেকযুক্ত (শঙ্কর)।

ইহা হতে শ্রেষ্ঠ—এই গুণ, ভাব বা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন (শঙ্কর)।

(১৪) দৈবীগুণময়ী মায়া—ঈশ্বরের স্বভাবভূত সত্ত্ব, রজ, তমোময়ী বা প্রকৃতি (শঙ্কর)। অলৌকিক সত্ত্বাদি গুণ বিকার যুক্ত মায়া (স্বামী)। বিশ্ব স্রষ্টার অতি বিচিত্র অনন্ত অলৌকিক মায়াশক্তি (বলদেব)। দৈবী গুণময়ী বলিয়াই মায়া দুরতিক্রম্য। ভগবানের মায়া মিথ্যা ইন্দ্রজাল নহে। ইহা সত্য। এই জন্য উক্ত হইয়াছে "মায়াতু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং"। (রামানুজ)।

রামানুজ প্রভৃতি বৈতবাদীগণ ব্রহ্মের নিত্য ত্রিমূর্ত্তি কল্পনা করেন। জীবজগৎ ও ঈশ্বর বা চিৎকণা অচিৎ ও চিৎ ব্রহ্মের এই তিন নিত্যভাব স্বীকার করেন। এইজন্য মায়া 'যে সত্য পদার্থ' তাহা রামানুজ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মধুসূদন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বেদান্তের অদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শুদ্ধ চৈতন্য জীব ঈশ্বর জগৎ এইরূপ বিভাগশূন্য। অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়' এই দ্বৈতভাব নাই। তবে তাহাতে অনাদি অবিদ্যার অধ্যাস হইলে অবিদ্যা যখন সত্ত্ব প্রধান হয়, তখন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় তাহাতে চিদাভাস হয়। ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়, জীব প্রতিবিম্বস্থানীয়। জীব উপাধি দোষযুক্ত হয়, ঈশ্বর সেরূপ হন না। সেই ঈশ্বর হইতেই জীব ভোগের জন্য (ও জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ জন্য) আকাশাদি ক্রমে—জীবভোগ্য শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যুক্ত প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়। বিম্ব ও প্রতিবিম্বে যে সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও জীবে সেই সম্বন্ধ। মায়া উপাধি যুক্ত চৈতন্য সাক্ষী। তাহা দ্বারাই মায়াকার্য্য এই জগৎ প্রকাশিত বা প্রকটিত হয়। এই জন্য মায়া দৈবী।

এই স্থলে মধুসূদন আরও বলিয়াছেন যে, যদিও এই শ্লোকে বহু জীবের কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু সেই জীববহুত্ব প্রকৃত নহে। অবিদ্যা সম্ভব বিবিধ অন্তঃকরণে এক চৈতন্যের যে বিভিন্ন প্রতিবিম্ব পড়ে—তাহাতেই জ্ঞানে বহুজীবের ধারণা হয়। গীতায় আছে:—

"ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।"

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্যানাদী উভাবপি।"

"মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন।"

শ্রুতিতে আছে—

"ব্রহ্ম বা ইদমাত্র আসীৎ তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ।"

"একোদেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়"

"অনেন জীবেন আত্মনানু প্রবিশ্য।"

আর মায়াই ব্রহ্মের শক্তি। সর্ব্বজগত কারণস্বরূপেশ্বরের জগৎ সৃষ্টি স্থিতিলয়কারী শক্তি। মায়া-আবরণ বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত অবিদ্যা বা প্রকৃতি। ইহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। বেদান্তসারে আছে, "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান বিরোধী ভাব রূপং যৎকিঞ্চিৎ।"

আমাতে প্রপন্ন—আমাকে ভজনা করে (স্বামী)। উপাসনা করে (রামানুজ)। শরণ লয় (বলদেব)। মধুসূদন বলেন যে, এই স্থলে দুইরূপ, "প্রপন্ন হওয়ার দুই রূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম অর্থ স্মৃতি সঙ্গত—যে ভগবান আনন্দঘন বাসুদেবকে ভজনা করে, সেই মুক্ত হয়। আর দ্বিতীয় অর্থ শ্রুতি সঙ্গত। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে তবে মায়ার আবরণ ভেদ করা যায়। শ্রুতিতে আছে—"আত্মেত্যেবোপাসীত তদাত্মানম্ এবাবেৎ, তমেবাবিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।"

নিধিধ্যাসন পর্য্যন্ত যায়, নির্ব্বিকল্প আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মায়ামুক্ত হওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানে শরণ লইলে (গীতার ১৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লোক) তবে সর্ব্বভূত চিত্ত বিমোহিনী মায়া পার হওয়া যায়, এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

(১৫) জ্ঞানহৃত—বিবেক সামর্থ হীন (মধু)। শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশজাত জ্ঞান মায়া দ্বারা নিরস্ত (স্বামী)।

আসুরিক ভাব—(গীতার ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তামসিক প্রবৃত্তিযুক্ত লোকের দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি স্বভাব (স্বামী)।

আর্ত্ত অর্থ-কামী আর জ্ঞানার্থী ও জ্ঞানী
সুকৃতি সম্পন্ন এই চারিবিধ জনে,
আমাকে ভরতশ্রেষ্ঠ! করয়ে ভজনা। ১৬

বলদেব বলেন, এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চারি শ্রেণীর লোক ভগবানকে ভজনা করে না। যথা মূঢ় (যাহারা ঈশ্বরকে কর্ম্মাধীন জীব মনে করে।) নরাধম (অসৎ কার্য্য ও অর্থশক্তি হেতু পামর) মায়া দ্বারা অপহৃত জ্ঞান (সাংখ্যাচার্য্যাদি) ও আসুরভাবাপন্ন লোক (ক্রিয়াবাদী, বিজ্ঞানবাদী প্রভৃতি)।

(১৬) আর্ত্ত—তস্কর ব্যাঘ্র রোগাদি অভিভূত, আপন্ন (শঙ্কর)।

অর্থকামী—ধনকামী (শঙ্কর), ইহ পরকালে ভোগ সাধক অর্থকামী (স্বামী)।

জ্ঞানার্থী—আত্মজ্ঞানেচ্ছু (স্বামী), ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানের অভিলাষী (শঙ্কর)।

জ্ঞানী—তত্ত্ববিদ্ (স্বামী) ভগবৎ সাক্ষাৎকার জন্য নিত্যযোগরত, নিষ্কাম প্রেমভক্ত (মধু)।

এই চারিবিধ জন—পুণ্যের তারতম্য অনুসারে এই চারি প্রকারের লোক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, এই চারি শ্রেণীর মধ্যে আর্ত্ত অপেক্ষা অর্থকামী শ্রেষ্ঠ, অর্থকামী অপেক্ষা জ্ঞানার্থী শ্রেষ্ঠ; আর জ্ঞানার্থী অপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

আবার সকল আর্ত্তলোকেই ঈশ্বরকে ভজনা করে না। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি যাহাদের অধিক, তাহারাই ঈশ্বর ভজনা করে—নতুবা তাহারা অন্য দেবতা ভজনা করে। অন্য শ্রেণী সম্বন্ধেও সেই কথা।

উক্ত চারি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর সাধক সকাম। কেবল জ্ঞানীই নিষ্কাম সাধক। প্রথম শ্রেণীর আর্ত্তীর দৃষ্টান্ত—ইন্দ্রের বর্ষণ ভয়ে ব্রজবাসীগণ, জরাসন্ধ কারারুদ্ধ রাজগণ বস্ত্র হরণ কালে দ্রৌপদী, ইহারা কৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন। অর্থার্থী যথা—সুগ্রীব, বিভীষণ, উপমন্যু, ধ্রুব। জ্ঞানার্থী, যথা—মুচুকুন্দ, জনক, উদ্ধব ইত্যাদি। জ্ঞানী, (ও নিষ্কাম ভক্ত) যথা সনকাদি ঋষিগণ, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, গোপীকা, অক্রুর, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি (মধুসূদন)।

তাহাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ—সদা যোগরত
একে ভক্তিমান জ্ঞানী; জ্ঞানীর নিকট
প্রিয় আমি অতিশয়—সে প্রিয় আমার। ১৭
সবাই উৎকৃষ্ট এরা; কিন্তু মম মতে,
আত্মতুল্য হয় জ্ঞানী; হয়ে যোগরত
করে সেই শ্রেষ্ঠগতি—আমাকে আশ্রয়। ১৮

(১৭) শ্রেষ্ঠ...জ্ঞানী—জ্ঞানী নিষ্কামী বলিয়া অন্য তিন প্রকার সকাম সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (মধু)। জ্ঞানীর দেহাদি অভিমান অভাবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না বলিয়া তাহারা সর্ব্বদা যোগরত বা একান্ত ভক্তিযুক্ত থাকিতে পারে, এ জন্য তাহারা শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। জ্ঞানী নিত্য যোগরত এবং বিষয়ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরে ভক্তিমান বলিয়া শ্রেষ্ঠ (রামানুজ স্বামী)।

প্রিয় আমি—বাসুদেবই আত্মা, আত্মা সকলের জ্ঞানীর প্রিয়, ইহা লোক প্রসিদ্ধ, এজন্য বাসুদেবই জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়। (শঙ্কর)।

সে প্রিয় আমার—ঈশ্বরের প্রিয় অপ্রিয় কিছুই নাই। তবে জ্ঞানী আত্মস্বরূপ বলিয়া পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বুঝে, এজন্য জ্ঞানী পরমাত্মার প্রিয়। গীতার অন্যত্র আছে,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু নমেদ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥

অতএব ভক্ত জ্ঞানী পরমেশ্বরে অধিষ্ঠিত এবং তাহাতে পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত। এই অর্থে জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের প্রিয়। পরের শ্লোকেও ইহা বুঝান হইয়াছে।

(১৮) উৎকৃষ্ট—মূলে আছে উদার) আর্ত্ত, অর্থার্থী, জ্ঞানার্থী ও জ্ঞানী ইহারা সকলেই পরমেশ্বরের প্রিয়, ভক্ত কখন পরমেশ্বের অপ্রিয় হন না (শঙ্কর)। ইহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে আত্মাভিমুখে অগ্রসর হয় ও পরিণামে মোক্ষলাভ করে (স্বামী)। আমাতে যাহার যেরূপ প্রীতি, আমার ও তাহার প্রতি সেরূপ প্রীতি। গীতায় অন্যত্র আছে "যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং।"

আত্মতুল্য—জ্ঞানী আমার স্বরূপ এজন্য অত্যন্ত প্রিয় (শঙ্কর)। কেন না, সে আমা হইতে ভিন্ন নহে (মধু)।

বহুজন্ম পরে তবে জ্ঞানবান গণে
—এই সমুদায়
বাসুদেব

...হইয়া ...র জন্য প্রবৃত্ত হয় (শঙ্কর), আমাকে প্রাপ্তি ভিন্ন আর অন্য ফল কামনা করে না (মধু)।

... বহুজন্ম পরে— অর্থাৎ প্রত্যেক জন্মে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়ের দ্বারা (স্বামী), অথবা প্রত্যেক জন্মে পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান জন্য বুদ্ধি ও চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানার্জনার্থ সংস্কার ...ক্রমে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া শেষে বহুজন্ম ... সব সর্ব" এই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় (গিরি ও ...)।

আসুরী বা রাক্ষস স্বভাব অর্থাৎ রাজসিক ... সিক প্রকৃতি সম্পন্ন লোক ঈশ্বরে ভক্তিমান ... পারে না। যাহারা পুণ্যসঞ্চয় দ্বারা দৈবী প্রকৃতিযুক্ত হয়—তাহারাই ঈশ্বরে বিশ্বাস লাভ ক... ক্তিমান হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে আর্ত, অর্থার্থী ও জ্ঞানার্থীগণ সকামী, তাহারা অর্থ জয় করিয়া সাধনা দ্বারা ভক্তি লাভ করে—ও কাম্যফল ভোগ করে। ক্রমে বহুজন্মের পুণ্য সঞ্চয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকে। চিত্ত নির্মল হই... নিষ্কাম হয়। তবে সে ক্রমে জ্ঞানবান হইতে পারে।

প্রকৃত জ্ঞানী কে, তাহা এই শ্লোকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড বাসুদেবময়,' এই ধারণা যাহার বদ্ধমূল হইয়াছে, যে শয়নে, স্বপনে, ভাবনায়, কল্পনায়, কোন সময়েই মুহূর্ত কাল জন্য, এই সংস্কার বা ধারণা হইতে বিচলিত না হয়, সেই জ্ঞানী।

শুনিতেছি, বেদে আছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—শুনিতেছি: "একমে... ...ন্ধ সর্ব্বদা মুখে বলিতেছেন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। জগৎ নাই; আমার আমিত্ব নাই—সকলই সেই মায়ারূপ। কিন্তু সে কথা আমার প্রকৃত ধারণা হয় কই? আমার একটী চিন্তা, একটী কার্য্য, একটী অনুভূতিও ত সে ধারণা দ্বারা নিয়মিত হয় না। যতক্ষণ আমি প্রবৃত্তি-বশে চালিত—সুখ দুঃখের অধীন, রাগদ্বেষের বশীভূত, যতক্ষণ আমি আমার আমিত্বকে ব্রহ্মসাগরে ডুবাইয়া দিয়া আত্মহত্যা করিতে না পারিয়াছি, যতক্ষণ বহুত্ব ... ম, জগতে ... পারি নাই, কূপ-তড়াগাদি রূপ গভীর অন্তর্গত জলাধার দেখ ব্রহ্মরূপ মহা... করিতে পারি নাই, ততক্ষণ আমার প্রকৃত জ্ঞান কিছুই হয় নাই। হয়তঃ জীবনের কোন মহামুহূর্তে প্রাণে হঠাৎ আলোক ফুটিয়া উঠিয়া হঠাৎ মনে হইল, এই জগৎ, এই আমি, ঐ জীব, সব ব্রহ্ম আর ... দ্বিতীয় নাই। তখন এক অদ্ভু... উথলিয়া উঠিল। তখন ঐ এক ... ভাবনাতে চিত্তের অবস্থা কিরূপ হয়—বাক্য ... হইয়া যায়। কিন্তু হায়, পর মুহূর্তে সে আলো নিবিয়া যায়। যে তিমিরে ছিলাম ... আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। সাধনার দ্বারা, যখন এইরূপ মুহূর্তের সংখ্যা বাড়াইতে পারা যায়, যখন এমন হইয়া আসে যে, জীবনের প্রতিমুহূর্তেই ঐ ধারণা বদ্ধমূল হয়, যখন এই দিব্যালোকে ...ইয়া গিয়া অন্তরে আর এক ... প্রকাশ ...—তৃণ হইতে সকল পদার্থে ব্রহ্মদর্শন হয়, কুকুর ... হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের ... শত্রু মিত্র সকলকেই আমি আ... ...না অবিচলিত থাকিতে পারি, তখন আমার জ্ঞান হয়। যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ আমি অজ্ঞানী, ভণ্ডজ্ঞানী, মিথ্যাচারী।

এই জন্যই গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃত জ্ঞানী মহাত্মা জগতে অতি দুর্লভ। বুঝি কোটি লোকের মধ্যে একজনও এরূপ জ্ঞানী মিলে না। আর বহু জন্মের কঠোর সাধনা ব্যতীত এই জ্ঞান লাভ হয় না। এই জ্ঞানের ফল "আত্মসাক্ষাৎকার" 'অপরোক্ষানুভূতি' 'বিজ্ঞান'। এই জ্ঞানফলে "সমুদায় ব্রহ্ম" এই ধারণা ... অন্তরের সমুদায় পূর্ব্বসংস্কার ডুবাইয়া দিয়া, এই 'ব্রহ্ম সংস্কার' ... ...ই ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

...ায়ু পুত্র, ধন, স্বর্গাদি

বিষয়ক কামনায় ...

যে যে ভক্ত যে যে মূর্ত্তি শ্রদ্ধা সহকারে
করে চেষ্টা অর্চ্চিবারে,—তাহার তাহার
সে অচল শ্রদ্ধা করি আমিই বিধান। ২১

সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, তার আরাধনা
করে সেই—তাহে করে কাম্যফল লাভ—
সেই সমুদায় করি আমিই বিধান। ২২
হয় বিনশ্বর কিন্তু অল্প জ্ঞানীদের

যে যে নিয়মেতে—ইন্দ্রাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আরাধনায় যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে, তাহা দ্বারা (শঙ্কর, রামানুজ)। জপ, উপবাস, প্রদক্ষিণ,নমস্কার প্রভৃতি ঐ সকল দেবতা আরাধনের প্রসিদ্ধ নিয়মে (গিরি, মধু)।

প্রকৃতির বশে—স্বভাব, বা জন্মান্তরার্জ্জিত সংস্কার বিশেষ দ্বারা (শঙ্কর)। পূর্ব্বাভ্যাস মত কামনার বশীভূত হইয়া (মধু, স্বামী)।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোকের অবতারণার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন যে, "সর্ব্বং বাসুদেব" এই জ্ঞান দুর্ল্লভ কেন, তাহা দেখাইতে এই শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। স্বামী বলেন যে, যাহারা কামী তাহারা পরমেশ্বরের ভজনা করিলে ক্রমে মুক্ত হয়; আর যদি তাহারা ক্ষুদ্র দেবতা সকল ভজনা করে, তবে তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে বিচরণ করে, এস্থলে তাহাই দেখান হইয়াছে।

(২১) মূর্ত্তি—(মূলে আছে 'তনু') দেবতামূর্ত্তি (শঙ্কর), দেবতারূপ আমারই মূর্ত্তি (স্বামী)।

শ্রদ্ধা—ভক্তি (শঙ্কর) জন্মার্জ্জিত বাসনা বল প্রাদুর্ভূত ভক্তি (মধু)। বিশ্বাস।

আমিই বিধান—সেই শ্রদ্ধা আমা হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ও সংস্কার হইতে জীবের শক্তি উৎপন্ন হয়, সাধারণতঃ সেই শক্তিও পরমেশ্বরে এবং পরমেশ্বর সেই শক্তির প্রবর্ত্তক। চণ্ডীতে আছে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেন সংস্থিতা।" চণ্ডীতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বজীবে যে চৈতন্য, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃশক্তি অবস্থিত, তাহা সেই ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া শক্তিমাত্র। চৈতন্যরূপে সেই নারায়ণী শক্তি সমুদায় জগত ব্যাপিয়া আছেন। এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলে তবে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করিতে শিক্ষা করা যায়।

(২২) করি আমিই বিধান—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মফল বিভাজ্ঞ পরমেশ্বরই সেই সব দেবতা আরাধনার ফল প্রদান করেন (শঙ্কর)। সেই সেই দেবতাতে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই ফল প্রদান করেন (গিরি)। যাহারা কর্ম্মবাদী, তাহাদের মতে কর্ম্মই মূল; কর্ম্ম আপনিই আপন ফল প্রদান করে। ইংরাজী বিজ্ঞানের (Conservation of force) জড় জগতের যে নিত্য নিয়ম জীবজগতেও সেইরূপ জীবের কর্ম্মশক্তি নিত্য। কর্ম্মের পাঁচ কারণ (১৮।১৩) কর্ম্ম উৎপন্ন হইলে এই পাঁচ কারণেই তাহার ফল পরিব্যাপ্ত হয়। কর্ম্মকর্ত্তার চিত্তেও সংস্কার বীজরূপে সেই কর্ম্মফল পরিণত হয়ও জন্মান্তরে সেই সংস্কারই কার্য্যবীজ রূপে বা কর্ম্মশক্তিরূপে কার্য্য করে।

যাহারা বেদান্তবাদী, তাহাদের মতে পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা হেতুই এ কর্ম্মবীজ কার্য্যরূপে পরিণত হইতে সমর্থ হয়। পরমাত্মা জীব সকলে অধিষ্ঠিত স্বরূপে অবস্থান করেন। তাহাকে কর্ম্মচক্রে মায়াবশে ভ্রমণ করান (১৮।১৯); তাহাকে তাহার স্বভাবোপার্জ্জিত অদৃষ্ট অনুযায়ী ফল বিধান করেন। পরমাত্মার অধিষ্ঠান জন্যই অদৃষ্ট শক্তি কার্য্যোৎপাদন করিতে পারে, সুতরাং দেবতা অর্চ্চনা জন্য যে সুকৃতি বা অদৃষ্টশক্তিউৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে যে ফল লাভ হয়, তাহাও সেই পরমেশ্বর বিধান করেন। প্রতি জীবেই পরমেশ্বর নিয়ন্তা ও অন্তর্যামীরূপে অধিষ্ঠান করেন।

(২৩) হয় বিনশ্বর—দেবপূজার ফলে দেবলোকে বা স্বর্গলোকে গতি হইতে পারে। সেখানে সুকৃতির ভোগ শেষ হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আবার দেবলোকে ও প্রলয় কালে লয় প্রাপ্ত হয় (গীতার ৮ অধ্যায়ের ১৭ হইতে ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

আমি (পরমেশ্বর) সর্ব্বকর্ম্ম ফলদাতা হইলেও সাধকের সাধনা অনুসারে সে ফলের পার্থক্য হয়, তাহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে (স্বামী)। যাহারা

সেই ফল ; দেবলোকে যায় দেবযাজী,
মম ভক্তগণ করে আমাকেই লাভ। ২৩
অব্যক্ত—ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত—এরূপে আমাকে
ভাবে অল্পবুদ্ধি লোকে ; নাহি জানে তারা
আমার পরম ভাব—অব্যয় উত্তম। ২৪

অল্পজ্ঞানী, তাহারাই ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চনা করে, তাঁহাতে তাহারা শুভফল পায় বটে, কিন্তু সে ফল সংকীর্ণ। যাহারা পরমেশ্বরের আরাধনা করে, কেবল তাঁহারাই পূর্ণ ফল লাভ করে। কেন না, তাহারা শেষে পরমেশ্বরকেই লাভ করে, তখন তাহাদের আর জন্মকর্ম্ম ভোগ করিতে হয় না।

(২৪) অব্যক্ত ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত—শঙ্কর গ্রহণ পূর্ব্বে অপ্রকাশিত, কিন্তু ইদানী লীলা-বিগ্রহ পরিগ্রহাদ্বারা শরীরিরূপে প্রকাশিত (শঙ্কর, গিরি)। প্রপঞ্চাতীত আমি মৎস্য কূর্ম্মাদিরূপে অবতীর্ণ। অথবা জগৎ রক্ষার্থ লীলা আবিষ্কৃত নানা বিশুদ্ধোজ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি যুক্ত অথবা কল্পনিশ্চিত দেহধারী অন্য দেবতার সমান রূপ বিশিষ্ট (স্বামী, মধু), অথবা পূর্ব্বে অব্যক্ত হইলেও ইদানী বসুদেব গৃহে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ(মধু)।

ব্রহ্মকে দুইরূপে ধারণা করা যায়। এক সগুণ বা সোপাধিক, আর এক নির্গুণ বা নিরুপাধিক। নিরুপাধিক ব্রহ্ম "নেতি নেতি" বাচ্য, বাক্য মনের অগোচর। জীব জ্ঞানমায়া আবরণে আবৃত, সীমাবদ্ধ। সেই আবরণ হেতু ব্রহ্মের রূপ অব্যয় (Absolute) স্বরূপ বুদ্ধিতে ধারণা হয় না ; সেই মায়া আবরণ হইতেই জ্ঞানে 'এই জগৎ (ইদংরূপে) প্রকাশিত। ও ব্রহ্মেতেই এই জগৎ কল্পিত হয়। ব্রহ্মকে এই জগৎ নিয়ন্তা-পুরুষ বা স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তারূপে ধারণা করা হয়। ইহাই পরম পুরুষরূপে (Porsonal God) ব্রহ্মের ধারণা।

এই ধারণাই সগুণ-ব্রহ্মের ধারণা। অথবা পুরুষ বা ব্যক্তি ভাবে পরমেশ্বরের ধারণা। যাহারা অল্পজ্ঞানী, তাহারা সেই সগুণ ঈশ্বরকেই ইন্দ্র, বরুণ, দুর্গা, কালী, মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার প্রভৃতিরূপে জগতের বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিয়ন্তা রূপে ধারণা করে। এই সগুণ ঈশ্বরে চরম ধারণা বিরাটরূপে। এইরূপে ব্রহ্মকে সৃষ্টির সহিত অভিন্ন ধারণা করা হয়। কিন্তু যিনি সচ্চিদানন্দঘন, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, নির্গুণ, তিনি জগৎ নহেন—জগৎ তাহাতে কল্পিত মাত্র ; যোগবলে জ্ঞানের বাহিরে গিয়া (অহং ইদং রূপ জ্ঞানের নিত্য দ্বৈতভাবের বাহিরে গিয়া) সেই ব্রহ্মের ধারণা হয়। জ্ঞানের চরম ধারণা বিরাটরূপ। কেবল জ্ঞান হইতে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি হয় না।

অতএব (Personal God) বা ব্রহ্মের ব্যক্ত ভাব অল্পবুদ্ধিমান লোকের ধারণা। (Pantheism) ব্রহ্মের বিরাগ রূপ জ্ঞানের শেষ ধারণা। আর অব্যয় অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের (Absolute) ধারণা ; জ্ঞানের বাহিরে গিয়া কেবল যোগবলে মুক্তি যোগে সিদ্ধ হয়।

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"আমার প্রকৃত স্বরূপ আছে, তাহা অব্যক্ত (নিরুপাধিক) —আমার সেই অবস্থা কর্তৃত্ব পালয়িতৃত্বাদি সমস্ত গুণের অতীত, কেবল মাত্র চিৎ পদার্থ।—এই চিৎ স্বরূপ পরমাত্মাতেই—ভ্রান্তিবশেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতেছে, সেই পরমাত্মাতেই—নানাপ্রকারের আকৃতি দেখাইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তিনিই এই সকল—কিন্তু তাই বলিয়া যদি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ না বুঝিয়া—এই সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বা আত্মা বলা হয়, তবে ঘোর ভ্রান্তির কথা হইল।—ব্রহ্মের ভাব না বুঝিতে পারিয়া কেবল জড়জগতের ভাবটী মনে করিয়া যদি কেহ "এ জগতই ব্রহ্ম" এরূপ কথা বলে, তবে মিথ্যা কথা হইল ;—আর যদি ব্রহ্মের ভাব বুঝিয়া ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু না দেখিয়া এই এই জগৎকে ব্রহ্ম বলে, তবে আর মিথ্যা হয় না। অতএব যাহারা আমার সেই অব্যক্ত, অব্যয়, অনুত্তম স্বরূপ না বুঝিয়া (সেই পরমাত্মাতেই) রজ্জু সর্পবৎ ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত মিথ্যাভূত যে সকল দেহ আছে (ইন্দ্র বরুণ, কৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব কালী, দুর্গা ইত্যাদি), তাহাকেই পরমাত্মা বা চৈতন্য বলিয়া জানে, তাহার নিতান্ত নির্ব্বোধ—আমা হইতে ভিন্ন ভাবে ঐ সকলের অস্তিত্ব নাই।—কিন্তু যদি আমার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান থাকিয়া ঐ সকলে কেবল আমি মাত্র (পরমাত্মাকে) দেখিতে পায়, তবে আর মিথ্যা জ্ঞান হয় না।"

নহি আমি প্রকাশিত সবার গোচর—
যোগমায়া সমাচ্ছন্ন ; এই মূঢ় লোকে
নাহি জানে জন্মহীন অব্যয় আমাকে। ২৫
অতীত বা বর্ত্তমান কিম্বা ভবিষ্যৎ—
সর্ব্বভূতগণে আমি জানি হে অর্জ্জুন,
কিন্তু তারা নাহি জানে আমারে কখন। ২৬

(২৫) যোগমায়া সমাচ্ছন্ন—ত্রিগুণযুক্ত মায়া আবরিত (শঙ্কর, আমাতে সংযুক্ত অন্তর অচিন্ত্য মায়া (স্বামী)। পরমেশ্বরের সংকল্পের বশবর্ত্তী মায়া অভিভূত (মধু), যোগাচ্য মায়া (রামানুজ)।

ব্রহ্মে যখন জগৎ প্রকাশ শক্তি কল্পিত হয়, তখন সেই শক্তিমান ব্রহ্মই পরমেশ্বর বাচ্য।—

"স ঈশ বশে মায়া স জীবঃ মন্ত্রয়াশ্রিত।" ব্রহ্মের এই মায়াতেই সৃষ্টি প্রকটিত। তাঁহার "আত্মা মায়া"ই যোগমায়া। এই মায়ার আবরণ ভেদ করিতে না পারিলে ব্রহ্মকে জানা যায় না। এই মায়াই সত্ত, রজ, তম এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ইহা ব্রহ্মেই যুক্ত। এজন্য ইহা যোগ মায়া। ইহাই জ্ঞানকে আবরিত করিয়া রাখে, সেই জন্যই জীব ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারে না।

সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান দার্শনিক তাঁহার কৃত World as will and Idea নামক পুস্তকে এই যোগমায়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ—

It is Mâyâ which blinds the eye of mortals, and makes them behold a world which they cannot say, either that it is or that it is not ...§ 3.

The sight of the uncultured is clouded as the Hindu's say, by the veil of Mâyâ. He sees not the thing—in—itself—but the phenomenon in time and space—the *principium individuationis*, and in the other forms of the principles of sufficient reason. In this form of his limited knowledge, he sees not the inner nature of things, which is one—but its phenomenons separated and opposed ... . § 63.

If that veil of Maya—the *principium individuationis* is lifted, so that the man no longer distinguishes between himself and others, the recognises in all beings his own in most time self... . § 68.

মূঢ়লোকে—এই যোগমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া মূঢ় (শঙ্কর, স্বামী)।

(২৬) আমি জানি—এই মায়া দ্বারা জীবগণ অভিভূত থাকিলেও মায়াধী পরমেশ্বরকে ইহা বদ্ধ করিতে পারে না। (ভাষ্য)।

মায়ার আবরণ কি? প্রথম কথা এই যে, মানবে আমরা জ্ঞানশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও সুখ দুঃখানুভব শক্তি দেখিতে পাই, মানব যখন সুখ বা দুঃখরূপ অনুভূতিতে অভিভূত, তখন তাহার জ্ঞানশক্তি কার্য্যকরী হয় না। মানুষ যখন কর্ম্মে নিরত, তখনও জ্ঞানের কার্য্য হয় না। এই জন্য জ্ঞানশক্তির কার্য্যকালে বা জ্ঞানবিকাশ সময়ে কর্ম্মবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির যতদূর সম্ভব সংযম করিতে হয়। অতএব আমাদের এই চিত্তবৃত্তি ও কর্ম্মবৃত্তি জ্ঞানের প্রথম অন্তরায়।

জ্ঞানের দ্বিতীয় আবরণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকলতা। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে রূপ সংজ্ঞা, সংজ্ঞার, বেদনা ও বিজ্ঞান এই পাঁচ স্কন্ধ মায়া। প্রকৃত প্রজ্ঞা এই পাঁচ আবরণের বাহিরে।

তাহার পর জ্ঞানে আরোহণ করিলেও আমরা জ্ঞানের অন্যরূপ আবরণ দেখিতে পাই। জ্ঞানের প্রথম আবরণ "অহং ইদং" "জ্ঞাতা-জ্ঞেয়" প্রমাতা-প্রমেয় এইরূপ দ্বৈত ধারণা। ('subject-object') বা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়—এই দুইরূপ জ্ঞানে বিকাশিত হয়। জ্ঞান এই দ্বৈত জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারে না। তাহার পর জ্ঞানে যে জ্ঞেয় 'ইদং' বা জগৎ প্রতিভাত হয়, তাহা স্থান (দিক্) ও কালে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের জ্ঞান দিক্‌কাল পরিচ্ছিন্ন। কালগর্ভে যে নিত্য পরিবর্ত্তন জ্ঞানে ধারণা করা যায়, তাহা হইতে কার্য্যকারণ সূত্রেরও ধারণা হয়।

এই দিক্‌কাল ও কর্ম্ম এই তিন ধারণার বাহিরে জ্ঞান যাইতে পারে না। ইহাই জ্ঞানের প্রকৃত মায়া আবরণ। ইহাই প্রকৃত অজ্ঞান।

ব্রহ্ম দিক্ কালাদি অপরিচ্ছিন্ন। জীব পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে সেই অপরিচ্ছিন্ন সত্তার ধারণা করিতে পারে না। ব্রহ্মকাল পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সকলই তিনি জানেন। কালের অতীত হইয়া সাধারণ অজ্ঞানাবরিত (বা দ্বৈত জ্ঞানাবরিত) জ্ঞানের বাহিরে অবস্থিত করিয়া জানেন। তাঁহার জ্ঞান ও জীবজ্ঞান এক নহে। তাহার জ্ঞান নিত্য, চৈতন্য, নিত্যবোধরূপা। এককালে সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল

ইচ্ছা দ্বেষ সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব মোহ বশে
হে ভারত পরন্তপ, সর্ব্বভূতগণ—
উৎপত্তি কালেতে হয় মোহে অভিভূত। ২৭

তাঁহার জ্ঞানে প্রতিভাত ও একীভূত হইয়া আছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার উদরস্থ বা তাঁহার চৈতন্য স্বরূপে বিলীন আছে।

(২৭) দ্বন্দ্ব মোহ—সুখ, দুঃখ, শীতগ্রীষ্মাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ের অনুভূতি। ইহার মূল ইচ্ছা দ্বেষ। যাহা পাইলে সুখ হইবে মনে হয়, তাহা পাইতে ইচ্ছা হয় ও যাহা পাইলে দুঃখ হইবে ও পরিহার করিয়া সুখ হইবে বোধ হয়, তাহার সম্বন্ধে দ্বেষ জন্মে। এই রাগ-দ্বেষ হইতে আমাদের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, দুঃখজ দ্রব্য ত্যাগ করিতে ও সুখজ দ্রব্য লাভ করিতে সর্ব্ব চেষ্টা হয়। সেই প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম চেষ্টা জ্ঞানকে মোহিত করিয়া রাখে। ইহা সাধারণ বিষয়-জ্ঞানের পথেও অন্তরায়।

দ্বন্দ্ব মোহ—অর্থাৎ দ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহ (শঙ্কর)।

উৎপত্তি কালেতে—(মূলে আছে সর্গে) জন্ম কালে (শঙ্কর)। স্থূলদেহ উৎপত্তি সময়ে (স্বামী, মধু) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যে বিষয়ে অনুরাগ ও যে যে বিষয়ে বিরাগ অত্যন্ত হইয়াছিল, তাহা সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া, সেইরূপ বাসনাই পরজন্মকালে বাসনা রূপে বিকাশিত হয়।

সংসারের বাসনা বীজ নিত্য। তাহা প্রলয়ে ব্রহ্মে লীন থাকে। প্রলয় কালে জীবগণও ব্রহ্মে লীন হয়। পরে যখন আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মের অধ্যক্ষে প্রতিজীবে তাহার পূর্ব্ব সৃষ্টির বাসনা উপ্ত হইয়া তাহার বিকাশ হয়। এই রূপে উৎপত্তি কালেই জীব বাসনা বা দ্বন্দ্ব মোহে অভিভূত হয়। তাহার পর সেই বাসনা কর্ম্মফলে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতিজন্মে জীবের চিত্তে বিকাশিত হয়। সৃষ্টি লয় জগতের নিত্যলীলা। কোন বিশেষ সৃষ্টি যে প্রথমে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এই জন্য প্রথম বাসনা কোথা হইতে আসিল, তাহা প্রশ্ন হয় না। এই সকল সৃষ্টি প্রভৃতি জগৎ কার্য্য মায়া মোহিত জ্ঞানেই প্রতিভাত হয়। মায়া মোহিত জ্ঞানে তাহার প্রকৃত উত্তর হয় না।

পুণ্যকারী যে সবার পাপ অন্তর্হিত—
দ্বন্দ্বমোহ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া তাহারা
ধরি দৃঢ়ব্রত করে আমারে ভজনা। ২৮
জরা মৃত্যু মোক্ষ তরে যাহারা যতনে
আমার আশ্রয় করি,—জানে ব্রহ্ম তারা
অধ্যাত্ম যে সব, আর কর্ম্ম সমুদায়। ২৯

(২৮) এখন কথা হইতেছে, যদি জন্ম হইতেই সর্ব্বভূত মায়ায় বিমোহিত হয় ও সেই জন্য ভগবৎ তত্ত্ব জ্ঞান শূন্য হয়, তবে প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের উপায় কি? তাহার উত্তর এই যে, জীব প্রকৃতি বশেই ক্রমে আপূরিত হয়। প্রকৃতিই জীবকে ক্রমে ক্রমে উন্নত করে। মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া জীব সুকৃত করিতে সমর্থ হয়। এই রূপে অনেক জন্ম ধরিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিতে করিতে পাপ দূর হয়। দ্বন্দ্ব-মোহ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে, শেষে দ্বন্দ্ব মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়।

এই জন্য যে পথ আশ্রয় করিতে পারিলে দ্বন্দ্বমোহ মুক্ত হওয়া যায়, সেই পথের উপদেশ নিরর্থক নহে। (গিরি)।

চণ্ডীতে আছে—

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া যিনি জীবের অন্তরে নানারূপে অবস্থিত, তিনি প্রসন্ন হইলেই নর মুক্তির পথ পায়।

চণ্ডীর অন্যত্র আছে—

তোমারি প্রসাদ লভি সুকৃত যে জন,
প্রতিদিন শ্রদ্ধা ভার করে আচরণ
নিত্যধর্ম্ম কর্ম্ম চয়—যাহে স্বর্গে গতি হয়;
সুনিশ্চয় দেবি, সেই সে কারণ তুমি,
এই তিন লোকে হও ফল প্রদায়িনী। ১১৬

(২৯) জরামৃত্যু মোক্ষতরে—জরামৃত্যু হইতে মুক্তির জন্য (শঙ্কর)।

আমার আশ্রয় করি—অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের আশ্রয়ে (গিরি ও মধুসূদন), পরমেশ্বরের (শঙ্কর)।

যাঁহারা সগুণ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া ক্রমে শুদ্ধান্তঃকরণ হয়, সেই মায়াধিষ্ঠিত ও ব্রহ্ম ব্যবহার ভেদে তাহার অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব এই পাঁচ ভাব অনুভব ও আয়ত্ত করিতে পারে (মধুসূদন)।

আধিভূত, আধিদৈব, আধিযজ্ঞ সহ
আমাকে যাহারা জানে—যোগরত তারা
মরণ কালেও পারে আমারে জানিতে। ৩০

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

(৩০) মরণ কালেও—মরণকালে চিত্তে কেবল সংস্কার মাত্রাবশেষ থাকে। তখন জ্ঞান শক্তির বা বুদ্ধি প্রভৃতির কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং ভগবান সম্বন্ধে যাহার চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া অভ্যাস বলে সংস্কারে গিয়াছে, মৃত্যুকালে ভগবান সম্বন্ধে রূপ ধারণা স্বপ্নবৎ চিত্তে প্রতিভাত থাকে ঈশ্বরে ভক্তি সংস্কারে পরিণত হইয়াছে, মৃত্যুকালে সেই ভক্তি বিদ্যমান থাকে মৃত্যু সময়ে যদি আত্ম স্বরূপে অবস্থান যায়, তবে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়।

অধিভূত—অধিযুক্ত—পর অধ্যায়ে

অনন্ত পুরুষ ও অনন্ত পুরুষের পরিণতি।

ব্রহ্মের আর একটী নাম অনন্ত বা বিরাট পুরুষ। সেই অনন্ত বিরাট শব্দের অর্থ,—কেবল অনন্ত বিরাট স্থানবিস্তৃতও নহে, ও কেবল অনন্ত বিরাট কালব্যাপীও নহে। অনন্ত বিরাটকাল ব্যাপী, অনন্ত বিরাট স্থান বিস্তৃতিই সেই অনন্ত বিরাট শব্দের বা অনন্ত বিরাট পুরুষ শব্দের প্রকৃত অর্থ। অনন্ত স্থান, রূপ বা ভূতের অনন্ত কাল ব্যাপৃতির সহিতই সেই অনন্ত পুরুষ সংস্থিত। অনন্ত কালব্যাপী অনন্ত রূপ ধরিয়াই ও অনন্ত জন্ম অতিক্রম করিয়াই তিনি অনন্ত পুরুষ। অথবা তিনি অনন্ত জন্ম অতিক্রম করতঃ বিশ্বরূপ ধরেন, তাই তিনি অনন্ত পুরুষ। অনন্ত কালের নামেই, অনন্ত পুরুষের নাম ও অনন্ত পুরুষের নামেই অনন্ত কালের নাম। অর্থাৎ আদি মধ্য ও অন্ত কাল রহিত ব্যাপী ও আদি মধ্য ও অন্ত্য স্থান (রূপ বা ভূত, যথা—পদার্থ, উদ্ভিদ, জীব, জন্তু, পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ ও জ্ঞান চৈতন্য) রহিত বিস্তৃতিই সেই অনন্ত বিরাট শব্দের বা অনন্ত বিরাট পুরুষ শব্দের প্রকৃত অর্থ। সুতরাং এ অনন্ত পুরুষ, কখনও অনন্ত বিরাট বিশ্বব্যাপী, কখনও নহে। কেবল উহার কোন বিশেষ অংশে অবস্থিতি করিবার বস্তু নহে। পুরুষ বা তাহার দেহ, বিরাট বি হ্রাস বৃদ্ধিতে (ভারাক্রান্তে ও ভার আবদ্ধ নহে। কাজে কাজেই বি ভার লাঘব করিবার বস্তু কেহ নাই ক্ষমতার অবতার কেহ নাই বা হই না। সুতরাং যিনি সেইরূপ অব ধরিয়া অবতীর্ণ হন, যাঁহা হইতে অ বা যাঁহার অংশরূপে অবতীর্ণ হ ঈশ্বর কেহ নাই বা থাকিতে আর সেইরূপ বিরাট বিশ্বই, বিরাট পুরুষের দেহ, ও সেইরূপ অ পুরুষই, সেইরূপ বিরাট বিশ্বের বা ভগবান। সেই অনন্তকালব্যা স্থান বিস্তৃত, বিরাট বিশ্বের, কেহ ঈশ্বর বস্তু, বা সৃষ্টি জন্য ঈশ্বর পারে না। অনন্ত কাল ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত জন্যই, বা তাহাতে অধিকা কেহ, উহার ঈশ্বর বস্তু হইতে পা এব ব্রহ্ম তাহার দেহ, অনন্ত বির সহিত অনন্ত বিরাট, অবিভক্ত,

ব্যাপী কিংবা তিনি সেইরূপ অনন্তকাল ও অনন্ত বিরাট স্থান বা রূপের সহিত বিস্তৃত ও প্রকাশিত, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তিনি সেই অনন্ত বিরাট বিশ্বের বাহিরে অবস্থিতও নহেন ও উহার কোন বিশেষ খণ্ডস্থানে অবস্থিতও নহেন। সেই অনন্ত বিরাট কালের বাহিরে প্রকাশিতও নহেন কিংবা উহার কোন বিশেষ খণ্ড কালে প্রকাশিতও নহেন। অথবা ঐ বিরাট বিশ্বের উহার কোন খণ্ড অংশের বা খণ্ড উপাদানের বাক্য মন ও চক্ষুর অগোচর বস্তুও নহেন,—ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বিরাট বিশ্ব সৃষ্ট বস্তু হইতে পারে না, পুনঃ সৃষ্টিতে আবদ্ধ হইতে পারে না, এবং কেহ উহার সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা রূপ ঈশ্বর (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) হইতে পারে না, বা সেরূপ পদস্থ সৃষ্টিকর্ত্তা বা বিশ্বকর্ম্মা কেহ নাই। অথবা সেই বিরাট বিশ্বকে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড (ব্রহ্মার সৃষ্ট পক্ষীর ডিম্বের মত গোলাকার ব্রহ্মাণ্ড) বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে না; বা বিরাট বিশ্ব, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল, তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে না কিংবা উহাকে ত্রিভুবন বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে না। অথবা উহা হেভেন ও আর্থ, দুই ভাগেও বিভক্ত হইতে পারে না। উহাকে কেবল বিরাট বিশ্ব বলিলেই উহার যাথথঃ নাম দেওয়া হয়। সুতরাং বিরাট বিশ্বের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগ রূপ, আদি, মধ্য ও অন্তকাল আছে, উহার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা রূপ ঈশ্বর আছেন, উহা সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টবস্তু ও উহার অংশ সকল জীবও তাহার সৃষ্ট বস্তু। বিরাট বিশ্বের পরে, তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, থাকেন বা থাকিবেন। বিরাট বিশ্বের সৃষ্টির পরে জীব সকলের সৃষ্টি হইয়াছিল বা এক সময়ে জীব শূন্য বা মানব শূন্য জগৎ (বিরাট বিশ্ব) ছিল বা জীবের জন্মের সহিত উহাদের উৎপত্তি হয়। উহারা মৃত্যুর পর কবরাদিতে বর্ত্তমান থাকে ও ঈশ্বরের বিচার নিষ্পত্তির দিন হইতে,—হয় অনন্ত সুখ, না হয় অনন্ত দুঃখের সহিত অবস্থিতি করে। উহাদিগের কখনও ধ্বংস হইতে হয় না বা দেহ পরিবর্ত্তন করিতে হয় না, কিংবা পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। সেই বিরাট বিশ্ব ভারাক্রান্ত হইলে সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর অবতারের রূপ ধরিয়া, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া উহার ভার লাঘব করেন, কিংবা অন্য কোন লোকহিতকর কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, ইত্যাদি রূপ দৃশ্যতে যে সকল বিরাট বিশ্বের পুরাণ কোরাণ বাইবেলাদি নামক ইতিবৃত্ত বা ধর্ম্মশাস্ত্র পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বা এক্ষণে হইতেছে, উহাদিগকে বিরাট বিশ্বের রহস্য বা ইতিবৃত্ত বলা যাইতে পারে না। সেই পুরাণাদিকে উহার বা জীবের প্রকৃত শাস্ত্র বা তদ্‌নির্দ্দিষ্ট অদ্বৈতবাদকে প্রকৃত অদ্বৈতবাদ বলা যাইতে পারে না। সেই সকল শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরকে ঈশ্বর বা অনন্ত পুরুষ, বলা যাইতেও পারে না।

তাহার পর পরিণতি তিন প্রকার। অবনত পরিণতি, উন্নত পরিণতি ও অত্যুন্নত পরিণতি। সেই পরিণতি শব্দের বা তিন প্রকার পরিণতির অর্থ,—অবস্থান্তর প্রাপ্তি। কিন্তু অবস্থান্তর বলিতে বিদেহ অবস্থান্তর বুঝায় না, দেহের সহিতই বুঝায়। সুতরাং সেই পরিণতি শব্দের বা সেই তিন প্রকার পরিণতির অর্থ দেহের সহিতই হয়, কি

নহে। কাজে কাজেই সেই তিন প্রকার অবনত, উন্নত ও অত্যুন্নত পরিণতির প্রভেদ কেবল লৌকিক ও অলৌকিক জীবের দেহের অবস্থাতেই হয়, স্থির বলিতে হইবে। লৌকিক জীব ও জীবভাবাপন্ন ব্যক্তিগণই উন্নত ও অবনত অবস্থান্তর প্রাপ্তির বস্তু; অলৌকিক জীব, জীবভাবাপন্ন নর মানব, বা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণই কেবল উন্নত ও অত্যুন্নত অবস্থান্তর প্রাপ্তির বস্তু। আবার সেই উন্নত বা অবনত অবস্থান্তর প্রাপ্তির অর্থ কেবল দেহান্তে নহে ও কেবল দেহের সহিতও নহে বা কেবল দেহের উন্নতিতে বা অবনতিতে, উন্নত বা অবনত অবস্থান্তর নহে;—কেবল আত্মার উন্নতিতে বা অবনতিতে উন্নত বা অবনত অবস্থান্তর নহে। লৌকিক ও অলৌকিক উভয় জীবের সম্বন্ধে অবস্থান্তর প্রাপ্তির অর্থ কেবল দেহান্তেও নহে,—কেবল দেহের সহিতও নহে, অথবা উহাদের উভয়ের কেবল দেহের উন্নতিতে বা অবনতিতে উন্নত বা অবনত অবস্থান্তর নহে,—উহাদের উভয়ের আত্মার উন্নতিতে ও অবনতিতে উন্নত বা অবনত অবস্থান্তর নহে। অথবা কেবল লৌকিক জীব সম্বন্ধে অবস্থান্তর প্রাপ্তির অর্থ উভয় দেহান্তে ও দেহের সহিত নহে। অথবা কেবল অলৌকিক জীব সম্বন্ধে অবস্থান্তর প্রাপ্তির অর্থ উভয় দেহান্তে ও দেহের সহিত নহে,—উহা কেবল দেহের উন্নতিতে বা অবনতিতে উন্নত বা অবনত অবস্থান্তর নহে। দেহত্যাগে পুনঃ দেহে ও অবস্থান্তর প্রাপ্তি সেই পরিণতি শব্দের অর্থ। দেহের সহিত ও অবস্থান্তর প্রাপ্তি সেই পরিণতি শব্দের অর্থ হয়, বা দেহ ও আত্মা উভয়ের যোগ উন্নতিতে ও অবনতিতে উন্নত বা অবনত অবস্থান্তর প্রাপ্তিই সেই উন্নত ও অবনত পরিণত শব্দের অর্থ। অতএব সেই অসমান লৌকিক ও অলৌকিক জীব সম্বন্ধে অবস্থান্তর প্রাপ্তির অর্থ কেবল এক সমান রূপে দেহান্তে দেহের উন্নতিতে বা অবনতিতে অথবা কেবল আত্মার উন্নতিতে বা অবনতিতে নহে এবং হয় না। সেই অসমান লৌকিক ও অলৌকিক জীব সম্বন্ধে অবস্থান্তর প্রাপ্তির অর্থ কেবল এক সমানরূপে দেহের সহিত বা উহাদের কেবল এক দেহের উন্নতিতে, অবনতিতে বা উহাদের কেবল আত্মার উন্নতিতে বা অবনতিতে নহে এবং হয় না। লৌকিক জীব সম্বন্ধে অবস্থান্তর প্রাপ্তির অর্থ দেহ পরিবর্ত্তনে ও নূতন দেহ ধারণেই উহার দেহ ও আত্মা যোগ উন্নতিতে বা অবনতিতে হয়। কেন না, তাহারই নাম লৌকিক অবস্থান্তর বা পরিণতি। জীব ভাবপন্ন নর মানবের অবনত অবস্থান্তর প্রাপ্তির অর্থও দেহ পরিবর্ত্তনে ও নূনঃ দেহে বা উহার দেহ ও আত্মা উভয়ের যোগ অবনতিতে হয়। কেন না, তিনিও লৌকিক জীবের সামিল। উন্নত বা অত্যুন্নত দিকে ধাবিত, সেই জীব ভাবাপন্ন নর মানবের, মুমুক্ষু ব্যক্তির বা অলৌকিক নর মানবের সম্বন্ধে অবস্থান্তর প্রাপ্তির অর্থ, এক দেহের সহিতই, বা উহাদের দেহ ও আত্মা উভয়ের যোগ উন্নতিতে হয়। কেন না, তাহারই নাম অলৌকিক জীবের অলৌকিক অবস্থা বা অলৌকিক অবস্থান্তর—পরিণতি। অর্থাৎ সেই লৌকিক অবস্থা (মৃত্যু ও পুনর্জন্ম প্রাপ্তির অবস্থা) অতীত হওয়ার নামই, অলৌকিক অবস্থা। অতএব অলৌকিক ব্যক্তির বা মুমুক্ষু ব্যক্তির, অবস্থান্তর প্রাপ্তি, অনন্ত পুরুষের পরিণতি, ব্রহ্মের নিত্য পরিণতি, ব্রহ্মত্ব, লয়, নির্ব্বাণ পদ বা ঈশ্বরত্ব পদ মৃত্যুতে হয় না,—চির দেহের সহিতই, বা

দেহ ও আত্মা উভয়ের অত্যুন্নত নিত্য যোগেই হয়। লৌকিক জড় জীবের অবস্থান্তর প্রাপ্তি (অবনত বা উন্নত যাহাই হউক অর্থাৎ অধিক জড় জীবত্ব বা জীব ভাবাপন্ন নর মানবত্ব) দেহ পরিবর্ত্তনেই ও আত্মা উভয়ের অবনত, অনিত্য যোগেই হয়। অতএব কেবল দেহের উন্নতিতে আত্মার উন্নতি পরিণতি হইবার সম্ভব নহে, বা কেবল আত্মার উন্নতিতে দেহের উন্নত পরিণতি হইবার সম্ভব নহে, বা দেহ শূন্য হইলে আত্মার উন্নত বস্তু, নিত্য বস্তু, অনন্ত বস্তু বা সেইরূপ অত্যুন্নত অনন্ত নিত্য পুরুষ বস্তু,—পরমাত্মা বস্তু হইবার সম্ভব নহে। কেবল আত্মার উন্নতিতে কাহারও অনন্ত পুরুষের নিত্য পরিণতি পাইবার সম্ভব নহে। কেবল আত্মার কিম্বা দেহের উন্নতিতে এবং দেহের প্রলয়ে নর মানবের বা মুমুক্ষু ব্যক্তির অত্যুচ্চ পরিণতি পরমাত্মায় লয় হইবার সম্ভব নহে। কেন না, আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ রূপে অবস্থিতি করিবার বস্তু নহে, উহা দেহের সহিত চির জড়িত বস্তু,—দেহের রূপেই আত্মার রূপ ও আত্মার রূপেই দেহের রূপ। সুতরাং নিরাকার রূপ আত্মার রূপ নহে বা নিরাকার আত্মা নামে কোন বস্তু আদৌ নাই। সেরূপ লয়ে, তাহার নিত্য পরিণতি হইবার সম্ভব নহে। তাহাতে তাহার অন্য পুরুষের নিত্য পরিণতি পাইবার সম্ভব নহে। কিম্বা দেহের লয়ে, অবনত দেহ ব্যতীত অন্য প্রকার নরকে পতিত হইবার সম্ভব নহে। অর্থাৎ সেই অনন্ত জড় বস্তু জড় জীবের উচ্চ পরিণত জীব ভাবাপন্ন মানবই, তাহার নিত্য দেহের সহিত, সেই অত্যুচ্চ উন্নত অবস্থা বা অনন্ত পুরুষের পরিণতি, ব্রহ্মের নিত্য পরিণতি, —লৌকিক পরিণতি (মৃত্যু ও পুনঃ জন্ম ও জরাতীত হওয়ার পরিণতি) ঈশ্বরত্ব, পূর্ণব্রহ্মত্ব, সেইরূপ নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হন। তাহারই নাম, প্রকৃত, ঈশ্বরের অদ্বৈতবাদ। তাহার দেহ আত্মার নিত্য যোগেই, তিনি সেই অত্যুচ্চ পরিণতি ব্রহ্মত্ব পদ প্রাপ্ত হন। অতএব কেবল সেই আত্মাতে সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা থাকিতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থে—ঈশ্বরত্ব পদ হয় না। দেহে চির জড়িত চৈতন্যের কেবল নিরাকার পরিণতি নহে এবং হয় না। অর্থাৎ জীবের বাক্য মন ও চক্ষুর অগোচর সাকার বা নিরাকার সৃষ্টিকর্ত্তা, অনন্ত পুরুষে উপরোক্ত পরিণতি নাই বা ছিল না। অতএব, উহাকে অনন্ত পুরুষ ঈশ্বর বস্তু বলা যাইতে পারে না, বা সে রূপ বস্তু কেহ নাই।

অতএব কেবল সেই সাকার দেহের সহিত নর মানবের বা অন্য কাহারও ঈশ্বরত্ব হয় না, কিম্বা কেবল সেই নিরাকার চৈতন্যের সহিত নর মানবের বা অন্য কাহারও ঈশ্বরত্ব হয় না। সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে নর মানবের কিম্বা অন্য কাহারও ঈশ্বরত্ব হয় না। সুতরাং সেই জ্ঞান চৈতন্যরূপী নিরাকার আত্মা বা পরমাত্মা, যাহা দেহে চির জড়িত, তাহা ঈশ্বর ভগবান বা পূর্ণব্রহ্ম হইতে পারে না। উহাকে দর্শন করিলে নরমানবের বা অন্য কাহারও নিত্য পরিণতি, অনন্ত পুরুষের পরিণতি, ব্রহ্মের পরিণতি হয় না। জীবের বাক্য, মন ও চক্ষুর অগোচর বস্তু ঈশ্বর হইতে পারে না, ঈশ্বর জীবের বাক্য, মন ও চক্ষুর অগোচর বস্তু হইতে পারেন না। অতএব দেহ আত্মার নিত্য যোগকারী নরমানবই, বিরাট বিশ্বের বা জীবের ঈশ্বর। তাহাকে দর্শন, ধ্যান করিলেই, তাহারা (জীব মাত্রেই—অবশ্য পর্য্যায়ক্রমে) সেই ব্রহ্ম দেহ,

নর মানব দেহ প্রাপ্ত হন বা হইবেন। তাহাদের সেই দেহেই ব্রহ্মের নিত্য পরিণতি প্রাপ্ত হন বা হইবেন। তাহাতেই অনন্ত পুরুষের অদ্বৈতবাদ গ্রথিত। তাই বলি, পূর্ব্ব হিন্দু ও অন্যান্য জাতির শাস্ত্রকারেরা কেহ যে, কাহারও নহে, বা জীবমাত্রেই কেহ কাহারও নহে, স্থির করিয়া গিয়াছেন বা সকল জীবের সেইরূপ ভাবনা করা কর্ত্তব্য,—উহাদের সদ্গতির পরিণতি প্রাপ্তির জন্য সকলের সেইরূপ ভাবনা করা কর্ত্তব্য, তদ্ব্যতীত তাহাদের মুক্তি লাভের অন্য উপায় আর নাই স্থির করিয়া গিয়াছেন এবং সেইরূপে গঠিত হইবার জন্য সেই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। পক্ষান্তরে অনেকানেক পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান হিন্দুভক্ত ও সাধকের সঙ্গীতে যে সেইরূপ ভাবার্থ দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহারা জড় ও চৈতন্য উভয় জীবের বা নরনারী উভয়ের কৃতকার্য্য হইবার জন্য যে তাহাই একমাত্র উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই অসমান জীবের সেই এক সমান কার্য্য জন্য এক সমান উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন, যাহা একা চৈতন্য জীব নরমানবের বা একা জীবভাবাপন্ন নরমানবের কিংবা একা ঈশ্বর ভগবান বা ব্রহ্মত্বের অধিকারী নরমানবের,—তাহার সেই দেহের সহিত সেই জন্মের কৃতকার্য্য হইবার পথ বা উপায়; তাহাই জড় ও চৈতন্য উভয় জীবের কৃতকার্য্য হইবার পথ বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন;—অর্থাৎ সেই অসমান অন্যান্য অধিক জড় জীবের বা উহাদের সর্ব্বোপরি জড় জীব স্ত্রীজাতির সেই নরমানবই,—তাহার দেহই উহার ঈশ্বর এইরূপ ভাবনা করিতে বা আপনার বলিয়া ভাবনা করিতে না দেখাইয়া, তাহাদিগকে সেই পৃথক পথ না দেখাইয়া যে এক সমান পথ দিয়াছেন, তাহা একেবারেই অসম্ভব ও কোন মতেই স্থান পাইতে পারে না।

এ অনন্ত পুরুষের পরিণতি বা এইরূপ পরিণতি প্রাপ্তির ক্ষমতা যে, কোন কাল বিশেষের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানাদি জাতি মধ্যে থাকিবে, এমন নহে, অপিচ উহা কেবল হিন্দুদের বা সেই হিন্দুর চারিবর্ণ মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণ জাতির ছিল, থাকিবে বা থাকে, ইহা একেবারেই যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসম্ভব। অতএব বর্ত্তমান জাতি বিভাগ কেবল কল্পনা মাত্র। সুতরাং সকল জাতির এ সংস্কার দূর করতঃ এই অত্যুন্নত অনন্ত পুরুষের পরিণতি, অথবা সেই পথে অগ্রসর হইবার পরিণতি প্রাপ্তির জন্য গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।

অনেকের মতে আমার এ মত না টিকিতে পারে; কিন্তু আমি যাহা বুঝিয়াছি, সাধ্যমত তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। সত্য, এক দিন না একদিন সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিবে।

শ্রীদ্বারকানাথ বসু।

বিলাতে বড়দিন।২

আর একটী প্রথা হচ্ছে, ক্রিশমাস ইভে সপ্পারের সময় টেবিলের উপর দুটী "ক্রিশমাস বাতি" জ্বালান। ঘরের ভিতর অন্য সহস্র আলো থাকলেও, অথবা সপার-টেবিলের উপর অন্য প্রকারের আলো থাকলেও, দুটী খুব বড় বড় মোমবাতি অত্যুজ্জ্বল ও সুশোভিত, সামা-

ধানের উপর সপার-টেবিলের দুই প্রান্তে জলে। এই বাড়িতে গৃহ-কর্ত্তা অন্ন খাওয়া না খেয়ে ফ্রুমেটি বা ফ্রুমিটি (Frumety Frumenty) বলে দুধে সেদ্ধ এক রকম গমের পিষ্টক আহার করবেন। পরিবারের অন্য সকলে ফ্রুমেটি আহারে বাধ্য নয়, কেবল ঘরের কর্ত্তা। ইহা যেন আমাদের দেশের পূজার পূর্ব্বদিনে নিরামিষ করার মতন। অবশ্য, বলার দরকার নাই, আজকাল নব্য সমাজে এই প্রথা "Is more honoured in the breast than in the observance."

আর একটী প্রথা আছে, তাকে "Waits" বলে। রাত্রি দুপুরের পর, তা রাত দুটো হোক্, তিনটে হোক্, কি চারটে হোক্, যদি আপনি আপনার পথের ধারের ঘরে ঘুমন্ত থাকেন, খুব সম্ভব পথের সুন্দর সমতানলয় মিলিত সুবাদ্যের স্বরবে জেগে উঠবেন। যদি জেগে উঠে জানলা খুলে দেখেন, দেখবেন, আপনারি জানালার নিচে একদল যুবক যুবতী সুন্দর বাদ্যালাপ করছে। ইহাকে Waits বলে। গ্রামের বা পল্লীর উৎসাহী যুবক যুবতী বা বালক বালিকা, অথবা বৃদ্ধ বৃদ্ধা কতকগুলি একত্র হয়ে ক্রিশমাস্ ইভে সমস্ত রাত্রি বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে বাজাবে ও আপনার ঘুম ভাঙ্গাবে। এই Waits র উদ্দেশ্য তার পরদিন আপনার নিকট থেকে কিছু পয়সা আদায় করা—এ কথা বোধ হয় আর স্পষ্ট করে আপনাকে বলে দিতে হবে না। আপনি বাজনা শুনে তৃপ্ত হন আর অতৃপ্ত হন, নিশ্চয়ই যদি রাত তিনটের সময় বাজনার শব্দে আপনার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাতে, আপনি রুষ্ট বই তুষ্ট হবেন, এমন আশা [illegible] কখনই ক'রতে পারি না, প্যালাটা [illegible]পনাকে দিতেই হবে। "ওয়ে[illegible] অতি প্রাচীন প্রথা। কবি ওয় [illegible] এ সম্বন্ধে কতিপয় স্তবক পদ্য রচনা [illegible] ছিলেন; কবি হয়ত শীতের প্রাবল্যে সুখ নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় Village ministrels তাঁর জানলার নিচে বাজনা সুরু করে দিয়ে থাকবে। কবি নিদ্রোত্থিত হয়েই বাক্‌দেবীর বীণা নিয়ে কবিতার তান ধরে থাকবেন। কন্‌কনে শীত, চাঁদের আলো, চির হরিৎ সরেলের পাতাগুচ্ছ ঝক্ ঝক্ ক'রছে, চারিদিকে নিস্তব্ধতার একটা ঘন ছাউনি পড়েছে, পাহাড়, উপত্যকা, বায়ু—সব ঠাণ্ডা—নীরব। শিশির জমে বরফ হয়ে গেছে। তবুও কিন্তু বাদ্যের সুস্বর অত ঠাণ্ডাতেও, বরফের ন্যায় জমাট না হয়ে মুক্ত আকাশ বিদারণ ক'রে সুস্বরে উঠছে। দলের লোকেরা এম্নি সতেজে ও সোৎসাহে বাজনা আরম্ভ করেছে! কবি ব'লছেন—

And who but listened? till was paid
Respect to every inmate's claim;
The greeting given the music played,
In honour of each household name.
Duly pronounced with lusty call
And "Merry Christmas" wished to all."

পল্লীগ্রামে লোক সংখ্যা অল্প, সুতরাং যে ভিলেজ মিনিষ্ট্রেলগণ ওয়েটস্ গাইতে বহির্গত হয়, তাদের পক্ষে গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদের নাম জানা অসম্ভব নয়। সুতরাং বাড়ীর প্রত্যেকের নামোল্লেখ করে, ক্রিশমাসের অভিবাদন জ্ঞাপন করাও কিছু আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু সহরে বা নগরে ওয়েট্‌সের এ অংশটা [illegible] পড়ে যায়। ওয়েটস আপনার জানলার সম্মুখে এসে শুধু এক পত্তন বাজিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের পাড়াতেও এ বছর ওয়েটস্ এসেছিল। আমার শয়ন কক্ষটা পথের ধারে নয়। কাজেই আমার সুখ-নিদ্রার কোন ব্যাঘাৎ ঘটে নাই।

পথের ধারের কামরায় ছিলেন, লই পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতরা-শের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমি ওয়েটস্ শুনেছিলাম কি না? আমি ব'ল্লাম যে, মহাত্মা যিশুর মর্ত্তো শুভাগমন প্রতীক্ষা করা খ্রীষ্টানেরি মহা কর্ত্তব্য। আর বোধ হয় সেই জন্যই পরম শুভানুধ্যায়ী পল্লীবাসী সখের বাদ্যকরেরা ভোর রাত্রে ভক্তদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে সজাগ করে দেয়। আমি অখ্রীষ্টান; আমার ঘুম না ভাঙ্গায় অথবা ওয়েটস্ শুনতে না পাওয়ায়, তত বিশেষ কিছু এসে যায়নি।

এদিকে ক্রিশমাশ-ইভের পরমায়ুর শেষ হয়ে আস্ছে। রজনীর তমসার পরিবর্ত্তে দিবার পূর্ব্বাভাস প্রাণীদিগকে ঈষতালোকিত ক'রেছে। ক্ষীণ আলোকচ্ছায়া নৈশ-গগনকে, সমস্ত প্রকৃতিকে এক অপার্থিব দীপ্তিতে উজ্জ্বল করেছে। ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তের বিকাশ হচ্চে। ভক্ত ও বিশ্বাসী খ্রীষ্টান সব কোথায়? এখনও সুনিদ্রার ক্রোড়ে? ঐ শুনুন, আপনার গৃহের কতিপয় বালক বালিকা আপনার পূর্ব্বে শয্যা পরিত্যাগ করেছে এবং মুখ প্রক্ষালন ও বেশ-ভূষা সম্পন্ন করে আপনার দ্বারের সমক্ষে—

'Christians, awake, salute the happy morn,
Whereon the Saviour of the world was born"

সুমধুর স্বরে ঘোষণা ক'রছে। ছেলে মহলে ক্রিশমাসের প্রাতে বাড়ীর সকলের কক্ষ-দ্বারের সুমুখে এরূপ সুললিত স্বরে সংগীত গেয়ে, ক্রিশমাসের ঘোষণা করে সুপ্তজনের নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গান এক রীতি। আজ কাল বড় একটা যদিও নগর কিম্বা উপ-নগরের মধ্যে দেখা যায় না, স্থানে স্থলে প্রাচীন ধরণের বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে এই রীতি এখনও দেখা যায়। আমাদের এ রকম সংগীত গেয়ে কেহ ঘুম না ভাঙ্গালেও আমরা আপনারা যথাকালে নিদ্রা থেকে উঠে স্নান ও পরিচ্ছদ সম্পন্ন ক'রে, প্রাতরাশের আশায় ভোজনাগারে (ভজনাগারে নয়) অবতরণ ক'রলাম।

"Merry Christmas to you"—আজ আর অন্য অভিবাদন নাই। সকলের হাসিভরা মুখে কেবল ঐ কথা। চাকর চাকরাণী, কর্ত্তা কর্ত্রী, বালক বালিকা, ভাই বোন, স্বামী স্ত্রী—সকলের মুখে ঐ এক অভিবাদন পদ—"Merry Christmas to you—সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় রাত্রে যখন যার সঙ্গে দেখা হ'চ্চে, প্রথম আলাপ হ'চ্চে—প্রথম কথা-হ'চ্চে "Merry Christmas to you. তুমি খ্রীষ্টান হও, অখ্রীষ্টান হও, বিশ্বাসী হও, অবিশ্বাসী হও, মায়াবাদী হও, জ্ঞান-বাদী হও, আস্তিক হও, নাস্তিক হও, অজ্ঞেয়-বাদী হও, আর প্রত্যক্ষবাদী হও—আজ আর কেহ তোমার ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বা বিশ্বাস বা মতের সম্মাননা রেখে তোমায় অভিবাদন করবে না। আজ বর্ণভেদ নাই, মতভেদ নাই, বিশ্বাস-ভিন্নতা নাই। ক্রিশমাসের প্রবলোচ্ছ্বাসে সকলকে একদিকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চে। তাই এক অপরিবর্ত্তিত আনন্দ-বিকশিত অভিবাদনের স্বর সকলের মুখে, সকলের কর্ণে, সকলের হৃদয়ে শব্দায়িত—"Merry Christmas to you—আমরাও প্রফুল্ল চিত্ত ও হর্ষ-বিকশিত আননে কর্ম-স্পর্শ ক'রতে ক'রতে সকলকে "Merry Christmas to you" বলে আপ্যায়িত ক'রলাম।

হয়ত ঘুম ভেঙ্গে উঠবার পরে কিম্বা সাজগোজ পরবার সময় দেখে থাকবেন, আপ-নার ওয়ার্ডরোবের উপর আপনার জন্য নানা উপহার রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসা কর্বেন, কে উপহার দিলে? দেখন খাম

কিংবা প্যাকেজের বহিরাবরণ বিমুক্ত করে। যারা আপনার স্নেহ ও বন্ধুতা পেয়েছে, যাদের সঙ্গে আপনি পরিচিত, যারা আপনার লোক, যারা আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, আত্মীয়, তারা সকলেই আজ এই শুভ মহা জন্মোৎসব দিনে, জাতীয় আনন্দোল্লাসের দিনে আপনার স্নেহ, মমতা ও করুণা স্মরণ ক'রে আপন আপন স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির যৎসামান্য নিদর্শন স্বরূপ, যথাসাধ্য উপহার দিয়ে আপনার কোমল ও করুণ স্মৃতির, অভিষেক করেছে। হয়ত আবার দেখবেন, আপনার প্রাতঃভোজনের টেবিলের উপর আপনার জন্য সরকারী ডাক-হরকরা আপনার দূরস্থ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-দের নিকট হ'তে কত কি এনে দিয়েছে। আহার ক'রতে ক'রতে, স্নেহাশীর্ব্বাদপূর্ণ উক্তি, শুভ কামনা পরিজ্ঞাপন, সমুজ্জ্বল অভিবাদন, করুণ স্মৃতিলিপি পাঠে ও নানাবিধ চিত্তরঞ্জন উপঢৌকন পরিদর্শনে আপনি কি মনে করতে পারেন, আপনি আজ এই মুহূর্ত্তে সেই মর্ত্ত্যের

"আসিয়াছে সেই দিন আয় সবে চলে—
পুণ্য লোকে যাব আজি পাপ তাপ ভুলে;
মুছিয়া ক্রন্দন ধারা, আয় আয় আয় তোরা
মধুর আনন্দ জ্যোতি গগন উজলে।
গম্ভীর আনন্দ নাদে ঐ শোন বীণা বাজে
জগত ভরিয়া উঠে আনন্দেরি রোলে;—
ভুবন আজি ডুবিবে, মহেশ মহোৎসবে
চরাচর ভাসিবে প্রেম সলিলে।"

সঘনে ও সোৎসাহে চার্চ্চ-বেল যিশুর ভক্তগণকে এই ব'লে আহ্বান ক'রছে। কিন্তু ভক্তগণ কোথায়? প্রথম প্রাতরুপাসনায় যাঁরা নিতান্তই সমাধি গহ্বরের অভ্যন্তরে এক পদ এবং উপরে এক পদ রাখিয়া আজও ভবের হাটে কেনা-বেচা ক'রছেন, তাঁদেরি কেহ কেহ হয়ত সে উপাসনায় যোগ দিয়া থা'কবেন। নতুবা, অত সকালে গির্জ্জায় যাওয়া, তা আবার এই শীতে নিতান্ত দায়ের কথা। যাই হোক্, ব্রেকফাষ্টের পর যে উপাসনা হয়, তাতে অনেকেই উপস্থিত থাকেন। তা বলে এ ভাববেন না যে, সকলেই এই উপাসনার সময় এই [illegible] দিনে এই [illegible]
[illegible] দিনে, গির্জ্জায়

করবেন না। অনেক নিমন্ত্রিত আত্মীয় ও বন্ধুর শুভাগমন হবে। ইতিপূর্ব্বে হয়ত যারা বাড়ীর কর্ত্তার নিতান্ত আপন সম্পর্কীয়—যেমন, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, পুত্রবধূ, দৌহিত্র প্রভৃতি—যাঁরা দূরে থাকেন, কার্য্য বশতঃই হউক অথবা অবস্থা গতিকেই হউক সবাই বাড়ী গুলজার ক'রেছেন। কেন না, এদেশের একটা এই রীতি যে, এই ক্রিশমাসের সময়ে এক বংশের যেখানে যে থাকে, সবাই সমবেত হয়ে ক্রিশমাস ডিনার খাবে। ইহা এক অতীব প্রাচীন প্রথা। বৎসরের এগার মাস ঊনত্রিশ দিবস যেখানে যে কাটাক্ না কেন, এই এক বিশেষ দিবসে সকলেই ইচ্ছা করে এবং চেষ্টা করে, পিতামাতার কিম্বা পিতামহ ও পিতামহীর আশ্রয়ে সমবেত হয়ে প্রেমের ও স্নেহের, প্রীতির ও শ্রদ্ধার বিনিময় ক'রবে। ক্রিশমাসের সময় নাকি কোন রকমের চিত্তবিকার কি মনোবাদ, কোন রকমের হৃদয়ের ব্যথা বা মনোমালিন্য রাখতে নাই। to forgive র অতল-কন্যা পিতামাতার অমতে স্বামী বরণ ক'রে তাঁদের স্নেহের অভাজন হয়ে সবৎসরকাল তীব্র বেদনায় কালাতিপাত করেছেন, আজ তাঁর জন্য স্নেহাধার জনক জননীর স্নেহ-বাহু প্রসারিত। যে পুত্র কোন অবাধ্যতার বশবর্ত্তী হয়ে, পিতার বিরাগভাজন হয়েছিলেন, আজ তাঁহার জন্য পিতার ডিনার টেবিলের এক অংশে একটী ডিশ রাখা হয়েছে। যে আত্মীয় কোন কারণ বশতঃ মনোমালিন্য সংঘটন করেছিলেন, আজ আপনি তার স্বাস্থ্যকল্পে এক ফোঁটা মদিরা পান ক'রছেন। কেননা, এদিনে ক্ষমা ও বিস্মৃতি প্রত্যেকের জীবনের নীতি। আপনি জিজ্ঞাসা ক'রবেন, বাস্তবিক কি ইংরাজ এই নীতি অনুসারে কার্য্য করে, না কেবল কথার কথা? না, কথার কথা নয়। আজ বাস্তবিকই সকল ইংরাজ হৃদয় খুলে প্রাণের সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বিতরণ করে। এ ভাবটী বড়ই চ'খে লাগে বলেই আমি আরো বিশেষ ক'রে বল্লেম। আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে বিজয়ার দিন